অনুষ্টুপ

শীত-গ্রীষ্ম সংখ্যা ২০০৫

পত্রিকাটি ধুলো খেলার প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন : হস্তীসূর্য

স্ক্যান করে দিয়েছেন : সৌমেন্দ্র পর্বত

এডিট করেছেন : সৌমেন্দ্র পর্বত ও সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

অ নু ষ্টু প

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

৩৯তম বর্ষ : দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংখ্যা

১৪১১

সূচি

প ত্রি কা র ক থা

স ম্পা দ কী য়

নেতা : শঙ্খ ঘোষ/৭

শব্দসংলাপ : সৌরীন ভট্টাচার্য/৮

স ং স্কৃ তি স মা চা র

ইগ্‌-নোবেল/ঘৃণ্যোবেল পুরস্কার : আশীষ লাহিড়ী/১৩, শান্তি? : অরুন্ধতী রায়/১৬, নগরোন্নয়ন, বিকেন্দ্রীকরণ ও শেওড়াফুলি লোক্যালের কাহিনি : ইন্দ্রজিৎ রায়/২৭, কেন্দ্রীয় বাজেট : ২০০৫-০৬ : দেবনাথ মুখোপাধ্যায়/৩২, 'লেফট ইজ রাইট' একটি নতুন স্লোগান : নয়ন পাল/৩৬, ব্ল্যাক : ভিন্ন প্রতিক্রিয়া : পরমব্রত দত্ত/৩৮, কল্যানী নাট্যচর্চা কেন্দ্রের খোয়াবনামা : দিবাস্বপ্ন নয়, স্বপ্নের বাস্তব জাল : হার্দিকব্রত বিশ্বাস/৪১, সুনামির অন্তর্বাস ও আমাদের নামষ্কাম : ধর্মদাস অধিকারী/৪৪,

পু স্ত ক প রি চ য়

ধর্ম, রাজনীতি, ভারতীয় সমাজ : সুধীর চক্রবর্তী/৪৯

উপনিবেশের গল্প : সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়/৫৪

প্র ব ন্ধ

পালাগানের বিষয়, কাহিনীর গঠন-কাঠামো ও ইতিবৃত্ত বিচার : আলীম আল রাজী/৫৯, বাংলার শ্রমজীবী মেয়েদের উনিশ-বিশ : শাশ্বতী ঘোষ/৮৮, জাতীয় সংগ্রামে যৌবনবাদ : অনুরাধা রায়/১০৩, ছিম্‌ছাঙর দুটা পার : মানস রায়/১৪৫, উত্থান : নেপালী প্রবাদ : কর্ণ থামী ও শৈবাল রায়/১৫১

এক গুচ্ছ ক বি তা

যুগান্তর চক্রবর্তী/১৬৯

দু টি ক বি তা

নির্মল হালদার/১৭৩, সন্তোষ মুখোপাধ্যায়/১৭৪, রূপা দাশগুপ্ত/১৭৫, অজিত বাইরী/১৭৬, হিন্দোল ভট্টাচার্য/১৭৭, সৌমনা দাশগুপ্ত/১৭৯, অর্ণব পাণ্ডা/১৮০, বল্লরী সেন/১৮১, জয়ন্ত জয় চট্টোপাধ্যায়/১৮২

ক বি তা ব লি

আনন্দ ঘোষ হাজরা/১৮৩, বিশ্বনাথ গরাই/১৮৪, সৌগত চট্টোপাধ্যায়/১৮৪, রুদ্র পতি/১৮৫, শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়/১৮৫, সব্যসাচী মজুমদার/১৮৬, অর্ণব চক্রবর্তী/১৮৭, অভিমন্যু মাহাত/১৮৭, অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়/১৮৮, স্নেহাশিস পাল/১৮৯, সোনালি বেগম/১৮৯, বিশ্বজিৎ মাইতি/১৯০, রবীন দত্ত/১৯০, দিলীপকান্তি রায়/১৯১, মৌসুমী চক্রবর্তী/১৯২, অসিত দাস/১৯৩, তমাল মুখোপাধ্যায়/১৯৪, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়/১৯৫, শোভন ভট্টাচার্য/১৯৫, সুস্নাত চৌধুরী/১৯৬,

গ ল্প

শিকড় : অভিজিৎ সেন/১৯৯

ক্রো ড় প ত্র : ১

'পথের পাঁচালী' ৫০ বছর/২১৩

ক্রো ড় প ত্র : ২

ব্যক্তিগত : পাঁচের দশক/২৫৭

অ নু ষ্টু প/১৯৬৬—২০০৫

সম্পাদক অনিল আচার্য

সম্পাদকীয় সহযোগী গৌতম সেনগুপ্ত : অভীক মজুমদার

সহযোগী সুশীল সাহা

কার্যালয় সচিব আশিস ঘোষ

কর্মসচিব অতীশ ঘোষ

প্রচ্ছদ দেবব্রত ঘোষ

বর্ণবিন্যাস কমল পাঁজা

মুদ্রণ ৬৫ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট

দাম ৬০্ টাকা

সডাক ৮০্ টাকা

পত্রিকার কথা

অনুষ্টুপ শুরু হয়েছিল ১৯৬৬ তে এখন ২০০৫। পট-পরিবর্তন হয়েছে অনেক। বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ, জরুরী অবস্থার দাবদাহ, এনডিএ পেরিয়ে ইউপিএর যুগ পর্যন্ত অনুষ্টুপ এখনো রুগ্ন হলেও জীবিত। কী প্রকারে বেঁচে ছিল এবং এখনও বেঁচে-বত্তে আছে, সে ইতিহাস অন্য। কেউ কেউ বলছেন সমাজটা তেমন করে বদলায়নি বলেই বেঁচে আছে পত্রিকাটি। আবার কেউ বললেন, 'আপোস! সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আপোস করে গেছে, তাই বেঁচে আছে। শুধু বেঁচে নেই, গায়-গতরে কি ঢাউস দেখছেন না! সাতটা বাঘেও খেয়ে শেষ করতে পারে না। কোত্থেকে আসে এত রেস্ত? সরকারের উচিত এইসব ঢাউস পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বন্ধ করে শীর্ণকায় এবং উঠতি পত্রিকার দিকে নজর দেওয়া। তাছাড়া সরকারের খেয়ে সরকারের পরে এরা সরকারি দলের জয়গান করে না, এরা কী ভয়ঙ্কর এনিগ্‌ম্যাটিক, গেলাও যায় না, ফেলাও না। মহা ঝামেলা! কোনও দলীয় চরিত্র এদের নেই! এদের রেখে কী লাভ!' কিন্তু, তবুও জগাই লড়ে, আর অনুষ্টুপ বেঁচে থাকে।

অস্বীকার করা যায় না, অনুষ্টুপ বরাবর একরকম থাকে নি। জনগণের পত্রিকা হবার রাজপথে সে নেই, কবেই বা ছিল? তবে সময় সারণি বেয়ে সে একের পর এক বিষয় ও সমস্যা নিয়ে কাজ করেছে। বহু লেখক ও বন্ধু অনুষ্টুপে এসেছেন, কাজ করেছেন। তাদের কেউ কিছুদিন ঘনিষ্ঠভাবে থেকেছেন, তার পর সে বাঁধন আলগা হয়ে গেছে। কেউ কেউ অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেছেন, আবার অনেক বন্ধু নিঃশব্দে নীরবে পাশে থেকেছেন, সত্তরের সেই ঝোড়ো দিনগুলো পেরিয়ে আজও, আজ পর্যন্ত। সবাইকে নিয়েই চলতে চেয়েছি আমরা। কোথাও পেরেছি, কোথাও পারি নি। কিন্তু সবার কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ।

অনুষ্টুপ তার চিন্তাভাবনার ধারাবাহিকতা সত্ত্বেও বেঁচে থাকার জন্য, অস্তিত্বকে এবং ভিত্তিকে দৃঢ় করার জন্য চেষ্টা করেছে নতুন চিন্তাভাবনাকে তুলে ধরার। পত্রিকাটি তাই পৌনঃপুনিকতার আবর্তে জড়িয়ে যায় নি। বিতর্ক এবং চিন্তাকে সে স্থান দিয়েছে সর্বাগ্রে। একই লেখকের পুনরাবৃত্তি করে যাওয়া, বা একই ধরনের লেখার পৌনঃপুনিকতা ঘটে যায়, যখন একধরনের এবং একই লেখকের লেখা অনবরত প্রকাশিত হয় একটি পত্রিকায়। সরে যান পাঠক। তাদের ধারণা হয় কী বেরোবে জানাই আছে, সুতরাং পড়ে কী হবে?

নতুন শতাব্দীতে এসে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছি আমরা। অনেকটা দৌড়ে হাঁফিয়ে গেছি। একটু আত্মবিচার ও আত্মবিশ্লেষণ করার বিশেষ দরকার। সেটা আমাদের করা কর্তব্য, আমরা করব। যদি কেবল আমাদের পরিকল্পনাকে একটু ধৈর্য ধরে মেনে নেয়া যায় তাহলে অনুষ্টুপ হয়তো প্রকৃত মর্যাদার অধিকারী হবে। লেখকের লেখা আরও বেশি সংখ্যক সিরিয়াস লোক পড়বেন। বছরে যতগুলো সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তার প্রত্যেকটিকে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে হবে, তাই এই পরিকল্পনা। শারদীয় সংখ্যায় সব লেখা ঠেসে দিলে তা হয় না। অনুষ্টুপ তো কোনও বড় বাণিজ্যিক পত্রিকা নয়, তাই আহার ও আহার্যর মধ্যে একটু ফারাক রাখতেই হয়। আমরা নিশ্চিত লেখক, পাঠক এবং বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।

অনেকে বলেছেন দুঃখবাদী ঘ্যানঘ্যানানি বন্ধ করুন। বন্ধ করলাম। তবে এখন যা লিখলাম, তাই বা কী?

সম্পাদকীয়

স্রোতে গা না ভাসালে আজকাল বড় বিপদ। কোনও প্রতিবাদ না করে সব কিছু মেনে নিয়ে বলতে পারলে ভালো। যদি তাও না পারা যায়, প্রতিবাদের আল্‌গা ভান করে চলতে পারলেও সুখী থাকা যায়। সর্বদাই যে খাতায় নাম লেখাতে হবে তার কোনও মানে নেই। খাতায় নাম লেখালে দায়িত্ব এসে যায়। দশচক্রে ভগবানের ভূত হবার আশঙ্কা থেকে যায়। খাতায় নাম লেখালে যে খুব অসুবিধা হয়, তাও নয়। তার হ্যাপাও কিছু কম নয়। খাতা বলতে কিসের খাতা? কীভাবে সে খাতায় নাম তুলতে হয়। খাতায় নাম না তুলে কীভাবেই বা ভালো থাকা যায়? এসব নিয়েই আজকের কথা।

গ্রামের মানুষ হলে খাতায় নাম লেখাতেই হবে। সম্ভব হলে শাসক দলে। খাতায় নাম লেখালে গ্রাম-পঞ্চায়েতের সদস্য, সভাধিপতি থেকে শুরু করে এম্ এল্ এ, মন্ত্রী, লোকসভার সদস্য, স্পিকার ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পর্যন্ত হওয়া যাবে। রাজ্য বা কেন্দ্রের অধীন স্বশাসিত সংগঠনের সভাপতি, ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তা, স্কুল, কলেজের গভর্নিংবডির সদস্য, আরও অনেক অনেক কিছু হওয়া সম্ভব। খ্যাতি, পুরষ্কার সব কিছুই জুটবে, যদি খাতায় নাম লিখিয়ে ঠিকমত পার্টির সদস্যপদ ব্যবহার করা যায়। যখন যে দল ক্ষমতায় থাকবে তখন সে দলে নাম লেখানো 'জ্যোতিষীর মতে' ভালো। আপনি তখন আর সৌভাগ্যের পেছনে দৌড়বেন না, সৌভাগ্য আপনার পশ্চাতে ধাবমান হবে। তাহলে ব্যাপারটা এতই সহজ? খাতায় নাম লেখালেই যদি সবাই সব পেত তবে তো সবাই নাম লেখাত। সবাই সবাইকে শাসন করতে পারে নাকি? এ-সব বাজে কথা। সবাই শাসক হয় না, তাহলে শাসিত হবে কে?

তাছাড়া গণতন্ত্র-এর অর্থ-ই তো দলীয় শাসন, নির্বাচন এবং মোদ্দা কথা হলো ক্ষমতা-দখল করা। তাহলে এত সব ঠেস-দেওয়া কথা লিখে কী লাভ? এব্রাহাম লিঙ্কন, লেনিন, মাও-সে তুঙ্ এত সব মহান মানুষ তো দলের খাতায় নাম লিখিয়েই মহত্ত্ব অর্জন করেছেন। এখানে খাতার মানুষ, আর

সাধারণ মানুষ আলাদা হবে কেন? চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, মাফিয়া তো খাতায় নাম লেখায় না। তাদের খাতায় নাম ওঠে। হ্যাঁ, তাদের নাম ওঠে পুলিসের খাতায় বা আইনের খাতায়। নাম তুলতে গেলেই হলো? নাম তোলা কি এতই সোজা? দলের অদৃশ্য খাতায় এদের নাম থাকে।

এছাড়া, লেখক, সাংবাদিক, কবি, অভিনেতা, চিত্রপরিচালক প্রভৃতি মানুষের নাম এমনিতেই খাতায় উঠে যায়। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, সুকান্ত, নজরুল, সত্যজিৎ, সুনীল প্রভৃতিদের নাম সবরকম ক্ষমতার খাতায় থাকে। এঁরা হলেন সর্বদলের কাঁঠালি কলা। সুতরাং খাতায় নাম লেখাতে পারলেই সবকিছু পাওয়া যায় না। তার জন্যে, থাকে বলে এলেম্ লাগে।

এ-কথা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বোপার্জিত স্বনামধন্য মানুষের ক্ষেত্রে। কপিলদেব, সৌরভ, সৌমিত্র-দের মত আন্তর্জাতিক নাম কি তাঁদের কোনও খাতায় তুলতে হয়? অমিতাভ বচ্চন্, হেমা মালিনি, শত্রুঘ্ন সিন্‌হা, ধর্মেন্দ্র, সুনীল দত্তদের জন্য সব দলের খাতা হাট্ করে খোলা। তাদেরও কি লোকসভার সদস্য থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হতে খাতায় নাম লেখার দরকার হয়নি?

সুতরাং খাতায় নাম লেখানো কথাটা বাঙালি মাত্রই নিন্দার্থে নিয়ে থাকে। যেমন (যৌনকর্মীর) বড়খাতায় নাম লেখানো, ইত্যাদি। তাই, খাতা, খাতা বলে নাসিকা কুঞ্চন করা আপনার অন্ততঃ শোভা পায় না। দেখবেন, আপনিও কবে, কখন এবং কোন খাতায় নাম লিখিয়ে ফেলেছেন, আপনি নিজেও তা জানেন না।

ভালো লোক ও খারাপ লোক চিরকালই আছে। জ্যোতির্ময় পুরুষ বা সুবোধ বালক দেখে আপনার কষ্ট বা হিংসে হচ্ছে। আগেও বলেছি, এখনও বলছি, খাতায় নাম লেখান, আর নাই লেখান, ধান্দাবাজি আপনাকে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে করতেই হবে। কেননা ২০০৫-এর সাম্যবাদের নয়া বৃন্দাবনে সেটাই দস্তুর।

নেতা

শঙ্খ ঘোষ

ছিলাম বুঝি তবে অগাধ ঘুমে
হঠাৎ খুলে গেছে চোখের পাতা
কাদের দেখি আজ কাছে বা দূরে দূরে
এ শুধু রাশি রাশি নষ্ট মাথা!

অনেকদিনই চোখ রুদ্ধ ছিল
এখন চেয়ে দেখি হাত-পা বাঁধা
যা-কিছু বলি তার উলটো ঘটে যায়
অন্তহীন এক জটিল ধাঁধা!

তবে কি এতদিন করিনি কিছু?
ঘুমেরও ভিতরে কি ছিল না হাঁটা?
সমাজবিরোধী-বা বলব কাকে আর
পথের মোড়ে মোড়ে পথের কাঁটা!

ভাবি তো পাদপীঠে দাঁড়িয়ে ঠিকই
কোথায় দিশা মেলে বলব সেটা—
আসল কথাটাই বুঝিনি আজও তবু
কেই-বা নীয়মান কেই-বা নেতা!

শব্দসংলাপ

সৌরীন ভট্টাচার্য

সাপের খোলস ছাড়ার মতো সব পোশাক ফেলে রেখে একদিন বেরিয়ে আসতে ইচ্ছে করে তার। সংসার ঠিক সইতে পারে না ওসব। অতটা বিদ্যুৎশক্তি ধারণ করা যায়ও না সহজে। জমাট মেঘের চাঁই লাগে। তাও কড়াক্কড় আওয়াজ করতে করতে বেরিয়ে আসে বুক চিরে। অত ঝক্কি কেন পোয়াতে যাবে সংসার। এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে হাতের লেখা মকশো করার ছেঁড়া কাগজে কিংবা কলম সচল রাখার জন্য পুরোনো খামের পিছনে লিখেও ফেলে কথাটা একদিন। বড়ো ধুরন্ধর লেখক ছিলেন এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সব জানতেন, ঠিকই বুঝতেন সব কিছু। নির্ঘাত কবিতার দুটো পঙ্‌ক্তি লিখেই তার আগে পরে হয়তো ঘাসের আড়াল চাপা দিয়ে লুকিয়ে রাখার মতো এমন দুটো একটা লাইনে তা ঢেকে রাখতে জানতেন যে হিংসা না করে পারা যায় না ভদ্রলোককে। সম্ভবত বদনামের ভাগীদার হতে হবে জেনেও। তা হোক। তবু পিছনে তো ট্যাঁড়া পিটোবে না, ফেউ লেলিয়ে দেবে না তো কেউ। গুপ্তধন অমনি ঢাকা-চাপা দেওয়াই থাকে। রহস্য-লাইন ভেদ করতে যে পারে সেই পারে। তা ছাড়াও আছে ব্যাখ্যার ছলে ঘুলিয়ে দেওয়া। যাও ঘুরে মরো। হিম্মৎ থাকলে পথ খুঁজে বাড়ি ফিরো, তখন দেখা যাবে। কত যে বিছানো থাকে ছল-চাতুরী মায়াজাল। বুড়ো হাড়ে এক একদিন কাঁপন লাগে প্রলয় ঝড়ে।

> এটা ঠিক যে কুয়াশা আর ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে ভাষা, আর সেজন্যে কেবল সংবাদপত্রের শিরোনামকেই দায়ী করে লাভ নেই। আমাদের লুব্ধতা ও হীনতা, আমাদের বৃহৎ সামাজিক বাজার চারদিক থেকে আমাদের ভাষাকে করে তোলে নিঃশীল, নিঃসাড় আর ততই চারদিকে জেগে ওঠে শব্দরৌরব, নির্জনন আলাপে-বিলাপে বৈঠকের পর বৈঠক কেটে যায়, লেখার পর লেখা ভরে ওঠে উপলব্ধিহীন উচ্চারণে, যে-কেউ এসে বলতে পারেন আমাদের এ হলো প্রকাণ্ড এক শব্দজীবী সংস্কৃতি, ফাঁপা, অলস, ভণ্ড। এই মিথ্যে আর ফলহীন কথা যে কেবল রাজনৈতিক বিচারের বেলাতেই দেখা দিচ্ছে তা নয়, কবিতাও সেই একই মিথ্যার দ্বারা লাঞ্ছিত।

শ্বাস-প্রশ্বাসময় যে-কোনো রচনার নামই কি কবিতা? কেন নয়? অন্তত শব্দে যে রচিত এটুকু বলা তো চাই। তবে কি কবিতা কোনো আবেগের নাম? তাই বা কেমন করে হবে। আবেগ কি রঙে নেই, সুরে নেই। তা না হলে ছবি, গান এসব দাঁড়ায় কিসের জোরে। আবেগ শব্দহীনতায় নেই? চলচ্চিত্র বা নাটকে কত যে তুঙ্গ মুহূর্ত তৈরি হয় নৈঃশব্দ্যে। শব্দ আর শব্দের ফাঁক ভরাট করার এক কারুকাজ। শব্দের এক বড়ো ঝকমারি তার অর্থ। অর্থের গায়ে হাত রেখেই আবার শব্দ নিজেকে ছাড়িয়েও যায়। তাই বাচ্যার্থ, তাই ব্যঞ্জনার্থ, তাই অভিধা

লক্ষণা ইত্যাদি ইত্যাদি যত কূটকচাল। কিন্তু এই শব্দ থেকে নিস্তার নেই কিছুতে। তার সমস্ত বাধ্যতার কাছে সমর্পণ চাই। সেই সমর্পণের চালেই নামতে হবে অসম খেলায়। শেয়ালের ধূর্ততায় সজাগ থেকে হঠাৎ কোনো অসতর্ক প্রহরে অশাস্ত্রীয় লঙ্ঘনে ঢুকে যেতে হয় বেহুলার বাসরঘরে শেষ ছোবলের আশায়।

প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চিরন্তন অভিযান এই জন্যেই। প্রতিষ্ঠান মেনে নেয় এই ষড়যন্ত্রময় অবস্থান, মানিয়ে নিতে চায় অন্যকে দিয়েও। একটা ভুল সামাজিকতায় সে ঢেকে রাখতে চায় সত্যের মুখ, তাই প্রতিষ্ঠান মিথ্যাচারী। এই মিথ্যার প্রতাপ এতটাই যে সাধারণ মানুষকে সে ভুলিয়ে দিতে পারে জীবনের মানে।

কত মিথ্যাচার তাহলে ছড়ানো তার চারদিকে। মিথ্যা ছড়ানো প্রতিষ্ঠানে, মিথ্যা ছড়ানো খ্যাতিতে, এমনকি মিথ্যা ছড়ানো নির্জনেও। কলরব মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণ থেকে সরে এলেই কি রেহাই জোটে। কোন অলৌকিক ঠাটে তার দম বন্ধ হবার উপক্রম হয় তা সে জানবে কেমন করে। ডুবন্ত মানুষ নাকি চোখে নানা রং দেখে। এই কি তবে সেই রঙিন বিচ্ছুরণ। তবে কি শেষ পর্যন্ত শব্দেরই সঙ্গে তার লড়াই। কে জানত শব্দ এমনি করে শোধ নেবে একদিন। আজ আর কোনো শব্দকেই তার বিশ্বাস হয় না। শব্দের কোনো প্রচলিত অর্থই আজ আর তার নিরাপদ আশ্রয় মনে হয় না। কিন্তু ছদ্মবেশ খুব জরুরি তার কাছে। এমন তেপান্তরে পাড়ি জমাতে হয় যাতে সভ্যতা কোনোমতে তার নাগাল না পায়। সভ্যতার দৌড় শেষ পর্যন্ত কতদূর বা কতটুকু এ তার এক রকমের আন্দাজ আছে। আফগানিস্তানের দুর্গম পাহাড় পেরোনো কি সত্যিই সভ্যতার এলেমে কুলোবে। সত্যিই ধোঁয়া দিয়ে কোনো গুহা থেকে বের করা যায়নি কোনো লাশ। অর্থের সীমা ওইটুকুই। শব্দের জারিজুরি ওখানেই শেষ।

ঠিক, সত্য জীবনে পৌঁছবার সমস্ত পথ রুদ্ধ করে রেখেছে আমাদের প্রতিষ্ঠান। সব দরজা বন্ধ। কিন্তু কত অসংখ্য এই দরজা, শৈলেশ্বর? কেউ তা জানে না। কেউ জানে না যে পরম্পরায় কতগুলি দরজা খুলবার পর তবে দেখা যাবে সম্পূর্ণ আলো। কিন্তু কেউ কেউ জানে যে দরজা আছে এবং দরজা বন্ধ।

পরাবাস্তব সব গদ্যপঙ্ক্তি রচনা করে করে কোন দায় তাহলে মেটানো সম্ভব তোমার পক্ষে। গোপন হত্যাকাণ্ডের পর রাত্রির অন্ধকারে কবরের মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে কী চাও তুমি? আলো-ঝলকানো হীরকদ্যুতির সেই ঘর, নাকি নিঃশর্ত সমাধির জমাট অন্ধকার। নাকি এই দুই বিপরীত বস্তুত সমার্থক। প্রক্রিয়া তো একই। ঘাম ঝরাতে ঝরাতে কোদালের কোপের পর কোপ ফেলে মাটিই সরাতে হয়। সে তুমি গুপ্তধন খুঁজে বার করো আর ছেঁড়া ন্যাকড়ার নষ্ট পুঁটলি পুঁতে ফেলো, যাই হোক না কেন। আত্মআবিষ্কার আর আত্মপ্রকাশ কি তবে একই কাজ নাকি। আর দনুজদলনী সেই জগৎসংসার? আত্মরিক্তা সে ভীষণা।

কবিকে তাই জেনে নিতে হয় যে সকলের কথা বলা আর সকলের জন্যে বলা একই জিনিস নয়। সত্যি সত্যি সকলের কথা বললে সে আর সকলের জন্য থাকে না হয়তো, আপাতত তা হয়ে দাঁড়ায় কয়েকজনের জন্য। এই কয়েকজনের সম্প্রসারণের মধ্যেই আছে যোগ্য বিদ্রোহ, কিন্তু তার জন্য সময় চাই, ধৈর্য চাই, উপেক্ষা সহ্য করবার বিক্রম চাই।

কিন্তু সম্প্রসারণেই সর্বনাশের লুকোনো বীজ থেকে যায় যদি। যদি সংহতি চাই? নির্ভরযোগ্য কোনো কেন্দ্র যদি চাই? কারুর মুখের দিকে তাকানোর দায় নেই কারো? কোন টানে বাঁধা থাকে নক্ষত্রপুঞ্জ। মহাকর্ষের অলক্ষ্য ক্রিয়াশীলতা কি সাধ্য সুঠাম কোনো গঠনতন্ত্রে? আতপ্ত নিশ্বাসে মোচন করো অবিচল সব মায়াজাল। একবার দাঁড়াও দেখি পবিত্র নগ্নতায়, তমসাচ্ছন্ন বলয়ের ওপার থেকে দমকে দমকে উছলে-পড়া আলো পান করো শরীরের প্রতিটি রোমকূপে। ভরা কলস টলটলিয়ে উঠুক, ফেনায় ফেনায় ভাসিয়ে নিক তোমাকে। আচ্ছন্ন তুমি মুক্তিস্নানে তীর্ণ হও।

শব্দবাহুল্যের বাইরে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞাপনের বাইরে দাঁড়িয়ে, ভুল আস্ফালনের বাইরে দাঁড়িয়ে সত্যিই যদি নিজেকে, নিজের ভিতর এবং বাহিরকে, আগ্নেয় জীবনযাপনের বিভীষিকার সামনে খুলে দিতে পারেন কবি, সেই হবে আজ তাঁর অস্তিত্বের পরম যোগ্যতা, তাঁর কবিতা।

নতুন সম্ভাবনার মতো স্পন্দমান। ডালপালা পাতা ও কুঁড়ি উচ্ছলিত। সংবৃতির শিক্ষা তখনো শুরু হয়নি। শব্দের অনাবৃষ্টি দেখা দেয়নি তখনো। রথ দেখার সঙ্গে কলা বেচা ছাড়াও যে আরো কত কাজ সেরে নিতে হয়। সংসারের অনটন কাকে বলে সে বুঝতে সময় লাগে। সাধে কি আর কেউ গেঁড়ি গুগলি খেয়ে দিন কাটায়। যত রাজ্যের অনাশব্দও কুড়িয়ে বাড়িয়ে কোনোমতে দিন গুজরান। শব্দ তাহলে আজ শোধ নিল। সব দাম মিটিয়ে দিতে হয়। রক্তমাংস শিরা উপশিরা টনটনিয়ে ওঠে, তবে না কথা ফোটে। ফোটে? ফোটবার কথা, ফোটে না! কথা শব্দ খুঁজে ফেরে। কথার মাপে জুতসই শব্দ মেলে না কিছুতে। শব্দে কিছুতেই ভরে না কথার সবটুকু। সবটুকু মানেই বা কী। শব্দের হাতে হাত রেখে কথা ছড়িয়ে যায়, যেতে পারে। আবার ভুল শব্দে তা আটকেও যায়। শব্দ-কথার একাত্ম সাধনায় নাকি যোগসিদ্ধি। বাগর্থ ইব পার্বতী-পরমেশ্বর।

আমাদের সমস্ত লেখার জগতে এই প্রসাধনের চর্চা আজ বাধাহীন হয়ে উঠছে আবার, আমরা অনেকেই তার শিকার। সাংসারিক জীবনে যেমন সমস্ত লক্ষ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠছে মার্চেন্ট অফিস, নিঃসার এবং নিঃসাড় চালাক-চতুরতাই যেমন হয়ে উঠছে জীবনের মূল ধ্যান, তেমনি আমাদের সাহিত্যজীবনেও ভাবছি কেবল শব্দ-সাজানোর চাতুর্য, দেখতে শুনতে ঝকঝকে হয়ে ওঠাকেই মনে করছি শিল্পের এবং জীবনের চরিতার্থতা।

আরো কত প্রলোভন আছে। চোখের সামনে আরো কত মায়াবী হাতছানি, আরো কত রংবাহার। জাদুবিদ্যা ও হাতসাফাইয়ে ঘোর লাগে বইকি।

আড়াল আড়াল আড়াল। আরো নির্মোক। আরো ভালোমানুষি সাজ। আরো বেচারা চেহারা। আরো আটপৌরে বসতি। শব্দখরায় আরো জর্জরিত। বিনাশবিন্দুতে পৌঁছেও সর্বশরীরে পুষে রাখো ঘাতকের রোখ।

না বললেও চলে। ছোটো অক্ষরের লাইনগুলি শঙ্খ ঘোষের 'শব্দ আর সত্য' বইয়ের বিভিন্ন জায়গা থেকে নেওয়া।

সংস্কৃতি সমাচার

ইগ্-নোবেল/ঘৃণ্যোবেল পুরস্কার

ধরা যাক ভারত-কলঙ্ক পুরস্কার নিতে লালু এসেছেন, আর পুরস্কার দিচ্ছেন ভারতরত্ন অমর্ত্য সেন। কিংবা ধরুন পদ্মবিদূষণ পুরস্কার পাচ্ছেন শঙ্করাচার্য ঠাকুর, দিচ্ছেন পদ্মবিভূষণ পণ্ডিত রবিশঙ্কর। না, এ রকম আমরা ভাবতে পারি না। কারণ আমরা বেরসিক। চুরিচামারি-জোচ্চুরিতে আমরা অগ্রসর দেশগুলোকে হাফ টাইমে ছ-গোল দিতে পারি, কিন্তু তা নিয়ে ম্যারাপ বেঁধে রসিকতা? ওতে আমাদের জাত যায়।

অগ্রসর দেশগুলোর সঙ্গে ঐখানেই আমাদের তফাৎ। ওদের দেশে গণ-বিবেক বলে একটা কোনো পদার্থ যেভাবেই হোক টিকে আছে। তার নানারকম বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। হার্ভার্ডের ইগনোবেল পুরস্কার (Ignobel Prize) তারই একটা উদাহরণ। প্রতি বছর প্রায় আসল নোবেল প্রাইজের মতোই ঘটা করে এই প্রাইজ দেওয়া হয়। অনেক সময় সত্যিকারের নোবেল-প্রাপকরা সেই পুরস্কার বিতরণ করতে আসেন।

রসায়নে কোকাকোলা (ইং)

এবারের, মানে ২০০৪ সালের কথাই ধরুন না। এবারে রসায়নে ইগ-নোবেল (বাংলায় কি ঘৃণ্যোবেল বলা চলে?) পেয়েছে কোকাকোলা কোং (ইংলন্ড)। অসাধারণ রসায়নিক কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁরা এই পুরস্কার পেলেন। ঘটনাটা এই রকম। কোকাকোলা (ইং) কোম্পানি 'দাসানি' (নামের মধ্যে কোথায় একটা ভারতীয় গন্ধ আছে না?) নামের একটি যুগান্তকারী জল বাজারে ছাড়েন। তাঁদের দাবি, সে-জল সাক্ষাৎ মা গঙ্গা-খুড়ি, পিতা টেম্‌সের কাছ থেকে সংগৃহীত। আগমার্কা পবিত্রতা। শুধু পবিত্রতা নয়, বিশুদ্ধতার চরম মাত্রা বজায় রাখায় জন্য তাঁরা সেই বোতলিত জলে একটি বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্য মেশান। সেই দুর্ধর্ষ প্রযুক্তি নাকি নাসা-র মহাকাশযান-ঘটিত আধুনিকতম গবেষণা থেকে আহরিত। এর ফলে যে-পণ্যটি তৈরি হল, তা, তাঁদের বিজ্ঞাপনের কপি-লেখকদের মতে, রূপেগুণেস্বাদেশুদ্ধতায় সারা বিশ্বে অনন্য। অথচ এমনই কপাল, ছ মাস ঘুরতে না ঘুরতে প্রমাণ হল, ঐ জল মোটেই টেম্‌স নদীর নয়, নেহাৎই কলের জল (টালার জলের বিলিতি সংস্করণ আর কি!)। তার থেকেও বড়ো কথা, বিশুদ্ধকারী রসায়নিক 'ব্রোমেট' পদার্থটি ঘোর ক্যান্সারজনক। এমনকি যে-মহতী প্রযুক্তির নলপথে তাঁরা সশব্দে বাজার ভাসালেন, দেখা গেল তা অতি সাধারণ ও বহুব্যবহৃত রিভার্স-অস্‌মোসিস প্রযুক্তি ছাড়া আর কিছু নয়! (দ্রষ্টব্য, *দি গার্ডিয়ান*, ২০ মার্চ, ২০০৪)। বেচারি কোকাকোলা কোম্পানি চোখের জলে নাকের জলে ভাসতে

ভাসতে ঐ বোতলের জল বাজার থেকে তুলে নিতে বাধ্য হলেন। আহা, গরিব বেচারিদের না জানি কত লোকসান হয়ে গেল। তবে, কয়েক হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করলেই কোমলহৃদয় মালিকদের মনের কষ্ট কমে যাবে, এ আশা আমরা অবশ্যই রাখতে পারি। ইতিমধ্যে তাঁদের এই অসামান্য নৈতিক ও রসায়নিক কৃতিত্বের স্মারকস্বরূপ ইগ্-নোবেল কমিটি তাঁদের পুরস্কার দিয়েছে।

ভ্যাটিক্যান-অর্থনীতিতে ইগ-নোবেল

এ বছর অর্থনীতিতে ইগ্-নোবেল পেয়েছেন-না, চমকাবেন না-ভ্যাটিকান। গড-এর উদ্দেশে প্রার্থনার 'পার ক্যাপিটা কস্ট' তাঁরা অদ্ভুতভাবে কমিয়ে ফেলেছেন-প্রার্থনার 'আউটসোর্সিং' করে। এবং-হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন, সে-আউটসোর্সিংয়ের প্রধানতম ফলভোগী সকল দেশের রানি আমাদের এই জন্মভূমি। আমেরিকা ও ইউরোপে খ্রিস্ট-ভক্তের সংখ্যা ব্যাপক হারে কমছে, অথচ ভ্যাটিক্যানের জাঁকজমকের বহর কমছে না; ফলে মাথাপিছু প্রার্থনার খরচ প্রচণ্ড হারে বাড়ছে। এহেন ধর্ম-মন্দার পরিস্থিতিতে ভারতের বিভিন্ন রোমান ক্যাথলিক গির্জায় লোক জড়ো করে, নানা রকম 'হাইপ' তুলে প্রার্থনাকারীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে তোলা গেছে। ফলে, ইউরোপে মোট প্রার্থনাকারীর সংখ্যা যতই কমুক, তার অনেকটাই পুষিয়ে দেওয়া গেছে ভারতের প্রার্থনাকারীদের সংখ্যা দিয়ে। ধর্মীয় বিপণন ও গ্লোবালাইজেশনের এ এক অনবদ্য যুগলবন্দী। সবচেয়ে বড়ো কথা হল, শস্তা শ্রম। ভ্যাটিকানের চকঝমকের এক মিলিয়ন ভাগের এক ভাগ পেলেই হাঘরে ভারতীয়রা আহ্লাদে আঠারোখানা হয়ে যাক। কাজেই দলে দলে তারা বোঁদে আর গুঁজিয়ার লোভে চার্চে ভিড় করে, প্রার্থনা করে। এতে সব দিক বাঁচে। অর্থনীতিক্ষেত্রে এই অসামান্য উদ্ভাবনার স্বীকৃতিস্বরূপ এবার ভ্যাটিকান পেলেন ইগ্-নোবেল। আমরা অভিনন্দন জানাই ভ্যাটিকানকে, বিশেষত তাঁদের এদেশী হাতাদের, যাঁরা সম্প্রতি এক রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীর নামে কলকাতার সবচেয়ে হুল্লোড়বাজ ফুর্তিপথটি উৎসর্গ করে ধন্য হয়েছেন।

ভাববেন না এসব রাগের কথা। এর পেছনে আছে অকাট্য তথ্য, নির্ভুল অঙ্ক। প্রার্থনার আটউসোর্সিংয়ের প্রধান ফলভোগী হল কেরালার চার্চগুলো। প্রক্রিয়াটা এইরকম। ধরুন আমেরিকার মিল্ওয়কির কোনো লোক তাঁর প্রয়াত পিসেমশাইয়ের আত্মার সদ্গতির জন্য স্থানীয় চার্চে প্রার্থনার আবেদন করলেন। যে-চার্চ তাঁকে জানাল, যথেষ্ট সংখ্যক পাদ্রীর অভাব, তাই তাঁরা প্রার্থনা করতে অপারগ। তবে এটা বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যুগ, তাই দমে না গিয়ে তাঁরা ই-মেল ভ্যাটিক্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঐ প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে বললেন। ভ্যাটিক্যান জানাল, তাদের অবস্থা আরো খারাপ, লোকে আর বড়ো একটা পাদ্রী হতে চাইছে না, পাদ্রীর অভাবে এরকম অনেক প্রার্থনার অনুরোধ ইতিমধ্যেই ওয়েটিং লিস্টে জমে রয়েছে। তবে ভারতে এখন ধর্মের বাজার খুব জোরালো। তাই কেরালার অমুক 'ডায়োসিজে'র

তমুক বিশপ মহাশয়কে ই-মেল ফরোয়ার্ড (যুগটা তো বিজ্ঞান-প্রযুক্তির, ভুললে চলবে কী করে!) করে দেওয়া হল, যাতে তিনি ঐ আমেরিকান ভদ্রলোকের পিসেমশাইয়ের আত্মার সদ্‌গতির জন্য প্রার্থনা করে দেন-ভাষাটা মলয়ালী হলে ক্ষতি নেই, কারণ গড্‌ তো সব ভাষাই বোঝেন। তখন কিছু দক্ষিণার বিনিময়ে ভ্যাটিক্যানের হয়ে কেরালার ঐ গির্জা প্রার্থনা করে দিল। মিল্‌ওয়কি-র পিসেমশাইয়ের আত্ম কোচিনে শান্তি পেল। এরই নাম হল প্রার্থনার আউটসোর্সিং।

সাধারণত কেরালার একজন নেটিব পাদ্রী একটি ভারতীয় আআর সদ্‌গতির জন্য প্রার্থনা করলে দক্ষিণা পেয়ে থাকেন চল্লিশ/পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু আমেরিকান আত্মার দাম বেশি-তার জন্য তিনি পান আত্মা পিছু আড়াইশো টাকা। কাজেই তাঁর বাড়তি (উপরি নয়) রোজগার মন্দ হয় না। কেরালার অন্তর্গত কোচিনের এর্নাকুলাম-আঙ্গামালি ডায়োসিজ-এর উপ-বিশপ শ্রী সেবাস্টিয়ান আদ্যান্থ্রাথ জানাচ্ছেন, মাসে গড়ে সাড়ে তিনশোর মতো 'প্রেয়ার আউটসোর্সিং'-এর অনুরোধ আসে তাঁর কাছে এটা কেবল একটা চার্চের হিসেব। কোচিনের সিরিয়ান মালাবার চার্চের বিশপ-সঙ্ঘের মুখপাত্র রেভারেন্ড পল থেলেক্কাত আশ্বস্ত করে বলেছেন, 'প্রার্থনার নাম ডলার কিংবা ইউরোপ কিংবা টাকা যাতেই দেওয়া হোক না কেন, তার মধ্যে কোনো বৈষম্য করা হয় না, প্রার্থনা সবসময়েই আন্তরিক।' (দ্রষ্টব্য, *Marginal Revolution,* ইন্টারনেট, ১৪ জুন, ২০০৪)

সুতরাং প্রার্থনা-ব্যবসা মন্দা কাটিয়ে যে রমরমার মুখ দেখেছে, তাতে আর সন্দেহ কী! ওদিকে আড়াইশো টাকা মানে পাঁচ ডলারও নয়, তাই পিসেমশাইয়ের আত্মার সদ্‌গতি এত অল্পে হল দেখে তাঁর শ্যালক-পুত্রও মহাখুশি। ভ্যাটিক্যানও খুশি, ঠিকঠাক ধর্মের নিয়ম পালন করা গেল দেখে। সবচেয়ে খুশি আমেরিকা সেই স্থানীয় গির্জা-ক্লায়েন্টকে ঠিকঠাক সার্ভিস দেওয়া গেল দেখে। চারদিকে খুশির বন্যা।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম আর দুর্নীতি-এই দুই ক্রাচে ভর দিয়ে ভালোই এগোচ্ছে 'পাশ্চাত্য খ্রিস্টীয় সভ্যতা'। অপ্রয়োজনীয় এবং বিপজ্জনক বর্জ্য পদার্থের ভার আমাদের মতো গরিব দেশের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার অভ্যেস তাদের বরাবরই ছিল। এবার কি ধর্মও সেই তালিকায় ঢুকে পড়ল নাকি? আস্তাপুঁড় থেকে জঞ্জাল খুঁটে খেয়ে আমরাও নিশ্চয়ই ভালোই আছি, নইলে পার্ক স্ট্রিটের নাম বদ্‌লে এত আহ্লাদ কেন আমাদের?

আমেন।

আশীষ লাহিড়ী

শান্তি?
সিডনি শান্তি পুরস্কার গ্রহণের মুহূর্তে কিছু কথা

অরুন্ধতী রায়

সিডনি ফাউন্ডেশন জেনেবুঝে পরিকল্পিত ঝুঁকি নিয়ে পা ফেলছে এটিকে এখন একটি স্বতঃসিদ্ধ হিশেবে মেনে নেওয়া যায়। গত বছর যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে তারা ড. হানান আশ্রায়ুইকে শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করে। এবং এ বছর করছে আমাকে।

তবে তাদের জন্য আমার একটি বক্তব্য রয়েছে। আমি জেনেছি ড. আশ্রয়ইর জন্য একটি আস্ত পিকেটিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এটি কি বৈষম্য নয়? আমার অনুরোধ ফাউন্ডেশন যেন আমার জন্যও একটি পিকেটের ব্যবস্থা করে। আমি যা শুনেছি, তা থেকে মনে হয় খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না। তবে আজ সম্ভব না হলে আগামী কাল হলেও আমার কোনোই আপত্তি নেই।

এ বছর সিডনি পুরস্কার ঘোষণার পরপরই আমাকে যারা ভালো করে চেনেন তাদের কাছ থেকে নানা ধরনের প্রশ্ন পেতে থাকি : আমাদের জানা-মতে সবচেয়ে অনর্থ-প্রিয় ব্যক্তিটিকে কেন এ পুরস্কার দেওয়া হল? ওরা কি জানে না তোমার শরীরে একটিও শান্তিপ্রিয় হাড় নেই? এবং মনে রাখার মতো এই প্রশ্ন : অরুন্ধতীদিদি, সিডনি শান্তি পুরস্কার কাকে বলে? সিডনিতে কোনো যুদ্ধ থামানোর ব্যাপারে তুমি সাহায্য করেছিলে বুঝি?

নিজের তরফ থেকে বলতে পারি, সিডনি শান্তি পুরস্কার পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত। এ পুরস্কারকে আমি তবু একটি সাহিত্য পুরস্কার হিসেবে গ্রহণ করতে চাইব; আমার নামের সঙ্গে যে সমস্ত পদক ও পদবি যোগ করা হয়, আমি তাদের কোনটিই মেনে নিতে পারিনা, যেহেতু তা আমি নই—আমি একজন রাজনৈতিক সামাজিক কর্মী নই, গণআন্দোলনের নেতা নই, এবং নিশ্চয়ই 'কণ্ঠহীনের কণ্ঠ' নই। (আমরা নিশ্চয়ই জানি 'কণ্ঠহীন' বলে আসলে কেউ নেই। যাদের তা বলা হয়, তারা হয় জেনেশুনে উপেক্ষিত। নয় তো ইচ্ছাকৃতভাবে চুপ করিয়ে রাখা)। আমি একজন লেখক যে নিজের ছাড়া কারুর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। তাই এ কথা বলতে চাইলেও পারি না, যে এ পুরস্কার আমি শক্তিহীন, অসহায়, উপেক্ষিত মানুষের পক্ষে এবং শক্তিশালীর বিরুদ্ধে লড়াই-রত মানুষের

হয়ে নিতে চাই। কিন্তু এ পুরস্কার গ্রহণের মুহূর্তে আমি এ কথা কি বলতে পারি, যে এই ঘটনা সেই সব রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ, সেইসব বিশ্ব মূল্যবোধের সঙ্গে সিডনি ফাউন্ডেশনের একাত্মতা প্রকাশ করে। যে দৃষ্টিকোণ ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী ও সচেতন পৃথিবীব্যাপী কোটি কোটি মানুষ?

যে মানুষ তার সময়ের একটি বিশাল পরিমাণ প্রতিরোধের পরিকল্পনায় এবং উপরিস্তরের আপাত-শান্তির বিঘ্ন ঘটাতে চেষ্টারত, তাকে শান্তি পুরস্কার দেওয়া হলে সেটা একটি অদ্ভুত ও মজার ব্যাপার বলেই মনে হওয়ার কথা। আপনাদের হয়ত মনে থাকবে আমার স্বদেশ সামন্ততান্ত্রিক এবং সেই পরিবেশে শান্তি জিনিশটা উৎকণ্ঠার ও দুশ্চিন্তার বিষয়। মাঝেমধ্যে পুরোনো, বাসি হয়ে যাওয়া প্রবাদবাক্যেও সত্য ধ্বনিত হয় : ন্যায় ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠা কি করে সম্ভব। এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ ছাড়া ন্যায়প্রতিষ্ঠাই বা কিভাবে হবে।

আজকের দিনে শুধু ন্যায়ই নয়, ন্যায় নামক ধারণাটির ওপর পর্যন্ত উদ্যত আঘাত। সমাজের ভঙ্গুর, ক্ষণভঙ্গুর অংশগুলির ওপর আঘাত এতই সুসম্পূর্ণভাবে, একই সঙ্গে এতই চতুর ও নিষ্ঠুরভাবে হচ্ছে, চতুর্দিক থেকে অথচ লক্ষ্যকে বিঁধতে একটু অসুবিধে হয়না এমনভাবে, যে আমাদের ন্যায়ের সংজ্ঞাই হারিয়ে যায়। এমনকি যাদের সদিচ্ছা রয়েছে তাদের কাছেও ন্যায়ের মতো এমন চমৎকার ধারণাটিকে একটি প্রশমিত, ভাঙা রূপে দেখার অভ্যেস রয়েছে। তারা ন্যায়-এর বিকল্প হিসেবে মানবাধিকারের কথা ভাবে।

একটু ভেবে দেখলে এই মাপকাঠির পরিবর্তন কতটা দুশ্চিন্তার তা বোঝা যায়। সাম্যের ধারণাকে কিভাবে যেন শিথিল করে সমীকরণ থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটি একটি ধীর, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মতো। প্রায় অজান্তেই আমরা বিষয়টিকে এভাবে দেখতে শুরু করি : ধনীর জন্য ন্যায় এবং নির্ধনের জন্য মানবাধিকার। কর্পোরেট জগতের জন্য ন্যায়, তার আগ্রাসনে যারা ভুগছে তাদের জন্য মানবাধিকার। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য ন্যায়, আফগান ও ইরাকিদের জন্য মানবাধিকার। ভারতীয় উচ্চবর্গের জন্য ন্যায়, দলিত ও আদিবাসীদের জন্য মানবাধিকার (যদি তাও জোটে), শাদা অস্ট্রেলিয়-দের জন্য ন্যায়, আদিবাসী ও ভিনদেশীর জন্য মানবাধিকার (বেশির ভাগ সময় তাও নয়)।

এটি খুব পরিষ্কার যে পৃথিবীতে একটি অন্যায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রাখতে হলে মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটবেই। একটি বিশাল প্রস্থের মানবাধিকার লঙ্ঘন ছাড়া নয়া-লিবারাল প্রকল্পগুলি শুধুমাত্র পরিকল্পনার স্তরেই থেকে যেতে বাধ্য। কিন্তু ক্রমশ এই মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রক্রিয়াকে দেখা হচ্ছে একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রক্রিয়ার ভেতরে ছোটো একটি দুর্ঘটনার মত। যেন এই সমস্যাগুলি এমনই ছোটো যে কিছু এন. জি. ও.-র সাহায্য নিয়েই সেগুলি দুদিনে মুছে ফেলা যাবে। সেই কারণেই উত্তুঙ্গ সংঘর্ষ যেখানে, সেখানে মানবাধিকার কর্মকর্তাদের সংশয়ের

চোখে দেখা হয়। যেমন ইরাক বা কাশ্মীর। যে সব গরিব দেশে বৃহৎ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়া হচ্ছে, 'স্বাধীনতা' এবং 'উন্নয়ন' জাতীয় কথাগুলির গভীরে খুঁড়ে দেখা হচ্ছে, সেখানে মানবাধিকার এন.জি.ও-দের দেখা হয় আধুনিক যুগের মিশনারি হিসেবে, যারা সাম্রাজ্যবাদের কুৎসিত দিক ঢেকে একে সর্বাঙ্গসুন্দর দেখানোর চেষ্টায় নিয়েজিত। এর উদ্দেশ্য, রাজনৈতিক ক্ষোভ ও অশান্তি প্রশমিত করা, চালু ব্যবস্থাকে চালু রাখা।

মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই অস্ট্রেলিয়রা জন হাওয়ার্ডকে পুনরায় নির্বাচনে জয়ী করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেছে নিয়েছে। হাওয়ার্ডের অন্যান্য অনেক কাজের মধ্যে অবৈধভাবে ইরাক আক্রমণ ও দখলের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা বলতে হবে। ইরাক আক্রমণ পৃথিবীর ইতিহাসে একটি কাপুরুষোচিত অধ্যায় হিসেবে গণ্য হবে। পৃথিবীর সব চেয়ে ধনী দেশগুলি, যাদের কাছে অতুলনীয় পারমাণবিক ভাণ্ডার, যার ফলে তারা বিশ্বে বেশ কয়েকবার বিপর্যয় ও ধ্বংস ডেকে আনতে পারে, তারাই একত্র হয়ে পারমাণবিক অস্ত্র থাকার মিথ্যা অভিযোগ এনে চড়াও হয় একটি গরিব দেশের ওপর, জাতিসংঘকে ব্যবহার করে সে দেশকে নিরস্ত্র দাঁড় করায়, তারপর তাকে আক্রমণ ও দখল করে এবং এখন তাকে বেচে দেওয়ার তৎপরতা চালাচ্ছে।

ইরাক প্রসঙ্গে কথা বলার এ উদ্দেশ্য নয়, যেহেতু সকলে তাই বলছে (দুঃখজনক ভাবে অনেক জায়গায় অনেক ভয়ংকর ঘটনার কথা অনুল্লিখিত রেখে।) তবে ইরাকের ঘটনাটি একটি নির্দেশনা দেয় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। কর্পোরেট ও সামরিক জুটি, যাকে 'সাম্রাজ্য' বলে মনে করা হয়, তারই কাজের একটি সক্রিয় নিদর্শন আমরা ইরাকে স্পষ্টভাবে পেয়ে যাই।

পৃথিবীর ধনসম্পদ মুষ্টিগত করার যুদ্ধ যতই বাড়ে ততই 'বৈধ সাময়িক আক্রমণ'-এর অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ ফিরে আসার চেষ্টা করে। কর্পোরেট-বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় যুক্তির ধাপে মিলিত হয় নয়া-সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া-লিবারিলিজম। এই রক্তের পর্দার আড়ালে দেখার সাহস ও শক্তি থাকলে সেই নিষ্ঠুর বেচাকেনা দেখা যাবে। কিন্তু প্রথমত মঞ্চটি কেমন, তাই দেখা যাক।

১৯৯১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ সিনিয়র 'ডেজার্ট স্টর্ম' নামের একটি অপারেশন চালু করেন। দশ হাজারের বেশি ইরাকি সে যুদ্ধে প্রাণ হারায়। ইরাকের মাটিতে ৩০০ টন ডিপ্লিটেড য়ুরেনিয়াম পরিমাণ বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। শিশুদের ক্যান্সারের হার বেড়ে যায় চার গুণ। তের বছরের বেশি সময় ধরে দুকোটি চল্লিশ লক্ষ ইরাকি মানুষ একটি যুদ্ধক্ষেত্রে বসবাস করেছে এবং খাদ্য পানীয় জল এবং ওষুধ পায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ডামাডোলে মনে রাখা দরকার যে হোয়াইট হাউজে ডেমোক্রাট বা রিপাবলিকান যারাই থাকুক না কেন ইরাকের এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি। অপারেশন 'শর্ক অ্যান্ড অ'-এর পর যে অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ চালু হয় সেখানে পঞ্চাশ লক্ষ শিশু প্রাণ হারায়।

খুব সম্প্রতিকাল পর্যন্ত মৃত যুক্তরাষ্ট্র সৈন্যের হিসেব নিখুঁত পাওয়া যাচ্ছিল, যদিও তেমনভাবে ইরাকি মৃত-দের হিসেব রাখা হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল টমি ফ্র্যাঙ্ক্স্ বলেন 'আমরা শব গণনা করিনা' (তার মানে ইরাকি শব)। উনি সহজে বলতে পারতেন, 'আমরা জেনেভা কনভেনশনও মানি না।' সম্প্রতি লান্‌সেট মেডিকাল জার্নালে একটি বিপদ জরিপের পর আনুমানিক এক লক্ষ ইরাকি মানুষের এ যুদ্ধে মৃত্যুর ঘটনা জানা যায়। অর্থাৎ এই হলের মতো একশটি হল-ভর্তি মানুষ। একশটি হল ভর্তি বন্ধু, মা, বাবা, সন্তান, সহকর্মী, প্রেমিক, আপনাদের মতো। সমস্যা হল আজ এই হলে তেমন একটা শিশু নেই। ইরাকের শিশুদের কথা যেন ভুলে না যাই। প্রযুক্তির ভাষা দিয়ে এই রক্তপ্লাবনকে বলা হচ্ছে প্রিসিশন বম্বিং। সাধারণ ভাষায় বলা যায় জবাই করা।

এ সমস্তই আজ সাধারণ জ্ঞান। যারা এই আক্রমণকে সমর্থন করে এবং আক্রমণকারীদের নির্বাচন করে, তারা অজ্ঞতার আড়ালে নিরাপদ থাকতে পারবে না। নিশ্চয়ই তারা মনে করে ইতিহাসের এই অধ্যায় ন্যায় ও ঠিক, অন্তত্পক্ষে সমর্থনযোগ্য, যেহেতু এর মাধ্যমে তাদের আখেরে লাভ হচ্ছে।

সুতরাং 'সভ্য', 'আধুনিক' জগৎ গণহত্যার এই ইতিহাস নিয়ে দাসত্ব এবং সাম্রাজ্যবাদের ওপর ভর করে আজ বিশ্বের বেশির ভাগ তেলের মালিক। তাদের হাতেই বিশ্বের সব থেকে বেশি অস্ত্র, টাকা এবং গণমাধ্যম। গণমাধ্যমে কর্পোরেট স্বার্থ এমনভাবে লীন হয়েছে যে যা হবার কথা 'মুক্তকণ্ঠ মাধ্যম' তাই হয়ে দাঁড়ায় সায় দিলে তবে মুক্ত কণ্ঠ মাধ্যম।

জাতিসংঘের সমরাস্ত্র তদন্ত বিভাগের প্রধান হ্যান্স ব্লিক্স বলেছেন তিনি ইরাকে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রমাণ খুঁজে পাননি। যুক্তরাষ্ট্রে ও ব্রিটেনের প্রতিটি 'প্রমাণ'-ই ভুল বলে বিবেচিত হচ্ছে। সাদ্দাম হোসেন নাইজার থেকে য়ুরেনিয়াম কিনেছেন অথবা কোনো এক ছাত্রের পি.এচ.ডির গবেষণাপত্র থেকে তুলে দেওয়া একটি লাইন যেটিকে প্রমাণ বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। ব্রিটিশ গোয়েন্দাবিভাগ ছিল এই ধরণের প্রমাণ জনসমক্ষে তুলে দেওয়ার পেছনে। অথচ দিনের পর দিন, যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত নামকরা 'শ্রদ্ধাভাজন' খবরের কাগজ ও টিভি চ্যানেলগুলি ইরাকের পারমাণবিক অস্ত্রের 'প্রমাণ'-এর জোর গলায় বলে গেছে। পরে জানা যায় এ সমস্ত 'প্রমাণ' এর রসদের পেছনে ছিল এক ব্যক্তি। আহমেদ চালাবি, যিনি সি. আই. এ-র মদতপুষ্ট (যেমন মদতপুষ্ট ইন্দোনেশিয়ার জেনারেল সুহার্তো, চিলির পিনোচে, ইরানের শাহ, তালেবান গোষ্ঠী এবং সাদ্দাম হোসেন স্বয়ং)।

সুতরাং একটি দেশকে বিস্মৃতির মতো ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া গেল। এ সত্য যা ক্ষমাপ্রার্থনার ফিসফিসানি কানে এসেছে। ক্ষমাপ্রার্থী তারা ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র না পেয়ে এবার ইরান এবং সিরিয়ায় নতুন গুজবের ভিত্তিতে আক্রমণ চালাবার কথা ভাবছে (ইরানকে তারা উচ্চারণ করে 'আইরান')। এই নতুন

গুজবের পেছনে কারা আছে? ঠিক তারাই, যারা ইরাক সম্পর্কে বানোয়াট গুজব রটিয়েছিল। সেই একই কর্পোরেট-স্বার্থে-লীন-হওয়া সংবাদমাধ্যম। এক বি.বি.সি সাংবাদিক ব্রিটেনের ব্লেয়ার প্রশাসনের নামে অভিযোগ এনেছিল ইরাকে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যাপারে সে প্রশাসন 'তথ্য তৈরি' করেছে। এর ফলে বি.বি.সি.-র প্রধানকে ইস্তফা দিতে হয় এবং একজন আত্মহত্যা করে। যদিও ব্লেয়ার প্রশাসন অনেক কুকর্মই করেছে তবুও আজ তারা ক্ষমতায় আসীন। একটি দেশে অবৈধ আক্রমণ এবং সে দেশের মানুষের গণহত্যার জন্য সে প্রশাসন দায়ী।

অস্ট্রেলিয়ায় অতিথি হিসেবে বেড়াতে আসার আগে ভিনদেশের নাগরিক হিসেবে আমার মত সকলকে একটি ভিসাফর্ম ভর্তি করতে হয়। সেখানে একটি প্রশ্ন থাকে : আপনি কি কোনোদিন যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বা মানবাধিকার ভঙ্গের অপরাধে লিপ্ত ছিলেন? জর্জ বুশ বা টোনি ব্লেয়ার কি অস্ট্রেলিয়ায় ভিসা পেতেন? আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় নিশ্চয়ই তারা যুদ্ধাপরাধী বলে বিবেচিত হবেন। তবে এই কতিপয় ব্যক্তি তাদের অফিস থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেই পৃথিবী পাল্টে যাবে এ বিশ্বাস সত্যের অপলাপ মাত্র। সমস্যা হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষও একই নীতিতে স্বাস্থ্যবোধ করে। যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের মূল প্রশ্ন ছিল সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব কে বেশি ভাল দিতে পারবেন।

ইরাকে অনেক তদন্ত করে গণবিধ্বংসী অস্ত্র খুঁজে পাওয়া না গেলেও সম্প্রতি নাকি প্রমাণ হয়েছে সাদ্দাম হোসেন তেমন অস্ত্র তৈরির পরিকল্পনা করছিলেন (যেমন ধরুন আমি অলিম্পিকে সাঁতারে স্বর্ণপদক পাওয়ার পরিকল্পনা করলাম)। ভাগ্যিস Preemptive Strike বলে একটি বিষয় জানা ছিল। ঈশ্বর জানেন এ লোকটি মারণাত্মক আর কী পরিকল্পনা করেছিল —যেমন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটরদের নামে আপত্তিকর চিঠি পাঠানো অথবা লন্ডনের আণ্ডারগ্রাউন্ডে বোরখা পরিহিত মেয়ে খরগোশ ছেড়ে দেওয়া। ইরাকের 'নয়া যুগ'-এ যখন সাদ্দাম হোসেনের বিচার হবে তখন নিশ্চয়ই এ ধরণের নানা তথ্যই প্রকাশ পাবে।

তবে যে তথ্য প্রকাশ পাবে না তা হল সাদ্দাম যখন ইরাকি কুর্দী ও শিয়াদের ওপর মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে তখন যে সব দেশ তাকে টাকা পয়সা ও অন্যান্য সংস্থান দিয়ে মদত যুগিয়েছে তারা হল যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন। আরও যে তথ্য প্রকাশ পাবে না তা হল জাতিসংঘকে দেওয়া বারোহাজার পাতার একটি রিপোর্টে সাদ্দাম হোসেন যুক্তরাষ্ট্রের যে চব্বিশটি কম্পানির নাম করেছিল, প্রাক্‌গাল্ফ যুদ্ধে যারা ইরাকের পারমাণবিক ও সাধারণ অস্ত্রের প্রোগ্রামে অংশ নেয়, তাদের প্রত্যেকটির নাম যুক্তরাষ্ট্র সেন্সর করেছিল (এই কম্প্যানিগুলির কয়েকটির নাম বেচেল, ডুপন্ট, ইস্টম্যান কোডাক, হিউলেট প্যাকার্ড, ইন্টার্ন্যাশনাল কম্পিউটার সিস্টেম্‌স্ ও ইউনিসিস)।

অতএব ইরাক এখন 'স্বাধীন'। সে দেশকে তো আসলে 'স্বাধীন করা হয়েছে'। দেশের মানুষকে পায়ের তলায় আনা হয়েছে এবং বাজারকে মুক্ত করা হয়েছে।

নয়া-লিবারালিজমের নতুন শ্লোগান, বাজার মুক্ত করো। আর ভোগান্তি বুঝুক জনগণ।

যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ইরাকের অর্থনীতির এক একটি বিভাগ-কে বেসরকারীকরণ করছে এবং বিক্রি করছে। নতুনভাবে শুল্ক ও অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ হচ্ছে। বিদেশী কম্পানি এখন ইরাকের একটি কম্পানির শতকরা একশ ভাগ কিনে বিদেশে তার লাভের পুরো টাকা চালান করে দিতে পারে। একটি দখলদার শক্তির পক্ষে এটি আন্তর্জাতিক আইনের ঘোর পরিপন্থী। এই কারণেই ইরাক দখলের পর ডামাডোলের মধ্য দিয়ে 'অন্তবর্তী সরকার'-এর হাতে 'ক্ষমতা হস্তান্তর' করা হয়। মাল্টিন্যাশনালদের কাছে ইরাক হস্তান্তর শেষ হলে গণতন্ত্রের হালকা বড়ি তেমন একটা অসুবিধের নয়। নয়া লিবারালাইজেশন নামক ধর্মবিশ্বাসের যে কর্পোরেট সংস্করণ নব্য গণতন্ত্র হিশেবে পরিচিত, তার জন্য এটি একটি ভালো মোড়কও বটে।

আশ্চর্য নয় যে ইরাককে নিলামে চড়ানোর এই ব্যাপারটি যখন ঘটছে তখন ক্রেতাদের হিড়িক সামলানোই দায়। বেচেল এবং হ্যালিবার্টনের মতো কম্পানিগুলি (শেষোক্ত কম্পানির প্রধান ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি ডিক চিনি স্বয়ং) ইরাকের পুনর্গঠন বাবদ প্রচুর কন্ট্র্যাক্ট পেয়েছে। এই কম্পানিগুলির যে কোনো একটির পরিচয় তুলে দিলেই সমস্ত পৃথিবীতে এসব ব্যাপার কিভাবে কাজ করে তা বোঝা যাবে। বেচেলের কথাই ধরা যাক। (বেচারা হ্যালিবার্টনকে বাদ দিতে চাইনি। তবে ইরাকে তেল শিল্প পুনর্নির্মাণের কন্ট্র্যাক্টে এই কম্পানি আড়াই কোটি ডলারের দাম ধরে এবং তাই নিয়ে তদন্ত শুরু হয়।

বেচেল এবং সাদ্দাম হোসেন পুরোনো বাণিজ্য-বন্ধু। এদের নানান আদানপ্রদান ও সমঝোতায় সাহায্য করেছেন স্বয়ং ডোনাল্ড রামসফিল্ড। ১৯৮৮ সালে সাদ্দাম হোসেন হাজার খানেক কুর্দি গ্যাস চেম্বারে হত্যা করার পর বেচেল এই সরকারের সঙ্গে বাগদাদে একটি দ্বিমুখী রাসায়নিক প্ল্যান্ট তৈরির কন্ট্র্যাক্ট সই করে।

ঐতিহাসিকভাবে দেখতে গেলে রিপাবলিকানদের সঙ্গে বেচেলের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। বেচেল এবং রিগানবুশ প্রশাসনগুলিকে একটি দল হিশেবে ধরা যায়। প্রাক্তন ডিফেন্স সেক্রেটারি ক্যামপার ওয়েনবার্গার বেচেলের সাধারণ উপদেষ্টা ছিলেন। প্রাক্তন ডেপুটি সেক্রেটারি অভ এনার্জি, কেনেথ ডেভিস, বেচেলের উপপ্রধান ছিলেন। বেচেলের সভাপতি রিলি বেচেল যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির একজন রপ্তানি বিষয়ক উপদেষ্টা। জ্যাক শিহান, একজন অবসরপ্রাপ্ত নৌ-জেনারেল এখন বেচেলের বয়োজেষ্ঠ উপপ্রধান এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তানীতি প্রণয়ন বোর্ডের সদস্য। প্রাক্তন স্টেট সেক্রেটারি জর্জ শাল্জ, বেচেলের ডিরেক্টরদের একজন এবং ইরাকি স্বাধীনতাকমিটির উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি।

তাঁর কাছে নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সের এক সাক্ষাৎকারে যখন জানতে চাওয়া হয়

তাঁর এ দুই ধরণের পেশার অসামঞ্জস্যকে তিনি কিভাবে দেখছেন, তিনি তার উত্তরে বলে, 'ইরাক আক্রমণ হলে বেচেল লাভ করবে এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। কিন্তু সেখানে যদি কাজ করার থাকে, তবে বলা যায়, বেচেল তার জন্য উপযুক্ত একটি কম্পানি।' বেচেলকে যে সকল কন্ট্র্যাক্ট দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে পড়ে বৈদ্যুতিক প্ল্যান্ট গঠন, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, জলীয় সরবরাহ ব্যবস্থা, পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং বিমানবন্দর পুনর্গঠন, সে সব কন্ট্র্যাক্টের দাম কোটি কোটি ডলার।

২০০১ এবং ২০০২ এর মধ্যে, যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা পরিষদের ত্রিশজন সদস্যের ভেতরে নয়জন এমন সকল কম্পানির সঙ্গে যুক্ত ছিল, যাদের সব মিলিয়ে নিরাপত্তাখাতে ছিয়াত্তর কোটি ডলারের কন্ট্র্যাক্ট দেওয়া হয়েছিল। এমন এক সময় ছিল যখন যুদ্ধে লড়তে প্রয়োজন হত অস্ত্রের। এখন অস্ত্র বিক্রির লক্ষ্যে প্রয়োজন হয় যুদ্ধের।

১৯৯০ এবং ২০০২-এর মধ্যে বেচেল তেত্রিশ লক্ষ ডলার ব্যয় করেছে নির্বাচনী প্রচারণায় রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রাট এ দুই শিবিরের পক্ষেই। ১৯৯০ সালের পর এরা দু' হাজারটি কন্ট্র্যাক্ট পেয়েছে যার মূল্য এগারো কোটি ডলার। কতটা লাভজনক বিনিয়োগ তা নিশ্চয়ই খুব স্পষ্ট।

বেচেলের পায়ের ছাপ সারা পৃথিবীতে ছড়ানো। মাল্টিন্যাশানাল হওয়ার মানে তো তাই।

বেচেল প্রথম আন্তর্জাতিক মনোযোগ কাড়তে শুরু করে বলিভিয়ায় প্রাক্তন একনায়ক হুগো বাঞ্জের সঙ্গে একটি কন্ট্র্যাক্ট সই করে। কোচাবাম্বা শহরে জলের বেসরকারীকরণের ব্যাপারে। লক্ষ মানুষ, যাদের পক্ষে বেচেলের জলের দাম দেওয়া সম্ভব হয়নি, রাস্তায় নামে। সারা শহরে সর্বাত্মক ধর্মঘট ডাকা হয়। শহরে মার্শাল ল জারি হয়। শেষ পর্যন্ত যদিবা বেচেল সেখান থেকে গণেশ উল্টাতে বাধ্য হয়, অকাল কন্ট্র্যাক্ট-ভঙ্গের দায়ে তারা বলিভিয়ার সরকারের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছে। আপনারা লক্ষ করবেন, এটি ইদানীং কালের একটি কর্পোরেট চাল।

ভারতে এখন বেচেল এবং জেনারেল ইলেক্ট্রিক বর্তমানে নিস্পন্দ এবং দুর্নামে জর্জরিত এনরন পাওয়ার প্রজেক্টের নতুন মালিক। ভারতে মহারাষ্ট্রের প্রশাসনকে এই প্রজেক্ট ত্রিশ কোটি ডলারের কন্ট্র্যাক্টে বাঁধে। ভারতের ইতিহাসে স্বাক্ষর হওয়া সর্ববৃহৎ কন্ট্র্যাক্ট এটি। ভারতীয় রাজনীতিক এবং আমলাদের 'শিক্ষিত করার জন্য' এনরন যে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করছে তা বলতে তাদের একটুও বাধে না। মহারাষ্ট্রে এনরনের এই দ্রুতগতি বেসরকারী প্রজেক্টে চরম দুর্নীতি ধরা পড়েছে। (এনরন ছিল রিপাবলিকানদের অন্যতম অর্থবল)। এনরনের উৎপাদিত বিদ্যুৎ এমন দুর্মূল্য যে সরকার ঠিক করে এনরনকে বিদ্যুতের খরচ দেওয়ার

চেয়ে উৎপাদন বন্ধ রেখে এনরনকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া শস্তা। তার অর্থ দাঁড়ায় পৃথিবীর একটি দরিদ্রতম দেশের সরকার এনরনকে বিদ্যুৎ উৎপাদন না করার জন্য বাইশ কোটি ডলার দিচ্ছিল।

যেহেতু এখন এনরনের অস্তিত্ব আর নেই, বেচেল এবং জি.ই-নতুন মালিক হিশেবে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে ৫.৬ কোটি ডলারের ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা দায়ের করেছে। এনরন এ প্রজেক্টে যা বিনিয়োগ করেছিল তা এর ভগ্নাংশ পরিমাপও নয়। তাদের বক্তব্য প্রজেক্ট সফল হলে নাকি এই টাকাই জমা হতো তাদের লাভের খাতায়। ৫.৬ কোটি ডলারের অর্থ কী তা বোঝানোর জন্য শুধু বলা যায়, ভারতীয় সরকার এর চেয়ে কিছু কম টাকায় গ্রামীণ কর্মোদ্যোগ নিশ্চয়তা প্রকল্পে কোটি কোটি মানুষের খেয়ে পরে বাঁচার মত বার্ষিক ভাতা নিশ্চিত করতে পারত। সেসব মানুষ, যারা হতদরিদ্র, ঋণে জর্জরিত, ভাসমান অস্তিত্ব ক্রমাগত অপুষ্টি এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-র জ্বালায় অতিষ্ঠ জীবন নির্বাহ করছে। এ এমন দেশ যেখানে ঋণগ্রস্ত কৃষক আত্মহত্যার প্রবৃত্ত হচ্ছে শ'য়ে নয়, হাজারে। গ্রামীণ কর্মোদ্যোগ নিশ্চয়তা প্রকল্পের ধারণাটি কর্পোরেট শ্রেণী 'আধাপাগল' এবং 'নতুন শক্তিতে বলীয়ান' বামপন্থীদের আকাশকুসুম কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে চাইছে। তাদের প্রশ্ন হল, এ টাকা আসবে কোথা থেকে। অথচ এনরনের মত কুখ্যাত কম্পানির সঙ্গে কোনো সমঝোতা হবে না, এই প্রসঙ্গে তারা ব্যস্ত হয়ে পুঁজির উড্ডীন প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন; তাদের মতে এতে বিনিয়োগের পক্ষে একটি অশুভ আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। এ মুহূর্তে লন্ডনে চলছে ভারত সরকার, বেচেল এবং জি.ই.-র মধ্যে এ ব্যাপারে সমঝোতা। বেচেল এবং জি.ই-র আশার বিলক্ষণ কারণ আছে। ভারতের যে অর্থমন্ত্রী এনরনের সঙ্গে সেই ভয়ংকর কনট্র্যাক্ট-এর ব্যাপারে রাজি ছিলেন, তিনিই আই.এম.এফ-এর হয়ে সম্প্রতি ঘরে ফিরছেন। শুধু ঘরেই ফিরছেন তা নয়, একটি পদোন্নতি নিয়ে ফিরছেন। তিনি এখন পরিকল্পনা কমিশনের সহ-সভাপতি।

ভাবুন একবার, একটি মাত্র কর্পোরেট প্রজেক্টের (ধারণা করা হচ্ছে) লাভের টাকায় দু কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের মৌলিক ভাতা এক শ দিনের জন্য নিশ্চিত করতে পারে। অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যারও পঞ্চাশ লক্ষ বেশি মানুষ। নয়া-লিবারিলিজমের প্রকান্ড ভয়াবহতার একটি মাত্র নজির এটি।

বেচেলের গল্পের এখানেই শেষ নয়। নাওমি ক্লাইন লিখেছেন বেচেল যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকের কাছেও ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে। এবং সত্তর লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ পাবে বলে আশ্বাসও পেয়েছে।

সুতরাং যারা বিজনেস অ্যাডমিন্সট্রেশন নিয়ে পড়তে চান, তাঁরা যেন বড় বড় স্বনামধন্য শিক্ষাঙ্গনে পড়ার কথা না ভাবেন, কর্পোরেট সাফল্যের জন্য সুগম রাস্তা অন্যত্র। প্রথম, আপনার কম্পানি বয়স্ক সরকারি কর্মকর্তা দিয়ে ভরাট করুন।

.এরপর, আপনার কম্পানির লোক সরকারি পদগুলি ভরাট করুক। এবার কিছু তেল সহযোগে নাড়ুন। যখন সরকার এবং আপনার কম্পানির মধ্যে ফারাক টানা যাবে না, তখন সরকারের মাধ্যমে একটি তেলসমৃদ্ধ দেশের ঠাণ্ডামাথা একনায়ককে অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত করুন। একনায়কটি যখন তার নিজের জনগণের ওপর বর্বর হত্যাযজ্ঞ চালায় তখন অন্যত্র তাকান। অল্প আঁচে ফোটান। এই সময় সরকারী কনট্র্যাক্টের সাহায্যে কয়েক কোটি ডলার জমা করুন। আপনার সরকারের মাধ্যমে এবার একনায়কটিকে আপসারণ করুন এবং তার প্রজাদের ওপর বোমাবর্ষণ করুন। অবকাঠামো যাতে নষ্ট হয় সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখুন। পাশে এক লক্ষ মানুষ হত্যা হলে হতে দিন। অবকাঠামো পুনর্গঠনের জন্য আরো কয়েক কোটি ডলারের কনট্র্যাক্ট সই করুন। যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ বাবদ এই ধ্বংসপ্রায় দেশে আপনার অসমাপ্ত ভগ্ন কনট্র্যাক্টগুলির ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা দায়ের করুন। আপনার যুদ্ধের প্রযুক্তি ও অস্ত্রসস্ত্র ফলাও করে দেখানো হোক, পরের যুদ্ধে ক্রেতাদের জন্য কাজে লাগবে। এবং শেষকালে, এই কম্পানির নামে একটি মানবাধিকার পুরস্কার চালু করুন। প্রথমটি মরণোত্তর মাদাম তেরেসা-কে দিন। তিনি কবর থেকে উঠে এসে প্রত্যাখ্যান বা তর্ক করতে পারবেন না!

বিধ্বস্ত ইরাক এই সমস্ত কম্পানিদের যুদ্ধবাবদ ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিশ কোটি ডলার দিতে হয়েছে : হ্যালিবার্টন, শেল, মোবিল, নেসলে, পেপসি, কেন্টাকি ফ্রাইড চিকেন এবং টয়জারাস। এছাড়াও রয়েছে একশ পঁচিশ কোটি ডলার ঋণ যার জন্য তাকে আই.এম.এফ-এর দ্বারস্থ হতে হচ্ছে মৃত্যুদূতের মত Structural Adjustment Programme নিয়ে তা তার শিয়রের কাছে হাজির। (যদিও ইরাকে এমন কোনো কাঠামোই বাকি নেই ঢেলে সাজানোর মতো; একমাত্র ধোঁয়াশায় ঢাকা আলকায়দা ছাড়া)।

নব্য ইরাকে বেসরকারিকরণ একটি নতুন মাত্রা পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীতে ক্রমাগত বেসরকারী বাহিনী যোগ হচ্ছে। এর সুবিধে হল এর ভেতরে কেউ হত হলে তা যুক্তরাষ্ট্রের হত সৈন্যের তালিকাভুক্ত হবে না। যুক্তরাষ্ট্রের জনমত অনুকূল রাখার জন্য তা দরকারি, বিশেষত নির্বাচনের বছরে তো বটেই। জেলখানা বেসরকারিকরণ হচ্ছে। নির্যাতনেরও হচ্ছে বেসরকারিকরণ। আমরা জানি এর অর্থ কী। নব্য ইরাকে টিভি স্টেশন এবং সংবাদ পত্রের অফিস গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলি চালিয়ে নিরীহ প্রতিবাদরত মানুষকে মারা হয়েছে। যে প্রতিরোধ শেষ পর্যন্ত টিকে আছে তাও এরই মতো নিষ্ঠুর এবং অযৌক্তিক। এর মধ্যে, একটি মুক্ত, অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক অহিংস প্রতিরোধ কি সম্ভব? মনে তো হয় না।

এই জন্য ইরাকের বাইরে আমরা যারা আছি তাদের ওপর বর্তায় অহিংস, অসাম্প্রদায়িক .প্রতিরোধ গড়ে তোলার দায়িত্ব। যদি তা করতে অসমর্থ হই, ঝুঁকি

আছে প্রতিরোধের ধারণাটিকে হাইজ্যাক করা হবে এবং সন্ত্রাসের সমার্থক বানানো হবে। সেটি নিশ্চয়ই বেদনাদায়ক কারণ প্রতিরোধ আর সন্ত্রাস কখনো এক কথা নয়।

সুতরাং এই হিংস্র, কর্পোরেট, সমরায়িত পৃথিবীতে শান্তির অর্থ কী? এমন একটি পৃথিবীতে, যেখানে ঋণের একটি গুরুতর অবস্থায় গরিব দেশগুলি দাঁড়িয়ে আছে, তাদের ৩৮২ কোটি ডলার দোনা শোধ করতে হবে সেইসব দেশকে যারা তাদের ধ্বংস করেছে? যে পৃথিবীর ৫৮৭ জন কোটিপতির হাতে বিশ্বের ১৩৫টি দরিদ্রতম দেশগুলির জি.ডি.পি. একত্র করলে যা দাঁড়ায়, তার বেশি সম্পদ ও টাকা? যে সব ধনী দেশ কৃষকদের প্রতিদিন কোটি টাকার ভর্তুকি দেয়, তারাই যখন গরিব দেশের কৃষকদের ভর্তুকি উঠিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেয়?

ইরাক, প্যালেস্তিন, কাশ্মীর, তিব্বত, চেচনিয়া-পৃথিবীর অধিকৃত এ সব দেশগুলিতে শান্তি কাকে বলে? অথবা অস্ট্রেলিয়ার আদিবরসীদের কাছে শান্তির অর্থ কী? অথবা নাইজেরিয়ার ওগোনিদের কাছে? অথবা ইসলামিক রাষ্ট্রে অ-মুসলিমদের কাছে? আফগানিস্তান, ইরান, সৌদি আরবের মহিলাদের কাছে? বাঁধ তৈরির নামে উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ যে সকল মানুষ বাস্তুহারা, বসতভূমি থেকে ওপড়ানো হয়েছে যাদের, তাদের কাছে? যে সকল গরিবদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে সম্পদ কেড়ে নেওয়ার ফলে তাদের জল, আশ্রয়, জীবিকাসংস্থান এবং আত্মসম্মানের জন্য লড়াই করতে হয়, তাদের কাছে? তাদের কাছে শান্তি মানে যুদ্ধ।

আমরা জানি সাম্রাজ্যের যুগে যুদ্ধে কারা লাভবান হয়। কিন্তু এও আমাদের প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে সাম্রাজ্যের যুগে শান্তির ফলে লাভবান হয় কারা। যুদ্ধবাজ হওয়া অপরাধ। কিন্তু ন্যায়ের কথা না বলে শান্তির কথা বলা পরাজয়। এবং যেসমস্ত সংগঠন ও ব্যবস্থা ঘোর অন্যায়ের পৃষ্ঠপোষক, তাদের মুখোশ খুলে না দিয়ে ন্যায়ের কথা বলা ভণ্ডামির অধিক।

যারা গরিব তারা গরিব নিজেদের দোষে, একথা বলা সহজ, এটাও ভাবা সহজ যে জগৎ সন্ত্রাস ও যুদ্ধের অবিভেদ্য জালে জড়িয়ে পড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি তাই বলতে পারেন, 'হয় আপনারা আমাদের পক্ষে নাহয় সন্ত্রাসীদের পক্ষে।' কিন্তু আমরা জানি তার বাইরেও বেছে নেওয়ার অবকাশ রয়েছে। আমরা জানি সন্ত্রাস যুদ্ধেরই বেসরকারিকরণ। যারা সন্ত্রাসী তারা যুদ্ধের মুক্তবাজারের পৃষ্ঠপোষক। তারা মানে না হিংসাত্মক পদ্ধতির আইনগত প্রয়োগ কেবল এবং একমাত্র রাষ্ট্রই করতে পারে।

সন্ত্রাসের নিষ্ঠুরতা আর দখলদার যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে বিবেকের বিভাজন করে নেওয়া তাই অসৎ। দু ধরণের হিংস্রতাই প্রতিরোধযোগ্য। একটি মেনে নিয়ে অপরটিকে অভিযুক্ত করা যায় না।

আসল দুঃখের ঘটনা হল বিশ্বের বেশির ভাগ মানুষ এই ধারণাকৃত শান্তি এবং যুদ্ধের ভয়াবহতার মাঝখানে আবদ্ধ। প্রশ্ন হল, এখান থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কী?

যারা আর্থিকভাবে সচ্ছল কিন্তু বিবেকের কাছে অস্বাচ্ছাদ্য বোধ করছে, তাদের প্রথম প্রশ্ন হওয়া উচিত তারা সত্যই এ জায়গা থেকে বেরোতে চায় কিনা। বেরোতে পারলেও কতখানি যেতে পারবে? দু' প্রান্তের ওই মধ্যবর্তী জায়গা খুব আরামের হয়ে পড়েছে কিনা।

যদি সত্য এখান থেকে বেরোতে চাই তাহলে ভালো এবং মন্দ এই ধরণের খবরই রয়েছে।

ভালো খবর হল এই, অনেক আগে থেকে কিছু মানুষ এ প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছে। তারা অর্ধেক পথে রয়েছে। বিশ্ব জুড়ে হাজার হাজার কর্মীর কারণে আজ আমাদের কাজ সহজতর। পথ তো একটিমাত্র নয়। হাজার খানেক পথ। হাজার খানেক লড়াই, যেখানে আমাদের দক্ষতা, মেধা, মন ও ভাণ্ডারকে প্রয়োজন। কোনো লড়াই-ই ছোট নয়, অযোগ্য নয়।

খারাপ সংবাদ হল, রঙিন প্রতিবাদসভা, মিছিল আর বিশ্ব সামাজিক ফোরামে বার্ষিক যাত্রাই যথেষ্ট নয়। লক্ষ্যকে বিদ্ধ করার মত কিছু গণ-অসহযোগ দরকার। হয়ত একটি বিপ্লব ঘটিয়ে দেওয়া যাবে না। কিন্তু বহু কিছু করার আছে। যেমন ইরাক আক্রমণে যে সমস্ত কম্পানি লাভবান হয়েছে, তাদের একটি তালিকা তৈরি করুন এদের চিহ্নিত করুন, প্রত্যাহার করুন, গণেশ ওল্টাতে বাধ্য করুন। বলিভিয়ায় যদি তা হতে পারে, ভারতেও পারে। অস্ট্রেলিয়ায় পারে। নয় কেন?

এটি একটি ছোট উদাহরণ। কিন্তু মনে রাখতে হবে সংগ্রাম যদি সন্ত্রাসে পরিণত হয়, তবে তার অন্তর্দৃষ্টি, সৌন্দর্য্যবোধ এবং কল্পাশক্তি সবই হারায়। সবচেয়ে বিপদের কথা হল নারীদের তা বিচ্ছিন্ন করে এবং শেষ পর্যন্ত এর শিকারে পরিণত করে। এবং যে রাজনৈতিক সংগ্রামের অন্তঃস্থলে, ওপরে ও নীচে সর্বত্র, নারী নেই, সে তো কোনো সংগ্রামই নয়।

আসল কথা হল এ যুদ্ধে যুক্ত হতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক হাওয়ার্ড জিন যেমন বলেন, 'একটি চলন্ত ট্রেনে নিরপেক্ষ থাকা যায় না।'

অনুবাদ : আনন্দময়ী মজুমদার

নগরোন্নয়ন, বিকেন্দ্রীকরণ ও শেওড়াফুলি লোকালের কাহিনি

১. ভূমিকা

অফিস থেকে বেরিয়ে মিনিবাসের ভিড়ে প্রায় দমবন্ধ হবার জোগাড়। শহরতলির বাড়িতে ফেরার রোজকার সান্ধ্য-অভিজ্ঞতা অবশ্য এখানেই শেষ নয়, সবে শুরু বলতে পারেন। হাওড়া স্টেশনে ঢুকে দেখি থিকথিক করছে ঘরে-ফেরা মানুষে মাথা। কোনো প্ল্যাটফর্মেই ট্রেন দাঁড়িয়ে নেই। সমস্ত ভিড়টা প্ল্যাটফর্ম নম্বর তিন আর চারের মুখে। দু-একজনকে জিগ্যেস করেই জানলাম অধিকাংশ দিনের মতোই আজও ট্রেন চলাচলের গোলমাল—কখন কোন্ প্ল্যাটফর্মে ট্রেন আসবে সে খবরের প্রতীক্ষায় রয়েছে সকলেই। প্ল্যাটফর্ম নম্বর এক থেকে ছয় যে কোনোটোতেই ট্রেন আসতে পারে। প্রতীক্ষারতদের অধিকাংই তুলনায় কাছের স্টেশনের অর্থাৎ উত্তরপাড়া, কোন্নগর বা শ্রীরামপুরের যাত্রী; ব্যান্ডেল, বর্ধমান, তারকেশ্বর যে লোক্যালই আসুক না কেন তাতেই তাঁরা উঠবেন, কারণ প্রায় সব ট্রেনই এই এই স্টেশনগুলিতে থামে। স্টেশনের মাইকে ট্রেন-আসার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ভিড়টা তাই যে প্ল্যাটফর্মে ট্রেন আসবে সেই প্ল্যাটফর্মের দিকেই এগোবে। এই কাহিনি শুধু হাওড়ার পূর্ব রেলের নয়, মেদিনীপুরগামী দক্ষিণ-পূর্ব রেলের বা শিয়ালদহ থেকে উত্তর বা দক্ষিণের যাত্রীদেরও বটে। সমস্যা যে শুধু বাড়ি ফেরার সময়, তা মোটেই নয়। সকালে অফিসে আসার অভিজ্ঞতাও আদৌ সুখকর নয়। ন-টার সময় স্থানীয় স্টেশনে দাঁড়ালে ট্রেনের দেখা মেলে বটে কিন্তু তাতে তিলধারণের স্থান মেলে না। নিত্যযাত্রী আমরা রোজই ভাবি, এই সমস্যার সমাধান কী?

দুঃখজনকভাবে, ট্রেনের এই সমস্যার সঙ্গে, অহেতুক, আমাদের যাত্রীসংখ্যার বাহুল্য, ট্রেনসংখ্যার স্বল্পতা এবং উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা জড়িয়ে ফেলা হয়। আমরা ভুলে যাই পৃথিবীর তাবড়-তাবড় শহরগুলিতে—লন্ডন, প্যারিস নিউইয়র্ক-য়েও নিত্যযাত্রীর সংখ্যা কিছু কম নয়। আবার ট্রেনের সংখ্যাও আমাদের নেহাৎ কম নয়; উদাহরণ হিসেবে, সকালে সওয়া আটটা থেকে সওয়া নটার মধ্যে কোন্নগর স্টেশনে দাঁড়ালে হাওড়াগামী ঠিক দশটা লোক্যাল ট্রেন পাওয়া যায়, আর্থাৎ প্রতি ছয় মিনিটে একটা ট্রেন বরাদ্দ। তাই মনে হয় সমস্যাটা ঠিকভাবে বিবেচনা করলে হয়তো সমাধান পাওয়া সম্ভব। সহজ সমাধান একটি অবশ্যই হয়—এই খাতে রেলমন্ত্রকের ব্যয় বাড়িয়ে ট্রেন, লাইন, স্টেশনের সংখ্যা এবং গুণ বৃদ্ধি। অধিক শর্করাপ্রয়োগে শরবতের মিষ্টত্ব বাড়ানোয় তেমন কৃতিত্ব নেই; তাই, সতর্কভাবেই ব্যয়-বৃদ্ধি না ঘটিয়ে সংমসংখ্যক ট্রেন, স্টেশন এবং যাত্রীসংখ্যা অনুমান করেই সমস্যার সমাধান খুঁজতে হয়।

এই প্রবন্ধে উপরিউক্ত সমস্যাটির মূল চরিত্র খুঁজে একটি সমাধানের প্রস্তাবনা ও তার দোষ-গুণ বিবেচনা করা হয়েছে। সর্বোপরি, যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে এই প্রস্তাবিত পরিকল্পনা

রূপায়িত হলে আমাদের নগরোন্নয়ন এবং বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া সহজে বাস্তবায়িত হবে। সমগ্র প্রবন্ধে উদাহরণ হিসেবে পূর্ব রেলের হাওড়া-বর্ধমান শাখাটি আলোচিত হয়েছে; তবে, একই সমস্যা (কলকাতার উপকণ্ঠে) রেলের অন্যান্য শাখাতেও বর্তমান, এবং, বলাই বাহুল্য, এই সমাধান সেই সব শাখাতেও প্রযোজ্য।

২. সমস্যা ও তার সমাধান

২.১ সমস্যার চরিত্র

সমাধান খোঁজার আগে নিত্য লোক্যাল ট্রেনের অনিয়ম-যাত্রার পেছনের ঠিক কারণগুলি অনুধাবন করা যাক। ভূমিকায় বর্ণিত সান্ধ্যকাহিনিটিই হলো সমস্যার মূল চরিত্র আর এর মূলে রয়েছে প্রধানত নিচের তিনটি পর্যবেক্ষণ।

পর্যবেক্ষণ ১. একটি শাখার (যথা, হাওড়া-বর্ধমান) অন্তর্গত বিভিন্ন ধরনের ট্রেন সেই শাখাটিকে ভৌগোলিকভাবে ভাগ করে ঠিকই, কিন্তু পরিষেবাগুলি যাত্রীদের ভাগ করে না। বর্ধমান-হাওড়া শাখায় রয়েছে বর্ধমান, পাণ্ডুয়া, ব্যান্ডেল, শেওড়াফুলি, শ্রীরামপুর, তারকেশ্বর, হরিপাল লোক্যাল, যেগুলি যথাক্রমে, নাম-স্টেশন থেকে ছেড়ে সব স্টেশনে থামতে থামতে হাওড়ায় পৌঁছয় (কয়েকটি "গ্যালপিং" বর্ধমান লোক্যাল ব্যতিরেকে)। তাই, এই শাখার বিভিন্ন অংশের যাত্রীরা একাধিক পরিষেবার ভাগ পায়; যেমন, শ্রীরামপুর থেকে হাওড়ার মধ্যের সব স্টেশনের যাত্রীরা উপরিউক্ত সব কটি ট্রেনই ব্যবহার করতে পারে।

পর্যবেক্ষণ ২. একটি শাখার অন্তর্গত দুই বা ততোধিক ভিন্ন লাইনের অন্তর্বর্তী স্টেশনগুলিকে 'জংশন' বলা হয়; যেমন, বর্ধমান-হাওড়া আলোচ্য শাখায় জংশন দুটি—ব্যান্ডেল এবং শেওড়াফুলি (বালি জংশন হলেও এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক নয়)। ভৌগোলিক কারণে জংশন হলেও এই স্টেশনগুলি পরিষেবার ক্ষেত্রে ঠিক 'জংশন'-এর ভূমিকা নেয় না। যেমন, শেওড়াফুলি জংশনে তারকেশ্বর লোক্যালের পরিষেবা শুরু বা শেষ হয় না। অন্য সব ট্রেনের মতোই তারকেশ্বর লোক্যাল তারকেশ্বর থেকে হাওড়া যায়; যাত্রাপথের মধ্যে শেওড়াফুলি জংশন কোনো পৃথক ভূমিকা নেয় না।

পর্যবেক্ষণ ৩. হাওড়ার মতো মুখ্য স্টেশনে ট্রেন ঢুকতে বা বেরোতে মাত্রাতিরিক্ত সময় নেয়, কারণ, প্রতিটি লোক্যালের জন্যে আলাদা, নির্দিষ্ট সময় এবং প্ল্যাটফর্ম ধার্য থাকে না।

২.২ গ্রহণীয় ধারণা

প্রবন্ধের ভূমিকায় বর্ণিত সমস্যার সমাধান পেশ করার আগে সমাধানে ব্যবহৃত গ্রহণীয় ধারণাগুলি (assumptions) আলোচনা করা যাক।

ধারণা ১. (যাত্রীদের পরিসংখ্যান-বিভাজন সংক্রান্ত) : যথার্থ পরিসংখ্যানের অভাবে যাত্রীসংখ্যা সহজে অনুমান করতে এই বিষয়ে কয়েকটি ধারণা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ধারণা ১.ক. ধরা যেতে পারে হাওড়া থেকে দূরত্ব যত বেশি, যাত্রীসংখ্যা তত কম; উদাহরণস্বরূপ, কোন্নগরের যাত্রীসংখ্যা মানকুণ্ডুর যাত্রীসংখ্যার থেকে বেশি।

ধারণা ১.খ. পরিপূরক হিসেবে, ধরা যাক, জংশন স্টেশনগুলিতে যাত্রীসংখ্যা বেশি। অর্থাৎ, ব্যান্ডেল দূরে হলেও সেখানের যাত্রীসংখ্যা মানকুন্ডুর যাত্রীসংখ্যার থেকে বেশি।

এই দুই ধারণা (১.ক. এবং ১.খ.) মিলে অবশ্য পাওয়া যায়, দূরের জংশনের যাত্রীসংখ্যা কাছের জংশনের তুলনায় কম; অর্থাৎ, শেওড়াফুলির যাত্রীসংখ্যা ব্যান্ডেলের যাত্রীসংখ্যার থেকে বেশি।

ধারণা ১.গ. পরপর দুটি জংশনের মধ্যের স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের বিভাজন, পরিভাষায় ঘন্টাকৃতির (বেল-শোপড-ডিস্ট্রিবিউশন); দুই জংশনের মাঝের অঞ্চলের যাত্রীসংখ্যা অন্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি। উদাহরণ হিসেবে, হাওড়া এবং শেওড়াফুলির মধ্যে কোন্নগর অঞ্চলে এবং শেওড়াফুলি এবং ব্যান্ডেলের মধ্যে চন্দননগর অঞ্চলে যাত্রীসংখ্যা সর্বাধিক।

এই গৃহীত ধারণাগুলির প্রেক্ষিতে এবার মোট যাত্রীসংখ্যা বিভাজনের একটা মান ধরে নেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক, সকালে হাওড়ামুখী এবং সন্ধ্যায় বিপরীতমুখী অফিসযাত্রীদের মোট সংখ্যার ৪০ শতাংশ হাওড়া থেকে শেওড়াফুলির মধ্যের, ৩০ শতাংশ শেওড়াফুলি থেকে ব্যান্ডেলের মধ্যের, ২০ শতাংশ ব্যান্ডেল থেকে বর্ধমানের মধ্যের এবং ১০ শতাংশ তারকেশ্বর থেকে শেওড়াফুলিয মধ্যের (সংখ্যাগুলি অনুমান মাত্র; ধারণাগুলি বজায় রেখে অন্য অঙ্কের অনুমান চলতে পারে)।

ধারণা ২. (যাত্রীদের পছন্দ সংক্রান্ত) : বিভিন্ন পছন্দ (Preference) বাস্তবে অবশ্যই বিভিন্ন। তবে, যুক্তিপ্রয়োগের সুবিধার্থে ধরা যাক, আলোচিত সব যাত্রীর পছন্দ একই প্রকার এবং তা নীচের গুণাবলী মেনে চলে।

ধারণা ২.ক. যাত্রীরা কম সময়ের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছতে খুব পছন্দ করেন; অর্থাৎ কম সময়ে গন্তব্যে পৌছনোর আনন্দ (utility) খুব বেশি, বিশেষত নীচের দুটির তুলনায়।

ধারণা ২.খ. যাত্রাপথে ট্রেন বদলের কষ্ট (disutility) কম সময়ে গন্তব্যে পৌছনোর আনন্দের তুলনায় সামান্য মাত্র।

ধারণা ২.গ. যাত্রীদের নিজস্ব স্টেশন থেকে সরাসরি ট্রেন পরিষেবা (যথা, পাণ্ডুয়া থেকে পাণ্ডুয়া লোক্যাল) পাবার আনন্দ কম সময়ে গন্তব্যে পৌছনোর আনন্দের সামান্য মাত্র।

২.৩. একটি সমাধান

হাওড়া-বর্ধমান মূল শাখাটিকে শেওড়াফুলি ও ব্যান্ডের জংশন দ্বারা তিনভাগে ভাগ করা যায়। এই স্বাভাবিক বিভাজনকে কাজে লাগিয়ে, ট্রেন ও লাইনের সংখ্যা বা গুণ না বাড়িয়েই সমস্যার সমাধান সম্ভব। এই সমাধানে প্রয়োজন (বর্তমানের বিভিন্ন লোক্যালের পরিবর্তে) মাত্র দুই ধরনের ট্রেন পরিষেবা।

ট্রেন ১ (বর্ধমান এক্সপ্রেস) : এটি বর্ধমান থেকে হাওড়া যাতায়াত করবে এবং যাত্রাপথে শুধুমাত্র ব্যান্ডেল এবং শেওড়াফুলি জংশনে থামবে।

ট্রেন ২ (লোক্যাল) : পরপর দুটি জংশনের মধ্যে চলবে এবং যাত্রাপথে সমস্ত স্টেশনে থামবে। অর্থাৎ বর্ধমান-ব্যান্ডেল লোক্যাল বর্ধমান থেকে ব্যান্ডেল যাতায়াত করবে এবং মধ্যের সমস্ত স্টেশনে থামবে। একইভাবে, ব্যান্ডেল-শেওড়াফুলি, তারকেশ্বর শেওড়াফুলি এবং শেওড়াফুলি হাওড়া লোক্যাল চলবে।

এই ট্রেনগুলি দিনের বিভিন্ন সময়ের গুরুত্ব অনুসারে প্রতি ঘন্টায়, তিনটি, চারটি বা পাঁচটি করে চলবে। অফিস যাত্রার সময় দুটি ট্রেনই ঘন্টায় পাঁচটি করে চলবে। অর্থাৎ হাওড়াগামী মোট দশটা লোক্যাল ট্রেন চলবে যা সংখ্যায় বর্তমান ব্যবস্থার সমতুল।

ট্রেনগুলির জন্য প্রতিটি জংশনে নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম থাকবে। এর রূপায়ণে প্রয়োজন বর্ধমান, ব্যান্ডেল, হাওড়ায় চারটি করে, এবং শেওড়াফুলিতে ছয়টি প্ল্যাটফর্ম। প্রসঙ্গত, এই স্টেশনগুলিতে উক্তসংখ্যক প্লাটফর্ম এখনই রয়েছে।

২.৪. লাভ-ক্ষতির হিসেব

ভূমিকায় বর্ণিত সমস্যাগুলির সমাধান করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল। আলোচ্য. পরিকল্পনায় সমস্যার পেছনে পর্যবেক্ষণ তিনটির (পর্যবেক্ষণ ১-৩) সমাধান করা হয়েছে।

২.৪.১. লাভ

এই সমাধানে যাত্রীদের বিভাজন সম্ভব হবে, জংশনগুলি পরিষেবা ক্ষেত্রেও জংশনের ভূমিকা নেবে। ট্রেনের সংখ্যা একই রেখে (অনেক ক্ষেত্রে বরং বাড়িয়ে) যাত্রী বিভাজনের ফলে এবং নির্দিষ্ট ট্রেনের জন্যে প্লাটফর্ম নির্দিষ্ট করার ফলে ভিড় কমানো যাবে। তদুপরি, যাত্রীদের যাত্রাসময় কম হবে (একমাত্র, শেওড়াফুলি-হাওড়ার অন্তর্গত যাত্রীদের সময় কমবে না, কিন্তু বাড়বেও না)। সুতরাং এই সমাধানটিতে পরিভাষায় 'প্যারেটো ইমপ্রুভমেন্ট' হবে।

২.৪.২. ক্ষতি

জংশন স্টেশন ছাড়া অন্য সব স্টেশনের যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছতে ট্রেন বদল করতে হবে। তবে ধরাই হয়েছে সেই কষ্ট গন্তব্যে দ্রুত পৌঁছনোর আনন্দের তুলনায় সামান্য।

৩. নগরোন্নয়ন, বিকেন্দ্রীকরণ

কলকাতা শহর যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হওয়ার চাপ আর সামলাতে পারছে না তা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন। শহরের প্রসারণ, উন্নয়ন, বিকেন্দ্রীকরণ যে তাই প্রয়োজন, সে বিষয়েও সকলেই একমত। বিতর্কিত প্রশ্ন হলো কীভাবে তা বাস্তবায়িত হওয়া উচিত।

৩.১. নগরোন্নয়ন

বর্তমানে শহর কলকাতা বেড়ে চলেছে দক্ষিণে এবং পূর্বে সড়কপথের ভরসায় (রেলপথ যেখানে নেই বললেই চলে)। সরকারের দায় এই নতুন জনপদের জন্যে সড়ক ও পরিবহন ব্যবস্থা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের। ফল হিসেবে, বাড়ছে সরকারের ব্যয়, তদুপরি বাড়ছে পরিবেশদূষণ। তবু জোকা ছেড়ে মানকুন্ডুতে বাস করার কথা কেউ আজ ভুলেও ভাবেন না। সড়কপথে উন্নতির নামে আমরা পেয়েছি শহরর পূর্বের বাইপাস; কিন্তু বাইপাসের দুধারে এখন গড়ে উঠেছে নতুন আবাসন। অচিরেই তাই এখনকার বাইপাস পরিণত হবে শহরের মধ্যের কোনো রাস্তায়; তখন তারও পূর্বদিকে গড়ার প্রয়োজন হবে একটি নতুন পাইপাসের; কালক্রমে হয়েতো আরও একটি।

উন্নত বিশ্বে, যেমন, ইউরোপের শহরগুলি বিশেষত লন্ডন, প্যারিস-এর শহরতলির উন্নতি ঘটেছে পুরোপুরি মাটির উপরের ও তলার ট্রেনের পরিষেবার ভরসায়। বিদেশের মত 'নেটওয়ার্ক' আমাদেরও আছে; প্রয়োজন, সেই নেটওয়ার্কের ভিত্তিতে নগর প্রসারণ ও উন্নয়ন। দুঃখজনকভাবে, আমাদের বর্তমান নেটওয়ার্কের ব্যবহার ও পরিষেবাতে কোনো গবেষণা বা চিন্তার ছাপ নেই। আর তাই হয়তো আমাদের শহরতলি লন্ডন, প্যারিসের শহরতলির মত গড়ে ওঠেনি।

৩.২. বিকেন্দ্রীকরণ

বিকেন্দ্রীকরণের সারমর্ম যদি হয় একটি কেন্দ্রের পরিবর্তে বিকল্প কেন্দ্র গড়ে তোলা, তাহলে, স্বাভাবিকভাবেই রেলের জংশনগুলি এইসব নতুন কেন্দ্র হবার যোগ্য দাবিদার হতে পারে। জংশনগুলির গঠন বিমান পরিষেবায় 'হাব' এয়ারপোর্টের মত হওয়া উচিত। আর যদি তা হয়, তাহলে এগুলি সহজেই হয়ে উঠবে বিকল্প কেন্দ্র। তখন কলকাতার চাপ ভাগ করে নিতে পারবে ব্যান্ডেল ও শেওড়াফুলি; রাজ্যের দ্বিতীয় শহর হতে পারবে বর্ধমান। এ সবই সম্ভব হবে লোক্যাল ট্রেন পরিষেবার উন্নতি ঘটিয়ে।

৪. উপসংহার

এই প্রবন্ধে প্রস্তাবিত সমাধানে বিমান পরিবহণে প্রচলিত 'হাব-অ্যান্ড-স্পোক' ব্যবস্থার ধাঁচ কিছুটা ব্যবহার করা হয়েছে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে সমাধানের অনেকটাই পশ্চিম ইউরোপের দেশে হল্যান্ড, বেলিজয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি-র ট্রেনচালানোর পদ্ধতির নকলে। প্রসঙ্গত, অপারেশন্স রিসার্চে ওলন্দাজরা পৃথিবীবেখ্যাত, তাই তাঁদের ট্রেন, ট্রাম, বিমানের পরিবহন ব্যবস্থাও তর্কসাপেক্ষে বিশ্বসেরা।

প্রস্তাবিত পরিকল্পনার পেছনের চিন্তাভাবনা যে শুধুমাত্র লোক্যাল ট্রেন নেটাওয়ার্কেই সীমাবদ্ধ তা মোটেই না। একই সূত্র কাজে লাগিয়ে মাঝারি এবং দূরপাল্লার ট্রেন পরিষেবার উন্নতি ঘটানো, এবং ফলস্বরূপ, দেশব্যাপী নগরোন্নয়ন ও বিকেন্দ্রীকরণ, সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে মাঝারি দূরত্বের পরিষেবা হাওড়া-পুরুলিয়া এক্সপ্রেস ট্রেনকে। বর্তমান পরিষেবার সঙ্গে এই প্রবন্ধের পরিকল্পনার তফাত হলো দুটি জংশনের মধ্যে সংযোগকারী ট্রেনের অভাব। প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুযায়ী, হাওড়া-পুরুলিয়া এক্সপ্রেস শুধুমাত্র খড়্গপুর এবং বাঁকুড়া জংশনে থামা উচিত; সঙ্গে অবশ্য প্রয়োজন, হাওড়া-খড়্গপুর, খড়্গপুর-বাঁকুড়া এবং বাঁকুড়া-পুরুলিয়া শাখায়, প্রস্তাবিত সমাধান মাফিক, লোক্যাল ট্রেন পরিষেবা। পুরুলিয়া বা উত্তরবঙ্গ এভাবে দূরদেশের অবস্থানজনিত অবহেলা থেকে সহজেই মুক্তি পেতে পারে।

৫. শেষকথা

এই প্রবন্ধের শিরোনামটুকু দেখে জ্ঞানী পাঠক নিশ্চয় ভেবেছিলেন, বিকেন্দ্রীকরণের গভীর জলে অনেক বৃহদাকার চতুষ্পদ তলিয়ে গেছে, লোক্যাল ট্রেনে মত পতঙ্গ তো কোন ছার। পাঠক, শরতে একটু উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে দোষ কীসের?

৬. কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অশোক সেন ও বিশ্বজিৎ রায়কে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ও সমালোচনার জন্য অনেক ধন্যবাদ। কয়েক বছর আগে, এই প্রকল্পের চিন্তাসূত্র ধরে *দ্য টেলিগ্রাফ* দৈনিকে কয়েকটি উত্তর-সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছিলাম, সম্পাদক রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়কেও এই সুযোগ তাঁর অতীতে প্রাপ্য ধন্যবাদ জানাই।

ইন্দ্রজিৎ রায়

কেন্দ্রীয় বাজেট : ২০০৫-০৬

কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে আলোচনা, লেখলিখি এগুলো বছরের এই সময়টাতে একটা আচারে পয্যবসিত হয়েছে। বোধহয় সে কারণেই কিছুকাল আগেও সাধারন মানুষের মধ্যে বাজেট পেশের দিন এবং পরের কয়েকটা দিন যেটুকু উৎসাহ লক্ষ্য করা যেত, আজকাল আর তেমনটা দেখা যায় না। ২০০৫-০৬ বিত্তবর্ষের কেন্দ্রীয় কাজেটও এর ব্যতিক্রম নয়। বর্তমান বিত্তমন্ত্রী শ্রী চিদাম্বরম গত প্রায় একবছর ধরেই (মে ২০০৪ থেকে) আর্থিক সংস্কার প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল করার লক্ষে বিভিন্ন নীতি ঘোষনা করেই আসছেন।

মন্ত্রী মহাশয় বাজেট প্রস্তাব শুরুই করেছেন এ কথা বলে, ২০০৪-র সংসদীয় নির্বাচন ছিল পরিবর্তনের এবং সাধারণ নাগরিকদের পক্ষে। দেশের মানুষের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য যে নতুন পথ সংযুক্ত প্রগতিশীল সরকার দেখাচ্ছেন তার প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে তিনি ঘোষণা করেছেন সে এতে বেশি সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক মঙ্গল হবে, এই ঘোষনাকে মাথায় রেখে এবার একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক অবস্থাটা কি দাঁড়াল।

এটা জেনে ভাল লাগল শব্দের মোড়কে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বাস্তবটিকে অর্থমন্ত্রী স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন ভারত গরিব দেশ নয়, কিন্তু দেশের একটা বড় অংশের মানুষ গরিব। আর এ দারিদ্র্য শুধু আয়ের মাপকাঠিতে নয়, এ দারিদ্র্য নিরক্ষরতায়, রুগ্নতায়, শিশুমৃত্যুতে, অপুষ্টিতে, চাকরি-হীনতায়। তাই দারিদ্র্য এবং বেকারির বিরুদ্ধে আঘাত হানতে হবে। কর্মসংস্থানের কথা বলতে গিয়ে নতুন চাকরি সৃষ্টির যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে তাতে সরকারের ভূমিকা আদৌ স্পষ্ট নয়। দেশিয় বস্ত্রশিল্পের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার যে ছবি আমরা আজও দেখে আসছি সেখানে দাঁড়িয়ে এককোটিরও বেশি কর্মসৃষ্টির গল্প খুব একটা আশার সঞ্চার করে না। পূর্বতন সরকারের আমলেও প্রতি বাজেটেই কর্মসংস্থানের একটি ক্ষেত্রের কথা শুনেছি, এ বাজেটেও শুনলাম। নির্মাণশিল্পে নাকি লক্ষ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান হবে। এ ব্যাপারটা এমনভাবে রাখা হয় যেন নির্মানশিল্পে মানুষ আগে কাজ করত না, এখনই যেন এই ক্ষেত্রে নতুন করে কর্মসংস্থান হবে।

জাতীয় গ্রামীন কর্মসংস্থান প্রকল্পে ১১.০০ কোটি টাকার সংস্থান হয়েছে। পুরনো 'কাজের বদলে খাদ্য' প্রকল্পটিই এই নতুন প্রকল্পে রূপান্তরিত হবে। কিন্তু কি ভাবে এই প্রকল্প রূপায়িত হবে এই স্বল্প পরিমান অর্থে কি ভাবে কোটি কোটি গ্রামীন গরিবের কর্মসংস্থান হবে তার কোন হদিশ প্রস্তাবে নেই, তবু শরিক বামপন্থীদের লাগাতর চাপে

জাতীয় ন্যূনতম কর্মসূচীর এই প্রতিশ্রুতি পালিত হওয়ার সূচনা তো হল। গ্রামের প্রান্তিক মানুষের হাতে এই ঘোষিত প্রকল্প কতটা ক্রয়ক্ষমতা তুলে নিতে পারবে তাই এখন দেখার।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্যে কিছু কর্মসূচি এই বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে। একটি একটি সাহসী পদক্ষেপ। পাশাপাশি একটি অনগ্রসর অঞ্চল অনুদান তহবিল গঠন করার কথাও বলা হয়েছে। ১৭০ টি অনগ্রসর জেলাকে বেছে নিয়ে পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা প্রদান করে প্রকল্পটি রূপায়িত হওয়ার কথা।

বন্যা নিয়ন্ত্রন এবং ভূমিক্ষয় রোধে একটি কর্মসূচি বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, কিন্তু গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা এবং বরাক উপত্যাকায় প্রতি বছর বন্যার যে ভয়াবহ তাণ্ডব আমরা দেখে থাকি এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গত কয়েক বছরে গঙ্গার বিস্তীর্ণ দু'পাড় জুড়ে ভাঙ্গন। ভূমিক্ষয়ের যে ভয়ঙ্কর রূপ আমরা দেখছি তাতে করে এই সমস্যা প্রতিরোধে এই মুহূর্তেই যতটা গুরুত্ব দেওয়া জরুরী ছিল, বাজেট প্রস্তাবে তার প্রতিফলন দেখা গেল না। পূর্বাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের নিরিখে এ সমস্যা এখন যে আকার ধারণ করেছে তাতে অতি সত্ত্বর কিছু কার্য্যকরী পদক্ষেপ না দিতে পারলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।

সংসদে রাষ্ট্রপতির বাজেট-পূর্ব ভাষনে যে 'ভারত নির্মাণ'-র স্বপ্ন উল্লেখিত হয়েছিল তার একটা রূপরেখা বাজেট-প্রস্তাবে পাওয়া গেছে। ছটি অংশে বিভক্ত এই স্বপ্ন প্রকল্পটি মূলত একটি বহুমুখী গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প যাতে আছে সেচ, বিদ্যুৎ, পানীয় জলের যোগানের কথা। এরই অঙ্গ হিসেবে হয়তো কিছু কিছু কাঠামোগত সংস্কারের কর্মসূচী বাজেটে নেওয়া হয়েছে যেমন গ্রামীন বৈদ্যুতীকরণ, ইন্দিরা আবাস যোজনায় ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি ইত্যাদি।

ভারতবর্ষের মত জনবহুল দেশে বর্তমানের প্রযুক্তিভিত্তিক বৃহৎ শিল্পে প্রয়োজনীয় কর্মবিনিয়োগ হওয়া সম্ভব নয় এটা আজকাল সবাই বোঝে। সুতরাং বেকার যুবক এবং কর্মচ্যুত মানুষদের জীবিকা অনেকটাই নির্ভর করবে মাঝারি/ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশের ওপর এবং/অথবা পরিষেবা ক্ষেত্রের প্রসারের ওপর। আলোচ্য বাজেটে এই দুই ক্ষেত্রের পক্ষে কোন ভাল খবর নেই। বরং ১০৮ টি ক্ষুদ্র শিল্প-র সংরক্ষণমুক্ত হওয়ার খবর আছে, অর্থাৎ, সংস্কারের তাড়ায় মুক্তকচ্ছ অবস্থা আর কি!

প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধিকে আপাতদৃষ্টিতে মেলানো যায় না। একদিকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ আর অন্যদিকে জটিল আর্থ সামাজিক কারণ থেকে উদ্ভূত এবং অনেকাংশে প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলো থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত অন্তর্দেশিয় সন্ত্রাসবাদ প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে একটা দুষ্টচক্র তৈরী করেছে যার থেকে বেরিয়ে আসার সাহস কেউই দেখাতে চান না। আর মূলধনী খাতে বিপুল ব্যয়বরাদ্দ প্রমাণ করে আন্তর্জাতিক অস্ত্র কারবারি। সামরিক আমলাদের চাপ কতটা সক্রিয়।

মোটামুটিভাবে বিভিন্ন সামাজিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে করা হচ্ছে। এমন প্রশ্ন হল যে প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলো রূপায়িত করতে যে বিপুল পরিমান অর্থের প্রয়োজন তা আসবে কোথা থেকে। এ ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে। জনকল্যানমুখী প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ আর পরিষেবা ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগের মিশ্রণই মনে হয় কাঙ্খিত সরকারি ভাবনায়।

আলোচ্য বাজেটে একটি বড় এবং বিতর্কিত পদক্ষেপ হলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের উর্দ্ধসীমা বাড়িয়ে দেওয়া। এরকম একটি ক্ষেত্র হলো টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা যেখানে ভারত অভাবনীয় প্রযুক্তিগত উন্নতি করেছে। এই উন্নত প্রযুক্তি বিদেশি লগ্নিকারিদের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া কতটা সঙ্গত বিশেষ করে যেখানে দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত হয়ে পড়ে। একই ভাবে ব্যাঙ্ক/বীমা শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগ নিয়েও প্রশ্ন উঠে পড়ে লগ্নিকারিদের স্বার্থ/নিরাপত্তার কথা ভেবে।

এবার আসা যাক কর-সংক্রান্ত প্রস্তাব আলোচনায়। কেন্দ্রীয় সরকারের কর-সংস্কার একটা বেশ খেলার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে হচ্ছে। অর্থনৈতিক সংস্কারের হাত ধরে কর-সংস্কারও একটি লাগাতার প্রক্রিয়া। অর্থনৈতিক উন্নতির অন্যতম স্বীকৃত মাপকাঠি হলো মোট জাতীয় উৎপাদন-এর সঙ্গে কর সংগ্রহের একটি অনুকূল অনুপাত। এই অনুপাত এদেশে এখনও কাঙ্খিত স্তরে পৌছোয় নি। এটা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে বাজেটে। গত কয়েক বছর ধরে রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধির একটা ধারাবাহিক হার বজায় থাকার ফলে এটা ভাবা সম্ভব হচ্ছে।

এবারের বাজেটে কর কাঠামোর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যাচ্ছে তা হলো পরোক্ষ করের একটি বড় উপাদান অর্থাৎ আমদানি সুল্ক-র ব্যাপক হ্রাস। এই হ্রাসের আওতায় বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে বিশুদ্ধ পানীয় জল উৎপাদনের প্রযুক্তি পর্য্যন্ত সবই আছে। মনে করা যেতে পারে একটা সময় ছিল যখন ভারত থেকে যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ রপ্তানি করা হত। ক্রমাগত দেশিয় শিল্পের ওপর থেকে সংরক্ষণ ব্যবস্থাগুলো প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফলে অপেক্ষাকৃত সস্তা বিদেশি পন্যের চাপে পিছু হটতে হটতে রুগ্ন এবং পরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং কর্মচ্যুতির শিকার হয়ে পড়ছেন হাজার হাজার শ্রমিক/কর্মচারি।

প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রেও সংস্কারের ব্যাপক প্রভাব পড়ছে কোম্পানি এবং সাধারণ করদাতাদের ওপর। স্বাধীনতালাভের কয়েক বছরের মধ্যেই করকাঠামো সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল পরিকল্পিত অর্থনীতির জন্য সম্পদ সংগ্রহ করার লক্ষ্যে। সেই পঞ্চাসের দশকে অধ্যাপক কালডোরের নেতৃত্বাধীন বিশেষজ্ঞ কমিটিকে দিয়ে শুরু করে পরবর্তীতে এমন আরও অনেক কমিটির হাত ধরে অতঃপর ড: রাজা চেল্লাইয়া এবং অধুনা জিয়া কেলকার কমিটির সুপারিশক্রমে বিভিন্ন পর্য্যায়ে কর সংস্কারের চেহারা দেখেছি। প্রায় প্রতিটি বিশেষজ্ঞ কমিটিই কৃষিআয়কে কেন্দ্রীয় আয়করের আওতায়

আনার সুপারিশ করেছে। কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত এবং বিপুল রাজনৈতিক প্রভাবসম্পন্ন কুলাক লবির চাপে এ দুঃসাহস আজ পর্য্যন্ত কোন সরকারই দেখায় নি। কোম্পানি করের ক্ষেত্রেও পরবর্তী কমিটিগুলো সুপারিশ করেছে এ যাবৎ প্রাপ্ত কর ছাড়ের সুবিধেগুলো প্রত্যাহার করে নেওয়ার। কিন্তু সে রকম বৈপ্লবিক কোন কিছু এ বাজেটেও ঘটেনি। বরং কোম্পানির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কর কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং যথারীতি মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী করদাতাদের মধ্যে যাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি শ্রেণীকে বেঁধে মারার একটা ঝোঁক এই বাজেটে খুব পরিষ্কার। যেটুকু করছাড়ের সুবিধে তাদের জন্যে বরাদ্দ ছিল তা সবই প্রায় তুলে নেওয়া হয়েছে। নতুন করে প্রবর্তিত ৮০সি ধারা মোতাবেক এক লাখ টাকার ছাড় ভোগ করা খুব বেশি সংখ্যক আয়করদাতার পক্ষে সম্ভব হবে না। শুধু তাই নয়, এই বাজেটের ফলে বরিষ্ঠ নাগরিকদের স্পষ্টতই বেশি কর দিতে হবে। কিঞ্চিৎমাত্র সুদ বেশি দিয়ে কর বাবদ তার চেয়েও বেশি উসুল করে নেওয়ারা নিষ্ঠুর মতলবটি কে দিয়েছেন তা তো জানা যাবে না, কিন্তু এটা ঘোরতর অন্যায়। আরও বড় অন্যায় বেতনভূক শ্রেণীর ক্ষেত্রে যে দৃষ্টিভঙ্গী এই বাজেটে নেওয়া হয়েছে তা। এঁদের বিরুদ্ধে স্পষ্টতই একটি সাংবিধানিক বৈষম্য ঘটছে এবং ঘটতে যাচ্ছে। প্রতি শ্রেণীর আয়করদাতা যেখানে তাদের আয় থেকে নানারকম ছাড়ের সুবিধে পাচ্ছেন, সেখানে শুধুমাত্র বেতনভূক শ্রেণীর ক্ষেত্রেই সমস্ত সুবিধে প্রত্যাহার করে নেওয়া অবশ্যই একটি অনভিপ্রেত বৈষম্য। ভবিষ্যতে অবশ্য আরও বড় অশনি সংকেত এই শ্রেণীর জন্য এই বাজেটেই আছে। ভবিষ্যনিধিতে জমা টাকা হাতে পাওয়ার সময় কর দিতে হবে এমন সম্ভাবনা প্রকট হয়ে উঠছে। এমন নিশ্চিত রাজস্ব আর কোথা থেকে পাওয়া যাবে! কিন্তু 'India shining'-র দুঃস্বপ্ন কি এতই তাড়াতাড়ি স্মৃতি থেকে মুছে গেল!

দেবনাথ মুখোপাধ্যায়

'লেফট ইজ রাইট' একটি নতুন শ্লোগান

এই শ্লোগান একবিংশ শতকের বাঙালি মার্কসবাদ বিশ্বাসী জনগণের জন্য জরুরি প্রবাদ প্রবচনের অন্তর্ভুক্ত। কংগ্রেসের বিধান-প্রফুল্ল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র বিনাশের পর ভগবান বুদ্ধ তার মার্কসবাদী পুলিশ ও অন্যান্য শিষ্যসমতুল্য সরকারি কর্মচারীদের মনুসংহিতা ইংরাজি ভাষায় রচনার অংশ বিশেষে এমত মাত্র দুটি বেদ বাক্য উচ্চারণ করেছেন। এই বাণীর উৎস সন্ধানে নিরত হয়ে বহু পরিশ্রমের পর বুঝতে পারলেন 'শুধু' তোমার বানী নয়, হে বন্ধু হে প্রিয়। এর উৎস হলো একটি প্রাচীন ব্যান্ড গীতিকা। সেটি একটু এদিক ওদিক করে নিলেই আপামর 'মার্কসবাদী' বাঙালি এই প্রথম প্রবচনের অর্থ উদ্ধার করতে পারবেন। একজন 'খচ্চর' এবং 'তদুপরি অসহায়' বং-সন্তান বললেন, এটা আসলে একটি পাটিগণিতের অঙ্ক। এটা হলো L=R, আবার অন্যভাবে এটা হতে পারে R=L. আমি অঙ্কে বরাবর ভীষণ কাঁচা। প্রশ্ন করলাম এটা কি কোনও 'মার্কসবাদী'র বিপ্লবের তৈলাক্ত বংশদণ্ডে ওঠার চাইতে কঠিন কোনও অঙ্ক? একজন 'মার্কসিস্ট বং' বললেন, নাঃ, আপনাকে নিয়ে পারা গেল না। বেশি বাড়াবাড়ি করলে আপনার দুর্গার চালচিত্রে কার্তিকের মত অবস্থা হবে। বর্তমান 'মার্কসবাদের বংশ' কোথায় প্রবেশ করে এবং কোথা দিয়ে নির্গত হয় ভালো-ই বুঝবেন। একজন কে-যেন সাংবাদিক পোস্ট-এডিট কলামে মার্কসবাদ ও নম্বরবাদ এক করে ফেলেছে। আমাদের সময় নম্বরবাদ নেই, যা খুশি নম্বর হলেই হবে। 'মার্কসবাদী'রা এ-সব নম্বর-ফম্বর বা ট্যালেন্টের তোয়াক্কা করে না। মনে প্রাণে বা ভালো কথায় কায়মনোবাক্যে 'আমাদের লোক' হলেই হলো। দেখলেন না 'দুলাল'-এর তালমিছরি বা মধুকর 'গুঞ্জন'কে আমরা কীভাবে যোগবিয়োগ গুণভাগে নিয়ন্ত্রণ করি? পাটিগণিত-ফনিত বোঝাবেন না। কে এক 'যাদব' পাটিগণিত লিখেছিলেন। ভুসি, দুধের ঘোটালার হিসেব করতে আমরা তাকে লালুপ্রসাদ যাদবের কাছে দিয়ে দিয়েছি। ফলে L=L অর্থাৎ Left=Lalu হলো। অন্য অঙ্ক মানি না। একেবারে রসকসহীন অঙ্কের অধ্যাপক বললেন, আমিও তো তাই বলছি। তবে অঙ্কের ফর্মুলা অন্যরকম। লেফট=লালু ঠিক আছে, কিন্তু লেফট=লেফট নয়। এল=সি=এল=আর=পি হয়ে গেল যে? ভ্রূ কুঁচকে কমরেড প্রশ্ন করলেন, এসব ইকুয়েশনের মানে? আপনি বলতে চাইছেন লেফট=কংগ্রেস=লালু=রাইট=পাওয়ার? এটা কোনও অংক হলো? অধ্যাপক বললেন, আরো একটা অঙ্ক আছে এল্=M=–ML–SUC+C.P.I+FB+RSP+C=P, এটা পশ্চিমবঙ্গের ইকুয়েশন। দরকারমত p বা পাওয়ারকে ঠিক রাখতে যে কোন ইকুয়েশন চলবে। তাহলে ছোট করে দাঁড়াচ্ছে L=R=P। এবার যদি 'P' কে কমন ফাক্টর

হিসেবে ধরি তাহলে ম্যালটিন্যাশনাল, চীন, ফরেন ক্যাপিটাল, মাফিয়া, সর্বসত্য মার্কসবাদ' দুগ্গো বা ঘেঁটুপুজো, রমজান, ক্রিস্‌মাস ভ্যালেনটাইন্সডে সব একজায়গায় গিয়ে একেবারে জমে ক্ষীর। L=P=R. p যদি common factor হয়, তবে L=R. অর্থাৎ লেফট্ ইজ রাইট। চেম্বার অফ্ কর্মাসগুলোকে এর মধ্যে ধরে নিতে হবে।

হ্যাঁ, প্রথমে একটি প্রাচীন ব্যাণ্ড গীতির কথা হচ্ছিল, সেটা হলো, 'লেফট এ্যাণ্ড রাইট, দ্যাটস অল রাইট, আপনা হাত, জগন্নাথ করবে ভাই বাজীমাৎ।' এটি পুরনো গান, চন্দ্রবিন্দু বা যে কোন ব্যাণ্ড গানটি যে কোনও দিন গাইতে পারে। তাহলে বর্তমান 'বামপন্থী' স্লোগান, লেফট ইজ রাইটও হলো, তৈলমর্দন করাও হলো, অবার গানও গাওয়া হলো। কি করে একসঙ্গে দুটোই করা যায়' যদি শিখতেই হয় তবে সু+সুর কাছে যেতে হবে। ধান্ধাবাজি করতে হবে কবিতা-উৎসবের নাম করে। সু-দাদার গান শুনতে হবে, তার সঙ্গে 'হুইস্কি, সোডা ও মুর্গি-মাটন' খেয়ে বাংলা ভাষা রক্ষার্থে আলকাতরার টিন নিয়ে বেরোতে হবে।

যদি এত সব না পারেন তবে তুলসি-মালা গুনতে গুনতে হাজার বার বলতে হবে লেফট্ ইজ রাইট, লেফট ইজ রা-ই-ট। উল্টে গেলেও ক্ষতি নেই। ডু-ইট-না-উ।

নয়ন পাল

ব্ল্যাক : ভিন্ন প্রতিক্রিয়া

আমাদের বন্ধুরা অমিতাভ এবং রানী মুখার্জী অভিনিত কলকাতার সাড়া জাগানো 'ব্ল্যাক' চলচ্চিত্রটির পুরোটা দেখতে পারেন নি। 'ব্ল্যাক' প্রসঙ্গে রঙ্গন এক প্রকার মেসিংকুফ্ দিয়ালোগ অবতারণা করে বক্ষ্যমান সিনেমা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আজকাল, বর্তমান এবং প্রতিদিন-এর সমালোচকরা প্রবল উৎসাহে আহাউহু করতে করতে প্রায় গড়াগড়ি খেয়েছেন। আহা-অমিতাভ! বাহা রানী করতে করতে খোলকরতাল নিয়ে প্রায় মানবিক-চৈতন্যের বিজয় মিছিল বার করে ফেলেছেন। সিনেমা বিষয়ে অজ্ঞ এই লেখকের পক্ষে কিছু বলা বা লেখা ধৃষ্টতামাত্র। কিন্তু বাঙালি ঐতিহ্যে ধৃষ্টতা আজকাল বীরত্বের লক্ষ্মণ, এই দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাস্তার লোক বা পোক হিশেবে দু-একটি কথা নিবেদন করি। মনে হয় আমার এই ভনিতা এবং শীর্ণকায় টেক্সট কারও পছন্দ হবে না। তাতেও নিশ্চিন্তি।

যাঁরা পুরোটা দেখতে পারেন-নি আমি তাদের দলে নই। কেননা আমি পুরোটা-ই দেখেছি। যারা প্রবল-উচ্ছ্বাসে নিজেরা ভেসে গেলেন এবং অন্যদের ভাসিয়ে দিলেন, আমি তাদের দলেও নেই। পশ্চিমবঙ্গে আবার দলটল না করলে মহাবিপত্তি। এই একদলীয় শাসনে শাসক প্রভুরা কী ভাবছেন এখনও সরকারিভাবে জানা যায় নি। তবু 'আজকাল' পত্রিকার লেখা যদি সরকারি প্রভুদের সরকারি ভাষ্য হয় তবে আমার পোড়া কপালে অশেষ দুঃখ আছে। কেননা এখানে ব্যক্তিক জমি বা স্পেস থাকতে নেই।

প্রথমে অন্য একটি প্রসঙ্গ বলে নিই। আমি এই চলচ্চিত্রটি দেখেছি '৮৯' নামক আধুনিক সিনেমাসেকোপে এবং ডলবি-ডিজিটাল সিস্টেমের মাধ্যমে। এই '৮৯' হলটি শ্রীযুক্ত হর্ষ নেউটিয়ার ম্যাজিক মাউন্টেন 'স্বভূমি'তে অবস্থিত। পুবদিকে সল্টলেকের স্টেডিয়াম এবং পাঁচতারা হোটেল। দক্ষিণদিকে ছোট ছোট ঢেউ খেলে যাচ্ছে এবং এখনো খুনখারাপি করার আদর্শস্থল সুভাষ সরোবর বা গুঞ্জনদের নিত্য যাতায়াতস্থল। পশ্চিমে প্রায় দশবিশ হাজার শ্রমিকের মুখের ভাত জোগানো বিশাল কারখানা মহাশূন্যে উধাও করে বিশ-থেকে পঁচিশ লক্ষ টাকা দামের প্রতি ফ্ল্যাটের বিশাল কমপ্লেক্স। এই 'স্বভূমি' কাদাপাড়া-ডাম্পিং গ্রাউন্ড। নিচে বিশাল মেথর পট্টি। মেথররা এখনও কী করে টিকে আছে জানি না। তবে আছে। ৮৯-এর মনোরম হলে, নরম কার্পেটে পা ডুবিয়ে হেলেন কেলারের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এই সিনেমাটি দেখতে দেখতে কখনো কখনো এই অঞ্চলের ইতিহাস মনে পড়ছিল। ধান ভানতে শিবের গীত গাইবার জন্য, যারা ভুল করে এই লেখাটি পড়ছেন, তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইছি। একশত তিরিশটাকা

ব্যয় করে ভালো লাগছে না বলে দুম্‌ করে উঠে আসার পাবলিক আমি নই। তাই সেই সময় কিছু স্মৃতিচারণ করে নিয়েছি।

সিনেমাটি দেখতে দেখতে মনে হলো বাঙালির ব্যাপক ভাললাগার জন্য যা যা মশলা দরকার তা সবই অনুপুঙ্খ এই ছবিতে উপস্থিত। আবেগ, উচ্চকিত আবেগে পরিপূর্ণ। বিদ্যাসাগর মশাই বেঁচে থাকলে, আমার বিশ্বাস হাপুস নয়নে কান্নার সুনামিতে ভেসে যেতেন। যদি কোনও সিনেমায় শেষ অব্দি জয় ও প্রবল আবেগাঘাত, কান্নাভরা দুঃখ থাকে, বাঙালি শরৎচন্দ্রীয় মতে *রামের সুমতি*-এর মত তা খেয়ে ফেলবে। একটি অন্ধ ও বোবা বালিকার জন্য সে সহানুভূতি বাড়বে বই কমবে না। যে সব বাঙালি শিক্ষক সেমিনার ও রাজনীতির প্রবল অভিঘাতে ছাত্রদের সঙ্গে নির্বিচারে প্রতারণা করেন এই ছবিটি তাদের কাছে অসহ্য ন্যাকামি বলে মনে হবে। প্রায় পনের-কুড়ি বছর ধরে একজন শিক্ষক (সিনেমায় 'টিচার') অন্ধ-বোবা ছাত্রীকে নিয়ে পড়ে থাকতে থাকতে 'আলঝাইমার্স'-এ আক্রান্ত হলেন। আবার সেই অন্ধ-বোবা ছাত্রী 'টিচার'-কে তাঁরই পদ্ধতিতে স্মৃতিশক্তি ফিরিয়ে দিল, এ শুধু ম্যাজিক নয়, ম্যাজিকের চাইতে কষ্টকল্পিত। দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া পুরো সিনেমাটি অতি-অভিনীত এবং দাগটি বেশ মোটা ও চড়া। সূক্ষতার প্রায় নাম গন্ধ নেই। সবাই কেন যে রানি মুখার্জীকে নিয়ে ব্যস্ত। আমার কিন্তু কিশোরী মিশেলকে অনেক বেশি ভালো লেগেছে। ভালো লেগেছে অল্পের মধ্যে হলেও ধৃতিমান-এর ব্যক্তিত্বময় অভিনয়। 'দেবরাজ'-এর বা 'টিচার' এর ভূমিকায় অমিতাভ বচ্চন নিশ্চয়ই অন্যরকম ভূমিকায়। সাধারণত যা অভিনয় করেন তার থেকে অন্যরকম। কিন্তু কণ্ঠস্বরে এবং অভিনয়ে সমান দাপুটে। যাকে বলে মেগা স্টার উপস্থিতি। 'ব্ল্যাক' যখন সবটাই ঝলমলে তখন কোথায় সেই অন্ধকার যা মানুষকে আলোয় নিয়ে যায়। সেট এবং ক্যামেরা বেশ বর্ণময়। মিশেল যে বাড়িতে বাস করে সেটা প্রাসাদতুল্য বা সত্যিই রাজপ্রাসাদ। পারিপার্শ্বিক ও প্রকৃতি এবং মেগাস্টাররা সিনেমার স্ক্রিপ্ট ও কাহিনীকে মেড্ টু অর্ডার-এ পরিণত করেছে। অসম্ভব ভালো ক্যামেরার কাজ। সবটাই অসম্ভব গোছানো এবং একেবারে দামি পশ্চিমী ঘরানার ছাঁচ। ক্রিশ্চিয়ান পরিবারের কাহিনী হওয়ায় চার্চ, যিশু এবং ইংরেজি সিনেমাকে পাশ্চাত্যধর্মী করে তুলেছে। ছবিটির ভারতীয় উপসর্গ বা চরিত্র নেই-ই। কিন্তু সেটা না থাকলেও কিছু যায় আসে না।

যারা দেখতে পারেন নি পুরো ছবিটি, তাদের দোষ দেবার কিছু নেই, আক্রমণ করারও তেমন যৌক্তিকতা নেই। অনেকেই অমিতাভ বচ্চনের মেঘনাদসুলভ গর্জন ও অতিনাটকীয় অভিনয় সহ্য করতে পারেন নি। মেইনস্ট্রিম ছবি দেখতে এরা তেমন অভ্যস্ত নন। ফলে সুকুমার বৃত্তি থেকে গেছে। কেন থেকে গেছে *'গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্ব সমাস'* পড়লে বোঝা যাবে হয়তো। সিনেমার পাঠ একেক-জনের কাছে একেক রকম। এই ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার কারণ নিয়ে গবেষকরা গবেষণা করতে পারেন, এটি সে আলোচনার ক্ষেত্র নয়।

সিনেমাটি দেখতে দেখতে সংবেদনশীল মনে ধাক্কা লাগতে পারে। কিন্তু দেখার পর সে অভিঘাত থাকা কঠিন। শিক্ষক-ছাত্রী সম্পর্কের দান-প্রতিদান এর ফেরৎ 'কহানি' এবং যুবতী-ছাত্রীর যৌনতার প্রতিক্রিয়া সামলানোর কাজটি 'হৃদি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে'-র মত হয়তো। তবে এই কাহিনির সূত্রপাত এবং শেষ পর্যন্ত একটি বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই লক্ষণীয়। ছবিটিতে অমিতাভ ও রাণি মুখার্জি থাকা সত্ত্বেও কোনও নাচগান তেমনভাবে নেই। সামান্য যা আছে তা একেবারে অন্যরকম এবং খাপ খেয়ে যায়। যদিও ওই বিশাল চোখ ধাঁধাঁনো পার্টির দৃশ্যটি অস্বস্তিকর। দুইবোনের মধ্যেকার টেনশন যেন হঠাৎ নাটকীয় প্রক্ষেপ এবং উচ্চকিত। হয়ত অন্যরকম হতে পারতো। ছবিটি আদ্যন্ত গতিময়। শুধু 'টিচার' 'টিচার' আওয়াজটি এবং প্রতিকাহিনীটি কেন জানি মনে হতে পারে বেশ আরোপিত। অমিতাভ-রানির চলাফেরা ভাবভঙ্গী তাঁদের অভিনয়, অভ্যাস বিরোধী বলে মনে হয় কষ্টকৃত এবং কোথাও কোথাও ম্যানারিজম্ ক্লিষ্ট।

মানবিকতার প্রশ্নে, সংবেদনশীলতার প্রশ্নে, আবেগের প্রশ্নে তেমন কিছু উত্তর নেই। ছবিটিতে আলো-অন্ধকার, ব্ল্যাক ও রোশনি-র দার্শনিক ব্যাখ্যা বার বার ফিরে আসে। আর আমার মনের মধ্যে বার বার ফিরে আসছিল প্রয়াত 'চুপকথা' নাট্যগোষ্ঠীর 'জন্মদিন' নাটকের 'দোয়েল'-এর কথা। সে 'ওয়াটার' কথাটি উচ্চারণ করেছিল অন্যভাবে।

সিনেমাটি দেখতে দেখতে উঠে গেল প্রেমিক-প্রেমিকা। বাইরে বেরিয়ে সুভাষ সরোবরের পাশ দিয়ে আলোচনা করতে করতে ফিরে আসছিলাম আমরা কজন। একজন বলে বসলেন, এ-ছবি অস্কার নমিনেশন পাবেই। সেদিকে চোখ রেখেই করা।' '৮৯'-হলে চলছে 'এ্যাভিয়েটর'। এবছরের অস্কার নমিনেশন পেয়েছে এই ছবি।

কিপাবে, কী পাবে না জানা নেই। তবে 'জন্মদিন' নাটকটি যেভাবে মনে আছে, 'ব্ল্যাক' যে একেবারেই মনে থাকবে না, তা পরদিন সকালেই মনে হয়েছিল।

পরমব্রত দত্ত

কল্যানী নাট্যচর্চা কেন্দ্রের
খোয়াবনামা : দিবাস্বপ্ন নয়, স্বপ্নের বাস্তব জাল

বাংলা থিয়েটারে এই দ্বিতীয়বার দেখা গেল আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে নিয়ে কাজ, দুটি প্রযোজনাই তার উপন্যাসদ্বয়কে কেন্দ্র করে, 'চিলেকোঠার সেপাই' এর প্রযোজনা নিয়ে অনেক আলোচনা তাই ও নিয়ে এখানে পুনরুক্তি অবাঞ্ছিত। কিন্তু 'চিলেকোঠার সেপাই' নামটি, খোয়াবনামার থিয়েটার-রূপ নিয়ে কোনো কথা বলতে গেলে স্মৃতিতে রাখা দরকার। আখতারুজ্জামানের এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট, বাস্তবতা, চরিত্র সবই যেন ইতিহাসের রূপকার। 'খোয়াবনামা' এক প্রত্নতত্ত্বের মাত্রচিত্র, কাৎলাহার বিল, পাকুড় গাছ, মুনসি, বিশালাকৃতি বাগাড়, রহস্যময় জাল সবই এক মারাত্মক ঘন বুনোটে গড়ে তোলে এই আখ্যানের শরীর, সারা উপন্যাস জুড়ে ছড়িয়ে থাকা টুকরো টুকরো গান মিশে থাকে চরিত্রের সঙ্গে, হঠাৎ চমকিয়ে দেয়, অসামান্য আবহ সৃষ্টি করে যার উদাহরণ বাংলা উপন্যাসের ভূখণ্ডে বোধহয় খুব বেশি নেই, তাই এরকম এক উপন্যাসকে মাপের পরিসরে, বাঁধা সময়ের চৌহদ্দিতে নিয়ে আসা মনে হয় বেশ চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। অবশ্য বাংলা থিয়েটার এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছে বহুদিন ধরে, কল্যাণী নাট্যচর্চা কেন্দ্র তাদের পরিশ্রমী প্রযোজনায় বোধহয় কাহিনী উপস্থাপনা করার এক আশু তাগিদ অনুভব করেছেন, গোটা উপন্যাসের যে 'গল্পের' গতি তাকে মঞ্চায়িত করাটা হয়তো তাদের প্রযোজনার কিছুটা ক্ষতি করেছে। 'খোয়াবনামা'র পরিকল্পনায় বহু নতুনের ছাপা আছে, বিশেষত দক্ষ মঞ্চশিল্পী বা আধুনিক নাটকের ভাষায় যাক scenographer বলা হয়, সেই সঞ্চয়ন ঘোষের মঞ্চ পরিকল্পনা, সত্যই এক কুহক বাস্তবের স্তরে নিয়ে যায় দর্শকদের, পুরো অভিনয়ের আধার হিসেবে, এই মঞ্চ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, প্রশংসনীয় ব্যবহার জালের, নাট্যকার শেষের দিকে কোরিওগ্রাফি ও গান সহযোগে যা সমবেত অভিনেতারা ব্যবহার করে, একমাত্র ওরকম কয়েকটি জায়গাতেই শরীরের ব্যবহার লক্ষ করা গেলো। বাদবাকি অভিনয়, সনাতন বাংলার সংলাপধর্মী থিয়েটারের রীতিকেই অনুসরণ করেছে, কিন্তু প্রশ্ন যেটা, সেটা হলো, অভিনয় ক্ষমতার দক্ষতা না থাকলে, বা কাজ চালানো গোছের কোনো ইঙ্গিত থাকলে সেটি নাটকের সম্ভাবনাগুলোকে নষ্ট করে, মাথায় রাখা দরকার, থিয়েটার দলগত প্রক্রিয়া, মঞ্চ আলো, আবহ যেমন আমাকে (অভিনেতাকে) সাহায্য করবে, তেমনই আমারও দায়িত্ব বর্তায় প্রযোজনাকে অন্যমাত্রায় পৌছে দেওয়ার। এ প্রেক্ষিতে নাট্যচর্চা কেন্দ্রের অভিনয় সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করা অসংগত হবে না, তমিজের বাপের

ভূমিকায় শেখর গুপ্ত ও তমিজের ভূমিকায় দীপংকার দাস'এর অভিনয় অন্য মাত্রার, নাট্যচর্চা কেন্দ্রের অন্য প্রযোজনাতে যেমন 'চিলেকোঠার সেপাই' ও 'নকশী কাঁথার মাঠ'-এ আমরা এদের মুনশিয়ানার পরিচয় পেয়েছি। ফুলজান (সুপর্ণা দাস) অন্যদের তুলনায় তাঁর চরিত্রের সংকটকে ধরবার চেষ্টা করেছেন অনেক বেশি মাত্রায়, বাকিদের অভিনয় সাধারণ মানের। তমিজের বাপের অভিনয়, তার শরীর ভাষা, আমাদের নিয়ে যায় খোয়াবনামার মিস্টিক আবেদনের কাছে। তমিজের বাপ খোয়াব দেখতে চায়, কিন্তু তার বাস্তবতা, তার সমাজ, তৎকালীন হিন্দু-মুসলিম রাষ্ট্রীয় রাজনীতি, দারিদ্র্য, সবই তাকে বারংবার এক স্তরে টেনে নামায়, যার নাম হতে পারে 'খোয়াবনামা'। ইলিয়াস বাংলা সমাজের যে সমালোচনার অবতারণা করেছেন, 'চিলেকোঠার সেপাই'তে সেটি যেমন অনেক মাত্রায় স্পষ্ট, 'খোয়াবনামা'য় তা অনেক সূক্ষ্ম, খোয়াবনামা যেন কোনো আঙ্কিক সময় নয়, সমগ্র বাংলাদেশের কালচেতনা, তার বিবর্তন, তার কমজোরি, তার সৌন্দর্য, তার ভয়, তার হীনমন্যতা, তার শোষণের নৈরাজ্যকে তুলে ধরেছে, সুতরাং এরকম এক উপন্যাস যে প্রযোজনার বীজ, সেখানে আমরা দাবি করব আরো উন্নত অভিনয়শৈলীর, যা চরিত্রের মুখ দিয়ে গল্প বলাবে না, চরিত্রই তৈরি করবে তার নিজস্ব রাজনীতির আখ্যান, এ প্রযোজনার আরো এক দিক, অবশ্য এ দোষে বাংলার বহু নাটকই দুষ্ট, তা হলো বামপন্থার সরলীকরণ, মঞ্চে একবারই এক কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীকে আসতে দেখা যায়, যে প্রায় মিনিট তিনেক বা তার অধিক সময় গড় গড় করে প্রায় এক 'ছোটোদের কমিউনিজম' এর অবতারণা করে। এ কেন? বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে কমিউনিস্ট পার্টির উত্থান নিশ্চয়ই এতটা সরল নয়, 'তেভাগা'র লড়াই বোধহয় আরেকটু জটিল, তবে নির্দেশককে সাধুবাদ দেওয়া যায় এই জন্যেই যে তিনি অন্তত রাজনীতির প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তার প্রযোজনায়, হঠাৎ সোনার পাথরবাটির ন্যায় এক 'সুস্থ সমাজ' গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে এক অরাজনৈতিক ও শুদ্ধ নাটকের' অবতারণা করেননি। তবে আরো কতগুলি দিক যেমন তমিজের বাপের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার অনুসন্ধান প্রয়োজন ছিল। মানুষটির পেট ভরেনা কেন? এ প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, নদী, বিল এবং তাকে ঘিরে মানুষের যে জীবনচক্র, তার যে টানাপোড়েন, যে বিশ্বাস, যে বিশ্বাসঘাতকতা, যে চোরাবালি সমস্তই দর্শককে দাঁড় করায় এক আরো রুক্ষ বাস্তবতার সামনে, আবার তার মধ্যেই ভেসে ওঠে চেরাগ আলির খোয়াব পড়া বা মুনশির গান, যা মুগ্ধ দর্শককে আরো গভীর অনুসন্ধানের আলো দেখায়। গৌতম হালদার তার নিজস্ব গায়কীতে গানগুলি অত্যন্ত সুন্দর উপস্থাপনা করেছেন, এটি খোয়াবনামার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক, তবে থিয়েটার তার 'real' উপস্থাপনার খাতিরেই দাবি করে 'live' গান, প্লেব্যাকের এখন থিয়েটারেও চাহিদা, তবে সরাসরি উপস্থাপনার মজাই আলাদা, মুহূর্তের মধ্যে দর্শকের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলতে পারে সেটা, টেনে বার করে আনতে পারে ক্যাথারসিস্, প্লেব্যাক্ সে হিসেবে অনেক ম্রিয়মান। তবে দীপক মুখোপাধ্যায়ের আলো পরিকল্পনা চমৎকার। কালিকাপ্রসাদের আবহ সুন্দর

ও তাঁর মননের পরিচয় রাখে। নাট্যচর্চা কেন্দ্রের বহু পরিশ্রমের ফসল এই প্রযোজনা, বোঝা যায় যে তারা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন, হয়তো সবটা করে উঠতে পারেননি, তবে সামাজিক দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়েই নিশ্চয়ই তারা আরো উত্তরণের চেষ্টা করবেন, এ আশা আরো কারণ তাঁরা এর আগেও ইলিয়াসকে নিয়ে নাটক করেছেন, সুতরাং ঔপন্যাসিকের যে সমাজবোধ, তার দর্শন, তার অনুসন্ধানের স্পৃহা, সময়কে প্রতিফলিত করার চেষ্টা, আশা করা যায় তাঁদের মঞ্চউপস্থাপনাতেও সেগুলির ছাপ থাকবে। এই প্রযোজনা হয়ে উঠুক বাংলার ইতিহাস জানার এক অনন্য উপায়, যা আরো নতুন করে দর্শকের বোধকে গড়ে তুলবে। থিয়েটারকর্মীর সেই দায়ও থেকে যায়। নিছক আড়াই-ঘণ্টার সান্ধ্যবিনোদনের জন্য তো নাট্যচর্চা কেন্দ্রের এই পরিশ্রম নয়, তবে খুবই মনে রাখা দরকার সব ক্ষেত্রে সরলীকরণ করার চেষ্টা বিপজ্জনক এবং সেটি বাস্তবতার ধারগুলিকে ভোঁতা করে দেওয়ার অপচেষ্টা মাত্র। ইলিয়াসের যে শক্তিশালী ইতিহাস চেতনা, রাজনীতিবোধ, এই প্রযোজনার উচিত তাকে আঁকড়ে ধরবার, তাতে নকলনবিশি হবে না, বরং দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে উত্তরণের পথটা পরিষ্কার হবে, হয়তো যমুনার মাঝিরা প্রবেশ করবে আরো গভীর নদীপথে, চোরাবালিতে ডুবে মরতে হবে না তমিজের বাপকে, দেশভাগের যূপকাষ্ঠে প্রাণ যাবে না বৈকুণ্ঠের। এই প্রযোজনা আরো মানুষের কাছে যাক, প্রশ্ন তুলুক তাদের মনে, থিয়েটার বহন করুক বহু মানুষের বার্তা, এই ২০০৫ সালের পৃথিবীতে যেখানে কিছুতেই যেন আর স্বস্তিতে শ্বাস ফেলা যায় না, খোয়াবনামা'র খোয়াব যেন দিবাস্বপ্নে পরিণত না হয়, সেটাই রইল নাট্যচর্চা কেন্দ্রের দায়িত্ব। শেষ কথা হিসেবে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি শব্দ মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে—'সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়।'

হার্দিকব্রত বিশ্বাস

সুনামির অন্তর্বাস ও আমাদের নামঙ্কাম

দীর্ঘকালব্যাপী অধিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থেকেই লোকআখ্যান ও প্রবাদের জন্ম হয়েছে। এমনই একখানা জব্বর গল্প হয় রাজার দুধপুকুরের অভিজ্ঞতা। প্রয়াগের মেলায় সব কিছু দান করে প্রায় ন্যাংটো হয়ে হর্ষবধন যে নাম কুড়িয়েছেন আর রাজা হরিশচন্দ্র বউবাচ্চা পর্যন্ত বিকিয়ে দিয়ে নিজে শ্মশানের ডোম সেজে বসেছিলেন, তার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান হল দুধপুকুরের গল্প। হাজার দুই আড়াই বছরের মধ্যে ভারতীয়তার যে পরিবর্তন ঘটেছে এই গল্পখানা তার সাথে খুবই মানানসই। এখন আমরা সবাই এক একজন ধুরন্ধর প্রজা। এস সেই সাথে নাক ও কান কাটা। ঐ চতুর প্রজারা রাতের অন্ধকারে একে অপরকে লুকিয়ে ঘটি থেকে জল ঢেলে দিয়েছিল, আর এখন আমরা সবাই কলসী কলসী জল ঢালছি সবার সামনে বসে। একেবারে লাইটপোস্টের গায়ে ঠ্যাং তুলে কুকুরের পেচ্ছাপ করার মতো।

ইদানীং ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, জলপ্লাবন কিছু একটা হলেই চাঁদা তোলার হিড়িক পড়ে যায়। দুর্গত মানুষদের জন্য কিছু একটা করার জন্য কাতর হয়ে ওঠে আমাদের প্রাণ। দপ্তরের কর্মীরা একদিনের মাইনে দিয়ে দেন সরকারী ফাণ্ডে। রাজ্য সরকারগুলি নিজের ছেঁড়া ফুটো ঢেকে দু'চার কোটি টাকা ঢেলে দেন প্রধান মন্ত্রীর রিলিফ ফাণ্ডে। বিত্তবান বিদেশীরা দশ বিশ লাখ দিয়ে দেন অকাতরে। এদেশের নেতারা টিভির ক্রু ও সাংবাদিক ডেকে হাসি হাসি মুখ করে একশোগুণ বড় করে চেক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীর হাতে।

এবার সুনামির পরেও সেই একই ট্রাডিশন। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সব কটি সংবাদ পত্রই রিলিফ ফাণ্ডখুলে বসে গেছেন-ঢোপ দেওয়া হচ্ছে, টাকা দিলে নাম ছাপা হবে। পত্রিকায় বিয়ের বিজ্ঞাপন ছাপার পর যাদের আর নাম ছাপার সুযোগ হয়নি, তারা এই প্রলোভন খুব একটা এড়াতে পারেন না। কেউ কেউ দশবিশ হাজারও উপুড় করে দেন। কেউ আবার দানধ্যানের উপযুক্ত পাত্রের অভাবে সংবাদপত্রকেই সত্যমূর্তি ধরে অফিস ফেরত পথে চেকখানা পৌঁছে দেন।

কিন্তু মজার কথা হল, সবার কাছে টাকা চাওয়া হলেও সম্পাদক মশাইরা নিজের মাইনের দশটি টাকা ঘটে রেখে শ্রীগণেশ বলে ফাণ্ডটি শুরু করেন না। সবাই বলেন, আপনি দিন, আপনি দিন। এর পরে টাকাটা যে কাদের হাত ধরে দুর্গতদের হাতে পৌঁছায়, তা সব সময় জানাই যায় না। কালীঘাটে পাঁটা বলি দিয়ে পুণ্যার্জন করার মতো অবস্থা। পাঁটার মাথাটি কোন হালদার খেলো, তা জানার উপায় রইল না যজমানের। ধরা যাক, সম্পাদক মশাইরা সংগৃহীত টাকা প্রাপকদের হাতে দিলেনই কিন্তু

কাকে দিলেন? এটা স্থির করবেন স্বয়ং সম্পাদক নিজে। প্রকৃত দাতাদের কোন বক্তব্য নেই। 'পরের ধনে পোদ্দারী' একেই বলে।

আর একদাতাসংঘ হলেন এদেশের খেলোয়াড়েরা। দুর্গত মানুষের জন্য এঁদেরও প্রাণ আঁকুপাকু করে, খেলার মাঠে নেমেও যেমন অ্যাড-এজেন্সির শ্যুটিং-এর জন্য এঁদের মন আনচান করে। ত্রাণ তহবিলে দান উপলক্ষে এঁরা তাই ঘরের নোংরা খানিকটা পরিষ্কার করে ফেলেন। আলমারির তলায় ফেলে রাখা ব্যাট, বল, প্যাড, গ্লাভস, জাঙ্গিয়া, অঙ্গরক্ষক নীলামে তুলে হুজুগে জনতার পকেট কেটে সেই যৌতিমাল ত্রাণতহবিলে ঝেড়ে দেন। জনতা সেই ঘামে ভেজা জার্সি টিশার্ট কিনে নিজের কালোটাকা জমানোর পাপস্খালন করেন।

ফলে শুমেকায় যেখানে নিজের কামাই থেকে দশ মিলিয়ন ডলার তুলে দিলেন ভিনদেশী দুর্গতদের দুর্দশা দেখে, সেখানে আমাদের খেলোয়াড়রা দিলেন অন্তর্বাস উজাড় করে। কিন্তু দুর্গত বলে সবাই তো আর আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে বসে নেই। তামিল জেলেরা বলে বসলেন, নো। নো মোর আন্ডারওয়্যার, নো পুরানো কাপড়া। পুণ্য চাইলে ওয়ার্ডবোরের জঞ্জাল খালি করা নয়, দিতে হলে টাকে হাত দাও, নতুন কাপড় দাও। তোমার পুরানো কাপড় পরতে গিয়ে চুলকানি পাঁচড়াকে কে সামলাবে বলো দিকিনি? মনে মনে এইডস্-এর ভয়ও যে রয়েছে তাই আন্ডার গার্মেন্টস নৈব নৈব চ।

সে সব কথা ভেবেই কেউ কি করলেন, অন্য ভেলকি দেখিয়ে পাবলিকের কড়ি খসানো যাক। চলুক বাঁদরনাচ। ঠিক হল সুনামি ম্যাচ হবে ক্রিকেটের। গোদা গোদা সবাই খেলবে তা বলতে না বলতে একখানা খেলা হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ায়। উঠল কিছু টাকা। কিন্তু আসল মাল ঢালার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছে কলকাতার পাবলিক। তাই বড় আসরখানা ফাঁদা হয়েছে এখানেই। হুজুগে পাটি এমন আর আছে কোন ভূ-ভারতে? তাই সিডনীতে যা কামাই, কালকাতায় হবে তার কয়েক গুণ বেশী, উদ্যোক্তারা সেই আশায় বুক বেঁধে বসে আছেন। অজস্র বেকার, অফুরন্ত তাদের সময়। আর টিকেটের মাশুলটি যাবে ত্রাণের কাজে। একঢিলে তিন পাখি মারার এমন মওকাটি আর কোথায়?

আমাদের গোদা খেলোয়াড় এই সুযোগে ব্যাট ফেলে ফুটবল খেলার আয়োজন করে বসে গেছেন। বাঁদুর নাচের দ্বিতীয় পর্ব আর কী। অর্থাৎ কাঁঠালটি ভাঙো পাবলিকের মাথায়, নিজের ট্যাকটি ঠিক করে বেঁধে রাখো। হাত দিও না একদম। তাই আমাদের দেশের সেরা ফুটবলারটি একটি লক্ষ টাকা দিয়েই সংবাদের শিরোনাম হয়ে গেলেন, যেখানে একজন বিদেশীর অবদান পঞ্চাশকোটি টাকা।

খেলোয়াড়ই বা কেন? আমাদের নেতা, অভিনেতা, শিল্পপতি, ধনপতি সবারই এক রা। কেউ দিচ্ছেন কোম্পানি থেকে এক কোটি অর্থাৎ কোম্পানির আয়কর কমে গেল পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা আর পাবলিক ডিভিডেন্ড পেল কম নেতা দিলেন রাজ্যের

উন্নয়নের তহবিল থেকে দু'পাঁচ কোটি অর্থাৎ পাবলিকের নলকূপ বসল সেই কটি কম। কিন্তু নাম হল নেতার। আর সে সব রাজ্যে যদি নির্বাচন সামনে থাকে তবে তো কথাই নেই দাতাকর্ণটির একেবারে পোয়াবারো। টিভিঅলারা ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পাবলিক দেখল, তাদের ভাগের সিকি দু'য়ানি কেমন করে এক নেতার হাত থেকে অন্যনেতার হাতে চলে গেল।

নেতা যদি এত এগিয়ে গেলেন, অভিনেতাই বা পিছিয়ে থাকবেন কেন? তিনি বা তাঁহারাও কৌটা হাতে নিয়ে রাস্তায় নেমে এলেন। সানস্ক্রীন লোশন মেখে রোদচশমায় আধামুখ ঢেকে ত্রাণ-মার্কা কৌটা তুলে ধরলেন বাসের ফুটবোর্ডে পা-রেখে দাঁড়ানো সুবেশ অভিনেতার দিকে। টিভি ক্যামেরাকে আগেই খবর দেওয়া ছিল। পাঁচটাকার কয়েনটি কৌটার ছেঁদা দিয়ে টুক করে পড়তেই ফ্লিক্ ফ্লিক্ করে উঠল ক্যামেরা, অভিনেত্রী ঘাড় ঘুরিয়ে টিভি ক্যামেরার দিকে পোজ দিলেন। ব্যস, কাম ফতে। ক্যামেরা অলারা গুছিয়ে উঠতেই অভিনেত্রী কৌটা ধরিয়ে দিলেন হুজুগে কোন পাবলিকের হাতে। বাসের ফুটর্বোড থেকে তড়াক্ করে নেমে অভিনেতা ঢুকলেন নিজের স্যান্ট্রোতে। পিছে পিছে অভিনেত্রীও সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়লেন। সন্ধ্যার সংবাদে আর পরদিন সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হল অভিনেত্রীর উথলে ওঠা হৃদয়ের উত্তাপ। পাবলিক খেলো তা হাপুশ-হাপুশ।

ভারতবর্ষ পুণ্যাত্মার দেশ। নরেরা নরাধম ও নারায়ণ।

ধর্মদাস অধিকারী

পুস্তক পরিচয়

ধর্ম, রাজনীতি, ভারতীয় সমাজ

সেকুলার ভারতে ধর্ম ও রাজনীত : শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়। উবুদশ/২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। কলকাতা-১২। ৮০.০০

সুধীর চক্রবর্তী

শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের 'সেকুলার ভারতে ধর্ম ও রাজনীতি' বইটির গোড়ায় রয়েছে প্রকাশকের পক্ষে সিদ্ধার্থ সাহা-র বক্তব্য এবং সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক স্বপন কুমার ভট্টাচার্যের লেখা প্রাক্‌কথন। বইটি আদ্যন্ত পড়ে অবশ্য মনে হল এই দুই উপক্রমণিকার তেমন কোনো দরকার ছিল না, কারণ শুভঙ্কর তাঁর বক্তব্যবিষয় ও তাঁর তথ্য সংগ্রহ বিশ্লেষণে এত সচেতন আর স্বতন্ত্র স্বভাবের যে তাঁর পক্ষে অন্য কারোর সওয়াল করবার দরকার পড়ে না। তবে, ওই দুটি লেখা থেকে লেখক সম্পর্কে কিছু তথ্য বা সাবুদ পাঠকরা পাবেন। যেমন শুভঙ্করই যে একদা জর্জ মীরজাফর গোস্বামী নাম নিয়ে সেই বিখ্যাত 'গাজীর গান' লিখেছিলেন, যা বহু গণসম্মেলনে গাওয়া হয়েছে, সেই খবরটা অনেকের কাছে অভিনব লাগতে পারে। বর্তমান আলোচকের কাছে লেখকের জর্জ মীরজাফর গোস্বামী সত্তা অবশ্য অজানা নয় কিন্তু মজা লাগে ওই নামগ্রহণের অনন্যতায়। বস্তুত তিন ধর্মের তিনটি নামের জোড়কলসী বেঁধে শুভঙ্কর আমাদের সেকুলারিজমকেই যেন এক জোর ধাক্কা দিয়ে বসেন।

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের প্রাক্‌কথন অবশ্য শুভঙ্কর সম্পর্কে বাড়তি কিছু তথ্য জোগান দেয়। আমরা জানতে পারি—'অর্থনীতির স্নাতক এই গ্রন্থলেখক সমাজবিজ্ঞান পড়েন স্নাতকোত্তর স্তরে; এবং পি.এইচ.ডি-র গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেন ফের রাষ্ট্রবিজ্ঞানে। কৌতুক ও দুঃখের কথা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় দুই বিষয় (ডিসিপ্লিন)-এর সতর্ক দ্বারপাল দুই জায়গাতেই তাঁকে প্রবেশ করতে বাধা দেন। অগত্যা তাঁর প্রস্থান গবেষণা সংস্থায়।' এর পিঠোপিঠি লেখকের নিবেদন অংশ পাঠ করে জানা যায় ১৯৮০-১৯৮৪ সালে শুভঙ্কর ইউ.জি.সি স্কলার হিসাবে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক অনিলবরণ রায়ের তত্ত্বাবধানে যে অভিসন্দর্ভের কাজ করেন তার শিরোনাম Religion and politics in Bengal : Continuity and Change। এমত গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে লেখক ধর্ম ও রাজনীতি নিয়ে নানা ছোট কাগজে কটি নিবন্ধ লেখেন বাংলা ভাষায়। প্রস্তুত বইটি সেইসব রচনার গুচ্ছ—যদিও কালক্রম অনুসারে সাজানো

নয়। বোঝা যাচ্ছে, লেখক লক্ষ রেখেছেন বিষয়বস্তুর দিকে এবং তার বিন্যাসে। লেখাগুলি প্রথমে ছাপা হয়েছে 'বোধি', 'নবান্ন', 'মধ্যাহ্ন', 'সত্তরদশক', 'উবুদশ', 'অনীক' এবং 'গণশক্তি'তে। বেশিরভাগ লেখাই বেরিয়েছিল 'অনীক'-এ। লেখক কবুল করেছেন যে 'রচনাগুলি পূর্ব-প্রকাশিত হলেও পরিমার্জন করা হয়েছে।' তবে লেখক যে কথা কবুল করেননি তাহল সেকুলার শব্দটির তিনি কোনও সর্বগ্রহণীয় বাংলা প্রতিশব্দ বানাতে পারেননি।

একদিক থেকে ভাবলে ব্যাপারটি বেশ দ্যোতনাপূর্ণ—কেননা, সেকুলার শব্দটির প্রতিশব্দ যেমন তৈরি করা যায়নি, তেমনই নিরূপিত হয়নি শব্দটির প্রকৃত অর্থ। শুভঙ্কর নিজেই বুঝেছেন যে, শব্দটির সাহেবি বয়ান হল Religious Neutrality। স্বাধীন ভারতের জনৈক সমাজবিজ্ঞানীর ভাষ্যে শব্দটির অভিধা হল Multi Religious Cultural Policy। ড. রাধাকৃষ্ণন বলেছেন, Religious Impartiality। তবু ব্যাপারটা খোলসা হয়নি। ধর্মউদাসীন, ধর্মনিরপেক্ষ, ধর্মহীনতা শব্দের পর শব্দ গেঁথেও মিলনমালাটি আজও গাঁথা গেল না—সংকটেরও শেষ নেই।

তবু, শুভঙ্করের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ কারণ সমস্যাটিকে তিনি এড়িয়ে যাননি, বরং পেরোতে চেয়েছেন, যার মুখপাত্র-নিবন্ধ হল বইটির প্রথম রচনা—'ধর্ম ও ধর্মহীনতা'। বলাবাহুল্য সূচক-নিবন্ধে লেখক বলতে চেয়েছেন সেকুলারিজম কথার অর্থ ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, বরং ধর্মহীনতা। বাংলাদেশের নামী বুদ্ধিজীবী সৈয়দ মহম্মদ হোসেন সেকুলার শব্দের প্রতিশব্দ করেছেন ইহজাগতিক, বদরুদ্দিন উমরও এই অভিধা মানেন। কিন্তু যেহেতু সেকুলারিজম প্রকৃত তাৎপর্যে পরজগৎকে অস্বীকার করে, তাই ইহজাগতিকতা তার লক্ষণ হতে পারে কি? পারে না। অতএব লেখকের লক্ষ্য ধর্মহীনতাকে সামনে রেখে তবে সমস্যার সমাধানে নামা। সমস্যা হল রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক। সমস্যার এমন বহুমুখী বিস্তারের সংকটও যে আমরা ভারতীয়রা জাতিগতভাবে বুঝতে পেরেছি তাও নয়—এবং পারিনি বলে সেকুলারিজম্ এর পক্ষে আমরা তেমন কোনও আন্দোলন আজও গড়ে তুলতে পারিনি। শুভঙ্করের খেদোক্তি : 'ক্ষমতালোভী রাষ্ট্রনায়করা সেকুলারিজম-এর প্রকৃত অর্থ গোপন করে যাবতীয় ধর্মান্ধতা আর কুসংস্কারে উৎসাহ দান করার বৃটিশ কৌশলকেই বরণ করে নেন।' প্রসঙ্গত তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও প্রথম প্রধানমন্ত্রীর সেকুলারিজম্ সংক্রান্ত ব্যাখ্যান। রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছিলেন, 'আমরা আমাদের দেশে প্রত্যেকে নিজ পছন্দমতো' মত ও পথ পালন ও প্রচার করার পূর্ণ অধিকার ভোগ করি ও প্রতিটি ধর্মের মঙ্গল চাই এবং তাদের বাধাহীন বিকাশ চাই।' আর নেহরু বলেছিলেন, 'সেকুলার রাষ্ট্র মানে এমন কোনো রাষ্ট্র নয় যেখানে মানুষে ধর্ম পরিত্যাগ করে, সেকুলার রাষ্ট্র মানে এমন রাষ্ট্র যেখানে রাষ্ট্র সমস্ত ধর্মকে রক্ষা করে,

কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট এক ধর্মের মূল্যে অন্য কোনো ধর্মের পক্ষাবলম্বন করে না বা কোনো ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করে না।'

এসব কথা তত্ত্বকথা হিসাবে বলতে ভালো, বলতেও ভালো, কেবল প্রয়োগের ক্ষেত্রে গণ্ডগোল বাধে। দেখাই যাচ্ছে সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ভাষ্য আমাদের কাজে লাগেনি। লাগলে ভারত আজ বিচ্ছিন্নতার ব্যাধিতে সংকটাপন্ন হত না, অবিশ্বাসের শঙ্কা আমাদের আচ্ছন্ন করত না। হিন্দু আর মুসলিম মৌলবাদও এতটা বিস্তার পেত না এবং দেশের অর্থনীতি, সমাজবিন্যাস, জাতিসত্তা ও সংস্কৃতির ভারসাম্য টলে যেত না। ক্ষুব্ধ লেখক সিদ্ধান্ত করেন : "দাঙ্গা হয়, নিহত হয় মানুষ, প্রাণের 'মূল্য' চুকিয়ে দেওয়া হয় নিষ্প্রাণ মুদ্রার মূল্যে। প্রবল প্রতাপে বিরাজ করেন 'সর্বত্যাগী' গুরুর দল; লজ্জাহীন, লোভী রাজনৈতিক নেতা; প্রশাসন আশ্রয় দেয় হত্যাকারীকে, 'সেকুলার' দেশ 'এগিয়ে চলে' ধর্মের পথে, ভক্তির পথে, গভীর থেকে গহন অন্ধকারে।"

স্বীকার করতেই হবে লেখক হৃদয়বান ও বেদনার্ত। বেদনা থেকেই তাঁর গবেষণার তথ্য ও সত্যসন্ধানের সূচনা। তাঁর স্পষ্ট প্রত্যক্ষ একটি রাজনৈতিক বিশ্বাস আছে—দুনৌকোয় তিনি পা দেননি। যা বলতে চেয়েছেন তার সমর্থনে তথ্য পুঞ্জিত করতে তাঁর কোনো অলসতা নেই। বহুপঠনের চিহ্ন নিবন্ধশেষের পুঙ্খ পাদটিকায় সাজানো। কেবল মত প্রতিষ্ঠায় একটি বিশেষ ঝোঁক তাঁর রচনা কৌশলকে অতিরেক দোষে আচ্ছন্ন করে। যাঁকে বা যাঁদের তিনি পছন্দ করেন না তাঁদের নামোচ্চারণের আগে বসিয়ে দেন ব্যঙ্গাত্মক বিশেষণ বা বর্ণনা। এটি নিতান্তই তারুণ্যজনিত বিস্ফার তাতে সন্দেহ নেই।

শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের এই বই আর পাঁচটা বইয়ের মতো নয়। এ বই রচনার পূর্বালাপ কোনও ঘনঘোর গবেষণা বা স্বমত প্রতিষ্ঠার আত্যন্তিকতায় নিষ্প্রাণ নয়—এর সঙ্গে তাঁর জীবনগত সংযোগ আছে। কারণ ভারতবর্ষের একজন সচেতন ও মানবিকতাসম্পন্ন অধিবাসী হিসাবে তাঁর জীবনের ও মননের লক্ষ্য এই দুর্ভাগ্যপীড়িত, সন্ত্রাসকবলিত দেশ এবং তার অন্তর্গত মানুষের বাস্তব অবস্থানের দোলাচল। তিনি নিজে বুদ্ধিজীবী কিন্তু ভারতের প্রান্তিক জনাংশের সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত। আমাদের মনে পড়ে ১৯৯৪ সালে তাঁর লেখা একটি চটি বই 'গরু নিয়ে রাজনীতি' শ্লেষে বিদ্রূপে অথচ তথ্যে বিশ্লেষণে মণ্ডিত হয়ে পাঠকদের নজর টেনেছিল। বি.জে.পি. নেতৃত্বে চালিত সরকারের শাসনকালে ওই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পায়। তারই পিঠোপিঠি শুভঙ্করের এই সেকুলার ভারত ও তার ধর্ম-রাজনীতি সংক্রান্ত বইটি বেরিয়েছে। বোঝা যাচ্ছে চিন্তাশীল এই লেখক এগিয়ে চলেছেন। চটি বই থেকে ১৮৪ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ বইয়ের পথে। তবে এখনও তিনি কোনও কুলীন প্রকাশকের দাক্ষিণ্য লাভ

করেননি। বইটি প্রকাশ করেছেন 'উবুদশ' নামের লিটল ম্যাগাজিন সংস্থা। তাঁদের ধন্যবাদ দিই।

শুভঙ্করের বইটিতে আছে মোট চৌদ্দটি অধ্যায়। কোনটিকেই দীর্ঘ বলা যাবে না। তবু নানা সময়ে এগুলি ছোট কাগজে বেরিয়েছিল বলে প্রসঙ্গগুলি সংক্ষেপে আলোচিত এবং আকারে ছোট। পরিমার্জনের কালে লেখক এগুলির কোনো কোনোটিতে একটু পরিবর্ধন করতে পারতেন এবং একটু চেষ্টা করলে কয়েকটি লেখাকে জুড়ে একটা সামগ্রিক রূপ দিতে পারতেন। তাঁর তত্ত্বউৎসুক মন উনিশ শতক থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বেশ কটি প্রসঙ্গকে ছুঁতে চেয়েছে, যার বেশিরভাগ বাংলাকে ঘিরে আর দুয়েকটির ব্যাপ্তি সর্বভারতীয়—যেমন 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি'-র প্রসঙ্গ নিশ্চয়ই ব্যাপক প্রেক্ষাপটে স্থাপিত, অন্যপক্ষে 'উনিশ শতকের বাঙলায় হিন্দু জাতীয়তা' বা 'আনন্দমঠ বিতর্ক' নিতান্ত সীমায়ত সমস্যা, তবে ঐতিহাসিক ভাবে জরুরি।

আসলে ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সমাজ পরিবর্তনের লয়ের সঙ্গে লেখকের বাস্তব অবস্থান তাল মেলাতে চেয়েছে এবং সেটাই প্রার্থিত। তবে লেখকের চোখ কান বেশ খোলামেলা এবং তিনি মুক্তমন। মতপ্রকাশে তাঁর গলা কাঁপেনা। স্পষ্ট জানিয়ে দেন : ''নারীবাদীদের' শ্রেনিদৃষ্টিভঙ্গি-বর্জিত 'নারীবাদ' আমরা সমর্থন করিনা।' বলেন, 'ধর্মান্ধরা কোনো দেশে মোল্লা, কোনো দেশে গুরু, পাণ্ডা; শিখা ও উপবীতধারী রক্তচক্ষু সমাজকর্তা। কোথাও এঁরা রূপ কানোয়ারকে দাহ করেন, কোথাও তসলিমাকে হত্যা করতে চান।' শুভঙ্করের লেখার তর্কবিতর্কের উশ্‌কানি আছে রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ সম্পর্কে তিনি প্রশ্নশীল আবার সশ্রদ্ধ। গান্ধীজি সম্পর্কে তাঁর মতামতের প্রতিকূলতা স্পষ্ট। জাতিভেদপ্রথা সম্পর্কে তাঁর ইতিহাসাশ্রিত বিশ্লেষণ খুব তারিফযোগ্য ও কৌতূহলী। 'ভাষা নিয়ে রাজনীতি : সেকালে ও একালে' বেশ উপভোগ্য রচনা। উর্দুর মতো সমৃদ্ধ ভাষাকে কীভাবে ভ্রান্তপথিক রাজনীতিকরা মুসলমানের ভাষা বলে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছেন তার বিবরণ খুব লজ্জাকর, অন্তত শুভবুদ্ধিসম্পন্নদের পক্ষে। সারকথা হল, শুভঙ্কর বোঝাতে চান এদেশে ভেদপন্থী সমজের স্রষ্টা হল ইংরেজের কূটনীতি, কিন্তু স্বাধীন ভারত এখনও তার কোনো মানবিক সমাধান করতে পারেনি।

শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়ে এই বই দেশের কয়েকটি জাগ্রত সমস্যাকে ধরতে চেয়েছে। এর অন্তর্গত বেশ কটি প্রসঙ্গ স্বতই বিতর্কিত এবং লেখকের রচনাভঙ্গি ও কিছু মন্তব্য তো অবশ্যই বিতর্ক টেনে আনবে। আমি কোনো পক্ষে না গিয়ে শুভঙ্করের একটি মন্তব্য তুলে দিচ্ছি :

''ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীপূর্ব যুগে 'হিন্দু আইডেনটিটি' আর 'মুসলমান

আইডেনটিটি' বোধ শুধুমাত্র সমাজের উঁচুতলার গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাম্প্রদায়িক বোধকে নিচুতলার মানুষের অন্তরে পৌঁছে দেন ভবিষ্যতের 'জাতির জনক'। গান্ধী ছিলেন সনাতনী হিন্দু। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের আবেদন প্রসঙ্গেও তিনি আত্মপরিচয় দিতেন হিন্দু হিসেবে। তাঁর কাছে হিন্দু সম্প্রদায় ছিল 'আমরা' আর মুসলমান সম্প্রদায় ছিল 'ওরা'। গান্ধী তাঁর 'হিন্দু আইডেনটিটি' বজায় রাখার জন্য খ্রিস্টান অথবা মুসলমানের গৃহে ফল ছাড়া কিছু খেতেন না। তিনি উভয় সম্প্রদায়ের বিবাহ সমর্থন করতেন না।"

শুভঙ্করের লেখায় প্রান্তবাদিতার ছাপ আছে, যেটা তাঁকে সামলে নিতে হবে। সেইসঙ্গে তাঁকে পরামর্শ দেব, বইপত্র পত্রিকার সাবুদ সাক্ষ্য ছাড়াও লোকায়ত জীবনের দিকে তাকাতে। ধর্ম ও রাজনীতির চক্র ও চক্রান্তের বাইরে সত্যিই এ দেশে সেকুলার ঔদার্য আছে। আছে সত্য মানবতার দিশা। এই জগৎ সম্পর্কে তাঁকে ঈষৎ অসতর্ক মনে হল। লালনফকিরকে তিনি বলেন 'বাউল চূড়ামণি'। তাঁর গানের উদ্ধৃতিতে ভুল করেন। বিনয় ঘোষের কবুলতি মেনে বলে বসেন, পাগল নাথী, গোবরা সম্প্রদায়, রামবল্লভী সম্প্রদায় আজও গান গেয়ে বেড়ান। তাই নাকি?

উপনিবেশের গল্প

'গল্পের কলোনি', সম্পাদনা : অভিজিৎ ঘোষ। চয়নিকা, ২০০৩। ৮০ টাকা

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

'গল্পের কলোনি' *বইটি কেবল কলোনির দেশের কয়েকটি গল্পের একটি সংকলন-ই এখানে পাওয়া যাবে এমন কিছু গল্প যেখানে 'গল্পই কলোনাইজ করছে মানুষের ইতিহাসবোধকে'—গল্পের ভেতর দিয়ে চলছে লেখকের 'স্বভূমি সন্ধানের অন্বেষণ' (পৃ. ১৬)। বাঙলা 'উপনিবেশ'-এর বদলে সম্পাদক যে বারবার ইংরেজি কলোনি শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তার একটা কারণ হয়তো এই যে, ওই শব্দটা একবার ধরে নিতে পারলে কলোনাইজ, কলোনাইজেশন কথাগুলোও গোটা গোটা বসিয়ে দেওয়া যায়; আজকের উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বচর্চার ফ্রেমে তাকে আঁটিয়ে নেওয়া যায় সহজে। কলোনির গল্প বলতে সম্পাদক কী বোঝাতে চাইছেন, সেই তত্ত্বটাও জমাট হয়ে উঠতে পারে এর ফলে।

অভিজিৎ ঘোষ তো কেবল কিছু অনূদিত গল্পের একটা সংকলনগ্রন্থই তৈরি করতে চাননি; কলোনি কা-কে বলে, কলোনির গল্পের চারিত্রলক্ষণ কী সে-বিষয়ে রীতিমতো একটা তত্ত্ব নির্বারণ করতে চেয়েছেন তাঁর দীর্ঘ ভূমিকায়। মননপুষ্ট সেই রচনাটি পড়তে পড়তে হঠাৎই মনে হয়, কলোনি শব্দটারই কীরকম অর্থান্তর ঘটে গেছে আমাদের দেশে। দুশো বছর কলোনি হয়ে থাকার পর আমরা স্বাধীন হলাম আর তার বছরখানেক পর থেকেই অঞ্চলে-অঞ্চলে গড়ে উঠতে শুরু করল রেফিউজী কলোনি। সেই 'কলোনি' মানে তো উপনিবেশ নয়; সোজা বাঙলায় তাকে বলা যায় : আস্তানা। অভিজিৎ ঘোষের ভূমিকায় অবশ্য ভারত-প্রসঙ্গটাই খুব কম জায়গা পেয়েছে। বিশ্ব জুড়ে যে উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বচর্চা চলছে, তাঁর ঝোঁকটা সেই দিকেই। তিনি নিজেই বলেছেন, এক্ষেত্রে তাঁকে প্রণোদিত করেছে তিনজন সমসাময়িক বাঙালি লেখকের রচনা (পৃ. ২২)।

বিশ্ব পটভূমিতেই তিনি বিচার করতে চাইছেন বিষয়টা; তাঁর প্রধান অবলম্বন সাম্প্রতিক উত্তর-ঔপনিবেশিক আর উত্তর-আধুনিক চর্চার তত্ত্ববিশ্ব। বিশ শতকের শেষ দিকে এসে উপনিবেশ শব্দটার অর্থও কেমন বদলে গেছে, প্রত্যক্ষভাবে রাজদণ্ড ধারণ না করেও বণিকের মানদণ্ড আজ কেমন উপনিবেশ করে ফেলতে পারে আর-একটা দেশকে, আর সেই বিশ্ববাজারবাদকেই বলা হচ্ছে 'বিশ্বায়ন'—

এইসব প্রশ্নও অভিজিতের রচনায় থাকবে প্রত্যাশিত ছিল, কারণ 'কলোনি'-র ধারাটাকে তিনি বুঝতে চেয়েছেন একটা বড়ো মাত্রায়। তাঁর অনুসন্ধানের বিষয় শুধু উপনিবেশ-বিরোধিতা নয়; তাঁরই সঙ্গে সঙ্গে মনের গভীরে 'অন্য যে প্রক্রিয়া' চলে, তাকেও তিনি খুঁজতে চান। তিনি জানেন, উপনিবেশে শাসিত মনের প্রকাশ শুধু বিদ্রোহ নয়, 'বিদ্রোহ বা বশ্যতাবাদ দুয়েরই প্রণোদনা ঘটিয়েছে উপনিবেশবাদ' (পৃ. ২৪, ২৭)। শুধু বাঙলা সাহিত্যই যিনি পড়েছেন, তিনিও এই কথার মমার্থ উপলব্ধি করতে পারবেন, আশা করা যায়।

শুধু বিদ্রোহ বা পরিত্যাগের সাহিত্য, অভিজিৎ মনে করেন, 'সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, তার বর্ণমালা থেকে হারিয়ে যায় নানা স্তর' (পৃ. ২৩)। উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ সরোজিনী' বা 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'-র মতো নাটক আজ পড়তে গেলে কতকটা এই রকমই মনে হয়। কিন্তু 'নীলদর্পণ'? তার বর্ণমালায় কত স্তর—অভিজিৎ ঘোষের মতো তত্ত্বজ্ঞানী পাঠক তা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। কিংবা ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ ও রৌদ্র'-র মতো গল্প। শাসক প্রভুর বিরুদ্ধে শাসিতের প্রতিবাদ যে কত স্তরে হতে পারে, তারই তো বহুমাত্রিক আখ্যান ওই গল্পটি। অভিজিৎ কিন্তু এসব কিছুই লেখেননি। আগেই বলেছি, তিনি শাসিত মানুষের স্বভূমি সন্ধানের সূত্র অন্বেষণ করেছেন; কিন্তু তাঁর স্বভূমি ভারত, তাঁর রচনায়, বড়োই উপেক্ষিত।

উপনিবেশ-বিরোধী সাহিত্যে, যেখানে শুধুই জাতীয়তাবাদী আবেগ, সেই সাহিত্যকে অভিজিৎ সংগত কারণেই 'একপেশে' মনে করেছেন; কারণ দেশের 'অন্তর্বর্তী বিভেদ-বিরোধ' সেখানে খুব বেশি জায়গা পায় না (পৃ. ১৮-২০)। ঠিকই তো। আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মহা-আখ্যান তাই বহুদিন পর্যন্ত মহারাষ্ট্র বা মাদ্রাজের ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী আন্দোলনকে উপেক্ষা করেছে। এই তো দেশের অন্তর্বর্তী 'বিভেদ-বিরোধ'। কিংবা আজ যাকে ভারতীয় জাতি বা 'নেশন' বলি, কাশ্মীর-মনিপুর-নাগাল্যাণ্ডকেই বা তার ফ্রেমে ধরানো যায় কীভাবে? এইসব প্রশ্ন কি অভিজিতের প্রতর্কে প্রাসঙ্গিক ছিল না?

কলোনি-র সংজ্ঞায় অভিজিত কানাডা, অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড, এমনকী চীন-কে পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর যুক্তি : 'কলোনি হওয়ার অভিজ্ঞতা' এইসব দেশের মানসলক্ষণেও ধরা পড়ে। কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ায় যারা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তারা কলোনির মানুষের 'স্বজাতি, কিন্তু সজ্জন নয়' (পৃ. ২৬)। তাঁর এই ব্যাখ্যান তর্কসাপেক্ষ; তবে আমার কাছে তার চেয়েও প্রাসঙ্গিক : ভারতের দলিত-আদিবাসী সম্প্রদায়ও তো এই রকমই ভেবেছিলেন; আবার কখনও কখনও সেই মানসিক দূরত্ব অতিক্রম করে মিশে গিয়েছিলেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্রোতে। কলোনির গল্প পড়তে গিয়ে কী করে ভুলি সেইসব কথা?

সম্পাদকের ভাষ্য নিয়েই এতটা লিখতে হলো, কারণ অনেকগুলো গভীর প্রশ্ন অভিজিৎ তুলেছেন; তারপর অনেকগুলো অল্প-পরিচিত বা অচেনা গল্প স্বচ্ছন্দ অনুবাদে সাজিয়ে দিয়েছেন এক-এক করে। শেষে আছে তথ্যসমৃদ্ধ লেখক-পরিচিতি। কত যত্নে-নিষ্ঠায় সম্পাদিত এই গ্রন্থটি, তার পরিচয় পাওয়া যায় সংকলনের পরিকল্পনা, বিন্যাস আর সম্পাদকের ভাষ্যরচনায়।

গল্প-নির্বাচন নিয়ে অবশ্য কিছু প্রশ্ন থাকতে পারে। টিম উইন্টনের (অস্ট্রেলিয়া) 'পড়শিরা' নামের অসামান্য গল্পটি, আমি তাকে পড়ছি উদ্বাস্তুসমাজের গল্প হিসাবে আর উদ্বাস্তু বলতে আমি বুঝি এক বিশিষ্ট মানবগোষ্ঠী, যাঁরা ছড়িয়ে আছেন এই ভূ-গোলকের বিভিন্ন প্রান্তে। নাদিন গর্ডিমারের 'ছ ফুট দেশের মাটি'-তে আমি কলোনিশাসন ছাড়াও আরও অনেক কিছু খুঁজে পাই। ঠিক তেমনি প্যাট্রিক হোয়াইটের (অস্ট্রেলিয়া) 'পত্তন'-কে শুধু কলোনির গল্প বললে যেন একটু খাটো করা হয়। রাজা রাও-এর 'নিমকা' চমৎকার লেখা, তবে এই সংকলনে প্রাসঙ্গিক কিনা, প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। চীন বা ভারত কেউই আজ আর কলোনি নয়। তবে চীনের গল্পটি বর্তমান ভারতের সাক্ষরতা অভিযানের পটভূমিতেও পড়া যেতে পারে।

গল্পগুলো নিয়ে আলাদা করে আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে না। বেশির ভাগ গল্পই বেশ ভালো। তার চেয়েও বড়ো কথা ল্যাংস্টন হিউজ, রনাল্ড সিগ্যাল, আমা আটা আইডু প্রমুখের কিছু রচনা পড়ে উপনিবেশের গল্প সম্পর্কে আমাদের মনে যে-ধারণা তৈরি হয়েছিল, এই সংকলন সেই ছাঁচটাকে কিছুটা বদলাতে চেয়েছে অন্য ধারার, অন্য মাত্রার কিছু গল্পের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে। সম্পাদকীয় ভাষ্যের সঙ্গে যিনি সম্পূর্ণ একমত হবেন না, তাঁকেও বোধহয় এটা স্বীকার করতে হবে।

প্র ব ন্ধ

পালাগানের বিষয়, কাহিনীর গঠন-কাঠামো ও ইতিবৃত্ত বিচার

আলীম আল রাজী

আমাদের দেশে ধর্ম বা প্রথা চালিত কোন উৎসব উপলক্ষে অথবা অবসর সময়ে আনন্দ-বিনোদনের মাধ্যম হিসেবেই হাজার বছর ধরে বিভিন্ন রীতির লোকনাট্য সাধারণ মানুষের দ্বারা লালিত হয়ে এসেছে। এসব লোকনাট্যের মধ্যে অঞ্চলে এই পালাগান একটি জনপ্রিয় নাট্যরীতি। পূর্ব ময়মনসিং অঞ্চল (নেত্রকোণা) ছাড়াও রংপুর, বগুড়া, চট্টাগ্রামসহ বেশ কিছু অঞ্চলে এই পালাগান পরিবেশিত হতে দেখা যায়। সুগ্রথিত ঘটনার পরিণামমুখী অগ্রগতি, দ্বন্দ্বময় বৃত্ত এবং সংলাপের প্রাণময়তা পালাগানের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে লক্ষণীয়।

ধারণা করা হয় মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে 'মানুষের লৌকিক জীবন' সাহিত্যের উপাদান রূপে গৃহীত হয়েছিল। সতেরো শতকে প্রধানত বাংলাদেশের ময়মনসিংহ অঞ্চলে স্থানীয় লোককাহিনী অবলম্বনে ধর্মভাব মুক্ত এক ধরনের বর্ণনামূলক সাহিত্য রচিত হতে থাকে যা, গীতিকা রূপে খ্যাত (এ সময় নাট্যকলার মূলধারা রূপে 'লৌকিক জীবনের প্রণয়' বিষয় হয়ে ওঠে)। মৌখিকভাবে সৃষ্ট ও প্রচারিত এ সব গীতিকাগুলি নশ্বর মানুষের বিয়োগাত্মক প্রেমের করুণ পরিণতি সম্পর্কে উচ্ছ্বাসিত ধারণায় পূর্ণ। গীতকাগুলিকে মানবতাবাদ মানবীয় কামনা, বাসনা বলিষ্ঠ নারী চরিত্রের উপস্থিতি এবং ধর্মীয় নৈতিক বিধি বিধানের বিরুদ্ধে যে প্রবল প্রতিবাদ স্পৃহা পরিলক্ষিত হয়, তা একে এক স্বতন্ত্র মর্যাদায় উপস্থাপিত হয়ে এসেছে এবং সবার কাছে পালাগান নামে খ্যাতি লাভ করেছে।[১] এ প্রসংগে পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও মৈমনসিংহ গীতিকার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে কাহিনীগুলির অন্যতম আকর্ষণ হল বাস্তব মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা। কাব্য সৌন্দর্য তাঁদেরও অনেক সময় অসামান্য, বিশেষ করে অধিকাংশ লোকগাথা কখনো লিখিত হয় নি। তাঁদের ভাষা এতো পরিবর্তিত হয়েছে যে, সেগুলিকে উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর রচনা বললেও ভুল হবে না। অধিকাংশ লোক-প্রিয় গাথা মানুষের মুখে মুখে চলেছিল এবং মুখে মুখেই তার বিকাশ ও বিবর্তন ঘটেছে। সে সব গাথার মধ্যে রয়েছে মানুষের কথা, রূপকথা, ভক্তিমূলক গল্প ইত্যাদি। কিন্তু আসল কথাটা প্রায়ই প্রণয়ের গীত। যেমন—'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র (চন্দ্রকুমার দে' সঙ্কলিত) গাথা সমূহ।

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য যেখানে একান্তভাবেই ঈশ্বর কেন্দ্রিক, গীতিকাগুলিতে সেক্ষেত্রে রক্ত মাংসের জীবন্ত মানুষেরই রাজকীয় আধিপত্য লক্ষ করা যায়। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় বিশেষত যখন আমাদের সমাজে নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না, পরিণামে সকল বিষয়েই পুরুষের অনুশাসন মেনে চলতে গিয়ে নারীরা পুরুষের হাতের ক্রীড়ানকে পরিণত হয়েছিল। তদুপরি সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী-বেহুলার দৃষ্টান্তে স্বামীকে দেবতা স্থানে গ্রহণ করায় অন্য একটি আদর্শ গড়ে উঠেছিল। সেই প্রেক্ষিতে ভারতীয় নারী যখন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে একান্তভাবে পরভৃতিকায় রূপান্তরিত হয়েছিল, তখন বিস্ময়করভাবে গীতিকার নারী চরিত্রগুলি স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যার ফলে, তা সহজেই একান্তভাবে অসচেতন পাঠকের দৃষ্টিও আকর্ষণ করে। আমরা জানি, গীতিকাগুলির রচয়িতারা সকলেই পুরুষ, অথচ অকপটে তাঁরা নারীর মহিমাকে বড় করে তুলেছেন। নায়িকা চরিত্রগুলির তুলনায় নায়ক চরিত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিষ্প্রভ, ম্রিয়মান, আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, আদর্শ ভ্রষ্ট এবং অকৃতজ্ঞরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিপরীতে গীতিকার নায়িকা চরিত্রগুলি ত্যাগে, তিতিক্ষায়, বিরল কর্তব্য পরায়ণতায়, কৃচ্ছ্রসাধনে, অসাধারণ মানসিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় ক্রমে তারা গীতিকাগুলির মুখ্য আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। নারীচরিত্রগুলির বিবিধ বিরল গুণের মূলে তাঁদের অন্তরের অমোঘ প্রেম শক্তিকেই কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।[২] অধিকাংশ গীতিকাগুলিতেই ঈশ্বরের পাশাপাশি ভগবান বা আল্লাহ্ এসেছেন বিস্ময়করভাবেই। ধর্মনিরপেক্ষ এ রীতির বন্দনা গানে যেমন মুসলমানদের নবী-রাসুল, মক্কা-মদীনা, কুরান-কিতাবের সাথে হিন্দুধর্মের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-সরস্বতীসহ বিভিন্ন দেব-দেবীর বন্দনা গীত হয়েছে। কোথাও কোথাও এর মধ্যে সরাসরি আল্লাহ্‌র চরিত্রেও অভিনয় করতে দেখা যায়। ধর্মনিরপেক্ষতার বিচারে আমাদের দেশীয় নাট্যঐতিহ্যে এরূপ সাম্প্রদায়িক উদারতার পরিচয় শুধু বাংলাদেশ ব্যতীত সারা পৃথিবীতেই বিরল বলে মনে হয়। অনেকে অবশ্য এসময়টাকে ভারতীয় নাট্যকলার অবনতির সময় বলে মনে করে থাকেন (!)।

অধিকাংশ গীতিকা বা পালাগুলি প্রণয়ের, তাও আবার প্রাক্‌বিবাহ, পূর্বের প্রণয় কেন্দ্রিক রচনা হওয়া সত্ত্বেও এসবের বিবরণ দান প্রসঙ্গে আমাদের লোক-কবিরা যে অসাধারণ সংযম ও শালীনতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। উল্লেখ যে, তাঁদের কেউই সহজলভ্য জনপ্রিয়তার পথ অবলম্বন করেন নি। বলা হয় গীতিকা রচয়িতারা নাকি সব নিরক্ষর কবি ছিলেন।[৩] সেক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তবে এসব কবি গীতিকাগুলি রচনার ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় শিল্পগুণের পরিচয় দিলেন কিরূপে? এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আমরা সাহিত্য কাকে বলব? এ প্রসঙ্গে বলা যায়, ভালোবাসার প্রবলতা জানাবার চেষ্টায় মন যখন আঁকুবাঁকু করে তখন প্রকৃতপক্ষে যে-কথাটা অসত্য, ভাবের পক্ষে সেটাই সত্য হয়ে ওঠে। তখন বলবার কথাকে বাঁকিয়ে বাড়িয়ে, সাজিয়ে তার সহজ অর্থকে অস্পষ্ট করে দিয়ে সাহিত্য আপন

কাজ চালায়। ঠিকমত এ কাজটি করতে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার দরকার পড়ে; মুখ্যত ভাব প্রকাশের এই ভাষাবাহন হচ্ছে সাহিত্য।[৫] আর এই সাহিত্য যদি হয় 'লোক' সৃষ্টি তাহলে তা অবশ্যই 'লোকসাহিত্য'। 'লোকসাহিত্য' রূপে পালা বা গীতিকার শিল্পমান বিচারে প্রথমেই দেখতে হয় তার শিল্পসম্মত প্রকাশভঙ্গী। গীতকাগুলি মনোযোগ সহকরে পাঠ করলে বোঝা যায়; এগুলির রচয়িতারা নিরক্ষর হলেও অশিক্ষিত ছিলেন না, ছিলেন না শিল্প সম্মত প্রকাশভঙ্গীর ব্যাপারে অসচেতন। বস্তুতপক্ষে, এর বিষয় ও আঙ্গিকগত দিক থেকে গীতিকাগুলিতে এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য অনুসৃত হয়েছে যার ফলে রচনাগুলি যেমন আকর্ষণীয়, বৃদ্ধি পেয়েছে এর শিল্পোৎকর্ষ, তেমনই সঞ্চারিত হয়েছে এগুলির বিচিত্রতা, যা পাঠক তথা শ্রোতৃমণ্ডলীকে তৃপ্তিদান করতে পারে।

বাংলা লোকনাট্যে 'পালাগান' একটি স্বতন্ত্র রীতি হিসেবে চিহ্নিত। পালাগানের বিষয় ও আঙ্গিকের এই আলোচনায় পালাগান বিষয়ে বিজ্ঞজনদের প্রদেয় বিভিন্ন সংজ্ঞা ও মতামতের দিকে আলোকপাত করা যেতে পারে :

পালাগান বলতে সাধারণভাবে পল্লীগীতিকাকেই বোঝানো হয় অর্থাৎ পল্লীগল্পকথার বৈঠকী গান। ইংরেজিতে যাকে 'Canticle Fable' বলা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে 'কাঞ্চনমালা', 'কাজলরেখা' ও 'মধুমালা' প্রভৃতি গীতিকা পালারূপে গাওয়া হত। ইংরেজীতে যেমন-জুডাস, বারবারা, এলেন, দি জিপসি লেডী ইত্যাদি। জনজীবনে প্রচলিত লোকনাট্যের আসরে পরিবেশিত বা আখ্যানধর্মী যেকোন লোকসংগীতের উপস্থাপনাকেই 'পালা'রূপে বোঝানো হয়ে থাকে। যেমন-'যাত্রা পালা', 'মৈষালবন্ধুর পালা', 'পদ্মপুরাণ পালা', 'ঝাপান পালা', 'বিষহরির পালা', 'পালা কীর্তন' বা 'কীর্তন পালা', 'ভাসান পালাগান', 'পালাগান' ইত্যাদি। উপরিউক্ত বিভিন্ন লোকনাট্যের পরিবেশনা রীতি ভিন্ন রকম হলেও এসব বিভিন্ন লোকনাট্যের সাথে 'পালা' শব্দটির যথেচ্ছ ব্যবহার হয়েছে বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে 'পালা' শব্দের আভিধানিক অর্থ নিরূপণের চেষ্টা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। 'বঙ্গীয় শব্দকোষে'র দ্বিতীয় খণ্ডে 'পালা' বলতে; [{সং পর্যায়> প্রা পল্লাঅ> বা (পল্লা) পালী; অস পালী}, পালা শব্দের আভিধানিক অর্থ পর্যায়ানুসারে রচিত মঙ্গলকাব্যের গেয় বিষয় বা গান (মঙ্গল বারের পালা আরম্ভ করি কঙ্কন-চণ্ডী। বঙ্গবাসী; স্থাপনা পালা সমাপ্ত ২৮; দিবাপালা; নিশাপালা ৭৩। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী। বঙ্গবাসী][৫]

'পালা' শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে ড. অজিতকুমার ঘোষ অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন, আসামের 'পালি' শব্দ থেকে 'পালা' শব্দের উৎপত্তি। তিনি বলেন, 'পঞ্চদশ শতাব্দীতে পূর্ণাঙ্গ নাটকের উদ্ভবের আগে 'ওঝা পালি' নামে এক প্রকার সম্মিলিত সঙ্গীত প্রচলিত ছিল। এই সঙ্গীত মিশ্রিত নৃত্যে 'ওঝা' অথবা দলনেতা নানারকম অঙ্গভঙ্গিসহ কিছু ছড়া আবৃত্তি করে এবং 'পালি' অথবা 'সহযোগীবৃন্দ' করতাল বাজিয়ে পদচারণাসহ গান গাইতে থাকে এবং 'ডায়েনা পালি' অথবা 'প্রধান সহযোগী' দলনেতার সঙ্গে কথোপকথনের রীতিতে কবিতাগুলি ব্যাখ্যা

করে দেয়। ঢুলিয়া অথবা ঢোল বাজনদারদের ক্রিয়া-কলাপের মধ্যেও লোকনাট্যের উপাদান সন্ধান করে পাওয়া যায়। উৎসব উপলক্ষে তারা নানারকম শারীরিক কসরত দেখাত এবং স্থূল নাট্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করত'।[৬] 'পালা' বিষয়ের উপরিউক্ত আলোচনায় প্রচলিত পালাগান রীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ স্পষ্ট হয়েছে। 'পালা' বিষয়ে অন্যান্য পণ্ডিতবর্গের মাতমত আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।

এ পর্যায়ে, 'পালা' শব্দের তাৎপর্য নিরূপণ করতে গিয়ে ড. সেলিম আল দীন বলেন, "পালা : সাধারণ অর্থে পরিবেশন যোগ্য কাহিনী, কোন বিস্তৃত কাহিনীর বিশেষ অংশ। মঙ্গলকাব্যে দিনে পরিবেশিত কাহিনী পর্ব দিবাপালা ও রাত্রে পরিবেশিত কাহিনী নিশাপালারূপে অভিহিত হয়। পালার অন্য নাম 'পাট', যেমন-ধোবার পাট।"[৭] প্রসঙ্গক্রমে আরো জানা যায়, পালি : দোহার, অসমীয় ভাষায় সর্বত্র এবং কখনো কখনো বাংলায় দোহার অর্থে 'পালির' ব্যবহার দেখা যায়। ঢাকা, মানিকগঞ্জ, প্রভৃতি জেলায় পালি অর্থে 'পাইল' উক্ত হতে দেখা যায়, যেমন-পাইলের গান (দোহারের গান)। এবং পালি গান : পালি অর্থাৎ দোহারদের দ্বারা পরিবেশিত গান। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' পালি গানের উল্লেখ আছে। এ প্রসঙ্গে 'দোহার' শব্দের যে সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন তাহলো; দোহার : সমবেত কণ্ঠে গানের নিমিত্তে আসরে অবতীর্ণ গায়কবৃন্দ। পাঁচালি, কথকতা, লীলানাট্য, লীলাকীর্তন, যাত্রা, ঘাটুগান, গাজীর গান, জারী, আলকাপ, প্রভৃতি নাট্যে গায়েনের পিছনে অথবা মঞ্চের মধ্যস্থলে উপবেশনকারী দলীয় গায়কগণ। পালা বা পাঁচালিতে দোহারদলে অবস্থানকারী 'ঠেটা' ব্যক্তি গায়েনের সঙ্গে নাট্যের প্রাসঙ্গিক অথবা প্রসঙ্গ বহির্ভূত বিষয় নিয়ে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। অনেক সময় গায়েন কোন অংশ ভুলবশত এড়িয়ে গেলে ঠেটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন দ্বারা তার খেই বা বচন সূত্র ধরিয়ে দেয়। সে কখনো কখনো নানা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন দ্বারা কাহিনীকে এগিয়ে নিতেও সাহায্য করে। জামাল-কামালের পালা থেকে ঠেটার যৌক্তিক প্রশ্নের একটি অংশ নীচে উদ্ধৃত করা হলো :

গায়েন : আচ্ছা তা হলে কি একরাত্রে মাতৃগর্ভে একটি সন্তান সৃষ্টি হয়?
ঠেটা : তা গায়েন সাব, কোন কোন দিনে কি গঠিত হইতাছে।
গায়েন : সোমবারেতে নিতি, মঙ্গলবারেতে নাভি, বুধবারেতে বত্রিশ নাড়ি, বসাইছে সারি সারি। বিষ্যুদবারে দিছে আল্লা মুখেরই গঠন, শুক্রবারে দান করেছে আল্লা চক্ষু নিরাঞ্জন। শনিবারেতে...রবিবারেতে মাথা।[৮]

দোহার বাংলা লোকনাট্যে অপরিহার্য অঙ্গরূপে সহস্র বৎসরের ধারাবাহিকতায় বিদ্যমান। এর উৎপত্তির বীজ প্রাচীন ও মধ্যযুগের কম্যুনিটি বা গোষ্ঠীগত সঙ্গীত চেতনার ধারায় সুপ্ত ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগে দোহার 'পালি' রূপে এবং পালাগান 'পালিগান' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) নামে পরিচিত ছিল।[৯] পালি (পালী) অসমীয় ভাষায় দোহার অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। মনে হয় বাঙলা থেকেই 'পালি' শব্দটি উত্তরকালে আসামে গৃহীত হয়েছিল।

পালাগানের সংজ্ঞা নিরূপণে উপরিউক্ত আলোচনায় এর যে সার্বিক চিত্র পেয়ে থাকি তাতে দেখা যায়, এর মধ্যে একজন মূল গায়েন থাকেন, যিনি সমস্ত অংশটি একাই নেচে-গেয়ে পরিবেশন করেন। সংলাপাত্মক অংশে সাহায্যের জন্য দোহারদের মধ্যে একজন প্রধান সহযোগী ('ডায়েনা পালি' বা ঠ্যাটা) থাকেন এবং গানের সমস্ত অংশে দোহারবৃন্দ বাদ্যযন্ত্র সহকারে গানের পাইল ধরে থাকে।

বহু আগে থেকেই বাংলা লোকনাট্য পালাগান রূপে বিভিন্ন রীতির অভিনয় প্রচলিত হয়ে এসেছে। বর্তমানে পালাগান নামে যে সব অভিনয় রীতি প্রচলিত রয়েছে সেগুলির বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে :

লক্ষ করলে দেখা যাবে, পালাগানের কাহিনীর সাথে আমাদের গীতিকাগুলির একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এসব গীতিকার আখ্যায়িকাগুলি প্রায়ই পালাগান হিসেবে গেয়। এর পুরো অংশে রয়েছে সাধারণ মানুষের কাহিনী। এর ভেতরে দেবতার হস্তক্ষেপ নেই বলেই চলে। এমনকি হিন্দু-মুসলমানের বা উঁচু-নীচুর ভেদও মানেন্ নি রচয়িতারা। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আজিজুল হক বলেন, "এদের রচনা পদ্ধতিও আশ্চর্য রকম। মঙ্গলকাব্যে হোক, বৈষ্ণব কাব্যে হোক, সর্বত্র কবিরা পুরানো অলঙ্কারশাস্ত্রের বাঁধা ছক অনুসরণ করেছেন।...গীতিকার কবিরা কিন্তু উপমা ও অলঙ্কারের ব্যবহারে আগাগোড়া মৌলিক। তাঁদের ভাষা যেমন সরল, ভঙ্গি তেমন অনাড়ম্বর।...এই দুই কারণে সন্দেহ জাগে গীতিকার গল্পগুলি পুরাতন, কিন্তু তাকে ঘষে-মেজে যথাসম্ভব প্রাচীন সাজে সাজিয়ে একালেই লেখা হয়েছে, একালের অনুযায়ী ব্যঞ্জনা দিয়ে।"[১০]

সৈয়দ আজিজুল হকের সন্দেহ অমূলক নয়। যেমন—এর প্রমাণ পাওয়া যায় বরিশালে প্রাপ্ত শিব বিষয়ক একটি ছোট্ট পালাগানে; সূর্যের উদয় থেকে মধ্য আকাশে উত্থানের পরোক্ষ-রূপকে সূর্যাই বা শিবাই ঠাকুরের বিবাহ এবং পত্নী গৌরীর সঙ্গে আপন গৃহে যাত্রার কাহিনী বর্ণনার মধ্যে। গৌরী অশ্রুসজল চোখে পতিগৃহে যাত্রা করছেন। সেই মুহূর্তে সূর্যাই সম্পর্কে নববধূ গৌরীর অবিশ্বাস এবং পিতৃগৃহ ত্যাগের যে বেদনা, তা এতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে স্থান পেয়েছে। সংগৃহীত পালাটি 'অতি প্রাচীন' বলে উল্লিখিত—

গৌরী : তোমার দেশে যামুরে সূর্যাই আমি কাপড়ে দুঃখ পামু।
সূর্যাই : নগরে নগরে আমি তাতিয়া বসামু।
গৌরী : তোমার দেশে যামুরে সূর্যাই আমি শঙ্খের দুঃখ পামু।
সূর্যাই : নগরে নগরে আমি শাখারি বসামু।
গৌরী : তোমার দেশে যামুরে সূর্যাই আমি মা বলিব কারে?
সূর্যাই : আমার যে মা আছে মা বলিবা তারে।
গৌরী : তোমার দেশে যামুরে সূর্যাই আমি বাপ বলিমু কারে?
সূর্যাই : আমার যে বাপ আছে বাপ বলিবা তারে।...।[১১]

লোকনাট্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল; এর কাহিনী (এর সাথে অবশ্যই তার ভাষা জড়িত), তারপর এর পরিবেশনা। একই কাহিনী বিভিন্ন অঞ্চলে সেখানকার

সামাজিক আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির ও পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার কারণে ভিন্ন ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। যার ফলে পরিবেশন রীতির পাশাপাশি নাট্যকাহিনীর মূল অংশের সাথে জন্ম নেয় তাঁদের পরিবেশনাগত ছোট ছোট শাখা প্রশাখা, ডাল-পালা। এগুলি অঞ্চল ভিত্তিক বিশ্বাস ও সেখানকার সামাজিক আচার-আচরণের উপরই বেশি নির্ভর করে থাকে। এসব আখ্যায়িকার উৎপত্তি সাধারণত সমাজের বয়স্কদের কাছ থেকে মৌখিকভাবে কাহিনী শুনে। স্থানীয় উপাখ্যানগুলির ক্ষেত্রে দুটি বিষয়কে আমরা প্রধান উৎসরূপে চিহ্নিত করতে পারি। যেমন (১) সমাজের বয়স্কদের কাছ থেকে মুখে মুখে কোন ঘটনার কাহিনীর শুনে, (২) মৈমনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকার মাধ্যমে।[১২] কুদ্দুস বয়াতী জানান, 'মহুয়া', 'মলুয়া' এবং 'ফিরোজ খান দেওয়ান' আখ্যায়িকাগুলি কেন্দুয়ার এরশাদুর রহমানের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

পালাগানের বয়াতীদের পরিবেশনায় যে সমস্ত আখ্যায়িকা পালাগান হিসেবে গাওয়া হয়ে থাকে তার একটি তালিকা নীচে দেয়া হল : ১. কমলা রানী, ২. ফিরোজ খান দেওয়ান, ৩. রতন বাদশা, ১০. কাঞ্চন বাদশা, ১১. সোনাহর বাদশা, ১২. ইমরান বাদশা, ১৩. মতিলল বাদশা, ১৪. চানফর বাদশা, ১৫. শাহী আরম বাদশা, ১৬. আসমত বাদশা, ১৭. ফুলচান্দ বাদশা, ১৮. জালি আলম বাদশা, ১৯. বাদশা তরমুজ, ২০. জয়নাল মিল্লিক বাদশা, ২১. তাজ মিল্লিক বাদশা, ২২. সেকান্দার বাদশা, ২৩. কারোন বাদশা, ২৪. জাহাঙ্গীর বাদশা, ২৫. হলদ বাদশা, ২৬. বাদশা আয়নাল হক, ২৭. রওন সাধু, ২৮. আমির সাধু, ২৯. আইলসা রাজা, ৩০. ওম রাজা কোম রাজা, ৩১. তালেব সওদাগর, ৩২. সোরাত বানু, ৩৩. অতুলা সুন্দরী, ৩৪. সুন্দর মতি, ৩৫. হরবুলা সুন্দরী, ৩৬. গুলে হরমুজ গেন্দাফুল কন্যা, ৩৭. মধুমালা, ৩৮. বিলকিস রানী, ৩৯. চিমু রানী, ৪০. ডালিম পরী, ৪১. চন্দ্র শেখরা, ৪২. রাজু সুন্দর, ৪৩. আলমাস কুমার, ৪৪. সুখে আলম, ৪৫. রূপ কুমার, ৪৬. আজুর লীলা, ৪৭. রাম-বিরাম, ৪৮. সায়ফুল মুকুল, ৪৯. দিল পছন্দ, ৫০. ফিরোজ রোকেয়া, ৫১ মেহের নিগার, ৫২. শীত বসন্ত, ৫৩. বিদ্যা সাগর, ৫৪. মনোয়ার গোলাম, ৫৫. জহর মালা, ৫৬. পালোয়ান খান, ৫৭. সাহেবের বাপ, ৫৮. দেঙ্গু মিয়া, ৫৯. কাগাধারের খেলা, ৬০. জিবর মল্লিক, ৬১. দাতা হাতেম তাঈ, ৬২. দুবোরাজ, ৬৩. গোত্রের হালকী।[১৩]

উপরোক্ত কাহিনীগুলির বেশিরভাগই রাজশক্তি ও অতিপ্রাকৃত গল্পের উপর ভিত্তি করে রচিত একটি মিশ্রিত রূপ। আর কিছু রয়েছে স্থানীয় লোককথাকে কেন্দ্র করে রচিত। বিষয়বস্তু হিসেবে রাজ-রাজারা ও রূপকথার পরীদের গল্পের মিশ্রিত রূপ নিয়ে গঠিত। সবগুলি আখ্যায়িকাই কল্প-কাহিনী উপকথা বা আখ্যায়িকা রূপে পরিচিত। এ সব আখ্যায়িকার মধ্যে রাজ শক্তি, যেমন রাজা-রানী, মন্ত্রী, যুবরাজ, রাজার মেয়ে চরিত্রগুলি এবং অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত বিষয়, যেমন-পরী, রাক্ষস, দৈত্য চরিত্রগুলির প্রাধান্য বেশি দেখা যায়। এছাড়াও পারশ্য-হিন্দুস্তানের কিছু সংখ্যক আখ্যায়িকার সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন 'সায়ফুল মুকুল' 'দাতা হাতেম তাঈ', 'ইউসুফ জুলেখা', 'গুলে

মনোয়ার', 'গুলে হরমুজ', 'মুসা নবীর জন্ম', 'হারুনুর রশীদ', 'আলমাস কুমার', 'মধুমালা', 'ইন্যাক (ইউনুস)-দিল পছন্দ', 'তাল মিল্লিক বাদশা' এবং 'জয়নাল মিল্লিক' ইত্যাদি।

অপর দিকে মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকায় মোট ৫৪টি পালা সংকলিত হয়েছে। ড: সেনের সম্পাদনায় Eastern Bengal Ballad: Mymensing (vo.1)-এ মোট ১০টি পালা নিয়ে ১৯২৩ সালে প্রথম খণ্ডে যে পালাগুলি প্রকাশিত হয় সেগুলি উদ্ধৃত করা হল : (১) মহুয়া, (২) মলুয়া, (৩) চন্দ্রাবতী, (৪) কমলা, (৫) দেওয়ান ভাবনা, (৬) দস্যু কেনারামের পালা, (৭) রূপবতী, (৮) কঙ্ক ও লীলা, (৯) কাজল রেখা, (১০) দেওয়ান মদিনা।[১৪]

দ্বিতীয় খণ্ড : (১) ধোপার পাট, (২) মইষাল বন্ধু (১, ২, ৩), (৩) কাঞ্চন মালা, (৪) শান্তি, (৫) নীলা, (৬) ভেলুয়া, (৭) কমলা রানীর গান, (৮) মানিকতারা বা ডাকাইতের পালা, (৯) মদন কুমার ও মধুমালা, (১০) সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া, (১১) নেজাম ডাকাতের পালা, (১২ (দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদালি, (১৩) সুরৎজামাল ও অধুয়া সুন্দরী, (১৪) ফিরোজ খাঁ দেওয়ান।[১৫]

তৃতীয় খণ্ড : (১) মঞ্জুর মা, (২) কাফেন চোরা, (৩) ভেলুয়া, (৪) হাতী খেদার গান, (৫) আয়না বিবি, (৬) কমল সদাগর, (৭) শ্যামরায়, (৮) চৌধুরীর লড়াই, (৯) গোপিনী কীর্তন, (১০) সুজা তনয়ার বিলাপ, (১১) বারতীর্থের গান। (তৃতীয় খণ্ড-২য় সংখ্যা)।

চতুর্থ খণ্ড-২য় সংখ্যা : (১) নছর মালুম, (২) শীলা দেবী, (৩) রাজার ঘুর পালা, (৪) নূরন্নেছা, (৫) মুকুট রায়, (৬) ভারাইয়া রাজার কাহিনী, (৭) আন্ধা বধূ, (৮) বগুলার বারমাসী, (৯) চন্দ্রাবতীর রামায়ন, (১০) মধুমালা, (১১) বীর নারায়নের পালা, (১২) রতন ঠাকুরের পালা, (১৩) পীর বাতাসী, (১৪) রাজা বসন্ত, (১৫) মলুয়ার বারমাসী, (১৬) জীরালনী, (১৭) পরীবানুর হাঁহলা, (১৮) সোনা রায়ের জন্ম, (১৯) সোনা বিবির পালা।

এসব পালার মিশ্রিত জনসমাজ ও জনজীবনের ছবি ভাষারূপ পেয়েছে যাযাবর শ্রেণীর ভ্রাম্যমাণ জীবন থেকে শুরু করে কৃষিভিত্তিক স্থায়ী জীবনের বিস্তৃত পরিধি পর্যন্ত। এদের কেউ সাপুড়ে, কেউ শিকারী, কেউ মৎস্যজীবী, কেউ মাঝিমাল্লা, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ কৃষিজীবী। লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত পালাগুলো লোকমুখে রচিত ও প্রচলিত।

বস্তুত বর্তমানে পালাগানের যে পরিণত রূপ আমরা দেখতে পাই, তা একদিনের সৃষ্ট নয়। বরং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় স্নাত হয়েই কাহিনী পরিণত রূপে নির্মিত হয়েছে। জীবিকা-সংগ্রহ রীতির ভিত্তিতে মানুষের সমাজকে যে চারটি পর্যায় (১. আহরণ ও শিকার যুগ, ২. পশু পালন যুগ, ৩. কৃষিযুগ ও ৪. শিল্প যুগ) রয়েছে, তার প্রথম তিনটি স্তরেই শ্রমজীবী মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। এদিক থেকেও পালাগুলোর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে দ্বিধাহীন হওয়া সম্ভব। আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ যাযাবর মানুষ,

বেদে, শিকারী, জেলে, ওঝা, সাধু সন্ন্যাসী এরা যেমন ধীরে ধীরে এসে মিশে গেছে কৃষিজীবী মানুষের সঙ্গে, তেমনি মাতৃতান্ত্রিক সমাজ জীবনের ঐতিহ্য সংস্কার ও বিশ্বাসের সূত্র ধরে তুক্-তাক্ যাদু-টোনা-মন্ত্র-ব্রত এগুলোও প্রভাব বিস্তার করেছে কৃষিজীবী মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। যার ছাপ গীতিকার বিভিন্ন পালাগুলিতে সুস্পষ্ট।

সমগ্র মধ্যযুগে একদিকে যখন মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য, রোম্যান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যান প্রভৃতির চর্চা চলছে, অন্যদিকে তখন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাঝে চলেছে নিজেদের জীবনভিত্তিক 'গাথা' রচনার প্রচলন। একই সমান্তরালে সাহিত্যের দুটি ধারা ক্রমশ বিকাশলাভ করেছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, সাহিত্যবোধ নিয়ে যারা সাহিত্য রচনা করেছেন বা যাদের জন্য সাহিত্য রচিত হয়েছে, তাঁদের কাছে দেব-দেবী ও ধর্মকথাকে বাদ দিয়ে মানুষ তখনও বড় হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু অপর ধারাটিতে মানুষই সব কিছুর উর্ধ্বে। কোন দেবীর স্বপ্নাদেশে নয়, কোন সামন্ত প্রভু বা শাসকের আদেশ বা পুরষ্কারের লোভে নয়, বিশেষ কোন ধর্মবোধের দ্বারা তাড়িত হয়েও নয়-বরং গীতিকার কবিরা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে নিজেদের আনন্দ-বেদনার কাহিনী নিজেদের ভাষায় নিজেদের জন্য রচনা করেছেন। এগুলো মানুষের জন্য মানুষের, নিজেদের জীবন কাহিনী-সমৃদ্ধ, নিজেদের তৈরী সাহিত্যকীর্তি। শুধু তাই নয়, মনুষের প্রাত্যহিক জীবনের বৈষয়িক সমস্যা সংকটের চিত্র এখানে থাকলেও বেশি প্রাধান্য পেয়েছে তাঁদের হৃদয়ের কথা, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবেগের কথা। যার প্রকাশে সজীব স্পন্দনে গীতিকাগুলো মুখরিত, শত নির্যাতনে নিষ্পেষণেও যার গতি রোধ করা যায় না। গীতিকার পালাগুলোর আবেদন তাই সর্বজনীন।

এ সমস্ত পালায় মানুষের যে জীবন ও সমাজ প্রতিফলিত হয়েছে তা বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ হতে অনেকটা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। এখানে জীবন অনেকটা ধর্মবন্ধন মুক্ত এবং স্বাধীন আবেগের দুর্দম-শক্তি চালিত। বস্তুত মানুষের ব্যক্তি সত্তার, স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা, তাঁর হৃদয়ের অনুভূতির কথা বলা হয়েছে গীতিকার বিভিন্ন পালায়। ব্যক্তি হৃদয়ের সংকট এখানে সমাজকে, গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে। ধর্ম ও সমাজের অনুশাসনের বন্ধনে মানুষের হৃদয় ও আবেগ বন্দী নয়। পালাগুলোর প্রায় প্রধান নারী-পুরুষ চরিত্রে তাঁদের হৃদয়াবেগকেই গুরুত্ব দিয়েছে, বিশেষ নারী চরিত্রগুলো মধ্যযুগের সাহিত্যের অন্যান্য ধারায় যখন মানুষ সবেমাত্র দেব-দেবীর আশ্রয়ে সাহিত্যে ঠাঁই পেয়েছে, সেখানে নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের, তাঁর হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ ও তাঁর স্বীকৃতির তখন প্রশ্নই আসে না। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন পালায় মানুষ বিশেষ করে নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ঘোষণা, তাঁর হৃদয়ে অকপট প্রকাশ, তাঁর শক্তিমত্তা, বুদ্ধিমত্তা, প্রেমে একনিষ্ঠা ও ত্যাগে পরাকাষ্ঠার যে পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। এখানে প্রায় সমস্ত পালাগানই নারীর প্রেমকাহিনী বিষয়ক। নারীর বিবাহ-পূর্ব প্রণয়, পরিণয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, পণিত বয়সে বিয়ে, সর্বোপরি প্রেমের নিঃসংকোচ প্রকাশ থাকায় ধারণা করা হয়-'আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তির উপর এই গীতিকাগুলোর সমাজ জীবন পরিকল্পিত হয়েছিল।'[১৬] তাই এসব

পালায় আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায় এবং এর কোন কোন কাহিনীতে সে সমাজের সংস্কার ও বৈশিষ্ট্য বর্তমান-একথা স্বীকার করে নিয়েও বলা চলে যে, এগুলো সেই সময়ের বা সেই সমাজেরই কাহিনী নয় বরং চিরন্তন গ্রাম বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ও তাঁদের সুখ-দুঃখের কাহিনী। এখানে বাল্য-বিবাহ, গৌরীদান প্রথা-এ বিষয়গুলো তেমন প্রত্যক্ষ করা যায় না, একথা ঠিক। বিপরীতে, বরং নারীর মুক্ত জীবনাকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীন প্রণয়বাসনার প্রকাশ লক্ষণীয়। তই বলে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা তখনও প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সমাজের উচ্চাস্বনে ছিল নারীর স্থান। বরং দেখা যায় পুরুষ শাসিত সমাজে নারীরা পুরুষের দ্বারা বিভিন্নভাবে হয়েছে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও নিগৃহীত। নিজেদের ইচ্ছা ও ক্ষমতানুযায়ী নারীকে পণ্যের মতো বিক্রি করা থেকে শুরু করে, বিনা অপরাধে তালাক দেয়া, দাসীর মতো ব্যবহার করা, মিথ্যে অপবাদে অভিযুক্ত করা, অপহরণ করা, একাধিক বিয়ে করা, নারীর প্রেমের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা ইত্যাদি সর্বপ্রকার অবিচার পুরুষেরা করেছে। এমনকি বিবাহোত্তর, জীবনেও পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি, নারীর জীবনকে করেছে দুর্বিষহ, করুণ ও মর্মান্তিক। তা সত্ত্বেও পালার নারী চরিত্রগুলো বিশেষত্ব লাভ করেছে তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্যে, নারী ধর্মের দৃঢ়তায়, প্রেমের একনিষ্ঠায়। প্রাত্যহিক জীবনাচরণে, তাঁদের ব্যক্তিত্বময়তায়, প্রেমে-নিষ্ঠায়, ত্যাগ-তিতিক্ষায় এরা সত্যিই উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।

'নাট্যাভিনয়ে নারী কুশীলব এবং বাংলার দেশজ নাট্যের প্রাসঙ্গিক ইতিহাস' প্রবন্ধে ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ বলেন, ''মধ্যযুগের ব্রাহ্মণ্য ও সাহিত্য ব্যতিরেকে অধিকাংশ সাহিত্যকর্মে, যেমন-মঙ্গলকাব্য ও ময়মনসিংহ গীতকায়, স্পষ্টভাবে বলিষ্ঠ নারী চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সর্পদেবী মনসা ও শিবভক্ত চাঁদ সওদাগর এর বিবাদের পরিণতিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনসার উপাসনায় বাধ্য হয়। অপর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বেহুলা, যে তাঁর মৃত স্বামীর গলিত লাসসহ ভেলায় চড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে দ্বিধা করে না এবং দেবতার দরবারে নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে তাঁদের মনতুষ্টি অর্জন করে স্বামী ও দেবরদের জীবন ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। অপরাদিকে ময়মনসিংহ গীতিকায় ধর্মের উর্ধ্বে যে উদার মানবতাবাদের বাণী ব্যক্ত করা হয়েছে, তাঁর গভীরেও নারী বিস্ময়করভাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। বগুয়া এমনই এক নারী চরিত্র যে, তাঁর প্রেমের জন্য সাহস ও একাগ্রতার বলে সকল পুরুষ চরিত্রকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করে গেছে। অপরদিকে নাথ-গীতিকায় ডাকিনী (বৌদ্ধ সিদ্ধানারী) ময়নামতির সাক্ষাৎ মেলে, যে তাঁর সাধনাবলে অসীম জ্ঞান ও অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যু জয় করে এবং জনগণের চেতনায় দেবী রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। মনসা, চণ্ডী, শীতলা ইত্যাদি মাতৃদেবীর উল্লেখিত ধারা, একটি অনার্য মাতৃতান্ত্রিক সমাজের চিহ্ন বহন করে, যাকে গুপ্তযুগ হতে শুরু করে প্রায় হাজার বছরের আর্য-সভ্যতার প্রলেপ দ্বারা নিশ্চিহ্ন করা কঠিন হয়েছিল। তাই গীতিকা ও মঙ্গলকাব্যের উদাহরণ সমূহে নারীদের বিশেষ অবস্থান ও দেবীত্বে রূপায়ণ এবং এক সমাজ

বেদে যে পণিজাতির, তার উল্লেখ দেখা যায় যারা ছিল সমুদ্রচারী, নৌবিদ্যা বিশারদ, ব্যবসায়ী ইত্যাদির বর্ণনায়। সম্ভবত তারাই পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করে ব্যবসা বাণিজ্যে বিপুল খ্যাতির অধিকারী হয়ে বাংলার ঐতিহ্যকে বিশ্ব প্রসারী করে। তারও পরে গুপ্ত যুগে তাঁদের প্রদর্শিত পথেই বাংলার বণিকগণ দেশে দেশে বিস্তার করে চলে বাণিজ্যে-ব্যবসা।[২২]

ত্রয়োদশ শতকে ময়মনসিংহের কবি কানাহরি দত্তের যে মনসামঙ্গল পাওয়া যায় তাতেও এই সমূদ্র যাত্রার বহু বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে মনে রাখা দরকার যে, 'গুপ্ত ও পাল রাজত্ব বৈশ্য প্রাধান্যের যুগ, তখন বণিকরাই প্রধান ছিলেন।' এ কারণেই দেখা যায়, এ যুগের লোককাব্যের নায়ক রাজা মহারাজা নয়, বণিক চাঁদ সওদাগর, ধনপতি সওদাগর অথবা শ্রীমন্ত সওদাগর প্রভৃতি চরিত্র। উদাহরণ স্বরূপ গীতিকাতে চাঁদ সওদাগরের চৌদ্দডিঙ্গা মধুকরের বর্ণনা পাওয়া যায় তা উদ্ধৃত করা হল :

পরথমে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
সেই না-এ চলিল লক্ষের সওদাগর।।
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে বিজু সিজু।
গাঙ্গের দুইকূল ভাঙ্গিয়া বেকা করে উজু।।
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে গুয়ারেখী।
যার উপরে চড়িয়া রাবণের লঙ্গা দেখি।
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা ভাড়ার পাটুয়া।
যেই না-এ উঠাইয়া লইল তাম্বুলের নাটুয়া।।
তার পাছে বাওয়াইল নৌকা নামে শঙ্খচূড়।
সমুদ্রের দুইকূল পাতালে ঠেকে মুড়।।
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা অজয় শেলপাট।
যাহার উপর মিলিয়াছে শ্রীফলার হাট।।
তার পাছে বাওয়াইল নামে টিয়াঠুটি।
সেই না-এ ভরে সাধু পাট আর ভুটি।।[২৩]

এভাবে চাঁদ সওদাগরের চৌদ্দডিঙ্গার বর্ণনা পাওয়া যায়। চৌদ্দডিঙ্গার বর্ণনার মধ্যে শুধু বিভিন্ন প্রকার নৌকার বর্ণনাই নয়, সে যুগের নৌযাত্রার সঙ্গে যে সব সংস্কার ছিল, এই যেমন-শত শত পাঠাবলি ইত্যাদির বর্ণনাও এসব গীতিকাতে রয়েছে। কোন কোন নৌকা এত বড় ছিল যে, গাঙ্গের বাঁকা দুই কূল ভেঙ্গে ভেঙ্গে সোজা করে চলতো, কোন কোন নৌকায় দাঁড়ালে লঙ্কাপুরী পর্যন্ত দেখা যেত। আবার কোন কোন যাত্রায় তারা সস্ত্রীকও যেতেন, নৃত্যগীতের ব্যবস্থা থাকতো। পঞ্চদশ শতকে রচিত 'রাজা তিলক বসন্ত পালা'তে সওদাগরদের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু এ যুগের সওদাগরদের সেই পর্বত সমান মহান চরিত্র যেন অধোগামী বলে মনে হয়। পর-নরীতে মগ্ন হয়েছে এবং তার ফলও তারা ভোগ করেছে। বীর নারায়নের পালাতে

আমরা দেখি 'ভরা লইয়া সাধুর ডিঙারে আহা পবনের আগে ধায়...।' এখানেও সাধুদের নারীলোভের চিত্র পাই। প্রায় প্রতি পালাতেই অরণ্য সঙ্কুল বনে নায়ক-নায়িকা পালিয়ে গিয়ে দিন যাপন করে, বন্যপ্রানীর সাথে তাঁদের বন্ধুত্ব হয়। এছাড়াও প্রায় প্রতিটি পালাতেই দেখা যায় নায়িকারা প্রকৃতিপ্রেমী, বিপদকালে দেবদেবী নয়, ছন্দ্র-সূর্য-তারা, বৃক্ষ-লতা, নদ-নদী, পশু-পাখী, আকাশ-বাতাসকেই সাক্ষী মানে, যা মাতৃতান্ত্রিক সমাজেরই ধারা-যা প্রায় সকল গীতিকাতেই রয়েছে। তাঁদের কাছে সবার উপরে হল প্রেম। পবিত্র প্রেম। এই প্রেমের কাছেই তারা দায়বদ্ধ-যা, বিশ্ব গীতিকার সাথে আমাদের গীতিকাকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করে রেখেছে।

গীতিকার বিভিন্ন পালায় নারী চরিত্রের-পুরুষের প্রেমের এই অপূর্ব মহিমান্বিত রূপটি প্রকাশ পেয়েছে পল্লীকবির সহজ সরল অনবদ্য প্রকাশভঙ্গিতে। সেখানে পল্লীরমণীর জীবনের ব্যর্থ ও অভিশপ্ত প্রেমকাহিনী, তাঁদের করুণ জীবনের বর্ণনা কবিগণ দর্শক-শ্রেতার সামনে উপস্থাপন করতে গিয়ে নারীদের সামাজিক অবস্থান, প্রাত্যহিক জীবনাচরণ, তাঁদের নিঃসঙ্গতা ও অসহায়ত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। শুধু বাইরের অত্যাচারের কাহিনী নয়, হৃদয়ানুভূতির উপর নির্যাতনের করুণ কাহিনীও ঠাঁই পেয়েছে এসব পালায়। মানুষ হিসেবে নারীর হৃদয়বৃত্তিজাত আবেগকে উর্ধে স্থান দিয়েছেন পালাকারগণ। সমাজে কিংবা জীবনে না হলেও অন্তত পালাকারদের রচিত গানে নারী তাঁর মূল্য পেয়েছে। গীতিকার নারী চরিত্রগুলো তাই এই উজ্জ্বল ও প্রাণময়।

তবে নারী-জীবনের প্রেমকাহিনী মূখ্য বিষয় হলেও আপামর মানুষের বিচিত্র অনুভূতি ও অভিব্যক্তির প্রকাশে পালাগুলো সমৃদ্ধ। রাগ, ক্রোধ, হিংসা ঈর্ষা, ঠিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা মানুষের প্রবৃত্তিরই কুৎসিত অথচ বাস্তব দিক। মানুষের হৃদয়ের প্রেম-ভালোবাসা যেমন সত্য, এই নেতিবাচক দিকগুলোও তেমনি সত্য। কাজেই এগুলোকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। পালাকারগণ বহুমুখী ও বৈচিত্রপূর্ণ চরিত্রগুলোকে দর্শক-শ্রেতার জন্য তুলে আনতে পেরেছেন তাঁদের অসাধারণ পর্যবেক্ষণশক্তির দ্বারা। সমাজকে, সমাজের মানুষকে সামগ্রিকভাবে অবলোকন করতে সক্ষম হয়েছেন। তারা তাঁদের চারপাশের প্রাত্যহিক জীবন ও জগৎ থেকেই কাহিনী ভাব, ভাষা, চরিত্র ইত্যাদি সবকিছু সংগ্রহ করেছেন। ফলে কোনরূপ কৃত্রিমতা এখানে ঠাঁই পায় নি। অকৃত্রিমতাই পালাগুলোর প্রধান গুণ। কাহিনী নির্বাচনে, ঘটনা বিন্যাসে, চরিত্র-চিত্রণে প্রতিটি ক্ষেত্রে কবিগণ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনবোধের গভীরতার যে পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্যিই উল্লেখ করার মত।

মর্তমানেও বাংলা লোকনাট্য পালাগানের কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্ত্রীর ভূমিকায় পুরুষ কুশীলব অভিনয় করে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ বগুড়া অঞ্চলের পালাগানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব অভিনয় অনুষ্ঠানে (Performance) দুইজন পুরুষ কুশীলব অভিনয় ও নাচের পাশাপাশি গানও গেয়ে থাকেন। কুশীলবদের বয়স ১৪ বছরের কাছাকাছি, এরা শাড়ি ও লম্বা পরচুলা ব্যবহার করে থাকে অথবা ক্ষেত্র

বিশেষে বড় চুল রাখেন। সাধারণত গান ও বাজনার সাথে নেচে গেয়ে মুকাভিনয় ঢং এ চরিত্রাভিনয় করে থাকে।

জানা যায়, ময়মনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া' উপাখ্যানের উপর ভিত্তি করে পরিবেশিত বাইদ্যশনির গানে 'সং নাচ' অন্তর্ভুক্ত এবং নারী ভূমিকায় পুরুষ কুশীলব অংশগ্রহণ করে থাকে। প্রায় আশি বছর আগে পদ্মার পূর্বপারের বাংলায় বাইদ্যানির গান ছিল ব্যাপকভাবে সমাদৃত। সে সময় বিভিন্ন পেশার মানুষের মাঝে মহুয়া উপাদান ভিত্তি করে শখের অভিনয় পরিবেশনার যে রেওয়াজ প্রচলিত ছিল, নিম্নে উদ্ধৃত কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে লোকগীতি (ঘোষা গান) হতে সেটি অনুমান করা সম্ভব :

"মামু হইল উমারা বাইদ্যা, ভাইগনা বাইদ্যানি
ভাতিজা উঠিয়া বলে চাচা আমি লবজানি।।"[২৪]

গালাগানের প্রকৃতি এখানে জীবন্ত, চরিত্রসমূহের জীবন সংগ্রামের সহায়ক শক্তি। মানব অনুভূতির সঙ্গে পরস্পরিত করে উপস্থাপিত হয়ে প্রকৃতি চিত্রায়িত হয়েছে নরনারীর প্রিয়-বিরহকাতর বারমাসী দুঃখ বর্ণনারসূত্রে, প্রকৃতির নানারূপ ব্যবহার সম্পর্কে।

আমরা জানি সমাজের মানুষের উপভোগের জন্যই গ্রামীণ জীবনের কবি কর্তৃক এসব পালা রচিত। সমাজের মানুষের সমর্থন নিয়েই এ-পালাগুলো প্রচলিত হয়ে এসেছে। কাজেই কাহিনীর বাস্তবতা এবং এর গ্রহণযোগ্যতা ছিলএকটি বড় প্রশ্ন। এসব কাহিনীর মধ্যে সাধারণ মানুষ তাঁদের জীবনের মিল খুঁজে পেয়েছে। এটা ধারণা করা স্বাভাবিক। কাহিনীর পরিণতিতেও জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশারই ছাপ রয়েছে হয়তো। এভাবেই জনগণের কাছে কাহিনী গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। গায়েন যখন কাহিনী উপস্থাপন করেন তখন সেই কাহিনর চরিত্র কিংবা বিষয়বস্তুর সঙ্গে দর্শক যদি নিজেদের অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও বাস্তব অবস্থার ঐক্য খুঁজে পায় তাহলে সেই কাহিনীর সাথে দর্শকদের একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়। কাহিনীর চরিত্র-সমূহের যে জীবন-যন্ত্রণা ও সংকট, তার সাথে দর্শক ও কথকের বর্ণনার একাত্মতা ঘটলো কিনা তার উপরেও কাহিনীর গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে। গায়েনের বর্ণিত কাহিনী ও চরিত্রের সঙ্গে দর্শকের যোগসূত্র এবং একাত্মতা আলোচ্য পালাগুলোর ক্ষেত্রে অবশ্যই কার্যকর। পুরুষানুক্রমে এগুলো তাই প্রচলিত হয়ে এসেছে মুখ থেকে মুখে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, "পালাগানের অধিকাংশই পূর্ব মৈমনসিংহের কোন কোন যথার্থ ঘটনা অবলমবন করিয়া রচিত হইয়াছে। যে সকল অশ্রুসিক্ত হইয়া লোকেরা শুনিয়াছে, সে সকল অবাধ ও অপ্রতিহত যমের দুর্জয় চক্রের ন্যায় সরল নিরীহ প্রাণকে পিষিয়া চলিয়া গিয়াছে-সেই সকল অপরূপ করণ কথা গ্রাম্য কবিরা পয়ারে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন।"[২৫] গীতিকার এই পালাগুলি কখনই সামাজিক প্রেক্ষাপটের বাইরে জনবিচ্ছিন্ন কাহিনী হিসেবে গড়ে ওঠে নি। কৃষিনির্ভর সামন্তবাদী সমাজ জীবনের প্রায় সর্বস্তরের জনমানবের চিত্রই এখানে রয়েছে। বস্তুত গীতিকার বিভিন্ন পালার কাহিনী বিন্যাস এমন যে, সমাজ জীবনের সর্ব পর্যায়ের মানুষ এখানে উঠে এসেছে। কাহিনীর প্রয়োজনেই এরা এসেছে নিজ নিজ ভূমিকায়।

নারী ও পুরুষের সামাজিক, ধর্মীয় ও রক্তের বন্ধনসূত্রে গড়ে ওঠা সম্পর্কের আওতাভুক্ত সবাই এখানে এসেছে। অর্থাৎ একজন নারী বা পুরুষ তাঁর জীবনের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন পর্যায়ে যতগুলো ভূমিকা গ্রহণ করে তার সবগুলোই গীতিকার পালায় ঠাঁই পেয়েছে। শুধু তাই নয়, গীতিকার মানুষকে সামাজিক মর্যাদা বা অবস্থানের দিক থেকে শ্রেণীকরণ করা হলেও দেখা যাবে, তাদের শ্রেণীচরিত্র এক নয়, বহুবিধ এবং বিচিত্র। সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে প্রথমেই যে দুটো শ্রেণীচরিত্রের ছবি ভেসে ওঠে, তাহলো উচ্চ-শ্রেণী এবং নিম্ন-শ্রেণী। পেশাগত, বংশগত এবং ঐশ্বর্য্যগত দিক থেকে এ ভেদাভেদ গড়ে উঠেছে। সর্বস্তরের জীবন সংবলিত পালাগানের এসব কাহিনী বাংলা সাহিত্যের একটি স্থায়ী জাতীয় সম্পদ। পীর, ব্রাহ্মণ, শুদ্র, দেওয়ান, জমিদার, নফর, পণ্ডিত, রাখাল, ডাকাত, বেদে বেদেনী, কিষাণ-কিষাণী সবাই মৈমনসিংহ গীতিকার নায়ক-নায়িকা, পাত্র-পাত্রী।'[২৬] এই বিচিত্র শ্রেণীর জনজীবনকে ঘিরেই পালাগুলোর কাহিনীর বিন্যাস ঘটেছে। হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, শিকারী-জেলে, দাস-দাসী সর্বস্তরের মানুষের পরিচয় রয়েছে এ সমস্ত পালায়।

এ সমস্ত চরিত্র ছাড়াও আরও কিছু চরিত্র কাহিনীর প্রয়োজনে চারপাশে এসছে। দেওয়ান স্ত্রী, উজির-নাজির, বেপারি, রাখাল শ্রেণী, বিচিত্র মাধব, মুরারি চণ্ডাল, মাঝি-মাল্লা, দাসী-বাঁদী এরাও সমাজ অন্তর্গত জনজীবনের একাংশ। বস্তুত বিভিন্ন পালায় চিত্রিত জনজীবনের যে পরিচয় বিধৃত তা গ্রামীণ সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরের মানুষের। আর তাঁদের চরিত্রায়ণে সমকালীন সমাজ জীবন ও নমানসেরই বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে। পালাকারদের অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে এ সমস্ত চরিত্র চিত্রণে।

লক্ষণীয় যে, পুরুষ চরিত্রের তুলনায় নারী চরিত্রের প্রতি কবির আকর্ষণ ও সহানুভূতি বেশি। প্রায় প্রতিটি পালা-ই নায়িকা প্রধান এবং তাঁদের চরিত্রই বেশি প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল। সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'এই পালাগানের নায়িকাগুলির চরিত্র পাঠ করে মনে হচ্ছে যেন আজন্তা গুহার চিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে আমার চক্ষের সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। ইহাদের লীলায়িত ভঙ্গি ও লাস্যের মনোহরিত্ব আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।'[২৭] প্রণয়ে একনিষ্ঠ, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা ছাড়াও শত অত্যাচার ও প্রতিকূল অবস্থাতেও অবিচল থাকার দৃঢ়তা, সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও আত্মত্যাগে গীতিকার নারী চরিত্রে যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে, জীবনতৃষ্ণার যে ব্যাকুল উদ্দীপনাময় প্রচেষ্টা রয়েছে তা অধিকাংশ পুরুষ চরিত্রেই নেই। নারীর শক্তি তাঁর প্রেমে, তাঁর নারীধর্মের গৌরবে। সে তুলনায় পুরুষ চরিত্র অনেক নিষ্প্রভ। নারীর দুঃখ বেদনা ও ত্যাগের সঙ্গেই কবি অন্তরঙ্গ হয়েছেন বেশি। তবে পুরুষ চরিত্র চিত্রণেও কবি অমনোযোগ বা প্রতিকূল মনোভাব প্রকাশ করেন নি। নারীর দুঃখ বেদনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়েছেন, সত্যি, কিন্তু তাই বলে কোন পক্ষপাত অবলম্বন করেন নি।

সমাজের উঁচু শ্রেণীর বা অভিজাত শ্রেণীর চরিত্র চিত্রণে কবিদের তিক্ততাপূর্ণ অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে প্রায় ক্ষেত্রেই। অভিজাত শ্রেণীর মানুষ এখানে খেয়ালী,

অত্যাচারী, অহংকারী নারীলিপ্সু রূপেই চিত্রিত এবং পুরুষ শাসিত সমাজে স্বভাবতই পুরুষ আর তাঁদের খেয়ালীপনা, অত্যাচার ও লালসার শিকার নারী। নারী তাঁদের সে লালসাতুর ইচ্ছাকে চরিতার্থ করে না বলেই পদে পদে বিপদ, ষড়যন্ত্র, নির্যাতন ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে। যদিও এখানে প্রায় প্রতিটি নারীই পরিণত বয়সের। তারা স্বাধীন ও মুক্ত জীবনাকাঙ্ক্ষায় বিশ্বাসী, প্রণয় বাসনা ও পরিণয়ে স্বাধীন মাতমত প্রকাশ করছে-কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, নারীর চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল। বরং হাজারো বাধা বিপত্তি, রক্তচক্ষুর শাসনেও নিষ্ঠুরতায়, নির্যাতনে নিপীড়নে নারীর জীবন হয়ে উঠেছে কণ্ঠকাকীর্ণ, বেদনাময়। নারীর জীবনের সেই বেদনার করুণ কাহিনীই ঠাঁই পেয়েছে পালাগুলোতে। কিন্তু অভিজাত শ্রেণীর চরিত্র চিত্রণ ও জীবনাচারণের বর্ণনা অনেকটা কষ্ট কল্পিত। তাঁদের জীবনে বহিরাবরণই কবির কাছে প্রত্যক্ষ। ফলে চোখে দেখা কোন ভূস্বামীর চরিত্র ও জীবনযাত্রার চিত্রই জমিদার-দেওয়ান-সওদাগর সবার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন হয়তো। আসলে অভিজাত শ্রেণীর সাথে রচয়িতাদের ছিল সীমাহীন পার্থক্য, তাই অভিজাততন্ত্রের জীবনধারা তাঁদের কাছে ততোটা সুস্পষ্ট ছিল না।[২৮] বরং সাধারণ চরিত্রগুলো এবং তাঁদের জীবনাচরণ অনেক বেশি প্রত্যক্ষ এবং অধিকতর সহজবোধ্য ছিল। এজন্য সাধারণ মানুষের জীবন ও চরিত্রায়ণে ও জীবনধারা বর্ণনায় এ স্বাচ্ছন্দ্য ধরা পড়ে না। অবশ্য প্রতিটি চরিত্রই স্ব-স্ব শ্রেণীর প্রতিনিধি স্বরূপ। জমিদার, দেওয়ান, কাজী, ব্রাহ্মণ, কৃষক, সওদাগর, সাধু-সন্ন্যাসী, মাঝি-মাল্লা, বেদে, জল্লাদ এরা সবাই স্ব-স্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও জীবনাচরণে তাঁদের সামাজিক অস্থানগত দিক থেকে স্বতন্ত্র। বিশেষ করে নারী চরিত্রগুলো পুরো সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। মা-স্ত্রী-প্রণয়িনী থেকে শুরু করে ভাবী, বোন, সতীন, সৎ-মা সব ধরনের চরিত্রই রয়েছে ভিন্ন অবস্থা ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে। এরা তাই কোন কোন ক্ষেত্রে অভিন্ন হলেও প্রত্যেহে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে চিত্রিত।

আমাদের সমাজ ও পরিবেশ জীবনের প্রায় প্রতিটি উপাদান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিভিন্ন পালাগানের বিষয় হিসেবে। সমাজের প্রচলিত রীতি, বিশ্বাস-সংস্কারের বিপরীতে দাঁড়া করানো হয়েছে ব্যক্তি মানুষকে। বিশেষ করে দেবী যেখানে সামন্ত শ্রেণীর প্রতিভূ, মানুষের পক্ষে নারী সেখানে মুক্তি, শান্তি ও মানবতার প্রতীক। সমাজ শৃঙ্খলে আবদ্ধ যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে উচ্চাসনে স্থান দেয়া হয়েছে মনুষ্য-প্রেম, মূল্যবোধ ও মানবিকতাকে। যারফলে পালার আবেদন হয়েছে সর্বজনীন।

পালাগানের ছন্দ

সার্বিক আকারে প্রযোজনার ছন্দ ধরতে বা বাধতে লোকনাট্যে গান একটি বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। এই গানের কথাগুলির বেশির ভাগই পদ-এ তৈরী করা হত। পদ তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়, শুনতেও ভালো লাগে। সাধারণত তিন রকম ছন্দের পদ প্রচলিত।[২৯] তার মধ্যে পয়ার নামের ছন্দের ব্যবহারই বেশি দেখা যায়।

পালাগানে বিভিন্ন রীতি পরিবেশনার আলোচনাকালে অভিনয় উপাদান-অংশে ছন্দ সম্পর্কে আমরা পূর্বেই কিছুটা ধারনা লাভ করেছি। যেমন-সংলাপাত্মক গীত, বর্ণনাত্মক গীত ইত্যাদি। আবার বিভিন্ন প্রকারের বর্ণনাত্মক গীত যেমন একপদী চরণের বর্ণনাত্মক গীত, পুনরাবৃত্তিমূলক বর্ণনাত্মক গীত, পালা অনুসার বা একান্তরমূলক বর্ণনাত্মক গীত, কোরাস বা সম্মিলিত বর্ণনাতমক গীত। এছাড়াও রাধারক্ষ্মীর দলে 'রয়ানী গানে'র পরিবেশনায় পূর্বেই আমরা গীতের পদ বিন্যাসে তিন ধরনের ছন্দ ব্যবহার সম্পর্কে অবগত হয়েছি। যেমন—(ক) প্রতিটি চরণ শেষে সংক্ষিপ্ত ধুয়া পরিবেশনা হল একপদী ছন্দ, (খ) দুই চরণে পরিবেশিত পদ হল দ্বি-পদী আর (গ) তিনটি চরণ সমন্বয়ে গঠিত পদ হল ত্রিপদী ছন্দ। এছাড়াও পালাগানের ছন্দ বিচারে আরও কিছু নাম শব্দ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন-পালাগানে ছন্দ আলোচনায় আমরা প্রায়ই 'পয়ার' এর ব্যবহার পেয়ে থাকি। এখানে পয়ার এর বৈশিষ্ট্য হল : পয়ার এ দুই পদের অন্তেমিল থাকে এবং দুটি সম্পূর্ণ চরণে বাক্য পূর্ণতা পায়। পয়ার এর ছন্দগত বৈশিষ্ট্য ৮+৬=১৪ মাত্রা। যেমন—

কলির ব্রাহ্মণ আর। বলির ছাগল।
ভালোমন্দ জ্ঞান নাই। প্রশ্রয় পাগল।।[৩০]

এছাড়াও পয়ারের মাত্রাগত বিভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হয়। যেমন—লঘু ত্রিপদী ছন্দ : ৬+৬+৮=২০ মাত্রা। দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ : ৮+৮+১০=২২ মাত্রা অথবা ৮+৮+১২=২৮ মাত্রা প্রভৃতি। যেমন—

<u>লঘু ত্রিপদী :</u>

চিনিতে না পারি না করো চাতুরী
বেহুলা বট গো তুমি।
দেহ পরিচয় জুড়াক হৃদয়
তোমার শাশুড়ী আমি।।[৩১]

<u>দীর্ঘ ত্রিপদী :</u>

কহেন বেহুলা সতী করো বীর অবগতি
মোর সম নাই অভাগিনী
সায় সদাগর পিতা অমলা অমার মাতা
মোর নাম বেহুলা নাচনী।।[৩২]

লক্ষণীয় হল, ত্রিপদী ছন্দের প্রতি পংক্তিতে তিনটি করে পদ রয়েছে; লঘু ত্রিপদীর তিন পদের মাত্রাসংখ্যা ছয়, ছয় ও আট এবং দীর্ঘ ত্রিপদীর তিন পদের মাত্রাসংখ্যা আট, আট ও দশ অথবা আট, আট ও বারো। এইরকম বিভিন্নমাত্রা বৈচিত্র্যের পয়ার পালাগানে লক্ষ্য করা যায়।

আর মিত্রাক্ষরে প্রত্যেক পংক্তির শেষে একটি করে পূর্ণ যতি থাকে। এক-এক পংক্তিতেই এক-একটি ভাব প্রায় শেষ হয়ে যায়। পাশাপাশি মিত্রাক্ষর/অমিত্রাক্ষর

শব্দগুলিও এ প্রসঙ্গে আলোচনা যোগ্য। মিত্রাক্ষর ছন্দে প্রত্যেক পংক্তির শেষে একটি করে পূর্ণ যতি থাকে। সুতরাং এক-এক পংক্তিতে এক-একটি ভাব প্রায় সমাপ্ত হয়ে যায়। যেমন—

মনের দুঃক্ষু মিটিয়াছে আশা
দেখিলাম বন্ধুর মুখ মনের ছিল আশা।
সুখেতে থাকো গো বন্ধু সুন্দর নারী লৈয়া,
সুখে করো গিরবাস জনম ভরিয়া।
না লইয়ো না লইয়ো বন্ধু কাঞ্চনমারার নাম,
তোমার চরণে আমার শতেক পরমান।
এই না ঘাটেতে আছে পাতার বিছানা
সুখেতে রজনী দোয়ে করেছি বঞ্চনা।
মনে না রাখিয়ো রে বন্ধু সেই দিনের কথা
আর না রাখিয়ো মনে সেই মালা গাঁথা।
রাতের নিশি আনিগুনি তোমার বাঁশির গানে
অভাগিনীর কথা বন্ধুরে না রাখিয়ো মনে।[৩৩]

অথবা,

সুরনদী ধারা বহে হিমাচল পুরে।
সেই তটে তপ করে মঙ্গল অসুরে।
ষট্ ঋতু সমান পবন মন্দগতি।
নিশি দিন তপ করে নাই অন্যমতি।[৩৪]

কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দে পংক্তির অন্তে বা মধ্যে যে কোনো স্থানে পূর্ণ যতি স্থাপিত হতে পারে। এর এক-একটি ভাব এক-একটি পংক্তিতে সমাপ্ত না হয়ে একাধিক পংক্তিতে প্রবাহিত হয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দকে পংক্তি লঙ্ঘক বা প্রবহমান পয়ার নামে অভিহিত করা যায়। যেমন—

কহিলা সৌমিত্রি পূর শিরঃ নোয়াইয়া
ভ্রাতৃপদে, কেন আর ডরিব রাক্ষসে।
রঘুপতি, সুরনাথ সহায় যাহার
কী ভয় তাহার প্রভু এ ভবমণ্ডলে।[৩৫]

পালাগান পরিবেশনে মূল গায়েন তাঁদের ধরাবাধা কয়েকটি সুরেই পরিবেশন করে থাকেন। তাঁদের পরিবেশিত জনপ্রিয় কয়েকটি সুর হল : 'বিনোদ সুর', 'বাদ্যানীর সুর', 'ভাইট্যাল সুর', 'পাইন্যা সুর', 'মেঘা সুর', 'ভেল্যুয়া সুর', 'উড়াইন্যা সুর', 'মইষাল সুর', 'চমক সুর', 'কীর্তন সুর', 'ভাষাণ সুর', 'বিলাপ সুর' ইত্যাদি। এর প্রতিটি আবার বিভিন্ন তাল ও লয় রয়েছে। যেমন—'পয়ার তাল', 'তিতাল' (তিতাল,) 'চৌতাল' বা 'চবুতারা', 'খ্যামটা তাল', 'লয় তাল', 'ঢিলা তাল' ইত্যাদি।[৩৬]

পালাগানে কাহিনীর গঠন-কাঠামো (ইতিবৃত্ত)

পালাগানের কাহিনীর ইতিবৃত্ত আলোচনায় প্রথম পর্যায়ের প্রাণিধান যোগ্য বিষয় হল তার মধ্যে বর্ণিতব্য চরিত্রগুলি। চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য অনেকটা সরল রৈখিক। অর্থাৎ যে রাজা করবে সে রাজার মতোই আচরণ করবে। এমনিভাবে জমিদার, পীর, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, দেওয়ান, জমিদার, নফর, পণ্ডিত, রাখাল, ডাকাত, বেদে-বেদেনী, কিষাণ-কিষাণী ইত্যাদি চরিত্রের সমাবেশে পালাগুলোর কাহিনী বিন্যাস ঘটেছে। হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, শিকারী-জেলে, দাস-দাসী সর্বস্তরের মানুষের পরিচয় রয়েছে এ সমস্ত পালায়। প্রকৃতি ও পরিবেশের নানারকম উপাদান যেমন—পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, নদী-নালাল, গাছ-পালা, পশু-পাখী প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায় পালাগানের বর্ণনায়। এদের মধ্যে আবার কিছু কিছু উপাদান যেমন—পাখী, বন্যজন্তুর সাথে আখ্যায়িকার মধ্যকার বিপদগ্রস্থ কেন্দ্রিয় চরিত্রদের সাহায্যে এগিয়ে আসে, তারা সাধারণ মানুষের অনুভূতি সম্পন্ন সম্পূর্ণ মানবিক চরিত্রের আচরণ করে থাকে (যেমন—নেত্রকোনা অঞ্চলে 'কমলারানীর সাগরদীঘি' পালাগানে-'পাহাড়িয়া কউয়া-ময়না পাখী', বগুড়া অঞ্চলের 'নাছিমনের বনবাস' পালাগানে 'বিরামকল পাখী')। এসব সরল রৈখিক বৈশিষ্ট্যের চরিত্র সমন্বয়ে পালাগানের কাহিনী বা আখ্যায়িকাগুলি রচিত হয়ে থাকে। এখানে যে ব্যাপারটি উল্লেখ তাহল, বয়াতীরা প্রায়ই তাঁদের অভিনীত পালার কাহিনীগুলিকে ইচ্ছেমত রূপান্তর সাধন করে থাকেন। বয়াতীরা যে কোন উৎস থেকে কাহিনী সংগ্রহ করে অভিনয়ের সময় মুখে মুখে অক্ষরবৃত্ত/মাত্রা ছন্দের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে কাহিনীর সংযোজন বা বিয়োজন করেন। হয়তো দেখা গেল তিন দিনের একটি পালা দুই ঘন্টার মধ্যেই গেয়ে শেষ করে দেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কাহিনীর যে বর্ণনা করে থাকেন তাহল পরিবেশিত পালার সংক্ষিপ্ত রূপ। আর ঐ একই পালা যখন দীর্ঘ সময় নিয়ে পরিবেশন করেন তখন পালার অভিনয়ে প্রতিটি ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনাসহ অভিনয় পরিলক্ষিত হয়। পালাগানের বেশির ভাগ কাহিনীই মিলনাত্মক। অর্থাৎ কিনা পালাগানের পরিবেশনায় কাহিনীর যে অবস্থা থেকে শুরু হয়, বিভিন্ন ঘটনা-পরম্পরার উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে শেষে কাহিনীর সেই শুরুর প্রথমাবস্থার মধ্য দিয়েই ঘটনার শেষ হয়ে থাকে। এটা হল কাহিনীর মিলনাত্মক দিক। যেমন 'কমলারানীর সাগরদীঘি' পালার কথাই ধরা যেতে পারে। এর কাহিনীর শুরুতে ঘটনার কোন টানা-পাড়েন বা সমস্যা থাকে না। সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করছে এটা হল কাহিনীর প্রথমাবস্থা। কাহিনীর মধ্যে রয়েছে এক একটি ছোট ছোট ঘটনা। এসব ঘটনা কাহিনীর সামগ্রিক গতিকে কখনও কখনও আপতঃভাবে বাধাগ্রস্ত করে আবার কখনও এগিয়ে দিয়ে কাহিনীর সামগ্রিক গতিকে গতিশীল করে সমগ্র পরিবেশনাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অপরদিকে পালাগানে কিছু কিছু কাহিনী লক্ষ করা যায় যেগুলি বিয়োগান্তক। না কখনওই কেন্দ্রিয় চরিত্রদের মিলনকে সূচিত করে না। যেমন—ময়মনসিংহ গীতিকার 'মলুয়া পালা'। পাশ্চাত্য নাটকের কাহিনীতে সাধারণত দ্বন্দ্ব ভিত্তিক ঘটনা লক্ষ করা

যায় যা দর্শকের মধ্যে টান টান উত্তেজনা তৈরী করে। মূল কাহিনীর সমান্তরাল কোন ঘটনার পরিবর্তে সমগ্র নাট্যকাহিনীর মধ্যে অনেকগুলি সমান্তরাল চরিত্রের সমাবেশ ঘটে থাকে। এর সমগ্র কাহিনীর গঠন অনেকটা ত্রিমাত্রিক আয়তনের। মাটি থেকে কোন বৃক্ষে চড়ে আবার নেমে আসার মতন। মাটি থেকে বৃক্ষে চড়ে সর্বোচ্চ পর্যায় যাওয়ার আগ পর্যন্ত অবস্থা হল কাহিনীর প্রস্তুতিপর্ব। বৃক্ষের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবস্থান হল কাহিনীর চূড়ান্ত অবস্থা বা Climax। এ সময় দর্শকগণ টান টান উত্তেজনার মধ্যে থাকে। এর পরবর্তী অবস্থা হল কাহিনীর পরিণতির দিকে অর্থাৎ Fall Down। প্রদত্ত লেখচিত্রের সাহায্যে তা দেখান যেতে পারে।

কিন্তু পালাগানের কাহিনীর মধ্যে কোন চূড়ান্ত অবস্থা থাকে না। যার ফলে দর্শকের মধ্যে কোন টান টান উত্তেজনা বিরাজ করে না। প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে এর দর্শক পরিবেশনার দ্বারা কি আস্বাদন করে থাকে? এর উত্তর হল রস। পাশ্চাত্যে দ্বন্দ্ব ভিত্তিক ঘটনার জটাজালের বিপরীতে পালাগানে কাহিনীর ঘটনাগুলি আবর্তিত হয় উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে। যেমন—এখন যে রাজা পরোক্ষণেই সে ফকিরে পরিণত হল, আবার এখন যে ফকির (ভিখারী অর্থে) মুহূর্তের মধ্যেই সে রাজা হয়ে গেল। ঘটনার এরূপ আবর্তন অনেকটা নদীর ঢেউ বা তরঙ্গের মতোই উঁচু-নীচু রেখায় গতিশীল।

উপরের ছকে লক্ষণীয় বিষয় হল, ধর্ম নিরপেক্ষ বিষয়বস্তুকে নিয়ে প্রচলিত (চর্চিত) কোন লোকনাট্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রীতিতে অভিনীত হচ্ছে। এখানে শুধুমাত্র অভিনেয় উপাদানগুলিরই পরিবর্তন ঘটছে। এছাড়াও কাহিনী, ধর্ম বা পারিপার্শ্বিকতা প্রভৃতি কারণে অভিনয় উপস্থাপনেরও পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন-খুলনা পাইকগাছার ভাসানগানে সমস্ত পুরুষ চরিত্র মহিলারাই করে থাকে। এখানে পুরুষ কোন অভিনেতা নেই। আবার পূর্ব ময়মনসিং এর পালায় কোন মহিলা অভিনেত্রী থাকে না।

প্লট বা ইতিবৃত্ত বিচার

নাট্যকাহিনীর প্লট বা ইতিবৃত্ত বিচার আলোচনায় নাটোর অঞ্চলের 'কমলারানীর সাগরদীঘি'র ইতিবৃত্ত সম্পর্কিত আলোচনা নীচে তুলে ধরা হল :

লোকনাট্যে কাহিনীর প্লট বা ইতিবৃত্ত বিচার আলোচনায় কাহিনীর অবস্থা বিচার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সে কারণে আলোচনার সুবিধার্থে শুরুতে নাট্যকাহিনীর অবস্থা বিচার সম্পর্কে আলোচনা করা হল। লোকনাট্যের ক্রিয়া অনুসারে অবস্থার বিচার করা হয়। এখানে 'ক্রিয়া' বলতে আমরা নাট্যকাহিনীর ঘটনাকে বুঝে থাকি। একটি ক্রিয়াকে পাঁচ ভাগে ভাগ করলে এর যে রূপ দাঁড়ায় প্রদত্ত ছকে তা দেখানো যেতে পারে—

আরম্ভ প্রযত্ন প্রাপ্তিসম্ভব নিয়তফলপ্রাপ্তি ফলাগম

নাট্যকাহিনীর এ অবস্থাগুলির সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

১. আরম্ভ : এটি নাটকের প্রথমাবস্থার নাম। এই আরম্ভ হচ্ছে একটি নাটকের ক্রিয়ার শুরু এবং আকাঙ্ক্ষীর জন্ম।

২. প্রযত্ন : নাটকের যে অংশ জুড়ে সিদ্ধি লাভের জন্য আকাংখাকে লালন পালন করা হয় সেই অংশটি হল প্রযত্ন অবস্থা অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষীর চেষ্টা।

৩. প্রাপ্তিসম্ভব : নাটকের সিদ্ধি লাভ বা ফলাগমের জন্য আকাংখাকে লালন পালন করার ফলে ফলাগম লাভের যে সম্ভাবনা দেখা দেয় সেই অংশটি হল প্রাপ্তিসম্ভব।

৪. নিয়তফলপ্রাপ্তি : নিয়তফলপ্রাপ্তি নিয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত লক্ষ্য করা যায়। যেমন : মনমোহন ঘোষ এর মতে, নিয়তফলপ্রাপ্তিতে ফলাগম নিশ্চিত হয়ে যায়। অপরদিকে, Concept of Ancient Indian Theatre-এ Cristophare Byreski উল্লেখ করেছেন যে, নিয়ত =Suppression=দমিত হওয়া। সুতরাং নিয়ত ফলপ্রাপ্তি হল আকাঙ্ক্ষীর দমন হওয়া।

৫. ফলাগম : প্রাপ্তিসম্ভবে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার যে সম্ভাবনা দেখা দেয়, নিয়তফলপ্রাপ্তিতে সে সম্ভাবনা দূর হয়ে যায় এরূপ মেনে নিলে ফলাগমে আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা যথেষ্ট যুক্তি যুক্ত মনে হয়।

অনেকগুলো খণ্ড খণ্ড নাট্যক্রিয়ার একটি সম্মিলিত রূপ হল একটি নাট্যকাহিনী। এক্ষেত্রে আমরা, নাট্যক্রিয়া = নাট্যকাহিনীকে বুঝবো। নাট্যে ক্রিয়ার কাঠামো হল এই পাঁচটি স্তর। তবে সব নাট্যকাহিনীতেই যে এই পাঁচটি অবস্থা থাকবে এমন নয়। যে কোন ক্রিয়ার আরম্ভ থাকবে, ফলাগম অবশ্যই থাকবে তবে অন্যান্যগুলি ধারাবাহিকভাবে নাও থাকতে পারে। অর্থাৎ আরম্ভ থেকে শুরু হয়ে নিয়তফলপ্রাপ্তিতেও শেষ হতে পারে। আবার আরম্ভ থেকে শুরু হয়ে যদি নিয়ত ফলপ্রাপ্তি না থাকে তবে প্রযত্ন ও প্রাপ্তি সম্ভবের দ্বারা নাটক পূর্ণতা পায় না।

অবস্থা——আরম্ভ প্রযত্ন প্রাপ্ত্যাশা নিয়তফলপ্রাপ্তি ফলাগম

বীজ

বিন্দু

পতাকা

প্রকরী

ফলাগম

সন্ধি——মুখ প্রতিমুখ গর্ভ বিমর্ষ নির্বহন

এখানে অর্থপ্রকৃতি/প্রকরী হল লোকনাট্যের ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য। ক্রিয়ার প্রকৃতি হল নাট্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা। নাটকের বিভিন্ন অবস্থায় এই অর্থপ্রকৃতি বিভিন্নরূপে

নাট্যক্রিয়াকে প্রভাবিত করে সমস্ত নাট্যকাহিনীকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। নাট্যক্রিয়ার বিভিন্ন অবস্থায় অর্থপ্রকৃতিগুলির কার্য সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল :

১. এখানে বীজ হল মূল আকাংখা যাকে ভিত্তি করে কার্য সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। অর্থাৎ যেখান থেকে ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা পায় 'ফলে' গিয়ে।
২. বিন্দুর উদ্দেশ্যই হল ক্রিয়ার বাধাকে অপসারিত করা। বিন্দু হল পানির ফোঁটার মত। এই বিন্দু কখনও মূল কাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায় আবার মূল আকাংখার পূর্ণতার প্রয়োজনে কার্যকে থামিয়ে রাখে।
৩. প্রকরী হল নাটকের মধ্যকার ছোট ছোট ঘটনা। যেমন—গাছের পাশের ঝোপ ঝাড়ের মতো। মূল কার্যকে এগিয়ে নেবার জন্য প্রাসঙ্গিক টুকরো টুকরো ঘটনার জন্ম দেয়, যা মূল প্লটকে বাধা দিয়ে অথবা গতিপ্রাপ্ত করে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়।
৪. পতাকা একটি সাব প্লট। এর বিস্তৃতি অনেকটা এরকম যেন মনে হয় যে, মূল প্লটের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এখানে পতাকাই যে আলাদা পরিণতি টানতে চায়, যেন একটি গাছকে অবলম্বন করে পেঁচিয়ে ওঠা লতাগুল্মের মত।
৫. ফলাগম হল আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা প্রাপ্তি।

বাংলা লোকানাট্যে কোন একটি ক্রিয়ার পাঁচটি অবস্থা থাকতে পারে। আবার প্রত্যেক অবস্থার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। তবে শুধুমাত্র কার্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকে। আর সন্ধির ক্ষেত্রে, আরম্ভ অবস্থাকে নিয়ে মুখসন্ধি। মুখ সন্ধিতে বীজ বপন করা হয়। প্রতিমুখ সন্ধিতে বীজকে লালন করা হয়। আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতার জন্য চেষ্টা করা হয়। গর্ভে প্রাপ্তিসম্ভব অর্থাৎ প্রাপ্তিসম্ভব অবস্থার প্রতিফলন দেখা যায় গর্ভ সন্ধিতে। বিমর্ষ সন্ধিতে নিয়তফলপ্রাপ্তির অবস্থা বিরাজ করে। আর নির্বহন সন্ধিতে ফলাগম ঘটে থাকে। তবে সব সন্ধিতেই কম-বেশি বিন্দুর ব্যবহার রয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে 'কমলারানীর সাগরদীঘি'র অবস্থা বিচারে 'অর্থপ্রকৃতি ও সন্ধি'র বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে 'কমলারানীর সাগরদীঘি' পালার কাহিনী সংক্ষেপ নীচে উদ্ধৃত করা হল :

কাহিনী সংক্ষেপ : কমলারানীর সাগরদীঘি-পূর্ব ময়মসিংহ অঞ্চল

ধমরাজ নামে সুসংদুর্গাপুরে একজন রাজা ছিলেন। মায়ের অনুরোধে তিনি রাজকীয়ভাবে এবং মহাধুম-ধামের সাথে কমলা নামের এক অপরূপা সুন্দরীকে বিয়ে করেন। পাশা খেলার প্রতি ধর্মরাজের ছিল প্রচণ্ড রকম নেশা। তাই বাসর রাতে তিনি কমলার সাথে পাশা খেলতে বসেন। পাশা খেলার ধর্মরাজ হেরে গিয়ে মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন, যখনই সম্ভব হবে তখনই তিনি পাশা খেলায় কমলাকে পরাজিত করে বাসর রাতের পাশা খেলায় পরাজিত হওয়ার প্রতিশোধ নেবেন। এরই মধ্যে কমলা

সন্তান সম্ভবা হয়ে পড়ে। এমনি এক রাতে কমলা ধর্মরাজের ফুলের বাগানের মন্দিরে কমলা ঘুমিয়ে থাকে। তখন পরীরা কমলাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে পাতালে ফিরে গিয়ে তাঁর রূপের কথা পাতাল নগরের রাজা 'কালরাজ'কে খুলে বলে। কালরাজ তখন পরীদের বর্ণনা শুনেই কমলার জন্য পাগলের মতো ব্যাকুল হয়ে পড়ে এবং তাকে পাবার জন্য পরিকল্পনা আঁটতে থাকে। এদিকে কমলা যতাসময়ে এক পুত্র সন্তান প্রসব করে এবং তাঁর নাম রাখা হয় রঘুনাথ। কালরাজ রঘুনাথের জন্ম হবার খবর জানতে পেরে ধর্ম রাজকে স্বপ্ন দেখায় "যদি সে এই সময় কমলার সাথে পাশা খেলে তাহলে কমলা পাশা খেলায় কমলাকে হারানোর এটাই মোক্ষম সময়। ধর্মরাজ পাশা খেলায় কমলাকে হারিয়ে তাঁর প্রতিশোধ চরিতার্থ করার সুযোগ নেয়। ধর্মরাজ কমলাকে পাশা খেলতে বাধ্য করে এবং বাজী ধরে; যদি পাশা খেলায় কমলা জিতে যায় তাহলে সুসংদুর্গাপুরে নব্বইপুরা জমির উপরে তাঁর নামে দীঘি খনন করবে আর যদি হেরে যায় তাহলে তাকে বনবাসে যেতে হবে। পাশা খেলায় ধর্মরাজ পরাজিত হয় এবং পূর্ব প্রতিশ্রুতিমতো কমলার নামে সাগরদীঘি খনন করার জন্য কাজ শুরু করে। প্রচণ্ড পরিশ্রমে দীঘি খননের কাজে নয় দিন অতিবাহিত হলেও দীঘিতে পানির কোন চিহ্নও দেখা গেল না। এমন সময় কালরাজ আবার ধর্মরাজকে স্বপ্ন দেখায়-"যদি কমলা ভরা এক কলসী পানি নিয়ে সাগরদীঘিতে নেমে নিজে কলসীর পানি তাঁর মাথার উপর ঢেলে দেয় তাহলেই পাতাল নগরের কালরাজ সাগরদীঘিতে পানি ওঠার বন্ধ নলগুলি খুলে দেবেন।" আবারও কমলা ধর্মরাজের কথায় সাগর দীঘিতে ভরাকলসী নিয়ে নামতে রাজী হতে বাধ্য হয়। কিন্তু কমলা তাঁর বিপদের পূর্বাভাস অনুমান করতে পেরে একটি পাখির (পরিবেশনের ভাষায়-"পাহাড়ী কাউয়া ময়না পাখি") দ্বারা মুক্তাগাছায় তাঁর সাতভাইয়ের কাছে বিপদের কথা জানিয়ে খবর পাঠায়। জরুরীভাবে তারা তাঁদের বোনকে বিপদের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য রওয়ানা দেয় কিন্তু সূসংদূর্গাপুরের পৌছুতে তারা খুবই দেরী করে ফেলে। ফলে তারা তাঁদের বোনকে সাগরদীঘির পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়।

অপরদিকে সাগরদীঘির পানিতে কমলা ডুবে গেলে পরীগণ তাঁকে পাতাল নগরে কালরাজের কাছে নিয়ে যায়। কালরাজ মলাকে বিয়ে করতে চাইলে কমলার অনুরোধে সে (কালরাজ) কয়েকটি শর্তের ভিত্তিতে বারো বছরের জন্য অপেক্ষা করতে রাজী হয়। শর্তগুলি হল : (১) কমলা তাঁর ছোট্ট শিশুকে লালন-পালন করার জন্য প্রতি রাতে পাতাল নগর থেকে মাটির উপরে উঠে এসে শিশুকে দেখে যেতে পারবে কিন্তু তাঁর (কমলা) গায়ে ধর্মরাজের ছোঁয়া লাগলে তাকে বারো বছরের জন্য বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হবে, (২) আর শিশুর বয়স বারো বছর হলে সে কমলা) কালরাজকে বিয়ে করতে রাজী হবে"। শর্ত অনুযায়ী কমলা প্রতি রাতে তাঁর সন্তানের যত্ন নিতে পাতালনগর থেকে মাটির উপরে সূসংদুর্গাপুরে চলে আসে। এদিকে সুস্বাস্থ্য নিয়ে রঘুনাথের বেড়ে ওঠা দেখে ধর্মরাজের মনে সন্দেহ জাগে এবং তাঁর শিশুর পেছনে একজন চর নিয়োগ করে। একদিন ভোর রাতে সে লক্ষ করল কমলা তাঁর ছেলেকে

বুকের দুই খাওয়াচ্ছে। নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে ধর্মরাজ কমলাতে ধরতে গেলে পাতালনগরে কালরাজ কমলাতে পাতালনগরে নিয়ে এসে বুকে পাথর চাপা দিয়ে আটকে রাখে। এদিকে ধর্মরাজের প্রাসাদে রঘুনাথ মায়ের বুকের দুধ খেতে না কেরে দিন দিন শুকিয়ে যায়। ধর্মরাজ তাঁর পুত্রকে লালন পালনের জন্য ভালো কোন দাই-মা না পেয়ে মুক্তগাছা শহরে চলে যায়। সেখানে কমলার বোন সমলা, তাঁর বোনের ছেলেকে কোলে তুলে নেয় এবং তাকে লালন-পালন করতে থাকে। আল্লাহর আশীর্বাদে তাঁর বুকে মাতৃদুগ্ধ চলে আসে এবং রঘুনাথ পরাণ ভরে সেই দুধ পান করে। এর ফলে রঘুনাথকে সমলার অবৈধ সন্তান ভেবে ভুল বুঝে সাতভাই সমলার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁকে বনবাসে পাঠিয়ে দেয়। সমলা বনের মধ্যে দুঃসহ কষ্ট আর যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে রঘুনাথকে বড় করে তোলে। রঘুনাথ স্কুলে যাওয়া শুরু করে একই সাথে দৈহিকভাবে খুবই শক্তিশালী হয়ে বেড়ে উঠতে থাকে। একদিন স্কুলের অন্যান্য শিশুরা তাঁকে অবৈধ সন্তান বলে পরিহাস করলে সে প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে পড়ে। বাড়ী এসে সমলাকে তাঁর পিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে এবং মুক্তগাছা শহরে তাঁর মামা'রা রয়েছে জানতে পেরে সেদিকে যাত্রা আরম্ভ করে। সেখানে তাঁর মামাতোবোন ফেরদৌসীর সাথে পরিচয় হয় এবং তারা একে-অপরকে ভালোবেসে ফেলে। তাঁর মামারা ফেরদৌসীকে এক অপরিচিত লোকের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে তাকে গুলি করে। পরে তারা রঘুনাথের পরিচয় জানতে পেরে সমলার উপর থেকে তাঁদের রাগ, ক্ষোভ ও অভিমান ঝেড়ে ফেলে। রঘুনাথ সমলার কাছে চলে আসে। সেখানে সমলা রঘুনাথের সেবা শুশ্রুয়া করে এবং রঘুনাথ ভালো হয়ে গেলে সমলা এবার তাঁর পরিচয়ের কথা এবং তাঁর মা কমলার দুরাবস্থার কথা জানিয়ে দেয়। এই খবর জানতে পেরে সাথে সাথেই রঘুনাথ সুসংদুর্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায়। সেখানে তাঁর বাবার সাথে দেখা হয় যে দীর্ঘদিন ধরে দীঘির পাড়ে বসে কমলার জন্য কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গিয়েছে। রঘুনাথ কোন কালক্ষেপণ না করে দীঘির পানিতে ঝাপিয়ে পড়ে ডুব দিয়ে পাতালনগরে চলে যায়। সে কালরাজের পাতালনগরে প্রবেশের জন্য কৌশল খাটায়। কালরাজের রাক্ষস পরীদের সাথে বীরের মতো যুদ্ধ করে কালরাজকে বন্দী করে, আর শীর্ণ, ক্লান্ত, রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাঁর মা'কে উদ্ধার করে সুসংদুর্গাপুরে নিয়ে আসে। সেখানে তাঁদের পরিবার পুনরায় সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। সমলার স্পর্শে ধমরাজ তাঁর চোখের দৃষ্টি ফিরে পায়। রঘুনাথের সাথে ফেরদৌসীর বিয়ে হয়ে যায়। এবং রঘুনাথ সুসংদুর্গাপুরের রাজা হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করে।

নাট্যকাহিনীর পাঁচটি অবস্থার সংজ্ঞা অনুসারে প্রত্যেকটিকে পর্যায়ক্রমিক সংখ্যান্তর বিন্যাসের দ্বারা 'কমলারানীর সাগরদীঘি' কাহিনীর অবস্থা বিচার করা যেতে পারে—

যদি,

আরম্ভ—১ম হয় কারণ আরম্ভ এ একটি ক্রিয়ার শুরু এবং আকাঙ্ক্ষার জন্ম ল্যাভ করে। অর্থাৎ অবস্থা বিচারে আরম্ভ প্রথমাবস্থা।

প্রযত্ন———২য় হয় কারণ প্রযত্ন নাটকের অবস্থা বিচারের দ্বিতীয়াবস্থা। প্রযত্নে আকাংখা পূরণের চেষ্টা চলে। অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষাকে লালন করা হয়।

প্রাপ্তি সম্ভব———৩য় হয় কারণ যেহেতু এটি তৃতীয় অবস্থা এবং প্রযত্ন অবস্থায় আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টার ফলে প্রাপ্তিসম্ভব অবস্থায় আকাঙ্ক্ষা পূরণের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

নিয়তফলপ্রাপ্তি———৪র্থ হয় কারণ এ অবস্থায় আকাঙ্ক্ষা পূরণের সম্ভাবনার পরিবর্তে আকাংখার দমনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। নিয়তফলপ্রাপ্তির এ অবস্থায় মনে হয় আকাঙ্ক্ষা পূরণ যেন আর সম্ভব নয়। অর্থাৎ অবস্থা বিচারে নিয়তফলপ্রাপ্তি ৪র্থ তম।

ফলাগম———৫ম হয় কারণ অবস্থার বিচারে সর্বশেষ অবস্থা হল ফলাগম।

'কমলারাণীর সাগরদীঘি'র উল্লিখিত কাহিনীতে আমরা দেখি, সুসংদুর্গাপুরের রাজা ধর্মরাজের মায়ের মনের বাসনা "পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করে যাবার ইচ্ছা" তাকে আন্দোলিত করে এবং নতুন নতুন ঘটনার জন্ম দেয়। অবস্থার বিচারে প্রমাবস্থা 'আরম্ভ' হল ধর্মরাজের মায়ের বাসনা কে পূরণ করার আকাঙ্ক্ষা। এখানে একটি ঘটনা থেকে আরেকটি ঘটনার বিষয়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে ধর্মরাজের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষারও পরিবর্তন হতে থাকে। যেমন—মায়ের ইচ্ছাকে ধর্মরাজ নিজের ইচ্ছা রূপে লালন করে বিয়ের জন্য উজিরকে পাঠায় পাত্রীর সন্ধানে। এখানে ধর্মরাজের বিয়ের জন্য পাত্রী খোঁজা থেকে শুরু করে বিয়ের রাতে কমলার সাথে পাশা খেলা পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনা 'প্রযত্নে'র অন্তর্ভুক্ত। বাসর রাতের প্রথম পাশা খেলায় হেরে গিয়ে ধর্মরাজ তিনদিনের জন্য কুঞ্জতখানার ঘরে যেতে উদ্যত হলে কমলার অনুরোধে সে নিবৃত হয় কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে "যখনই সুযোগ পাবে, তখনই কমলাকে পাশা খেলায় হারানোর চেষ্টা করবে। এখানে ধর্মরাজ তার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ইচ্ছাকে লালন করে বলেই এ অংশকে 'প্রযত্ন' বলা হয়েছে। দ্বিতীয় খেলায় হেরে গিয়েও ধর্মরাজ কিন্তু তার ইচ্ছাপূরণে সচেষ্ট থাকে। সে পাশা খেলার পূর্বশর্ত মতো ৯০পুরা জমির উপরে সাগরদীঘি খনন করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং হাজার হাজার শ্রমিকের ৯দিন ৯রাত দীর্ঘ পরিশ্রমের পর দীঘির খননকার্য সমাপ্ত হয়। ধর্মরাজের আকাঙ্খা পূরণের সম্ভাবনা দেখা দেয়। সে কারণে এ অংশ 'প্রাপ্তাশা'। কিন্তু আকাঙ্খা পূরণে বাধ সাধে পাতাল নগরের কালরাজ। সমস্যা হলো দীঘিতে পানি ওঠে না। কেননা, কালরাজ যাদু-টোনা করে সাগরদীঘিতে পাড়ি ওঠর পথ বন্ধ করে দিয়েছে। ধর্মরাজ চিন্তাগ্রস্থ। কালরাজ রাতে ধর্মরাজকে স্বপ্ন দেখায়, "যদি কমলারানী ভরা কলসীসহ দীঘিতে নেমে কলসীর পানি তার মাথায় ঢেলে খোলা চুল ভিজিয়ে দেয় তাহলেই তার দীঘিতে পানি উঠবে। ধর্মরাজের মনে আকাঙ্ক্ষা পূরণে নতন আশার সঞ্চার ঘটে। সে স্বপ্নের নির্দেশ মতো তার ইচ্ছা পূরণের আশায় কমলাকে ভরা কলসীসহ দীঘির মাঝে নামতে বাধ্য করে। দীঘির মাঝে নেমে কমলা কলসীর পানি দিয়ে তার মাথার চুল ভিজিয়ে দিতেই

তর-তর করে দীঘিতে পানি উঠতে শুরু করে। কিন্তু কমলা দীঘির ভেতর থেকে উঠে আসতে পারে না। কারণ কালরাজ শিকল দিয়ে তার পা বেঁধে রেখেছে। ধীরে ধীরে দীঘির পানি বাড়তে থাকে। সমস্ত দীঘি পানিতে পরিপূর্ণ হয় আর কমলা সেই পানির মধ্যে হারিয়ে যায়। কাহিনীর এ অংশ 'নিয়তফলপ্রাপ্তি'। কেননা এ অংশে দীঘিতে পানি ওঠে ঠিকই কিন্তু কমলাকে হারানোর বিষাদে সে আকাঙ্ক্ষাপূরণ আর সফলতা পায় না। বিপরীতে কমলাকে ফিরে পাবারও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। ফলে কাহিনীর গতি এখানেই যেন থমকে দাঁড়াতে চায়।

ধমরাজ কমলাকে সাগরদীঘির মাঝে নেমে পানি ঢালার প্রস্তাব দিলে কমলা তার সমূহ বিপদের কথা বুঝতে পারে। 'সাগরদীঘিতে নামলে তার বিপদ হতে পারে'— এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে সে পাহাড়িয়া-কাউয়া-ময়না পাখির মাধ্যমে তার ভাইদেরকে খবর পাঠায় বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য। এ অংশে সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা হল 'প্রযত্ন'। এখানে কমলা মনের মধ্যে সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার আকাঙ্ক্ষাকে লালন করে। মুক্তাগাছায় সাতভাই ময়না পাখির মাধ্যমে কমলার ভীষণ বিপদ জানতে পেরে তাকে উদ্ধারের জন্য সুসংদূর্গাপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রার পরিকল্পনা করে এবং কমলাকে বিপদ থেকে উদ্ধারের সম্ভাবনা যেন নিশ্চিত হয়ে যায়। অবস্থা বিচারে এ অংশ তাই 'প্রাপ্তাশা'র অন্তর্ভুক্ত। কালরাজের যাদু-টোনার কারণে সাতভাই সাগরদীঘিতে পৌঁছুতে দেরী করে ফেলে। ফলে তারা কমলাতে সাগরীঘিতে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। সাগরদীঘিতে কমলার ডুবে যাওয়া, হতাশ হয়ে সাতভাইয়ের বাড়িতে ফেরা যেন আপাতভাবে ঘটনার ইতি টানতে চায়। মনে হয় ঘটনা যেন এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। কাহিনীর এ অংশ তাই 'নিয়তফলপ্রাপ্তি'।

সাগরগীঘিতে কমলার ডুবে যাবার পর থেকে মূলত রঘুনাথের পর্ব শুরু হয়। মা হারা রঘুনাথের লালন-পালনের জন্য ধর্মরাজ দাই-মা নিয়োগ করে। কিন্তু ছোট্ট রঘুনাথ কোন দাই-মার বুকের দুধ গ্রহণ করে না। অবশেষে নিরুপায় হয়ে ধর্মরাজ মুক্তাগাছা শহরে কমলার ছোট বোন সমলার কাছে যায় এবং তাকে রঘুনাথের লালন-পালনের ভার অর্পণ করে। এ পর্যায়ে রঘুনাথকে লালনের জন্য ধর্মরাজের চেষ্টা, রঘুনাথের কোনও দাই-মার দুধ পান না করা ইত্যাদি ঘটনাংশ 'প্রযত্ন' অবস্থার অন্তর্গত। রঘুনাথের লালন-পালন ও পরিচর্যার জন্য সমলার দায়িত্ব গ্রহণ এবং আল্লাহর অসীম দয়ায় ও নির্দেশে যুবতী সমলাকে মাতৃত্ব দান রঘুনাথকে সুস্থ-সুন্দরভাবে বাঁচার আশাকে নিশ্চিত করে দেয় বলে এ অংশ 'প্রাপ্তাশা'। সমলার সাতভাই রঘুনাথকে তার অবৈধ সন্তান ভেবে রঘুনাথসহ তাকে বনবাসে পাঠানোর ফলে সমলা ও রঘুনাথের জীবন চরম বিপদসঙ্কুল হয়ে পড়ে। ফলে ঘটনা যেন আলাদা পরিণতি টানতে চায়। এ অংশ তাই 'নিয়তফলপ্রাপ্তি'। বনবাসে কাঠুরিয়ার সাথে সাক্ষাতের পর তার আশ্রয়ে রঘুনাথ বড় হয়। ধীরে ধীরে তেজীয়ান ও শক্তিশালী হয়। এভাবে তার বয়স বারো বছর পূর্ণ হবার সময়ে সে জানতে পারে যে সমলা রঘুনাথের কাছে তার

আসল পরিচয় প্রকাশ করে। সে তার পিতার পরিচয় জানার জন্য বেরিয়ে পড়ে। এ অংশ তাই 'প্রযত্ন'। মুক্তাগাছায় তার মামাতো বোন ফেরদৌসীর সাথে পরিচয় হওয়া হল প্রাপ্ত্যাশশ, এখানে তার আকাঙ্ক্ষা পুরণের সম্ভাবনা দেখা দেয়। মামাদের গুলিতে রঘুনাথের আহত হওয়া তার আকাঙ্ক্ষা পূরণের সম্ভাবনাকে ব্যহত করে বলে এ অংশ 'নিয়তফলপ্রাপ্তি'। সমলার শুশ্রূষায় রঘুনাথ সুস্থ হয়ে ওঠে। পরে রঘুনাথ মামাদের কাছ থেকে তার পিতা ধর্মরাজের কথা জানতে পারে, যিনি বর্তমানে বৃদ্ধ এবং স্ত্রী কমলার শোকে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গিয়েছেন। পিতার কাছ থেকে মায়ের বর্তমান অবস্থার কথা জানতে পারে সাগরদীঘির পানিতে ডুব দিয়ে পাতাল নগরে কালরাজার দেশে চলে যায়। সেখানে গিয়ে বিভিন্ন কৌশল খাটিয়ে সে তার মাকে উদ্ধার করে। পাতাল নগর থেকে শীর্ণ, ক্লান্ত অবস্থায় কমলাকে উদ্ধার করে পৃথিবীতে নিয়ে আসে। কমলা ধর্মরাজের চোখে হাত বুলিয়ে দিতেই তার স্ত্রী কমলাকে ফিরে পায় এবং রঘুনাথ তার মামাতো বোন ফোদৌসীকে বিয়ে করে সুখী ও সুন্দরভাবে রাজ্য পালন করতে থাকে।

উপরে উল্লিখিত অবস্থার বিচারে 'কমলারানীর সাগরদীঘি' পালাগানের মধ্যে ক্রিয়ার ক্রমপর্যায়ে যেসব অবস্থার বিস্তার ঘটেছে সেগুলি হল—

আরম্ভ——(প্রযত্ন——প্রাপ্তি সম্ভব——নিয়তফলপ্রাপ্তি)——(প্রযত্ন——প্রাপ্তি সম্ভব—নিয়তফলপ্রাপ্তি)—(প্রযত্ন——প্রাপ্তি সম্ভব——নিয়তফলপ্রাপ্তি)——ফলাগম

উপরোক্ত অবস্থাগুলিকে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করলে পদ্মাপুরাণ গানের ইতিবৃত্ত বা প্লটের যে চিত্র আমরা পাই তা নিম্নরূপ—

১——(২—৩—৪)——(২—৩—৪)——(২—৩—৪)——৫

কিন্তু যাত্রাপালা, লাইলী মজনু, ঘাটু গান, হাসান-হোসেনের ঘটনা, জারী গানের ইতিবৃত্ত অনেকটা ব্যতিক্রম। এর প্লট নির্মাণ পাশ্চাত্তের দ্বন্দ্ব বিষয়কে ভিত্তি করে গঠিত। ত্রিমাত্রিক গঠনে তার আকৃতি। এর কেন্দ্রিয় চরিত্র শক্তিহীন এবং মৃত্যু শেষে দুষ্ট চরিত্রের পরাজয় দেখান হয়। অবস্থা বিচারে কাহিনী ৪র্থ অবস্থায় এসে শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ কেন্দ্রিয় চরিত্রের আকাংখী থেকে যায়। নাট্যকাহিনীর পরিণতিতে হিরো-হিরোয়িন মৃত্যুবরণ করলেও তাঁদের পক্ষে কেউ দাড়িয়ে তাঁদের আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প ব্যক্ত করে এবং দুষ্ট চরিত্র ভালো হয়ে যায়।

পালাগানের পালাকারেরা মুখে মুখেই পালা বাধতেন এবং নৃত্য-গীত-সংলাপ-বাদ্যসহকারে ধুয়া যোগে তা পরিবেশন করতেন। ধর্মনিরপেক্ষ এ সমস্ত পালা নিছক আনন্দ বিনোদনের উদ্দেশ্যেই পরিবেশিত হতো। বিভিন্ন উৎসবাদিতে, মেলায় বা বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পালাগান পরিবেশনার ডাক পড়ে।

মানব সমাজে কাল পরম্পরায় লোকমুখে নানা ধরনের উপকথা, গল্পকথা ও আখ্যান প্রচলিত রয়েছে। প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে এই গল্পকথা বা আখ্যান গীত ও বর্ণনার নাধ্যমে সচরাচর অন্তরঙ্গ আসরে পরিবেশিত হতো। আধুনিক কালের

নাট্যে এই ধরনের পরিবেশনাকে 'কথানাট্য' নামে অভিহিত করা হয়। মুখে মুখে প্রচলিত হওয়ায় এর ভাষাও সর্বকালেই সমকালের ভাষারূপে বিবৃত হয়ে এসেছে। এগুলোর চরিত্র, ঘটনা বা পরিবেশনার রীতি প্রচীনকাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় অবিকৃত থাকলেও ভাষার ক্ষেত্রে কোথাও প্রাচীনত্ব পরিলক্ষিত হয় না। এগুলো আজও আমাদের গৃহাঙ্গনে পরিবেশিত হয়। এ পরিবেশনা একেবারেই গৃহাঙ্গনের, চার দেয়ালে আবদ্ধ মঞ্চের নয়। দর্শক-শ্রোতার দিক থেকেও এগুলিতে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণীর শিশু কিশোর, যুব বয়োবৃদ্ধ সাধারণ নারী ও পুরুষের উপস্থিতি বেশি হয়ে থাকে। এ রীতিতে কোনো কাহিনী বর্ণনা ও গীতের আশ্রয়ে একজন প্রধান কথক বা গায়েন দ্বারা দোহার সহযোগে পরিবেশিত হয়। সাধারণত সন্ধ্যার পরে গৃহস্থ বাড়ীর উঠানে কিস্‌সা, শাস্ত্র বা লোককথার আসর বসে। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে হারমোনিয়াম, খোল বা ঢোলক, মন্দিরা, চটি, করতাল ইত্যাদি। অনেক সময় মাটির পাত্র বা অনুরূপ বাদ্যযন্ত্রও এতে ব্যবহৃত হয়।

বাঙালীর হাজার বছরের নাট্যচর্চায় যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে অধিক গ্রহণযোগ্য রীতি বা প্রয়োগ পদ্ধতিগুলি রয়ে গেছে সাধারণের মাঝে আর বাদবাকী সব নাট্য বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় হারিয়ে গেছে কালের অতলে। পালাগানের বিষয় ও প্রয়োগ পদ্ধতি প্রাচীন নাট্যধারার ঐতিহ্যকে বহন করে বলেই তা আজও জনপ্রিয় নাট্যরীতি রূপে বেঁচে আছে শহর ও গ্রামের মানুষের মাঝে। এর কাহিনীর সরল গাথুনী অথচ প্রচণ্ড গতিময়তা আছে-যার পরিবেশনা এখন আর কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং ছড়িয়ে পড়েছে দেশে ও বিদেশে সর্বত্র।

তথ্য নির্দেশিকা :

১. তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৫৮, পৃ. ১৬-১৭
২. বরুণ কুমার চক্রবর্তী, গীতিকাঃ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১৪
৩. পূর্বোক্ত, বরুণ কুমার চক্রবর্তী, পৃ. ১৪
৪. নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী, বাংলাসাহিত্যের কথা, কলিকাতা, ১৩৯৯, পৃ. ২৬
৫. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড প-হ, পৃ. ১৩২২
৬. পূর্বোক্ত, ড. অজিতকুমার ঘোষ, পৃ. ১৩২
৭. ড. সেলিম আল দীন, বাঙলা নাট্যকোষ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ঢাকা ১৯৯৮, পৃ. ২১৮-২১৯
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৮
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৪
১০. সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, ময়মনসিংহ-গীতিকা চর্চা, ময়মনসিংহ গীতিকা, ১৯৯৯ পৃ. ৪২৩
১১. ড. সেলিম আল দীন, মধ্য যুগের বাঙলানাট্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৬
১২. Dr. Syed Jamil Ahmed, Acinpakhi Infinity, Indigenous Theatre of Bangladesh, Dhaka, 2000 Pg. 271
১৩. পূর্বোক্ত

১৪. ড. আশরাফ সিদ্দিকী, পূর্ববঙ্গ : ময়মনিংহ গীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১০
১৫. পূর্বোক্ত
১৬. ফাতেমা কাওসার, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চৌত্রিশ বর্ষ সংখ্যা, পৃ. ১৬৮
১৭. ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ, সাহিত্য পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা-সাইত্রিশ বর্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৪৬
১৮. নিহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৫৬
১৯. ড. আশরাফ সিদ্দিকী, আমাদের গীতিকা সাহিত্য, সাময়িকী-যুগান্তর পত্রিকা, ঢাকা-শুক্রবার, ৭ই ডিসেম্বর ২০০১
২০. ফাতেমা কাওসার, মৈমনসিংহ গীতিকা'র জনজীবন, সাহিত্য পত্রিকা, ১ম সংখ্যা-চৌত্রিশ বর্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৬৭
২১. পূর্বোক্ত, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, সাহত্যি সাময়িকী, দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা, ৭ই ডিসেম্বর ২০০১
২২. পূর্বোক্ত
২৩. পূর্বোক্ত
২৪. শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন, মৈমনসিংহ-গীতিকা, সং-১৯৭৩, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য
২৫. পূর্বোক্ত, শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন, মৈমনসিংহ-গীতিকা, সং ১৯৭৩, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য
২৬. আলি নওয়াজ, ময়মনসিংহ গীতিকা, ময়মনসিংহ, ১৯৭৮, পৃ. ৫৬
২৭. ফাতেমা কাওসার, 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র জনজীবন, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চৌত্রিশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, পৃ. ১৯২-১৯৩
২৮. ড. আশরাফ সিদ্দিকী, 'আমাদের গীতিকা সাহিত্য', সাহিত্য সাময়িকী-যুগান্তর দৈনিক পত্রিকা, ঢাকা-শুক্রবার, ৭ই ডিসেম্বর ২০০১
২৯. নিত্যানন্দ বিনাদ গোস্বামী, প্রাচীন কাব্যের ছন্দ, বাংলাসাহিত্যের কথা, ১৩৯৯, পৃ. ৩৯
৩০. নিত্যানন্দ বিনাদ গোস্বামী, প্রাচীন কাব্যের ছন্দ, বাংলাসাহিত্যের কথা, ১৩৯৯ বাংলা পৃ. ৩৯
৩১. পূর্বোক্ত
৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০
৩৩. নিত্যানন্দ বিনাদ গোস্বামী, প্রাচীন কাব্যের ছন্দ, বাংলসাহিত্যের কথা, ১৩৯৯ বাংলা, পৃ. ১০৬-৭
৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০
৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ,. ১১০
৩৬. মোহাম্মদ সাইদুর, বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন : ৫০ (শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত), ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ২৪৮

বাংলার শ্রমজীবী মেয়েদের উনিশ-বিশ

শাশ্বতী ঘোষ

সমসময়ের বাংলা নিয়ে কথা বলার নানান বিপদ আছে বলেই বোধহয় আমাদের সমাজবিজ্ঞানীদের এক বিরাট অংশ মনোনিবেশ করেছেন ঔপনিবেশিক ইতিহাসে—উনিশশতকের নারীর অবস্থান নিয়ে গবেষণাও তার অংশ। কিন্তু উনিশশতকের নারী নিয়ে গবেষণায় মূলত এসেছে ভদ্রমহিলার প্রসঙ্গ—নারীশিক্ষার প্রয়োজন আছে না নেই, কি হবে সেই শিক্ষার বিষয় ইদ্যাদি। দেখা যাচ্ছে একদিকে সেখানে ছিল মেয়েদের পাশ্চাত্য আদর্শে গৃহিণী করে তোলার বাসনা, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যদি ঘরের মেয়ে সীমানা লঙ্ঘন করে ফেলে সেই দ্বিধা। প্রশ্ন উঠেছিল মেয়েদের উপযুক্ত স্থান কোথায়। সেটা অবশ্যই 'ঘর'। সেই মেয়েরা কাজ করবে কি? কি কাজ হবে 'ভদ্রঘরের' মেয়ের 'উপযুক্ত' কাজ যা তার আব্রুকেও রক্ষা করবে আবার জীবিকানির্বাহেরও পথ দেখাবে? এসেছেন পেশাজীবী মেয়েরা। কিন্তু এর মধ্যে কদাচিৎ উপস্থিত থেকেছেন কারখানার, খনির বা চা বাগিচার শ্রমিক মেয়েরা। পুরুষদের পাশাপাশি তাঁদের কাজ করতে হয়। তাতে আব্রু রক্ষা হয় না বলেই হয়তো এঁরা উপযুক্ত বিষয় হিসাবে সে সময়ের আলোচনায় আসেননি। কারণ এরকম কাজও তো মেয়েদের 'উপযুক্ত' নয়। কিন্তু অবিভক্ত বাংলার এঁরা মোটেই নগণ্য ছিলেন না। এই সমস্ত নারীশ্রমিকদের সম্বন্ধে কিছু মৌলিক গবেষণা নিয়েই একটা ধারাবাহিকতাকে প্রশ্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে এই নিবন্ধে।

চাকুরে বাঙালি কখনই কায়িক পরিশ্রমকে যথেষ্ট মর্যাদা দেয়নি। তার চাকরি সর্বস্বতার প্রেক্ষাপট এখানে আলোচ্য নয়। ফলে উনিশ শতকের মেয়েদের ইতিহাসে কায়িক পরিশ্রমে দিনাতিপাত করা মেয়েরা বহুদিন যথেষ্ট গুরুত্ব পাননি। কিন্তু মধ্যবিত্ত বা পেশাদার মেয়েরা নয়, এঁরাই ছিলেন বাংলার শ্রমজীবী মেয়েদের সংখ্যাগুরু অংশ। এঁদের অনেকেই জাতি পরিচয়ে বাঙালি ছিলেন না। এঁদের নিয়ে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ঔদাসীন্য, ট্রেড ইউনিয়নে পুরুষশ্রমিকদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের, এমনকি মেয়েদের কাজ করার বিরোধিতার ইতিহাস ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে। তবুও এই নিবন্ধের সীমিত পরিসরে মজুরির স্বল্পতাকে পুরণ করতে কত মেয়ে আংশিক সময়ের জন্য একাধিক পেশা নিতে, এমনকি বারবনিতাবৃত্তিতে বাধ্য হতেন, সে নিয়ে আলোচনা সম্ভব হবে না।

মেয়েদের কাজকে কম গুরুত্ব দেওয়ার ধারাবাহিকতা আমাদের খুব পরিচিত।

এমনকি মেয়েদের কম মজুরি দিলেও শ্রমিক সংগঠনরা সেটাকে মেয়েদের অক্ষমতার যুক্তিতেই মেনে নিতেন, নয়তো সেটাকে ন্যায্য মনে করতেন যেহেতু মেয়েদের পরিবারের 'অন্নদাত্রী' বলে মনে করা হতো না। পরিবারের আয়ে প্রত্যক্ষ [উপার্জনের মাধ্যমে] বা পরোক্ষভাবে [সাশ্রয় কারী কাজ করে] মেয়েদের যথেষ্ট অবদান থাকলেও কি পরিসংখ্যানবিদ, কি প্রশাসক, কি সমাজসংস্কারক এমনকি নারীসংগঠনও এঁদের আয়কে অপ্রধান বলে মনে করেছেন। বিপরীত কিছু ঘটলে সেটাকে নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম বলে ধরেছেন। ফলে শ্রমিক মেয়েরা কাজ পেল কি না, মজুরি কম কি না, ছাঁটাই হলো কি না সেটা কখনই গুরুত্বের সঙ্গে তখন আলোচনায় উঠে আসেনি। যে কাজের বিনিময়ে অর্থ উপার্জিত হয় না, অর্থকৌলীন্যভিত্তিক সমাজে মেয়েদের সে কাজ তো গুরুত্ব পায়নি বটেই, এমনকি যে কাজের বিনিময়ে মেয়েরা উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছেন, সে কাজের গুরুত্বও হারিয়ে গেছে।

এই নিবন্ধ উনিশ শতকের অবিভক্ত বাংলার নারী শ্রমিকদের খুঁজতে চেষ্টা করেছে। সেজন্য প্রথম পর্বে এসেছে মেয়েদের কোন কাজকে 'কাজ' বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে সেই নিয়ে জনগণনাকারীদের বিতর্ক। পরবর্তী পর্বে এসেছে নারীশ্রমিকদের পাঁচ দশকের (১৮৮১-১৯৩১) কাজে যোগদানের চেহারাটি, অঞ্চল বিশেষে তার বণ্টন। সবশেষে এসেছে এই মেয়েদের জন্য শ্রমিক সুরক্ষার কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, সেই সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলিকে নারীশ্রমিকরা, মালিকরা, ট্রেড ইউনিয়ন এবং নারীনেত্রীরা কি চোখে দেখেছিলেন সেই বিষয়টি। মনে রাখা দরকার মানবীচর্চার এই ক্ষেত্রটি যথেষ্ট নবীন।

প্রথম পর্ব

মেয়েদের 'কাজ' : জনগণনা বিতর্ক

জনগণনা প্রথম হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তারপরে ব্রিটেনে প্রজাদের হাল-হকিকত বুঝে নেবার, সবকিছুকে মুঠোর মধ্যে আনার একটি সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক প্রয়াস বলে আজকের উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজবিজ্ঞানীরা এই তথ্যায়নের উপর বেশ খড়্গহস্ত। জনগণনার হাজারো সীমাবদ্ধতা, সংজ্ঞার অস্পষ্টতা সত্ত্বেও ব্রিটিশরা এই কাজটা করার ফলেই আমরা এই সময়ের মেয়েদের কাজের একটি পরিমাণগত চিত্র পাচ্ছি।

ভারতে প্রথম জনগণনা শুরু হয় ১৮৭১ সালে, যা ১৮৭২ সালে শেষ হয়। কিন্তু এই জনগণনাটি অত্যধিক ত্রুটিযুক্ত বলে অধিকাংশ আলোচনা ১৮৮১ সালের জনগণনা থেকে শুরু হয়। ১৮০১ সালের প্রথম ব্রিটিশ জনগণনার ধারায় ১৮৬১ সালের ব্রিটিশ জনগণনা সম্পন্ন হয় রেজিস্ট্রার জেনারেল ফারের অধীনে। তিনি মানুষের কাজের যে বিভাজনগুলি করেছিলেন, ভারতীয় জনগণনা তা গ্রহণ করে। লেসে ফেয়ার-এ বিশ্বাসী ফার মনে করতেন সব মানুষেরই একটা না একটা পেশা থাকবে। ফলে তিনি সমস্ত ধরণের কাজকে ছটি পেশায় বিভক্ত

করেন এবং প্রতিটি বিভাগকে কয়েকটি উপবিভাগে বিন্যস্ত করেন। বিভাজনগুলি ছিল এরকম: পেশাদার, গৃহভিত্তিক, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, অনিশ্চিত এবং অনুৎপাদনশীল। 'গৃহভিত্তিক' কাজের বিভাজনটিতে দুটি উপবিভাগ হলো পরিবারের মধ্যে কাজ এবং ব্যক্তিগত পরিষেবার জীবিকা। প্রথম দলে আছেন সে সমস্ত মেয়েরা যাঁরা গৃহকর্মের পরিবর্তে মজুরি পান না—সোজা বাংলায় পরিবারের সদস্য বা মা-বোন-স্ত্রীরা। দ্বিতীয় দলে আছেন যাঁরা গৃহকর্মের পরিবর্তে মজুরি বা বিনিময়ে অন্য কোনো কিছু পেতেন। উল্লেখ্য যে মেয়েদের কাজকে কাজ বলেই স্বীকার করা হয়েছে, অনুৎপাদনশীল বিভাজনে তা অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

ভারতীয় জনগণনা অধিকর্তারা ব্রিটিশ হলেও ফারের ব্রিটিশ বিভাজনটি এদেশে প্রয়োগ করতে অস্বীকার করলেন। তাঁরা মানতে নারাজ যে পরিবারে নারী বা শিশুর কোনো উৎপাদনশীল ভূমিকা থাকতে পারে। তাঁদের মতে তারা হলো মূলত উপভোক্তা, অনুৎপাদনশীল। তাদের ভরনপোষণের জন্যই পরিবারের পুরুষেরা কোনো না কোনো পেশা অবলম্বন করে। সুতরাং উৎপাদনে ব্যস্ত সেইসব মানুষদের তালিকায় যদি পরিবারের মেয়ে-বৌ বা মা-বোনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে তাদেরও ঐ উৎপাদক মানুষগুলির সমস্তরের বলে মনে হতে পারে [জনগণনা, ভারত, ১৮৭১, রিপোর্ট অংশ]। সামাজিক গোলযোগের ভয়ে মেয়েদের ঘরের কাজকে ব্রিটিশরা নিজেদের দেশে 'কাজ' তথা 'পেশা' বলে স্বীকৃতি দিলেও উপনিবেশের জনগণনায় গৃহকর্মী মেয়েদের পরজীবী তথা 'অনুৎপাদনশীল' হয়ে গেলেন।

১৮৮১ সালের জনগণনায় বিতর্কটি আবার মাথা চাড়া দিলো। বলা হলো সব দেশেই মেয়েদের কাজটা খুব কঠিন এবং প্রয়োজনীয় হলেও এই কাজকে ঠিক কেনা-বেচা করা যায় না বলে এই কাজকে 'উৎপাদনশীল' আখ্যা দেওয়া যায় না। আজকের অর্থনীতির তত্ত্ব স্বীকার করেছে যে মেয়েরা এমন অনেক কাজ করেন যেগুলি সাশ্রয়কারী কাজ, অতএব উৎপাদনশীল না হলেও খোলাবাজারে সেগুলি কিনতে গেলে অর্থব্যয় হতো। ভারতবর্ষেও সব মেয়েরাই কাজ করেন, ঘরে-বাইরে, নয়তো শুধু ঘরে তো বটেই। বিশেষত কৃষিশ্রমিক হিসাবে মেয়েদের একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। যেমন অনেক সময়ই কৃষক পরিবারে এরকম ভাগ করা খুব কঠিন যে 'এই' কাজগুলি হচ্ছে 'ঘরের বৌ' হিসাবে কাজ এবং 'অন্য' কাজগুলি হচ্ছে কৃষিশ্রমিক হিসাবে কাজ। বৌটি যখন ধান সেদ্ধ করে, তখন সেই কাজটা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে হলেও তা পরিবারের উৎপাদনের কাজ, অর্থনীতির ভাষায় মূল্য সংযোজন।

ভারতের মতো দেশে যেখানে খুব কম বয়সে বিয়ে হয়, সেখানে একটি মেয়ে জীবনের সিংহভাগটাই বরের ঘরে গিয়ে কাটায়। সেই মেয়ে পরিবারের কৃষিশ্রমিক হিসাবে কাজ না করলেও ঘরের কাজ তাকে নিশ্চিতভাবেই করতে হয়। কিন্তু জনগণনাবিদরা মেয়েদের কাজ নিয়ে প্রচলিত ধারণার বশবর্তী হয়ে 'কৃষিশ্রমিক', অন্য নির্দিষ্ট পেশার পুরুষের স্ত্রী, 'স্ত্রী' (যেন কখনো কখনো স্ত্রী

হওয়াটাই একটা পেশা) বা 'বেকার' বলে মেয়েদের চিহ্নিত করেছেন। ১৮৮১ সালের জনগণনার রিপোর্ট অংশে এইজন্যই গৃহীত বিভাজনগুলি সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

১৮৯১ বা শতকের শেষ জনগণনায় পেশা থেকে 'স্ত্রী' বিভাজনটা বাদ গেল। 'নানা পেশা'র মানুষের তালিকা করার পরিবর্তে সমস্ত জনসংখ্যার 'জীবিকার উপায়' খুঁজে বার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এই জনগণনায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাবৎ জনগণ হয় কর্মী, নয়তো পরনির্ভর।

গৃহকর্ম উৎপাদনশীল কাজ কিনা, স্ত্রী হওয়াটাই একটা পেশা কিনা, গৃহবধূরা কি শুধুই পরনির্ভর জনগণনার এ সমস্ত প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র করে তখনকার ব্রিটেনের শিল্পভিত্তিক সমাজে মেয়েদের বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গী নতুন রূপ নিচ্ছিলো। ভারতের মতো কৃষিভিত্তিক সমাজে তা প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু সেই নিয়ে বিতর্কের অনুসন্ধান সামান্যই হয়েছে এযাবৎ। ঘরের কাজ-বাইরের কাজ, মজুরিশ্রম-বিনা মজুরির শ্রম এসমস্ত ধারণাকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্র ঘর আর বাহিরের সীমারেখাকে নির্দিষ্ট করে দিচ্ছিল। ব্রিটেনে শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদ বিকাশ পাচ্ছে, বাড়ছে বাজরের পরিধি, পণ্য উৎপাদনই যখন নিয়ম হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তা অনেক কিছুর সঙ্গে মেয়েদের আর পুরুষদের 'উপযুক্ত' ক্ষেত্র তথা 'উপযুক্ত' কাজকেও স্পষ্ট করে দিচ্ছে। পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে নগদে মজুরির রমরমা। তার ভিত্তিতে নতুন করে তৈরি হচ্ছে 'উৎপাদনশীল' আর 'অনুৎপাদনশীল' শ্রমের সংজ্ঞা। বাড়ছে তাদের মধ্যে দূরত্ব। পণ্য উৎপাদনের আগের যুগে না ছিল সেই পার্থক্য, না ছিল সেই দূরত্ব।

গৃহবন্দীদের পেশা ঠিক কি বলে যে ধরা হবে, তার মধ্যে সে যুগের আরেকটি বিতর্ক আত্মপ্রকাশ করছে। জনগণনা অধিকর্তা ফার বলছেন সবার একটা না একটা পেশা থাকা উচিৎ, অর্থাৎ সবাই নিজের নিজের ভরনপোষণের দায়িত্ব নেবে, কারুর ভরণপোষণের জন্য রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীর কোনো দায় নেই। এই ধারণাটা শিল্পবিকাশ পর্যাপ্তভাবে হয়েছে, উৎপাদন আর ভোগ দুটি সম্পূর্ণ পৃথক কাজে পরিণত হয়েছে, বাহির এবং ঘরের পৃথকীকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে, এমন দেশ, যেমন ব্রিটেনে প্রযোজ্য হলেও ভারতের মতো কৃষিভিত্তিক দেশে এই ধারণা নির্বিচারে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকেই যায়। সেখানে গৃহবধূরা নিজেরা নিজেদের দায়িত্ব নিলে আদর্শ পরিবারের যে সংজ্ঞা [পরিবারের কর্তা পুরুষটি স্ত্রী এবং সন্তানদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেবে] ঔপনিবেশিক প্রভাবে রূপ পাচ্ছিল, তার রূপায়ণে হয়ত ব্যাঘাত ঘটত। জনগণনার সংজ্ঞার সঙ্গে মেয়েদের 'উপযুক্ত' কাজের ধারণার পরিবর্তন তাই আরো গবেষণার অপেক্ষায়।

দ্বিতীয় পর্ব

জনগণনা ও মেয়েদের মজুরিশ্রম

মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের মধ্যে নারীশিক্ষা এবং মেয়েদের অধিকারের নানাদিক আলোচিত হলেও কাজের অধিকারের প্রশ্নটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে খুব স্পষ্ট করে আসেনি। না আসার একটা জোরালো কারণ হয়তো ব্যাপক সংখ্যায় কাজে, বিশেষত চটকলের কাজে যোগ দিয়েছিলেন যে মেয়েরা, তাঁদের ৯০ শতাংশই ছিলেন 'আপ কান্ট্রি'—বিহার, সেন্ট্রাল প্রভিন্স, মাদ্রাজ, ইউনাইটেড প্রভিন্স থেকে আসা অভিবাসী নারীশ্রমিক। মাত্র দশ শতাংশ ছিলেন হিন্দু বা মুসলিম বাঙালি মেয়ে। তাঁরাও কঠোর পর্দাপ্রথা মেনে ঘরে বসে ফুরণে কাজ করতেন। আর হিন্দুস্থানী, তেলেঙ্গী, মাদ্রাজী মেয়েরা কারখানায় কাজ করে বাঙালী মেয়েদের তুলনায় তিনগুণ বেশি মজুরি পেত। ফলে এঁদের নিয়ে বাঙালিরা খুব একটা ভাবেননি।

মেয়েদের কাজ এবং তার গণনার ফাঁককে কেন্দ্র করে এখন প্রচুর আলোচনা হচ্ছে। তাই উনিশ শতকের জনগণনার তথ্য বলে যা পরিবেশিত হবে, তা যে প্রকৃত সংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট কম তা মনে রাখতে হবে। নিবন্ধে যখন নির্মলা ব্যানার্জির কাজটি উল্লেখিত হবে [নির্মলা ব্যানার্জি (১৯৮৯) ওয়ার্কিং উইমেন ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল মডার্নাইজেশন অ্যাণ্ড মার্জিনালাইজেশন, কুমকুম সাঙ্গারি ও সুদেশ বৈদ সম্পাদিত রিকাস্টিং উইমেন : এসেস ইন কলোনিয়াল হিস্ট্রি, কালি ফর উইমেন, নতুন দিল্লি থেকে প্রকাশিত পুস্তকে,] তা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী বা অবিভক্ত বাংলাকে বোঝাবে যার মধ্যে মূল বাংলার পাঁচটি প্রশাসনিক বিভাজন অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পাঁচটি বিভাজন বা ডিভিশন হলো : বর্ধমান, প্রেসিডেন্সী, রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী হলে তার সঙ্গে যুক্ত হবে উড়িষ্যা, পাটনা, ভাগলপুর ও ছোটো নাগপুর।

এই সময় মেয়েরা মজুরিশ্রমে আংশ নিচ্ছেন। তবুও এ ধারণা যথেষ্ট নতুন। যাঁদের কাছে পরিবারের 'সম্মান' গুরুত্বপূর্ণ, তাঁরা অন্য বিকল্প না থাকলে তবেই এই ধরনের কাজে অংশ নিতেন। যেমন সেন্সাস্ এবং অন্যান্য রিপোর্ট উল্লেখ করে শমিতা সেন দেখিয়েছেন যে পুরুষ কর্তাটির আয়ে সংসার না চললে বা বৈধব্য, সন্তানহীনতা, স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে বাধ্য না হলে মেয়েরা ঘরের বাইরে কাজে যেতেন না। অবশ্য গবেষণার প্রয়োজন পড়ে না, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাই এ তথ্যের স্বতঃস্ফূর্ত সাক্ষ্য। নির্মলা ব্যানার্জি দেখিয়েছেন সুতো কাটা বা মুকুল মুখার্জি দেখিয়েছেন [উইমেন্স ওয়ার্ক ইন বেঙ্গল, ১৮৮০-১৯৩০ এ হিস্টরিক্যাল অ্যানালিসিস, ভারতী রায় সম্পাদিত *ফ্রম দ্য সীম্স্ অফ হিস্ট্রি এসেস অন ইণ্ডিয়ান উইমেন*, অক্সফোর্ড, নয়াদিল্লি থেকে (১৯৯৫) প্রকাশিত সংকলনে আছে] ধান কোটার কাজে মেয়েরা ছিলেন বিপুল সংখ্যায়। এগুলো মূলত গৃহভিত্তিক কাজ। এছাড়াও মেয়েরা ছিলেন ঘুঁটে দেওয়া, মিষ্টি বানানো এরকম ঘরে বসে তৈরি করা যায় এধরনের নানা জিনিস বানানো এবং বিক্রি করার নানা কাজে।

কিন্তু মেয়েদের 'কাজ' নিয়ে যে বিতর্ক দানা বাধছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৯১ সালের জনগণনার এই বক্তব্য এবং তার ফলাফল সহজেই বোঝা যায় : 'যে নারী ও শিশুরা কাজ করে না, সে পরিবারের কর্তার যে পেশা তা যেন লিপিবদ্ধ করা হয়, কিন্তু (কাজ করে) এমন কেউ, এমনকি কোনো শিশুও যেন বাদ না যায়'। গণনাকারীদের প্রতি এই নির্দেশের ফলে বহু মেয়েই কাজের জগৎ থেকে মুছে গিয়েছিলেন। একই ঘটনা অন্যত্রও ঘটে—বম্বে বা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতেও এভাবে বহু মেয়ে হিসাবের বাইরে চলে যান। সেন্ট্রাল প্রভিন্স এবং উত্তর-পশ্চিম বা নর্থওয়েস্ট প্রভিন্সে পরিবারের কর্তার পেশার সঙ্গে শিশুদেরও জুড়ে দেওয়া হয়, ফলে পেশাজীবীর সংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায় [উমা কল্লাগম (১৯৯৪)-দ্য অ্যানালিটিক্স অফ ওয়ার্ক অ্যাণ্ড সার্ভাইভাল, ওঁর *লেবার অ্যাণ্ড জেণ্ডার : সার্ভাইভাল ইন আর্বান ইণ্ডিয়া*, সেজ, নয়াদিল্লি থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে]।

নির্মলা ব্যানার্জী দেখাচ্ছেন ১৮৮১ সালের আগে বাংলা ছিল ভারতে শিল্পে অগ্রসর অঞ্চলের অন্যতম। অবশিল্পায়নের ফলে ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলি ধ্বংস হতে শুরু করলেও উনিশ শতকের গোড়ায় শিল্পশ্রমিকের ২০% নানা জিনিষ বানানো আর বিক্রয়-এর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সারা ভারতে ঐ অনুপাত ছিল ১৫%। বাংলাদেশে মেয়েরা অ-কৃষি কাজেও নিয়মিত অংশ নিতেন। ১৮৮১ সালে বাংলাদেশে প্রতি তিনজনে একজন নারী কৃষিতে অংশ নিয়েছিলেন। পাশাপাশি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীতে যেখানে বিহার এবং উড়িষ্যাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেখানে ৪১% নারী ১৯১১ সাল পর্যন্তও নানান দ্রব্য বানানো এবং বিক্রয়ের কাজে যুক্ত ছিলেন। নানান ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি আসায় সারা দেশের তুলনায় বাংলার মেয়েদের কাজগুলিই বেশি করে চলে গেল। ফলে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বাংলার মেয়েদের বাইরের কাজে যোগদানের হার সারা দেশের মধ্যে কম হারগুলির অন্যতম। সেজন্য বাংলায় বেড়েছিলো পরনির্ভরতার হারও [নির্ভরশীল ÷ উপার্জনকারী জনসংখ্যা] এবিষয়ে নির্মলার গবেষণা বলছে যে শুধুমাত্র বাংলাকে ধরলে পরনির্ভরতার অনুপাত ছিল ৩৬ : ৬৪, বিহার এবং উড়িষ্যার ক্ষেত্রে ৪৮ : ৫২। অবশ্য তার একটা সম্ভাব্য কারণ হতে পারে যে বাংলার মেয়েদের কৃষিক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হার ছিল অত্যন্ত কম, যা ছিল মেয়েদের কাজের অন্যতম ক্ষেত্র। বিহার এবং উড়িষ্যায় স্থানীয় মেয়েরা মূলত সীমাবদ্ধ থেকে গেলেন কৃষিক্ষেত্রে। ফলে তাঁদের অংশগ্রহণ অতটা কমেনি। অবশ্য এ নিয়ে গবেষণা চলছে যে বাংলার মেয়েদের কাজে যোগদানের হার ঐতিহাসিকভাবেই কম ছিল, নাকি প্রযুক্তির অভিঘাতেই তা কমে গিয়েছিল। কম থাকলে, কেন কম ছিল।

জনগণনা থেকে প্রাপ্ত মেয়েদের কাজের তথ্যকে মূলত : তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় :

ক. যে সমস্ত কাজ মেয়েরা স্বতন্ত্রভাবে চালাতে পারতেন, অর্থাৎ পরিবারের পুরুষ কি কাজ করছেন, তার সঙ্গে মেয়েদের এধরনের কাজের কোনো সম্পর্ক থাকতো না। যেমন ধান ভানা, জ্বালানী সংগ্রহ, গৃহপরিচারিকার পেশা প্রভৃতি।

খ. পরিবারের কর্তা বা মূল উৎপাদনকারী তথা পুরো পরিবারের পক্ষে সহায়ক কাজ যেমন তাঁতিবাড়ির মেয়েদের সুতো কাটা, কুমোর বাড়িতে মাটির জিনিষগুলি শুকোতে দেওয়া বা কৃষিজীবী পরিবারের মেয়েদের ধান সেদ্ধ করা, ধান ভানা প্রভৃতি কাজ, জেলে বা গোয়ালা বাড়ির মেয়েদের মাছ বা দুধ বিক্রিতে ভূমিকা, বেতের ঝুড়ি বোনা এবং বিক্রি প্রভৃতি।

গ. যেখানে নারী ও পুরুষ মজুরিশ্রমিক হিসাবেই কাজ করতেন পরিবার হিসাবে বা ব্যক্তি হিসাবে। খনিতে পুরুষরা কয়লা কাটতো, স্ত্রী-সন্তানরা তা বইতো। চা-কফি-রাবার বাগিচায় পুরুষ এবং নারী পরিবার হিসাবেই কাজ করতেন, যদিও তাঁদের কাজের ক্ষেত্রগুলি ভিন্ন থাকতো। চটকলে সর্দারের মাধ্যমে কাজ মিলতো। একলা মেয়েকেও 'সুরক্ষার' জন্য কোনো পুরুষকে আশ্রয় করতে হতো, গড়ে উঠতো স্থানীয় ভিত্তির পরিবার। তবে সর্বত্রই থাকতেন একলা মেয়েরাও শিল্পশ্রমিক হিসাবে কম মজুরির সঙ্গে পরিবারহীন একলা মেয়েদের 'সহজলভ্য' এই ধারণার সঙ্গেও অহরহ লড়াই করে বাঁচতে হতো।

মেয়েরা প্রায় সব কাজেই পুরুষের তুলনায় কম মজুরি পেতেন। মেয়েরা যে কাজগুলোতে সুযোগ পেতেন, আমাদের পুরুষপ্রধান মূল্যবোধ সেই কাজগুলিকেই অদক্ষ অতএব কম মজুরির দাবিদার বলে চিহ্নিত করতো। এ বিষয়ে পুরুষপ্রাধান্যের সঙ্গে আশ্চর্য মেলবন্ধন ঘটেছিল পুঁজিবাদী কারখানা ব্যবস্থার। সস্তা শ্রমের ভিত্তি আরো মজবুত করেছিল মেয়েদের অদক্ষতা অক্ষমতার ধারণা। শুধু পুরুষশ্রমিক, কারখানা মালিক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা যে এবিশ্বাস কায়েম রাখতে সচেষ্ট ছিলেন তা নয়, নারীশ্রমিকদের একটা বড় অংশ এমনকি মধ্যবিত্ত মেয়েদের সংগঠনও এ ধারণার পক্ষপাতী ছিলেন।

পূর্বোল্লিখিত সমস্ত ধরনের কাজগুলি নিয়ে যে সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তা সারণি ১-এ উপস্থিত করা হলো :

সারণি ১ : বাংলার নারী ও পুরুষ কর্মী, ১৮৮১-১৯৩১

সাল	কর্মী (হাজারে)		জনসংখ্যার শতকরা অংশ হিসাবে কর্মীর অনুপাত (%)	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
১৮৮১	১৮২৭	১১১৭২	১০.১	৬১.৪
১৯০১	১৬৯৬	১২৭৯৩	৮.২ (৩১.৭)	৫৯.৫ (৬১.৯)
১৯১১	১৯৪৭	১৩৯৭২	৮.৮ (৩৩.৭)	৫৭.৮ (৬১.৯)
১৯২১	২০৫৮	১৪০৬৩	৯.১ (৩২.২)	৫৮.২ (৬০.৫)
১৯৩১	১৭৯২	১২৩৯৮	৭.৪ (২৭.৬)	৪৭.৬ (৫৮.৩)

(বন্ধনীতে সর্বভারতীয় অনুপাত) [মুকুল মুখার্জি (১৯৯৫) জে. কৃষ্ণমূর্তির গবেষণা থেকে উদ্ধৃত করেছেন]

এই সারণি দেখাচ্ছে যে পুরুষশ্রমিকের তুলনায় মূল বাংলার নারীশ্রমিকের অনুপাত কমছে, কমছে সংখ্যাও। অন্যদিকে পুরুষশ্রমিকের অনুপাত কাছাকাছি থাকলেও সংখ্যা বেড়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় হলো যে বাংলায় যে শুধু পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের বাইরের কাজে যোগদানের হার কম ছিল তা নয়, তা মেয়েদের কাজে যোগদানের সর্বভারতীয় গড়ের তুলনায়ও কম ছিল। এর সাক্ষ্য মেলে সারণি ২ থেকে।

সারণি ২ : মেয়েদের কাজে যোগদানের হার, ১৯১১-৩১ (জনসংখ্যার শতকরা অনুপাতে)

রাজ্য	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
অন্ধ্রপ্রদেশ	৪১.৬	৩৭.৫	৩০.৩
আসাম	৩৯.০	৩৭.৫	৩৫.৫
বিহার	৩৪.৭	৩৫.৯	২৬.১
গুজরাত	৩০.৭	২৪.১	২৮.৬
কেরালা	২৮.০	২৪.১	৩৮.৪
মধ্যপ্রদেশ	৪৭.৯	৪৬.৮	৩৭.৫
মাদ্রাজ	৩৬.৫	২৯.২	২৩.১
মহারাষ্ট্র	৩৯.৮	৩৭.০	৩০.৩
উড়িষ্যা	৩০.৪	৩৩.২	৩০.০
রাজস্থান	৪৫.৪	৪৬.২	৩৮.৩
উত্তরপ্রদেশ	৩৩.৩	৩৭.৩	২৯.৮
পশ্চিমবঙ্গ	১৮.৮	১৭.৪	১৩.২
সারা ভারত	৩৩.৯	৩২.৮	২৮.৪

[মুকুল মুখার্জি অশোক মিত্রের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত করেছেন। পরবর্তী সময়ের ভৌগোলিক এবং প্রশাসনিক বিভাজনের সঙ্গে তুলনীয় করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়েছে]।

এই সারণি বলছে যে আজকের পশ্চিমবঙ্গেই শুধু যে মেয়েদের মজুরিশ্রমে যোগদানের হার সারা ভারতে সবচেয়ে নিচে তা নয়, তার একটা ধারাবাহিকতা আছে। আর সেই হারও ক্রমশ কমেছে।

সারণি : ৩ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীতে জনসংখ্যার অনুপাতে নারী ও পুরুষের কাজে যোগদানের হার ও বিভিন্ন পেশার আনুপাতিক অবস্থান ১৮৮১—১৯৩১

সাল	কাজে যোগদানের হার		কৃষি ও সাধারণ শ্রমিক		চিরাচরিত ব্যক্তিগত পরিষেবা		স্থানীয় বাজারের জন্য উৎপাদন ও বেচাকেনা		বৃহত্তর বাজারের জন্য উৎপাদন		আধুনিক ক্ষেত্র	
বাংলা (মূল)	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
১৮৮১	৮.৭	৫৮.৩	৩২.২	৭০.৩	১৩.৩	১০.৪	৪৩.২	১৬.২	১১.২	৩.১	—	—
১৯০১	৮.৮	৫৮.৬	৪০.৯	৭৫.৩	৯.৯	৩.৯	৩৩.২	৯.৫	১০.৪	৩.২	৫.৫	৮.১
১৯১১	৯.০	৫৯.০	৪৮.৭	৭৮.৮	৮.৭	২.০	২৮.২	৮.৩	১১.৫	৩.২	২.৯	৭.৬
১৯২১	৮.৫	৫৭.১	৫৪.১	৭৮.২	৬.০	১.৬	২১.০	৮.৬	১১.৯	৪.৩	৬.১	৭.৩
১৯৩১	৭.০	৪৬.৭	৫৫.৯	৭৯.০	৪.৬	১.৬	১১.৮	৭.২	৮.৭	৭.৩	১৯.০	৫.০
বিহার ও উড়িষ্যা												
১৮৮১	২৫.৪	৬৬.৫	৭০.৫	৭৭.০	৩.৯	৭.১	১৭.৯	৩১.৩	৭.৭	২.৬	২.৪	২.৩
১৯০১	২৮.৩	৬৩.০	৭৪.১	৮২.৮	৪.৫	৩.২	১৬.৬	৭.৯	২.৪	১.৮	২.৪	২.৩
১৯১১	৩৩.০	৬২.২	৭৮.৬	৮৩.২	২.৩	১.৯	১৩.১	৫.৩	২.৪	২.৩	৪.০	৩.৫
১৯২১	৩৫.০	৬৩.৩	৮১.৭	৮৪.২	২.০	২.৮	১১.২	৫.২	৩.০	৩.৭	২.২	৩.৬
১৯৩১	২৫.১	৫৭.৩	৮৩.৯	৮৬.২	২.২	৪.৩	১০.৫	৫.১	১.০	২.৫	২.৩	১.৯

সূত্র : নির্মলা ব্যানার্জি (১৯৮৯)

সারণি ৩ক : বাংলার বিভিন্ন বিভাগে (ডিভিসন) মেয়েদের কাজে যোগদানের হার (শতকরা) ১৯১১-৩১

বিভাগ	১৯১১	১৯৩১	বিভাগ	১৯১১	১৯৩১
বর্ধমান	১১.২	৯.১	পাটনা	৩৫.২	৩১.৭
প্রেসিডেন্সি	৭.৬	৬.৫	ভাগলপুর	৩২.৮	৩০.১
রাজশাহি	৬.৩	৫.৮	উড়িষ্যা	৮.৩	৭.৪
ঢাকা	৫.৭	৫.৬	ছোটোনাগপুর	২৫.৭	২৪.০
চট্টগ্রাম	৭.৩	৬.৩			

সূত্র : পূর্বোক্ত

এবার দেখা যাক এই মেয়েরা কি কি ধরনের কাজে যোগ দিতেন। সেই তথ্য সারণি ৩ ও ৩ক-তে উপস্থিত করা হল। সারণি ৩ ও ৩ক স্পষ্ট দেখাচ্ছে যে মূল বাংলায় মেয়েদের কাজে যোগদানের হার বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অন্য দুটি অংশ বিহার এবং উড়িষ্যার থেকে লক্ষ্যণীয়ভাবে কম ছিল। কিন্তু এটাও লক্ষ্যণীয় যে তার মধ্যেও কিন্তু কৃষিকাজ নয়, বরং কাছের বা দূরের বাজারের জন্য উৎপাদনে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিলো উল্লেখ্য। এর পাশাপাশি নির্মলার গবেষণা দেখিয়েছে যে অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে আধুনিক ক্ষেত্রটি বিস্তার পেয়েছে। চিরাচরিত ক্ষেত্র থেকে মেয়েদের কাজ চলে গেছে যে পরিমাণে, আধুনিক ক্ষেত্রে সেই পরিমাণে কাজ সৃষ্টি হয়নি। পাশাপাশি মুকুল ঐ একই প্রক্রিয়াকে দেখিয়েছেন বিশেষভাবে ধান ভেনে চাল বানানোর কাজটিকে কেন্দ্র করে। আধুনিক চালকল আসার সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে মেয়েদের কাজ, কিন্তু চালকলগুলিতে পুরুষরাই কাজ পেয়েছেন। সারণি ৪ ও ৫ দেখাচ্ছে কত বিভিন্ন ধরনের কাজে মেয়েরা যুক্ত ছিলেন। মনে রাখতে হবে দুটি সারণির বিভাজন ভিন্ন।

সারণি ৪ : (মূল) বাংলার নির্বাচিত কিছু পেশায় মেয়েদের সংখ্যা (শত)

কাজ	১৮৮১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
১. সাধারণ জ্বালানি বানানো (ঘুঁটে বা গুল দেওয়া)	২১০	২০৮	২৭৬	১১৯	৩৯
২. দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন (ঘি, ছানা, ননী প্রভৃতি)	—	২১৫	২২৩	১৬৬	১৮২
৩. রেশম পোকা চাষ	—	৩০১	১৪১	২৩	৫
৪. সুতি কাপড় বোনা	১৭০৩	৪৬২	৪৫০	৫১৯	৩৫৭
৫. রেশম কাপড় বোনা	—	৩৪	৯৪	৩৬	১০
৬. চট বোনা	৪৩৫	২৬২	৫০৮	৫৪২	৩৮৮
৭. বেতের ঝুড়ি বোনা ও অন্যান্য হস্তশিল্প	৬১৭	৪৫৪	৪২৯	২৯৭	১৯৮
৮. চিকিৎসা	১২১	১২৬	১৫২	১০৫	১১৩
৯. শিল্প	৩	১২	১৮	২৬	৫০
১০. গৃহপরিচারিকা	১৩৩৭	৮০১	১১০৭	১১৫৮	৪১৯৮
১১. ধান ভানা	—	২১৩১	২৭০৩	১৬৯৬	১৩১১

সূত্র : মুকুল মুখার্জি (১৯৯৫)

এই সারণি দেখাচ্ছে যে গৃহপরিচারিকা ছাড়া বাকি কোনো পেশায় মেয়েদের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেনি। বরং চিরাচরিত ক্ষেত্র হিসাবে শুধু ধান ভানা নয়, ঘুঁটে দেওয়া বা দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনেও মেয়েদের সংখ্যার উল্লেখ্য হ্রাস ঘটে।

সারণি : ৫ আধুনিক পরিষেবায় নারী ও পুরুষের সংখ্যা (হাজার) ১৯০১—১৯৩১

কাজ	১৯০১				১৯১১				১৯২১				১৯৩১			
	বাংলা		বিহার ও উড়িষ্যা		বাংলা		বিহার ও উড়িষ্যা		বাংলা		বিহার ও উড়িষ্যা		বাংলা		বিহার ও উড়িষ্যা	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
১. প্রশাসন, কলাচর্চা ও অন্যান্য পেশা (পুরোহিত ও ধাত্রী বাদে)	৬	২৪১	৫	১৩৬	১৪	২৫৭	৭০০	১৩৪	৬	২৫৩	১১	১০১	৯	২৮৮	৬	১১৭
২. গৃহপরিচারিকা	৮৩	১৭৭	১২৫	১২১	১১২	২৫৫	২১৫	২২৭	১১৬	৩৩৪	১২৪	১৮৪	৩৬১	৩৮৯	১০৭	৯৯
৩. ব্যবসা বাণিজ্য, অর্থ (স্থানীয় ব্যবসায়ী বাদে)	১৪	২০১	১৮	৬০	৪৭	২৬২	৭১	১৫০	২৩	১৯৩	৭০	১৫৫	২৭	৩৯৪	৫২	১৮৩
৪. পরিবহন, যোগাযোগ ও গুদামজাত করা	৯	৩১৭	৫	১০১	৩১	৪৬৯	১৩	২৪০	১৮	৩৫৫	১৭	৯৮	১২	২৭০	—	৯১
৪ক. রেলপথ	১	৩৪	১	২০	২	৭৪	২	৩৪	২	৪৩	২	৩৫	২	৬৭	১	৩২
মোট	১১২	৯৩৬	১৫৩	৪১৮	২০৪	১২৪৩	৭৫১	২০৪	১৬৩	১২৩৫	১৬৩	৫৩৮	৪০৯	১৩৪১	১৬৫	৪৯০

সূত্র : নির্মলা ব্যানার্জি (১৯৮৯)

সারণি ৫ থেকে পাওয়া যাচ্ছে মেয়েদের পাশাপাশি পুরুষদের নানা পেশায় বণ্টনের চিত্রটি। এখানে সমস্ত আধুনিক শিল্পেই মেয়েদের উল্লেখ্য হ্রাস এবং পাশাপাশি পুরুষদের বৃদ্ধির ছবিটি পাওয়া যাবে। মনে রাখা দরকার যে সারণি ৪ ও ৫-এর সময়সীমা ও ভৌগোলিক ব্যপ্তি ভিন্ন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আলোচ্য দুটি তালিকাতেই নিজস্ব আয়সম্পন্ন বা 'অসম্মানজনক' পেশার মানুষদের পেশাজীবী বলে চিহ্নিত বা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই সারণিও দেখাচ্ছে যে শুধু মেয়েদের ক্ষেত্রে নয় পুরুষদের ক্ষেত্রেও সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি বা প্রসার ঘটেছে গৃহপরিচারকের কাজে, বিশেষত বিহার ও উড়িষ্যায়। তবুও পুরুষদের ক্ষেত্রে গৃহপরিচারক পেশার অনুপাত কখনই এক তৃতীয়াংশ ছাড়ায়নি, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে তা ৭০ শতাংশেও পৌঁছে গিয়েছিলো। নির্মলা ব্যানার্জীর মতে ১৯৩১ সালের পর শিল্পে কাজের সুযোগ যখন কমতে কমতে একেবারে নিচে ঠেকে গেল, তখন গৃহপরিচারিকার কাজই হলো মেয়েদের প্রধান অ-কৃষি অবলম্বন।

১৯২১ বা ১৯৩১ সালের জনগণনার সময়সীমাতেই আমরা মেয়েদের কাজের এই হ্রাসের ছবি দেখছি কেন? এর সঙ্গে সুরক্ষামূলক আইনি ব্যবস্থার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। সেগুলি প্রায়শই বাস্তবে কার্যকর হয়নি। কিন্তু বাংলার কারখানা-খনি-চা বাগিচা, অর্থাৎ সংগঠিত ক্ষেত্র থেকে মেয়েদের ছাঁটাই করার অস্ত্র হিসাবে সেগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। এ বিষয়ে আশ্চর্য সমাপতন ঘটেছে পুরুষশ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়ন, নারীসংগঠন, সমাজসংস্কারক আর প্রশাসকদের বক্তব্যে।

তৃতীয় পর্ব

আইনি সুরক্ষা ও সংগঠিত শ্রমজীবী মেয়েরা

চা-বাগান

জানকী নায়ার দেখিয়েছেন বাস্তবে [লেবার লেজিসলেশন অ্যাণ্ড দ্য উইমেন ওয়ার্কিং, *ওঁৱ উইমেন অ্যাণ্ড ল ইন কলোনিয়াল ইণ্ডিয়া,* কালি ফর উইমেন, নয়াদিল্লি (১৯৯৬) প্রকাশিত গ্রন্থে] আইনি সুরক্ষা চাবাগানের মেয়েদের কাজের থেকে ছাঁটাই করার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। ১৮৬৩, ১৮৬৫, ১৮৭০, ১৮৭৩, ১৮৮২ আর ১৮৯২ সালে প্রণীত নানা সরকারি বিধি সর্দার প্রথা তুলে দেয় ও মজুরি নির্ধারণ করে। কিন্তু বহাল থাকে কাজ ছেড়ে পালানোর জন্য চূড়ান্ত দৈহিক শাস্তি। অন্যদিকে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলি না পাওয়াটা নিত্যকার ঘটনা হয়ে ওঠে। এখানে শ্রমিকদের প্রায় ৪০% ছিলেন নারী। অত্যধিক মৃত্যুহার এবং অত্যল্প জন্মহার দুইই ছিলো কর্তৃপক্ষের বিশেষ চিন্তার বিষয়। কারণ জন্মের হার বেশি হলে দূর থেকে কুলি নিয়োগ করার প্রয়োজন হতো না। এখানে সরকারি রিপোর্টই বলছে 'দুর্বল' বৈবাহিক বন্ধন হচ্ছে অত্যল্প জন্মহারের কারণ। কিন্তু নারীশ্রমিকদের ক্রমাগত দাঁড়িয়ে কাজ করার ফলে অত্যধিক হারে গর্ভপাত বা বাগিচার

জীবনযাপনের ধরণও যে গর্ভপাতের মূল না হলেও অন্যতম প্রধান কারণ— সেম্বন্ধে এসব রিপোর্ট নীরব। স্থায়ী বিবাহবন্ধনে জন্মহার বাড়বে ধরে নিয়ে একক মেয়ের নিয়োগকে 'আপত্তিকর' বলে চিহ্নিত করা হলো। মজুরিবৃদ্ধি বা জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর জন্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা না করে নারীশ্রমিকদের মধ্যে প্রজননহার বাড়াতে গর্ভপাতকে দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে জোরদারভাবে ঘোষণা করা হলো। এ বিষয়ে বয়স্কারা সাহায্য করলে নির্দিষ্ট হলো তাদের শাস্তি। জোর পড়লো পরিবারকে টিকিয়ে রাখা আর পারিবারিক মূল্যবোধের উপর। ফলে ১৯০৬ সালে আসাম লেবার এনকোয়ারী কমিটি সুপারিশ করলো পরিবারকে টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজনে বন্ধ রাখতে হবে একক মেয়ের নিয়োগ। কর্মী হিসাবে নয়, সন্তানের জন্মদাত্রী হিসাবে প্রয়োজনীয় হচ্ছে মেয়েরা। ফলে বিশ শতকের দুদশকের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য ভাবে কমলো নারীশ্রমিকের সংখ্যা।

কয়লাখনি

১৯৩০ সাল পর্যন্ত নারীসংগঠনরা কয়লাখনির মেয়েদের নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাননি। মূল বাংলার সমস্ত কয়লাখনি শ্রমিকের ৩৫% ও মাটির নিচে কর্মরতদের ৩৪% ছিলেন নারীশ্রমিক। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর বিহার এবং উড়িষ্যায় ৩১% শ্রমিক মেয়ে হলেও মাটির নিচের কর্মরতদের ৩৯% ছিলেন নারী। কয়লাখনির মতো এখানেও সর্দারের মাধ্যমে 'শ্রমিকদল' নিয়োগ করার ফলে পরিবার হিসাবেই শ্রমিকরা কয়লাখনির কাজে যোগ দিতেন। ১৯২৩ সালে খনি আইনের খসড়া লেখার সময় মেয়েদের আদৌ খনিতে কাজ করা উচিত কিনা সেই প্রশ্নটি সামনে এলো। দেখা গেল শ্রমিক মালিক সবপক্ষই মেয়েদের খনিতে কাজ করা এবং মাটির নিচে কাজ করার পক্ষে। পুরুষ কয়লা কাটে, মেয়ে ও শিশুরা সেটা বয়ে নিয়ে যায় এটাই দস্তুর। এর অন্যথা হলে দাম বাড়বে কয়লার, চাহিদা কমবে, ফলে কাজ যাবে শ্রমিকদের। কয়েকজন জাতীয়তাবাদী নেতা আবার এই সুরক্ষাব্যবস্থাকে ভারতীয় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ চক্রান্ত বলতেও ছাড়েননি। ফলে মেয়েরা কাজ করে যেতে লাগলেন।

কোনো সভ্য দেশেই মেয়েরা মাটির নিচে কাজ করেন না এই কারণ দেখিয়ে ১৯২৯ সালে নিয়ম করা হলো যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, সেন্ট্রাল প্রভিন্স এবং পাঞ্জাবের নুনের খনি ছাড়া মেয়েরা মাটির নিচে কাজ করবেন না। সে সমস্ত ক্ষেত্রেও মাটির নিচে কর্মরত মেয়েদের সংখ্যা দশ বছরের মধ্যে কমিয়ে আনা হবে। ফলে কাজ কমলো মেয়েদের। জানকী দেখাচ্ছেন ১৯৩১ সালের পর কোনো মেয়েই আর মাটির নিচে কাজ করতেন না। বিশেষত : বাংলা-বিহার অঞ্চলে কয়লাকাটার যন্ত্র এসে মেয়েদের কাজের সুযোগ প্রচণ্ডভাবে কমিয়ে দিল। ১৯২১ সালে ঝরিয়া কয়লা খনিতে ২১,০০০ জন নারীশ্রমিক ছিলেন, ১৯২৬ সালে কমে দাড়াল মাত্র ১৬,০০০। এবার জাতীয়তাবাদী নারী ও

পুরুষ নেতারা সভ্যতার প্রশ্ন ছাড়াও কয়লাখনিতে মাটির নিচে কাজ করতে নৈতিকতার প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। যতদিন যন্ত্র ছিল না, ততদিন দক্ষতার দোহাই দিয়ে নৈতিকতার প্রশ্নকে বাঁধ দেওয়া হলেও যখন যন্ত্র এসে গেল, তখন সভ্যতা, পারিবারিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা প্রভৃতির দোহাই দিয়ে খনি থেকে মেয়েদের বিদেয় করার অনেকগুলি পক্ষই জুটে গেল।

চটকল

১৮৮১ সালে প্রথম কারখানা আইন চালু হল, ১৮৯১ সালে একটি সংশোধনী এনে কাজের সময় ১১ ঘণ্টা হবে বলে নির্দিষ্ট করলো। ১৯১১ সালের কারখানা আইন মেয়েদের রাতে কাজ করা বন্ধ করলো সমস্যা হলো চটকলে মরশুমধর্মী বলে এখানে মরশুমে ২৪ ঘণ্টাই কারখানা চালু থাকত। ১৯২২ সালে কারখানা আইন সংশোধন করে মেয়েদের কাজের সময় ১০ ঘণ্টা করা হলো।

আন্তর্জাতিক শ্রম কনভেনশন (তখনও সংস্থা হয়নি) ১৯১৯ সালে প্রসূতিকালীন সুবিধাকে বিধিবদ্ধ করলো। যদিও ভারত সেই বিধিতে প্রথমদিকে স্বাক্ষর করেনি, কিন্তু দেশের ভিতরে বাইরে সর্বস্তরে স্বাক্ষর করার চাপ বাড়তে থাকলো। জাতীয়তাবাদীরা এবং নারীসংগঠন অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স এ ব্যবস্থাগুলিকে সমর্থন করলো।

নতুন বিধিনিষেধ মেয়েদের সর্বোচ্চ কাজের ঘণ্টা বেঁধে দিল, রাতের শিফটে কাজ করা নিষিদ্ধ করলো, শিশুশ্রম বন্ধ করলো এবং প্রসবকালীন সুবিধাদান বাধ্যতামূলক করলো। এই বিধিনিষেধগুলি কখনই প্রায় মানা হত না। কিন্তু যখন এই বিধিনিষেধগুলি বাধ্যতামূলক করা হলো, তখন চটকলেও নারীশ্রমিক ছাঁটাই করে এলো হয় পুরুষশ্রমিক নয়তো যন্ত্র।

শমিতা সেন দেখিয়েছেন [উইমেন অ্যাণ্ড লেবার ইন লেট কলোনিয়াল ইণ্ডিয়া (১৯৯৯): দ্য বেঙ্গল জুট ইণ্ডাস্ট্রি, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ইউ.কে] প্রত্যাশিতভাবেই চটকলের নারীশ্রমিকরা এই বিধিনিষেধগুলিকে তাঁদের স্বার্থের বিরুদ্ধে বলে মনে করেছেন, এগুলোকে এড়ানোর নানান কৌশল অবলম্বন করতে চেষ্টা করেছেন। সেক্ষেত্রে মুনাফার স্বার্থে তাঁদের সহায়ক হয়েছেন মালিকপক্ষ। এই নারীশ্রমিকরা বিধিনিষেধ চান না, বিশ্রাম চান না, প্রসবকালীন সুবিধা চান না। তাঁরা চান কাজের সুযোগ, হাতে মজুরি, ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায়। আইন আরো কঠোরভাবে প্রযুক্ত হলে সেই লড়াইটাও শেষ হয়ে গেছে। শ্রমিক সংগঠন সমস্ত শ্রমিকের স্বার্থ নয়, পুরুষশ্রমিকের স্বার্থ দেখেছে, জোর দিয়েছে পারিবারিক মজুরির দাবিতে, সুগম করেছে নারীশ্রমিকের ছাঁটাইয়ের পথ। আমেদাবাদে ১৯৩৫ সালে অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্সের অষ্টম সম্মেলনে রাজকুমারী অমৃত কাউর সাবধানবাণী জানান যে এই সুরক্ষাবিধি মেয়েদের সুবিধা তো দেবেই না, বরং পুরুষশ্রমিক নেওয়া

সহজ করে দেবে। তবুও এই সংগঠন কঠোর ভাবে সুরক্ষাবিধি মানা এবং বিশ্ব শ্রম সংস্থার প্রসবকালীন সুবিধার প্রস্তাবে ভারত যাতে স্বাক্ষর করে সেজন্য চাপ বজায় রেখেছে বলে দেখিয়েছেন জেরাল্ডি ফোর্বস উইমেন্স ওয়ার্ক ইন কলোনিয়াল ইণ্ডিয়া, (১৯৯৮) : ওঁর *উইমেন ইন মডার্ন ইণ্ডিয়া*, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, নয়াদিল্লি (ভারতীয় সংস্করণ) গ্রন্থে। তাঁর মতে এই নারীনেত্রীরা মেয়েদের অবস্থা নিয়ে সচেতন ছিলেন না তা নয়, এঁরা বিশ্বাস করতেন মেয়েদের কারখানায় কাজ করাটাই প্রকৃতিবিরুদ্ধ। মেয়েদের অমানবিক পরিস্থিতিতে কারখানায় কাজ করতে হতো, শ্রমিক বস্তিতে থাকতে হতো ঠিকই। কিন্তু তার উত্তর শুধু মেয়েদের জন্য সুরক্ষাবিধি নয়, সমস্ত শ্রমিকের জন্য সুরক্ষাবিধি, ন্যূনতম সুযোগসুবিধার দাবি, তা না হলে তা নারীশ্রমিকের ছাঁটাই অনিবার্য করে তুলবে—এধরনের ভাবনা উঠে থাকলেও, প্রধান্য পায়নি। ফলে আমাদের রাজ্যে কৃষি এবং অকৃষি দুই ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত সংখ্যায় নারীশ্রমিক থাকা সত্ত্বেও মেয়েদের 'আসল' জায়গা যে ঘর, ভাবনার স্তরে সেই ধারণা পরিব্যপ্ত হয়ে গেছে। ফলে পশ্চিমবাংলায় মেয়েদের মধ্যে দারিদ্র্য থাকলেও অর্থকরী কাজে বিশেষত বাইরের কাজে যোগদানের হার ঐতিহাসিকভাবেই বোধহয় কম থেকে গেছে।

উনিশ শতকের ইতিহাসে অনধিকারী হিসাবে আত্মপক্ষ সমর্থনে শেষে বলা যায় যে মধ্যবিত্ত, পেশাদারি বাঙালি মেয়েদের আত্মানুসন্ধানের ইতিহাসের বাইরে এক বিশাল সংখ্যক শ্রমজীবী মেয়েও এসময়ের বাংলার মেয়েদের ইতিহাসের অঙ্গ। তাঁদের প্রতি নীরবতাও এক ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা। সেই ধারাবাহিকতাই অক্ষুণ্ণ থাকে যখন আজও বাংলার শ্রমিক সংগঠনে নারী শ্রমিকদের দাবিদাওয়া আন্তরিক গুরুত্ব পায় না বা কৃষক সংগঠনে কৃষিজমিতে মেয়েদের উত্তরাধিকারের দাবি উল্লেখিত হয় না।

জাতীয় সংগ্রামে যৌবনবাদ

অনুরাধা রায়

প্রস্তাবনা

আমাদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম প্রসঙ্গে নরম পন্থা, চরম পন্থা, কংগ্রেসি ধারা, গান্ধীবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদির কথা বহু-আলোচিত। যৌবনবাদ প্রায় অনুল্লিখিত। (১) কিন্তু মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসকে নিছক ঘটনা, সংগঠন বা সুসম্বদ্ধ আদর্শভিত্তিক কাজকর্মের ইতিহাস না ধরে যদি বলি মেজাজ-মানসিকতার ইতিহাস, তাহলে যৌবনবাদকে গুরুত্ব দিতেই হয়। যৌবনবাদও আদর্শ; তবে ঠিক সুচিন্তিত মতাদর্শ নয়, বরং একটা আবেগ যার ভিত্তি যৌবনের আদর্শায়ন। এটি বিকশিত হয়েছিল মোটামুটি গত শতকের বিশের দশকের বাংলায়—রাজনীতি ও সাহিত্যে, বিশেষ করে কাব্যে। মুক্তিসংগ্রাম যদি মেজাজ-মানসিকতার ব্যাপার হয় তাহলে তার ক্ষেত্র যে শুধু রাজনীতি নয়, সাহিত্য তথা কাব্যও—এ কথা বলাই বাহুল্য। যেটা বলা দরকার তা হল সেদিনের মুক্তিসংগ্রাম যৌবনবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বটে, কিন্তু যৌবনবাদের আবেগ শুধু মুক্তিসংগ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তার একটা সর্বতোমুখী ও আন্তর্জাতিক চেহারা ছিল। অবশ্য মুক্তি শব্দটি ব্যাপক অর্থবহ। বিদেশি ঔপনিবেশিকের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সীমিত দাবি দিয়েই তাকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে তার কোন মানে নেই। এইসময় জাতীয় মুক্তি সংগ্রামেও স্পষ্টতই একটা সর্বব্যাপিতা ও আন্তর্জাতিকতা এসে পড়েছিল। আবার যৌবনবাদের একটা বিমূর্ত চেহারাও ছিল। মুক্তিসংগ্রামের সক্রিয়তার সঙ্গে এই বিমূর্ত দিকটি মেলানো আপাত-কঠিন এবং এটা প্রধানত বিধৃত হয়েছিল সাহিত্যেই। তবু এই দিকটাও আমাদের আলোচনায় একেবারে বাদ দেওয়া যাবে না। কারণ, খণ্ডিতভাবে নয়, সব মিলিয়েই যৌবনবাদকে বুঝতে চাই আমরা। আর এটাও মনে হয় যে সেদিন দেশ যদি বিদেশি-পদানত না হত, যদি রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্রভাবে অনুভূত না হত, তাহলে বোধহয় যৌবনবাদও (জাতীয়, আন্তর্জাতিক, বিমূর্ত, কার্যকরী যেকোন চেহারাতেই) এখানে বিকশিত হতে পারত না।

একটু অন্যভাবে বলি। যৌবনবাদ যেন জাতীয় সংগ্রামের ছবি আঁকায় sfumato-র প্রয়োগ। সে ছবির মাঝখানটা বেশ স্পষ্ট। সেখানে স্বদেশের রাষ্ট্রীয়

স্বাধীনতা অর্জনের আয়োজন। এই কেন্দ্রকে ঘিরে আছে সর্বমানবের সর্বাত্মক মুক্তির একটা আদর্শ—সামাজিক, অর্থনৈতিক সর্বক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে। এই জায়গায় আছে দরিদ্রের লাঞ্ছনা, নারীর অবদমন, ধর্মের ভণ্ডামি ইত্যাদি অনেক কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এখান থেকেই ছবিটা ক্রমে অস্পষ্ট হতে সুরু করেছে। পরের দিকে ছবির বহিঃরেখা একেবারেই ঝাপসা—যেন একটা বিচ্ছুরণ। এখানে আছে শুধুই একটা মেজাজ—প্রবল প্রাণচঞ্চল্য ও বেপরোয়া বিদ্রোহের তাগিদ—অর্থহীন, অকারণ। আছে নতুন কিছু করার আগ্রহ। যা ইচ্ছে করার, এমনকি ভুল করার অধিকার দাবি। আছে বিপদের মুখে ঝাঁপ দেবার উন্মাদনা। আর অবশ্যই আছে নর-নারীর প্রেমের আকুলতা—সে প্রেম প্রায়ই সমাজবিধিকে অমান্য করে, বেশ জটিল পথে যায়। এই তিনটি স্তর মিলিয়েই যৌবনবাদকে আমাদের বুঝে নিতে হবে।

যৌবনবাদ বলে ঠিক কোন শব্দ সমসাময়িকরা ব্যবহার করতেন না। কিন্তু যৌবন নিয়ে তাঁদের প্রবল উচ্ছ্বাস, যৌবনের ওপর প্রচণ্ড গুরুত্ব আরোপ খুবই প্রকট। যৌবনই তাঁদের কাছে মানব-মাহাত্ম্যের, সাহসী বিদ্রোহের ও মানব-সভ্যতার সব সমস্যা সমাধানের প্রতীক হয়ে ওঠে। তাই 'যৌবনবাদ' কথাটাও তাঁদের ক্ষেত্রে সংগতভাবেই প্রয়োগ করা যেতে পারে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, অসহযোগ আন্দোলন ও যৌবনবাদের সূচনা

বাঙালির যৌবনবাদের সূচনা মোটামুটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। যুদ্ধে ব্রিটিশ ভারতীয়দের সাহায্য গ্রহণ করেছিল। সাধারণ গরিব ও মধ্যবিত্ত ঘরের বহু তরুণ যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। সে অবশ্য শাসকদের সহায়তার জন্যই। কিন্তু, এদের সবাই না হলেও, বেশ অনেকেই ভেবেছিল যে যুদ্ধে যাওয়াটা দেশপ্রেমের কাজ—এতে করে বিদেশির পদানত ও অস্ত্রবলে অনধিকারী ভারতবাসী শিখবে যুদ্ধবিদ্যা, যে শিক্ষা স্বাধীনতাযুদ্ধের সাফল্যের জন্যই একান্ত দরকার। একদা যে বালক বন্ধুর কাছে এয়ারগান ধার করে গাছের এক একটি পেঁপেকে বড়লাট ছোটলাট, ডি এম বা এস ডি ও কল্পনা করে হাতের নিশানা ঠিক করত সেই নজরুল ইসলাম তো অনেকটা এই ভেবেই স্কুল পালিয়ে ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়েছিলেন। (২) *বাঁধনহারা পত্রোপন্যাসে* (৩) করাচির সেনানিবাস থেকে লেখা নুরুল হুদার একটি চিঠিতে এই উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত। যুদ্ধে যোগ না দিলেও ঐ সময় সরকারের ভারতরক্ষা বাহিনীর বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় যোগ দিয়ে সামরিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। তিনিও যেদিন রাইফেল নেবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ামের ভিতর মার্চ করে প্রবেশ করলেন, তাঁরও সেদিন পরম তৃপ্তি—'যেন আমরা এমন একটা কিছুর দখল নিচ্ছি, যাতে আমাদের একটা জন্মগত অধিকার আছে, অথচ যা থেকে আমাদের অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে'। (৪)

দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ প্রভুকেও তাহলে ভারতীয়দের কাছে সামরিক সাহায্য নিতে হয়—এই উপলব্ধি ভারতবাসীর, ভারতীয় তরুণদের তো বটেই, মর্যাদাবোধ ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করল।

বাংলা সাহিত্যে যুদ্ধ প্রসঙ্গে মেজাজের দিক থেকে যেটা বড় হয়ে দাঁড়াল তা হল রণভেরীর শব্দে জেগে ওঠার আহ্বান, শত্রুর দম্ভ খর্ব করার প্রয়াস, বিজয়-হুঙ্কার আকাশে তোলা, ইত্যাদি। প্রমথনাথ চৌধুরীর (*সবুজপত্রের* নন) *পাষাণ* কাব্যগ্রন্থের 'বাহবা বাঙালি', 'কালা পল্টন' প্রভৃতি জঙ্গী রণযাত্রার কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে। এই জঙ্গী মেজাজটা গুরুত্বপূর্ণ, লক্ষ্য তখনো পর্যন্ত ব্রিটিশ-বিরোধী না হলেও। আর যেহেতু মেজাজটা যুদ্ধযাত্রা-সংক্রান্ত এবং যুদ্ধে তরুণরাই প্রধানত অংশ নেয়, তাই এই মেজাজ তারুণ্য-গৌরবের ধারণার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট বটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত মোটের ওপর শিক্ষিত বাঙালি মানসে শক্তি, সাহস ও তারুণ্যকে উত্তেজিত করে তুলল। (৫)

যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের *মর্মগাথা* কাব্যগ্রন্থের 'দেশের দাবী' কবিতাটি ১৯১৪ সালে লেখা। এখানে দেশের উন্নতি-চিন্তার সঙ্গে যুবশক্তির আবাহনকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। চীন-জাপান, ইওরোপ-আমেরিকার জাগরণ-গীতি গেয়ে ছুটে চলার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে কবি বিশেষ করে দেশবাসী যুবকদেরই ডাক দেন—'তোরা প্রেমের পুলকে আয়/যুগের সঙ্গে যুবক ব্যতীত কে আর যুঝিতে চায়।' ১৯১৪ সালেই প্রথম চৌধুরীর পত্রিকা *সবুজপত্র* বাংলা সাহিত্যে চমকপ্রদভাবে যৌবনের উজ্জীবনী শক্তি জাগিয়ে তুলতে চাইল। এই পত্রিকার যৌবনের দরবারে আমন্ত্রণ পেয়ে প্রৌঢ় কবি রবীন্দ্রনাথও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন-'ভরা যৌবনের দিনেও/যৌবনের সংবাদ/এমন জোয়ারের বেগে এসে লাগে নি আমার লেখনীতে।' (৬) তারুণ্যের প্রবল তাগিদেই তাঁর তখনকার রচনা 'সবুজের অভিযান'—'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,/ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ/আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা (বলাকা) (৭)। *বলাকা* কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতায় আছে যৌবনের জয়গান। যৌবনই যেন বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের মৃত্যুসাগর মন্থন করে অমৃত তুলে আনবে, প্রলয়-পারাবার পার হয়ে নতুন সৃষ্টির উপকূলে বিজয়ধ্বজা উত্তোলন করবে—'যৌবনেরই পরশমণি/করাও তবে স্পর্শ/দীপক-তানে উঠুক ধ্বনি/দীপ্ত প্রাণের হর্ষ/নিশার বক্ষ বিদার করে/উদ্বোধনে গগন ভরে/অন্ধ দিকে দিগন্তরে/জাগাও না আতঙ্ক/দুই হাতে আজ তুলব ধরে/তোমার জয়শঙ্খ।' (৮) তাছাড়া *বলাকার* ছত্রে-ছত্রে অনুরণিত হয়েছে চলার মন্ত্র। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অণু-পরমাণুতে এক উদ্দাম চাঞ্চল্য ও অদম্য গতিবেগ কবি অনুভব করেছেন, জীবনের মধ্যেও উপলব্ধি করেছেন দুরন্ত সচলতা, যা যৌবন-সজীবতার অনুষঙ্গ।

যৌবনবাদের আন্তর্জাতিকতার মাত্রাটাও এসেছিল অনেকটা ঐ বিশ্বজোড়া যুদ্ধের দৌলতেই। যুদ্ধের পর যখন দিকে দিকে দানা বেঁধে উঠল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী

আন্দোলন, সেগুলিও যেন একটা বিশ্বব্যাপী বিকাশের অঙ্গ হয়েই দেখা দিল (যার চূড়ান্ত পরিণতি দেখা যাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী জুড়ে সাম্রাজ্যের অবসানে।) বলশেভিক বিপ্লবের সামাজিক-অর্থনৈতিক বাণীও এইসময় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে লেখা নজরুলের 'ব্যথার দান' গল্পে রাজনৈতিক সচেতনতার এই নতুন মাত্রাটি স্পষ্ট—দুই ভারতীয় সৈনিকের বেলুচিস্তান থেকে সোভিয়েট সীমা অতিক্রম করে লালফৌজে যোগ দিতে যাওয়ায় এবং বিশ্বের অন্তরে অন্তরে শক্তি সঞ্চয়কারী তার মহান নিঃস্বার্থ উদ্যোগে প্রণোদিত হওয়ার উৎফুল্লতায়। ফৌজী তারুণ্যের এ এক নতুন রকম অভিব্যক্তি। ইতিমধ্যেই ইসলামী জগতে এসেছে এক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সংস্কারমনস্ক র‍্যাডিকালিজমের জোয়ার—একের পর এক 'তরুণ' আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ঘটছে তার প্রকাশ। ১৯০৮-এই 'ইয়ং টার্কস'-এর সুলতান-বিরোধী সফল বিদ্রোহ বিরাট আলোড়ন তুলেছিল। যুদ্ধের পরে তুরস্কে কামাল পাশার আন্দোলন যেমন বিশের দশকে 'ইয়ং আফগান'দের অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়াল (৯), সেরকম ভারতেও তার যথেষ্ট প্রভাব পড়ে।

আর আমাদের দেশে যুদ্ধের পরে হল অসহযোগ আন্দোলন। যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সংকট, নানান মানুষের নানান ক্ষোভ ও আশা-আকাঙক্ষা, জালিয়ানওয়ালাবাগের মত বীভৎসতা এবং অবশ্যই গান্ধী নামে এক অসাধারণ ব্যক্তির নেতৃত্ব ভারতবাসীকে নিয়ে গেল এই আন্দোলনের দিকে। খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে মিলে অসহযোগ আন্দোলন এক প্রবল প্রাণশক্তি জাগিয়ে তুলল জাতীয় জীবনে—যেন নতুন এক যুগের সূচনা হল। এই নতুনের বোধের সঙ্গে যৌবন বা যুবশক্তি কতটা সংশ্লিষ্ট ছিল সে প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। গান্ধীর অভিনব সব কথাবার্তা—স্বরাজ, আহিংসা ইত্যাদি—এগুলির মধ্যে যেন বেশ পরিণত মনের ধৈর্য ও স্থৈর্য, প্রাজ্ঞতা ও বিজ্ঞতার ধারণাই প্রকাশ পেয়েছিল। তাছাড়া খিলাফত আন্দোলন তো তুরস্কের সংস্কারমনস্কতাকে অগ্রাহ্য করে সেখানকার ঐতিহ্যিক শাসনতন্ত্রকেই সমর্থন করেছিল। তবু এটাও তো ঠিক যে গান্ধীর পত্রিকার নাম ছিল *Young India*, এবং অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধী প্রস্তাবিত তিন ধরণের বয়কটের একটি ছিল ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট। তাঁর আহ্বানে সত্যি দলে দলে ছাত্র স্কুল-কলেজ ছেড়েছিল। পিকেটিং, হরতাল, গ্রামে গ্রামে গিয়ে আন্দোলন সংগঠনে তারা বড় ভূমিকা নিয়েছিল। এইভাবে রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে তারা আগে বিশেষ আসে নি। সুতরাং দেশের মুক্তিসংগ্রামে যে ছাত্র-যুবকদের বড় ভূমিকা আছে, এই স্বীকৃতি তারা অসহযোগের দৌলতে পেয়েই গেল।

গান্ধী-নিরপেক্ষভাবেও অসহযোগের ভিতরে ভিতরে যৌবনোচ্ছ্বাস খানিকটা থেকেই গিয়েছিল। যেমনটি ধরা পড়েছে *মোসলেম ভারত* পত্রিকায় সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর দুটি কবিতায়। (১০) একটি 'নবীনের গান'। সেখানে জীবনের জয় ঘোষিত, শিকল ছেঁড়ার আহ্বান। পুরোটাই বেশ বিমূর্ত। আরেকটি কবিতা 'অদরকারের না', যেখানে নবীন তরুণ মাঝিকে মাঝদরিয়ায় 'উছল প্রাণের ঘূর্ণিমাঝে' 'অদরকারের

না'-এর হাল ধরতে বলছেন কবি, শঙ্খের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মৃত্যুপারের মেলায় যাবার জন্য। এই যে প্রাণশক্তির উচ্ছলতার প্রকাশ, এমনকি মরণকে অগ্রাহ্য করে জীবনকে মর্যাদা দেওয়া এবং প্রচলিত অর্থে যাকে 'দরকার' বলে তাকে তুচ্ছ করা এগুলি সবই যৌবনবাদের বিশিষ্ট লক্ষণ।

আর একটা বড় কথা—অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যেই যৌবনবাদের মন্ত্রগুরু হিসেবে নজরুলের আত্মপ্রকাশ। ১৯২০ সালে তাঁর পল্টন ভেঙে দিলে তিনি দেশে ফিরে বন্ধু মুজফ্‌ফর আহমদের সংসর্গে থেকে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করলেন, এবং দুজনে মিলে জুলাই মাস থেকে বের করতে লাগলেন প্রবলভাবে ব্রিটিশ-বিরোধী সান্ধ্য দৈনিক *নবযুগ।* (১১) তারপর অসহযোগ আন্দোলন সুরু হলে (জানুয়ারি, ১৯২১) নজরুল তাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পূর্ণ উৎসাহে। গান্ধীর সঙ্গে তাঁর জীবনদর্শনের অমিল প্রথমদিকে তেমন দুস্তর বলে মনে হয় নি। গান্ধীবাদেও তো ছিল ন্যায়ভিত্তিক সমাজচিন্তা, সাহসী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ। তবে অহিংস অসহযোগকে সমর্থন করতে গিয়ে নজরুল যেন এই সময় বিদ্রোহী যৌবনেরই শব্দভাণ্ডার তৈরি করছিলেন—তরুণ ঈশানকে প্রলয় বিষাণ বাজানোর আহ্বান জানিয়ে, ধ্বংসনিশান উড়িয়ে, 'ভাঙার গান' গেয়ে। বিশেষ করে এই 'ভাঙার গান'টি ('কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট') রচিত হয় অসহযোগের শেষাশেষি, যখন গান্ধীর নিয়ন্ত্রণ স্পষ্টতই আলগা হয়ে আসছিল। (১২) আর ঐ সময়েই (জানুয়ারি, ১৯২২) প্রকাশিত হল তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী', যে বিদ্রোহী অবশ্যই তরুণ (১৩)। এই কবিতা বিশেষ করে শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। কবিতাটিতে দেশের মুক্তিসংগ্রামের কথা সরাসরি না বললেও উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল থামাবার সংকল্প ছিল। যৌবনবাদের ধ্বংসাত্মক বিদ্রোহের কল্যাণসুন্দরে উত্তরণের সম্ভাবনা তৈরি হল এভাবেই। তার সঙ্গে অবশ্য 'গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি'র চটুল আকর্ষণও ছিল। আর বিদ্রোহের সবটা যে খুব গঠনমূলক ও অর্থবহ তাও নয়। তবু সর্বোপরি এ কবিতার বিদ্রোহী মেজাজটাই নবশক্তি সরবরাহ করল জাতীয় সংগ্রামকে।

'বিদ্রোহী'র প্রভাবের কথা প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্মৃতিচারণায়—'হঠাৎ আর একটা তীব্র প্রবল তুফানের ঝাপটা কাব্যের রূপ নিয়ে তরুণ মনকে উদ্বেল করে তুলেছিল "আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি/আমি পথসম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি।" কবিতার ছন্দে ও ভাষায় একি উত্তাল তরঙ্গ। কার কণ্ঠে এ প্রচণ্ড কল্লোল, কিশোর জগতে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। জেগে উঠেছিল একটা রোমাঞ্চিত শিহরণ।' (১৪) অপেক্ষাকৃত অরাজনৈতিক যে বুদ্ধদেব বসু, তাঁরও প্রতিক্রিয়া—'বিদ্রোহী পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিক পত্রে—মনে হল এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগ অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মনপ্রাণ যা কামনা করেছিল, এ যেন তাই। দেশব্যাপী উদ্দীপনার এই যেন বাণী। (১৫) নজরুলের এই তরুণ বিদ্রোহীকে ইতিপূর্বে *বাঁধনছাড়া* উপন্যাসেও দেখা

গিয়েছিল। তবে কবিতাটি তার পাঠকপ্রিয়তার কারণেই বাংলায় বিদ্রোহী যৌবনবাদের অধ্যায়টির ভূমিকা হিসেবে গণ্য হতে পারে। তারপর বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলায় তিনি যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তা সেদিনের যুবক পরিমল গোস্বামীর ভাষায় 'গালভানির মত তিনি যে বাংলায় যুবশক্তি মৃত ব্যাঙের মত পড়ে আছে, তার মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করতে এসেছেন তাঁর বিদ্যুজ্জনন যন্ত্র নিয়ে।'(১৬)

উত্তর-অসহযোগ পর্বের রাজনীতি ও যৌবনবাদ

বাংলার রাজনীতিতে অসহযোগ-পরবর্তী পর্ব মানে গান্ধীবাদ সম্পর্কে মোহভঙ্গ ও বিকল্প পথের সন্ধান। আর অবশ্যই যৌবনের নবোচ্ছ্বাস—গান্ধীর রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক আদর্শ যে যৌবনের নাপসন্দ, তাঁর অহিংস কর্মপদ্ধতিও যার কাছে মনে হয় নিষ্প্রভ। এই সময় বাংলায় প্রবল হয়ে উঠল সেই যৌবনের ধারণা যার শক্তি স্থৈর্য-সমঝোতায় নয়, বরং নাকি সজীবতায় ও উদ্দামতায়; যা নাকি সিদ্ধির সন্ধান করে কূটকৌশলের আশ্রয়ে নয়, একান্তিক আবেগ ও আগ্রহে, আত্মত্যাগের মহৎ দুরূহ পথে। এই বিদ্রোহী যৌবন-অভিযাত্রার সেনাপতি হয়ে নজরুলই সেদিন সবথেকে উচ্চকণ্ঠে ও আবেগাপ্লুত স্বরে যুবকদের আহ্বান জানিয়েছিলেন বিকল্প রাজনীতিতে—'নবীন মন্ত্রে দানিতে দীক্ষা আসিতেছে ফাল্গুণী/জাগোরে জোয়ান! ঘুমায়ো না ভূয়ো শান্তির বাণী শুনি,/অনেক দধীচি হাড় দিল ভাই/দানব দৈত্য তবু মরে নাই/সূতো দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, বসে বসে কাল গুনি!/এ নিরস্ত্র বন্দীর দেশে হে যুগ শস্ত্রপণি!/পূজা করে শুধু পেয়েছি কদলী/এইবার তুমি এস মহাবলী/রথের সম্মুখে বসায়ো চক্রী চক্রধারীরে টানি'/আর সত্য সেবিয়া দেখিতে পারি না সত্যের প্রাণহানি।' (১৭)

যৌবনবাদের প্রাধান্য সত্ত্বেও কোন তথাকথিত 'যুব' আন্দোলন (ইয়ং টার্কস বা ইয়ং আফগানদের মত) কিন্তু এখানে হয় নি। নির্মল নিঃস্বার্থ নির্ভীক নবযৌবনের রাজনীতির সর্বোত্তম রূপ পরিলক্ষিত হল বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপে। আরেক বিকল্প পথের পথিক সাম্যবাদীরাও কাজ করেছিল যৌবনবাদের আবহে। এমনকি কংগ্রেসি আন্দোলনের মধ্যেও সুভাষচন্দ্র বসু বা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মত নতুন প্রজন্মের নেতাদের প্রাধান্য বিস্তারে এবং ছাত্র-আন্দোলনের গুরুত্ব লাভের মধ্যে যৌবনবাদের জয় ঘোষিত হয়। রাজনীতির সর্বত্রই সেদিন যৌবনবাদ। স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা ধারায় অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক গোপাল হালদার দেশের ও তাঁর নিজের সেইসব যৌবনের দিনের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন 'ইতিহাসে যে কালান্তর আরম্ভ হয়েছিল, তা প্রতিদিনই দুর্বারতর হয়। দেশে স্বাধীনতার উন্মাদনা—সে যৌবন জলতরঙ্গে আমাদের যৌবন উজান বইতে চায়। ঘাতপ্রতিঘাতে এক একবার চঞ্চল হয়ে উঠতে হত।' (১৮)

নজরুল-সম্পাদিত *ধূমকেতু* পত্রিকা (অগাস্ট-অক্টোবর ১৯২২), যার উদয় ও বিদায় ধূমকেতুর মতই, মাত্র তিন মাসের মধ্যেই উত্তর-অসহযোগ জাতীয় আন্দোলনের দিক নির্ণয়ে সাহায্য করেছিল। 'কালির বদলে রক্ত ডুবিয়ে লেখা' সেই সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধের সুতীব্র প্রভাবের কথা বলেছেন সেদিনের যুবক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। (১৯) প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্মৃতিচারণায়—'ধূমকেতু একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা তো নয়, বিদ্রোহী দুরন্ত যৌবনের জয়পতাকা।' (২০) *ধূমকেতু* দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য ঘোষণা করল, আর তার জন্য যে পন্থার কথা বলল সেটা অস্পষ্ট হলেও খুব জঙ্গী মেজাজের। এই পথকে স্পষ্টতা দিতে এগিয়ে এলেন বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা, যাঁরা গান্ধীর আশ্বাসে এক বছরের জন্য নিজেদের কাজকর্ম মুলতুবি রেখে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলে আবার ফিরে আসতে চাইছিলেন নিজেদের কর্মধারায়। এঁরা *ধূমকেতুর* গর্জনে প্রচুর উৎসাহ পেলেন। সেখানে নজরুলের 'ক্ষুদিরামের মা'-র মত রচনা (২ আশ্বিন, ১৩২৯) তো সরাসরি বিপ্লবী প্রচেষ্টা উত্তেজিত করার প্রয়াস—'তোমরা চিনতে পারছ না, তোমরা মায়ায় আবদ্ধ। ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও আমাদের ক্ষুদিরামকে—তোমাদের ছেলেদের ছেড়ে দাও, ওরা আমাদের আমাদের লক্ষীছাড়া দলের। ওরা মায়েদের নয়, ওরা বনের। ওরা হাসির নয়, ফাঁসীর।' আশ্চর্য নয় যে যুগান্তর দল *ধূমকেতুকে* নিজেদের মুখপত্র বলে প্রচার করেছিল। (২১)

তনিকা সরকার তাঁর *Bengal : Politics of Protest, 1928-34* গ্রন্থে (২২) বিশের দশকে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের অভ্যুত্থানের একটি বড় কারণ হিসেবে যৌবন-গরিমার রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, যৌবন-গরিমার ধারণাকে কেন্দ্র করে একটা নিটোল সুসংহত দেশপ্রেমের দর্শন গড়ে তোলা হয়েছিল মধ্যশ্রেণীর হিন্দু ঘরের তরুণদের জন্য। যৌবনের সঙ্গে স্বাধীনতা-প্রেম আত্মত্যাগ, মৃত্যুঞ্জয়ী সাহস ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট করা হয়েছিল এই দর্শনে। এই মেজাজটাকে জাগিয়ে তোলার জন্য প্রায়ই *গীতা* থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হত। ডে-হত্যার (১৯২২) পর সরকারি দমন-পীড়নে সাময়িকভাবে সন্ত্রাসবাদের এই পর্বটির সমাপ্তি ঘটে। ১৯২৮ নাগাদ সন্ত্রাসবাদীদের নতুন কর্মোদ্যোগ দেখা যায়। পুরোনো নেতদের দলাদলি ও সাবধানী মনোভাবের জায়গায় তরুণ সদস্যরা নিয়ে এল অনেক বেশি ঔদার্য ও জঙ্গী কৌশলগত চিন্তাভাবনা। এই সময় থেকে বিপ্লবীরা বিদেশী শাসককে বড়সড় আঘাত হানবার প্রস্তুতি নিতে থাকে। চট্টগ্রামের মত জেলায় বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ তরুণদের ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করে। ১৯৩০ সালে গান্ধী-আহূত আইন-অমান্য আন্দোলনের মধ্যেই যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হল তার কুশীলবদের অন্যতম কালীপদ চক্রবর্তী সেই অগ্নিযুগের স্মৃতিচারণ করেছেন—'সেদিন এই রাজনীতি মেশানো ক্লাব আন্দোলনের ফলে (ক্লাবগুলির বাইরের উদ্দেশ্য ছিল শরীরচর্চা, কিন্তু ভেতরে ভেতরে চলত বিপ্লবী তৎপরতা) শহরে তো বটেই,

জেলার প্রতি গ্রামে গ্রামে তরুণ ছাত্রদের বেশির ভাগই দলের বা দলের আওতায় এসে পড়েছিল। তখনকার দিনে তরুণ দেখলেই বা তার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বললেই বোঝা যেত যে সে কোন না কোন দলের সদস্য। তার কথাবার্তা, চালচলন ইত্যাদি সবটাই যেন একটা শৃঙ্খলার সাক্ষ্য বহন করত।' (২৩) চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল, জালালাবাদের যুদ্ধ এই পর্বের সন্ত্রাসবাদকে স্মরণীয় করে রেখেছে তো বটেই, অত বড় বিপ্লব-প্রচেষ্টা আর না হলেও কয়েকবছর ধরেই ঘটে আরো নানা বিস্ফোরক ঘটনা। অনেক ইংরেজ রাজপুরুষ ও পুলিশ অফিসারকে বিপ্লবীদের শিকার হতে হয়। তরুণদের সঙ্গে তরুণীরাও এই প্রথম এই ধরণের কাজকর্মে সরাসরি অংশ নিল। ১৯৩০-এ রাইটার্স বিল্ডিং-এ বিনয়-বাদল-দীনেশের অলিন্দ-যুদ্ধও এই পর্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৯৩১-এর এপ্রিল মাসে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসির প্রতীক্ষায় রত কুড়ি বছরের দীনেশ গুপ্ত বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানান একটি চিঠিতে এবং সেই উপলক্ষে তারুণ্যের জয়জয়কার করেন, যদিও দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি তাঁর তারুণ্যের জয়যাত্রার পক্ষে অনুকূল মনে হয় নি—'নতুন বছর সুরু হয়েছে, আটত্রিশ সনের ভেতরে সাঁইত্রিশ সন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। নতুনের কাছে পুরাতন হার মেনেছে। গাছের জীর্ণ পাতা ঝরে পড়ে নব কিশলয়কে স্থান ছেড়ে দিচ্ছে। প্রকৃতির এই নিয়ম। নিরন্তর ভগবানের চিরনবীন সত্যমূর্তি এর ভেতর দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে আমাদের যত নিয়ম-কানুন সবই উল্টো : এখানে বুড়োরা সমাজ ও রাষ্ট্রে নিজেদের একেবারে অচল, অনড় করে রেখে দিয়েছে। গদী তো ছাড়বেই না, বরং সময় অসময় চোখ রাঙ্গাবে আর এঁড়ে গলায় চিৎকার করে একথাই জানিয়ে দেবে যে বুড়ো হয়ে চোখ কান আর আত্মসম্মানের মাথা না খাওয়া পর্যন্ত কেহই কোন কার্যের যোগ্য হয় না। আমাদের দেশে তরুণেরাও সাপের মাথায় ধুলো পড়ার মত এসব কথা শুনে নিজেদের বল-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। এটা তারা কিছুতেই বুঝবে না যে, বৃদ্ধ ও তরুণের মত ও পথ চিরকাল ভিন্ন। এদের এক করতে গেলে তরুণকে বৃদ্ধ হতে হবে, নয়তো বৃদ্ধকে তরুণ হতে হবে। এদেশে তরুণরাই বৃদ্ধ হয়।' (২৪)

ইতিমধ্যে স্বাধীনতার লক্ষ্য বিস্তারিত হতে সুরু করেছে সমাজবাদে। শ্রমিক-কৃষকদের (বিশেষত শ্রমিকদের) নিয়ে সাম্যবাদী আন্দোলন গড়ে উঠতে লাগল, অনেক পুরোনো বিপ্লবপন্থীও (বিশেষ করে অনুশীলন দলের) আকৃষ্ট হলেন মার্কসবাদে, সেখানেও বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন বাংলার সাম্যবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ মুজফফর আহমদের সুহৃদ ও রুশবিপ্লব-মুগ্ধ নজরুল। লেবার-স্বরাজ পার্টির মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হল তাঁর সম্পাদিত *লাঙল ও গণবাণী* (যথাক্রমে ডিসেম্বর, ১৯২৫ ও অগাস্ট, ১৯২৬)। এই কাগজদুটিতে নজরুলের একাধিক কবিতায় দরিদ্রের বঞ্চনা শুধু নয়, নারী-পুরুষের সমাজ-বৈষম্য, পাদ্রী-পুরুত-মোল্লার অনাচার সবকিছুরই প্রতিবাদ শোনা গেল। একদা বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর

অনুগামী এবং এই সময় সাম্যবাদে দীক্ষিত রণেন সেনের স্মৃতিচারণায় মার্কসীয় বইপত্র বা ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা সাকলাতওয়ালার সঙ্গে কাজীসাহেবের প্রভাবের কথাও আছে —'সেযুগে বাঙালির সবথেকে বোধহয় প্রিয় কবি, যাঁর লেখা পড়বার জন্য বা আবৃত্তি ও গান শোনবার জন্য বিশেষ করে যুবসমাজ ব্যাকুল হয়ে থাকত, 'বিদ্রোহী' কবিতায় ও *ধূমকেতুতে* তাদের উচ্চকিত করে তারপর তিনিই বের করলেন *লাঙল* ও লিখলেন 'সিক্ত যাদের সারা দেহমন মাটির ক্ষমতা রসে/এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরই বশে।'(২৫)

যৌবনবাদ প্রাধান্য লাভ করেছিল বাংলা কংগ্রেসেও। গান্ধী সম্পর্কে অনেক সমালোচনা সত্ত্বেও সেদিনকার রাজনীতির সর্বাগ্রগণ্য সংগঠন কিন্তু কংগ্রেসই। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী ও সাম্যবাদীরাও তাকে মাথায় রেখেই এগিয়েছিলেন। ১৯২৪ পর্যন্ত বাংলা কংগ্রেসের নেতা ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, বয়স্ক ব্যক্তি হলেও গান্ধীর সঙ্গে তাঁর মতাদর্শগত পার্থক্যের কথা সুবিদিত এবং তাঁর দেশপ্রেমের বলিষ্ঠতা নানা মতধারার মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। তাদের মধ্যে নতুন প্রজন্মের অনেক তরুণও ছিলেন। চিত্তরঞ্জনের দুই তরুণ শিষ্য সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন ছাত্রদের সঙ্গে তো বটেই, তরুণ বিপ্লবীদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলতেন। সুভাষ তো নিজেই হয়ে উঠেছিলেন রাজনীতিক্ষেত্রে নবজাগ্রত তারুণ্যের এক বড় প্রতীক। বস্তুত, বিভিন্ন ধারার রাজনীতির মধ্যে আবেগগত এমনকি সাংগঠনিক যোগাযোগ সে যুগের বাংলার রাজনীতির বৈশিষ্ট্য(২৬), এবং সে আবেগের একটি প্রধান উপাদান যে যৌবনবাদ (দেশাত্মবোধের সঙ্গে) একথা বললে নিশ্চয় ভুল হবে না। কংগ্রেস-প্রীতি তথা গান্ধী-ভক্তি (গান্ধীবাদের জন্য ততটা না হলেও অনন্যসাধারণ নেতা হিসেবে), বিপ্লবী সক্রিয়তা বা সহানুভূতি এবং সাম্যবাদী প্রবণতা একই আধারে সহাবস্থান করত। মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, নজরুলও ১৯২৬ সালে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য হয়েছিলেন, এমনকি কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনেও দাঁড়িয়েছিলেন (যদিও পরাজিত হন)। গান্ধীর প্রতি যথেষ্ট বিরূপতা সত্ত্বেও ১৯২৪ সালে গান্ধীর বাংলায় আগমন উপলক্ষে তাঁকে ও তাঁর চরকাকে নিয়ে গান-কবিতাও রচনাও করেছিলেন।

১৯২৩ সালে সুভাষচন্দ্র রাজনীতির পথসন্ধান দিতে গিয়ে 'তরুণের স্বপ্ন' লিখলেন একেবারে কবির ভাষায়(২৭)—'যৌবনের পূর্ণ জোয়ারে আমরা ভাসিয়া আসিয়াছি সকলকে আনন্দ দিবার জন্য, কারণ আমরা আনন্দের স্বরূপ। আশা উৎসাহ ত্যাগ ও বীর্য লইয়া আমরা আসিয়াছি। আমরা আসিয়াছি সৃষ্টি করিতে, কারণ সৃষ্টির মধ্যেই আনন্দ। আমরা আনিয়া দিই পুরাতনের মধ্যে নূতনকে, জড়ের মধ্যে চঞ্চলকে, প্রবীনের মধ্যে নবীনকে এবং বন্ধনের মধ্যে অসীমকে। আমরা অতীত ইতিহাসলব্ধ অভিজ্ঞতা সব সময় মানিয়া লইতে প্রস্তুত নই। অজানা ভবিষ্যৎ আমাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। আমরা চাই 'the right to make blun-

der' অর্থাৎ ভুল করিবার অধিকার। তাই আমাদের স্বভাবের প্রতি সকলের সহানুভূতি নাই, আমরা অনেকের নিকট সৃষ্টিছাড়া ও লক্ষ্মীছাড়া। আমরাই দেশে বিদেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করিয়া থাকি। আমরা শান্তির জল ছিটাইতে এখানে আসি নাই। বিবাদ সৃষ্টি করিতে, সংগ্রামের সংবাদ দিতে, প্রলয়ের সূচনা করিতে আমরা আসিয়া থাকি। যেখানে বন্ধন, যেখানে গোঁড়ামি, যেখানে কুসংস্কার, যেখানে সংকীর্ণতা সেখানেই আমরা কুঠার হস্তে উপস্থিত হই। যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুগে যুগে আমরা হাসিতে হাসিতে রক্তদান করিয়াছি সেই স্বাধীনতা সর্বতোমুখী। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল দিকে আমরা মুক্তির বাণী প্রচার করিবার জন্য আসিয়াছি—কি সমাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি রাষ্ট্রনীতি, কি ধর্মনীতি। তরুণের প্রসুপ্ত আত্মা যখন জাগরিত হইয়াছে তখন জীবনের মধ্যে সকল দিকে সকল ক্ষেত্রে যৌবনের রক্তিম রাগ আবার দেখা দিবে। এই যে তরুণের আন্দোলন এটা যেমন সর্বতোমুখী, তেমনি বিশ্বব্যাপী। ওগো আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরা ওঠো, জাগো, ঊষার কিরণ যে দেখা দিয়াছে।'

কংগ্রেসি রাজনীতির অঙ্গ হিসেবে ছাত্র আন্দোলন খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল এই সময়।(২৮) অসহযোগের সময়ই ছাত্রদের সম্বোধন করে চিত্তরঞ্জন দাশ বলেছিলেন—'ছাত্রগণ আমি তোমাদের কাছে মাথা নত করি।' সুভাষ বসু ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তও ছাত্রদের গুরুত্ব দিতেন খুব। নেতারা যেভাবে ছাত্র-যুবকদের সমর্থন লাভের জন্য তাদের 'তোয়াজ' করছিলেন তা নিয়ে সরকারি কাগজপত্রে ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। এরপর ১৯২৮ সালে 'গো ব্যাক, সাইমন' আন্দোলনে ছাত্ররা অগ্রণী ভূমিকা নিল। প্রেসিডেন্সী ও স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সম্পাদকদ্বয় ও আরো কিছু ছাত্রকে কর্তৃপক্ষ এই কারণে বহিষ্কার করলে ছাত্রবিক্ষোভ প্রবল হয়ে ওঠে এবং এই প্রথম গোটা বাংলাদেশের ছাত্রদের সংগঠন All Bengal Students' Association গঠিত হয় কংগ্রেসেরই আওতায়। যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এটি গঠিত হল তা অবশ্য বিঘ্নিত হয় কিছুদিনের মধ্যেই, সুভাষ ও যতীন্দ্রমোহনের সমর্থকদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও প্রথমোক্তদের পৃথক সংগঠন তৈরির ফলে। আইন-অমান্য আন্দোলনেও ছাত্রদের অংশগ্রহণে কালো ছায়া ফেলে এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। ছাত্রদের জঙ্গী ভাব যা ছিল, নেতাদের নিয়ন্ত্রণে তা তেমন মাথা তুলতে পারে নি। ১৯৩১-এর মার্চ মাসে গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে সহসা আন্দোলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হলে ছাত্ররা অনেকে হয়ত আশাহত হয়, কিন্তু তা মেনেও নেয়। অবশ্য এই সময় তাদের নাকি এমন বোঝানো হয়েছিল যে আন্দোলন শীঘ্রই আবার সুরু হবে। এমন কিছু সংস্থা তারা তৈরি করেছিল যেখানে নিছক শরীরচর্চা নয়, লাঠি ও ছোরা খেলাও শেখানো হত। হিংসাত্মক আন্দোলনের কথা যে তারা ভাবছিল তা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কলকাতা ও ঢাকা থেকে দূরে বিভিন্ন জেলায়। যেমন, ১৯৩১-এর এপ্রিল মাসে যতীন্দ্রমোহন ময়মনসিংহ ছাত্র সম্মেলনে যোগ দিতে গেলে তাঁর অহিংস নীতির

প্রতিবাদে লাঠি হাতে তাঁকে আক্রমণ করতে ওঠে কিছু ছাত্র। আইন-অমান্যের দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলায় ছাত্রদের কারাবরণের হার অনেক বেড়ে যায়। তবে মোটের ওপর তারা গান্ধীর অহিংস নীতি ও কর্মসূচীতেই (সভা, পদযাত্রা, পুস্তিকা-বিতরণ, পিকেটিং) নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে।

বলা বাহুল্য, আমরা এখানে জাতীয় আন্দোলনে যুবকদের অংশগ্রহণের ইতিহাস লিখতে বসিনি। সে তো উনিশ শতকে ইলবার্ট বিলের সময় থেকেই তারা অংশগ্রহণ করেছিল, এবং করেছিল আমাদের আলোচ্য সময়কালের পরেও—যৌবনবাদ স্তিমিত হয়ে গেলেও। কিন্তু যৌবনবাদের প্রভাবে এই সময় তাদের অংশগ্রহণে যে জোয়ার এসেছিল এবং সাইমন কমিশনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৮-২৯ সালে যে সেই জোয়ারের সবথেকে লক্ষণীয় স্ফীতাবস্থা, এটা আমাদের মনে রাখা ভাল। বস্তুত এই দু বছর সারা ভারতেই অজস্র ছাত্র-যুব সংগঠন ও সমাবেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলায় ১৯২২ সাল থেকেই জেলাস্তরে ছাত্র সংগঠন তৈরি হচ্ছিল। ABSA হল ১৯২৮-এ। ১৯২২-এ সুভাষের উদ্যোগে যে All Bengal Young Men's Association গঠিত হয়, ১৯২৮ সালে তাকে নবরূপ ও নবনাম দিয়ে তৈরি হল All Bengal Youth Association (মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নামের পরিবর্তন)। এই সংগঠনে যুগান্তর, অনুশীলন, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সব রকম তরুণই ছিল। তাছাড়াও বিক্ষিপ্ত ভাবে সারা বাংলার শহরে গ্রামে স্থানীয় স্তরে ছাত্র ও যুব সংগঠন গঠিত হতে থাকে।(২৯) তাদের মেজাজ ব্রিটিশ-বিরোধী, প্রধান কাজ বিপন্নের সেবা, পাঠাগার পরিচালনা, ব্যায়ামের ব্যবস্থা; সঙ্গে আমোদপ্রমোদ, গল্পগুজব ও বাদপ্রতিবাদও (৩০)। মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর নামে এক সুদুর গ্রামে ২১টি ছেলের এক তরুণ দলের খবর পাই, যারা নিজেদের গ্রামে তাঁতঘরে খদ্দর তৈরি করে, নিজেরা খদ্দর পরে, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে খদ্দর বিক্রী তো করেই, তারসঙ্গে গাঁয়ের লোকেদের সঙ্গে মিশে চরকা, একতা, অস্পৃশ্যতা-বর্জন ইত্যাদি আদর্শের কথা প্রচার করে (৩১)। চট্টগ্রামের যুব সংগঠনগুলির বিপ্লবী প্রবণতার কথা তো আগেই বলেছি। ১৯২৯-এর ১৪ই সেপ্টেম্বর লাহোর জেলে যতীন দাসের মৃত্যুতে তরুণদের ক্ষোভ উত্তাল হয়ে ওঠে। তারপর ১৯৩০-এর এপ্রিলে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন যৌবনবাদের বলিষ্ঠতম অভিব্যক্তি। আর আইন-অমান্য আন্দোলনের কথা তো একটু আগেই বললাম।

উল্লেখযোগ্য—জাতীয় রাজনীতির সেই উজ্জীবনের মুহূর্তে, ১৯২৯-এর ইস্টারের সময়, রংপুরে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর (অর্থাৎ প্রদেশ কংগ্রেসের অধিবেশনের) অব্যবহিত আগেই যে বঙ্গীয় যুব সম্মিলনী বসল, তার সভাপতির অভিভাষণে প্রবীণ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'তরুণের বিদ্রোহে' উদ্দীপিত হয়ে তাকে পথনির্দেশ দিতে এগিয়ে এসেছিলেন (৩২)। রাষ্ট্রিক সংঘ ও তরুণ সংঘ যে এক হয়েও মেজাজের দিক থেকে আলাদা এটা তার নিজেরই স্পষ্ট

করে বোঝা ও বলা উচিত, এই দাবি তিনি জানান। আর এটাও তিনি জানতেন যে বঙ্গীয় তরুণ সংঘকে সম্বোধন করলে বিপ্লববাদীদেরও অনিবার্যভাবেই সম্বোধন করা হবে। তিনি একদিকে কংগ্রেসী তরুণদের সাবধান করে দেন যাতে তারা কংগ্রেসের নিছক লেজুড় হয়ে নিরীহ সীমাবদ্ধ রাজনীতি না করে, অন্যদিকে বিপ্লববাদী তরুণদের অসহিষ্ণু অভিলাষ ও কল্পনার আতিশয্যকেও কিঞ্চিৎ সমালোচনা করেন। গান্ধীসহ বয়স্ক সব নেতাদের সাবধানী কৌশলী নীতির তীব্র সমালোচনা করে (বিশেষ করে মাদ্রাজ কংগ্রেসে সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতার দাবী পাশ হবার পরেও কলকাতায় পশ্চাদপসরণ করে ডোমিনিয়ন স্টেটাস ফিরে চাইবার জন্য) তিনি ঘোষণা করেন যে সেদিনের রাজনৈতিক সম্ভাবনাকে সার্থক করে তোলার ভরসা শুধুমাত্র বাংলার এই যৌবনশক্তির জাগরণে। তিনি বলেন, স্বাধীনতা কখনই দাতার দক্ষিণ হস্তের দান হতে পারে না, তার জন্য মূল্য দিতে হবে—'কিন্তু কোথায় মূল্য? কার কাছে আছে? আছে শুধু যৌবনের রক্তের মধ্যে সঞ্চিত। সে অর্গল যতদিন না মুক্ত হবে কোথাও এর সন্ধান মিলবে না। সেই অর্গল মুক্ত করার দিন এসেছে। দেশ কি বাঁচায় বুড়োরা? ইতিহাস পড়ে দেখ। তরুণ শক্তি নিজের মৃত্যু দিয়ে দেশে দেশে কালে কালে জন্মভূমিকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে গেছে।'

হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছিন্নতা ও যৌবনবাদ

উত্তর-অসহযোগ পর্বের রাজনীতির যেকোন আলোচনায় হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছিন্নতার কথা আসতে বাধ্য। অসহযোগ আন্দোলনের সময় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জোয়ার এসেছিল। তারপরেই কিন্তু প্রবল দ্বন্দ্ব সুরু হল। আমাদের আলোচ্য যৌবনবাদের প্রেক্ষাপটে এই ব্যাপারটা খুবই সক্রিয় ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্যের নানা জায়গায় প্যান-ইসলামিজমের উদ্দীপনা এখানকার মুসলমানদেরও ছুঁয়েছিল। দ্রষ্টব্য ১৩৩১ সালে দেখা নজরুলের 'সুবেহ উন্মাদ' কবিতা (৩৩)—'জাগিল আবার ইরান, তুরান, মরক্কো, আফ্‌গান, মেসের/সর্বনাশের 'পরে পৌষমাস এল কি আবার ইসলামের?' *মোসলেম ভারত* পত্রিকায় 'বিদ্রোহী'-র সঙ্গে একত্রে প্রকাশিত হয় তাঁর 'কামাল পাশা' (৩৪)। কামাল কিন্তু ধর্মীয় রাষ্ট্রের নয়, আধুনিক সাধারণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। তিনি বা সমসাময়িক অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের জঙ্গী নেতারা নজরুলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন ধর্মীয় কারণে ততটা নয়, যতটা ঐসব রাষ্ট্রে জাগরণের মেজাজ আনার জন্য। নিগৃহীত মুসলমানদের জন্য নজরুল যে ধর্মনেতার থেকে রাষ্ট্রবীরের আবির্ভাবই বেশি চেয়েছিলেন তা ১৩৩৩ সালে রচিত 'খালেদ' কবিতায় স্পষ্ট—'চাহি না মেহদি, তুমি এস বীর হাতে নিয়ে শমসের।' (৩৫) মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের কর্মকাণ্ডে কবি খুঁজে পেয়েছিলেন যৌবনের উদ্দামতা, যে উদ্দামতা তিনি পরাধীন ভারতেও কামনা করেছিলেন।

নজরুলের ভারতীয় জাতীয়বাদ সব সন্দেহের উর্ধ্বে। তবু মুসলমানদের জন্য তাঁর বিশেষ চিন্তা ও উদ্বেগ স্বাভাবিক কারণেই ছিল। গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও অশিক্ষায় আচ্ছন্ন মুসলমান সমাজে তিনি বিশেষ করে তারুণ্যের আবাহন করতে চেয়েছিলেন। ১৯৩২ সালে সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে তিনি ফতুয়াধারী ফতোয়াবাজ মোল্লা মৌলবীদের হাত থেকে গরীবদের বাঁচাতে আহ্বান জানান মুসলমান তরুণদের। হিন্দু যুবকদের ঐক্য ও ত্যাগ থেকে শিক্ষা নিতে বলেন তাদের—তরুণ বীর সন্ন্যাসী যারা অনায়াসে ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিস্টার প্রফেসার হয়ে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন করতে পারত, তারা রাস্তায় প্রাণ ফিরি করে ফিরছে এই দেখে উদ্বুদ্ধ হতে বলেন। (৩৬) ১৯২৯-এ চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষেও তিনি সেই স্বপ্নের কথা বলেন যা বাঙলার তরুণ মুসলিমের, প্রবুদ্ধ ভারতের, বিংশ শতাব্দীর নব-নবীনের, যে স্বপ্ন সফল করতে গেলে বিশ্বের এই নব অভ্যুদয়ের দিনে সকলের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে হবে তাদের।(৩৭) উল্লেখ্য, রক্ষণশীল হিন্দু মুসলমান গোষ্ঠীগুলির তীব্র কুৎসার মুখে দাঁড়িয়ে নজরুল যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন ভ্রাতৃঘাতী বিরোধ রোখার জন্য, সে কাজেও হিন্দু-মুসলমান তরুণদের ওপরেই ভরসা রেখেছিলেন; দ্রষ্টব্য তাঁর 'পথের দিশা' (*ফণিমনসা*) কবিতা।

অনেকটা নজরুলেরই সুরে মিলনধর্মী কবিতা লেখেন খান মোহম্মদ মঈনুদ্দীন—*সত্যাগ্রহী* পত্রিকায় 'তরুণের ডাক', ১৯২৭ সালে, হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের তরুণদের একত্রে বাঁচা ও এগিয়ে যাবার আহ্বান জানিয়ে।(৩৮) কাছাকাছি সময়ে *সাম্যবাদী* পত্রিকায় প্রকাশিত এঁর আর একটি কবিতা 'জাগরণী' শুধু মুসলমান তরুণদের প্রতি উদ্দিষ্ট হলেও কোনরকম বিচ্ছিন্নতাবাদ সেখানে প্রশ্রয় পায় নি।(৩৯) নজরুল, আবদুল কাদের বা মহীউদ্দীনের মত কবিদের রচনায় সেদিন তারুণ্যের অভিযান সব সংকীর্ণতা ও বিভেদ মুছে ফেলার পথ প্রশস্ত করেছিল। উল্টোদিকে কিন্তু দেখি, গোলাম মোস্তাফা, যাঁর অসহযোগের কবিতায় কোন বিচ্ছিন্নতার সুর ছিল না, তাঁর মধ্যে ক্রমে এল বেশ বড় পরিবর্তন। তিনিও বাঙালি মুসলিম তরুণদের উত্থান কামনা করলেন, কিন্তু সে পুরোপুরি মুসলিম দুনিয়ারই অঙ্গ হিসেবে, হিন্দুদের সঙ্গে মিলে নয়। বরং তাঁর মতে মুসলমানদের পক্ষে আগ্রাসনটাই যেন জরুরি। *সাহিত্যিক* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'তরুণের গান' কবিতায় এই ভাব খুব স্পষ্ট(৪০)। পরবর্তী কালে এই কবি পাকিস্তানের দাবির মস্ত প্রবক্তা হয়ে ওঠেন।

সেযুগের দুটি মুসলমান-সম্পাদিত পত্রিকার সন্ধান আমরা পেয়েছি—ঢাকার *তরুণপত্র* ও বগুড়ার *তরুণ*। দুটিতেই মুসলমান লেখকরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, তবে হিন্দুরাও ছিলেন। পশ্চাদপদ মুসলমানদের জন্য বিশেষ ভাবনাচিন্তা এগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে, তবে তার মানেই বিচ্ছিন্নতা নয়। বস্তুত, মুসলমান তরুণদের বারে বারে

প্রতিবেশী হিন্দু তরুণদের স্বার্থত্যাগ ও সাহস থেকে শিক্ষা নিতে ও একই সঙ্গে জাতীয় সংগ্রামে অংশ দিতে বলা হয়েছে। *তরুণপত্রের* একটি প্রবন্ধে(৪১) তরুণ বাঙালি মুসলমানকে উর্দুর বদলে মাতৃভাষা বাংলার চর্চা করার আহ্বান, রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে—'মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা।'(৪২) কিন্তু ঐ সংখ্যাতেই আরেকটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে মুসলমানদের চরিত্র গঠনের জন্য ভালো জীবনীগ্রন্থ নেই, হিন্দু সমাজের বিদ্যাসাগর রামমোহনদের জীবনী মুসলমান ছাত্রদের উপযোগী নয়।(৪৩) বগুড়া থেকে প্রকাশিত *তরুণ* পত্রিকার একটি সংখ্যার (৪৪) 'তরুণ মজলিস' অংশে বগুড়ার নানা স্থানে নবগঠিত তরুণ সংঘগুলির বিবরণ প্রসঙ্গে বগুড়া শহরের ইয়ংমেনস মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন ও ইয়ংমেনস অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে মনোমালিন্যের খবর পাই। সম্পাদক অবশ্য তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন ও বলেন—'দেশের মুক্তির জন্য আজ দিকে দিকে তরুণের অভিযান সুরু হইয়াছে। বর্তমানযুগে হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত শক্তি না হইলে দেশের উপকার হইবে না' স্বাধীনতা মিলিবে না, ইহা আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। কিন্তু তাই বলিয়া সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল, জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারাইয়া যাঁহারা দেশের উপকার করিতে চান তাঁহারা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত।' কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার জন্য এই পত্রিকায় মাঝেমাঝেই দেখা যেত আল্লাহ ও হজরত মহম্মদের প্রতি সজুদ ও দরুদ নিবেদনের সমারোহ, বা কোরান, হাদিজ, মাজিদের ওপর বড় বেশি জোর। কিম্বা 'তরুণের প্রতিভা' নামে কোন প্রবন্ধে সমসাময়িক তুরস্ক, পারস্য আফ্‌গানিস্তানের সঙ্গে চীন ও রাশিয়ার তরুণদের কথা বলেও শেষপর্যন্ত খুব বেশি গৌরবান্বিত করা ১৮ বছরের তরুণ সিন্ধুজয়-খ্যাত মহম্মদ বিন কাশিমকে এবং মুসলিম তরুণকে তারই মত তৌহিদ (ধর্মভাবাপন্নতা) ও ইমানের জুশ তৈরি করে সিন্ধু-জয়ের গান গেয়ে অগ্রসর হতে বলা।(৪৫)

যৌবনবাদ যেমন মাঝে মাঝে মুসলমানত্বের বোধ ও বিচ্ছিন্নতা, এমনকি ইসলামী আগ্রাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল, হিন্দুত্ববাদের সঙ্গেও তেমন হয়েছিল কি? তনিকা সরকার তরুণ বিপ্লবীদের কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে হিন্দুত্বচর্চার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বারে বারে বলেছেন।(৪৬) বিপ্লবীদের আচার-অনুষ্ঠানে কালীপূজা ইত্যাদি ধর্মীয় ব্যাপার জড়িত ছিল। তারা *গীতার* মত ধর্মগ্রন্থ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করত; হিন্দু যুবকরাই বিপ্লবী দলের সদস্য হত, মুসলমানরা নয়—এ সব তো সুবিদিত তথ্য। তবে বিশের দশকের শেষ দিকে বিপ্লবীদের যে নব কর্মোদ্যোগ সুরু হয়, তাতে অন্য অনেক পরিবর্তনের সঙ্গে এক্ষেত্রেও একটা পরিবর্তন আসে, একথাও তনিকা সরকার জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের ভূমিকা এইসময় কমে আসে, যদিও মুসলমানরা চট করে বিপ্লবী দলে স্থান পায় নি।

সাধারণভাবে অবশ্য আমরা লক্ষ্য করেছি, নজরুল একজন মুসলমান হয়েও সেদিন বাঙালিকে মাতিয়ে দিতে পেরেছিলেন এবং তাঁর পাঠকদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। 'রুদ্র', 'ঈশান' ইত্যাদি শব্দ আমরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যৌবনবাদী কবিদের রচনায় পেয়েছি—হিন্দু দেবতার নাম হিসেবে নয়, প্রলয়ের প্রতিমা হিসেবে। সেইরকম, *গীতা* যদি কারো প্রিয় গ্রন্থ হয় সে যে উগ্র মুসলমান-বিরোধী হিন্দু হবে তার কোন মানে নেই। ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত দীনেশ গুপ্তের চিঠিগুলি পড়লে বোঝা যায়(৪৭) কিভাবে তিনি গীতার অবিনশ্বর আত্মার তত্ত্বের সাহায্যে নিজে মৃত্যুভয় সম্পূর্ণ জয় করেছিলেন এবং আত্মীয়-পরিজনদেরও সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি চিঠিতে ইসলাম ও খৃস্টধর্মেরও দোহাই দিয়েছেন এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এই চিঠিরই পরের দিকে ধর্মের প্রচলিত ব্যবহার সম্পর্কে অত্যন্ত অসন্তোষও প্রকাশ করেছেন—'যে দেশে দশ বছরের মেয়েকে পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ ধর্মের নামে বিবাহ করিতে পারে, সে দেশের ধর্মের মুখে আগুন। যে দেশে মানুষকে স্পর্শ করিলে মানুষের ধর্ম নষ্ট হয়, সে দেশের ধর্ম আজই গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত। সবার চাইতে বড় ধর্ম মানুষের বিবেক। সেই বিবেককে উপেক্ষা করিয়া আমরা ধর্মের নামে অধর্মের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতেছি। একটা তুচ্ছ গরুর জন্য, নাহয় একটু ঢাকের বাদ্য শুনিয়া আমরা ভাই ভাই খুনোখুনি করিয়া মারিতেছি। এতে কি ভগবান আমাদের জন্য বৈকুণ্ঠের দ্বার খুলিয়া রাখিবেন, না খোদা বেহস্তে আমাদিগকে স্থান দিবেন?'

যৌবনবাদের উদার সদিচ্ছাই আমাদের মোটের ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবু তারই মধ্যে ধর্মমোহ ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার টান মুসলমানদের মত হিন্দুদের দিকেও অলপবিস্তর ছিল। পত্রপত্রিকার কথাই যদি ধরি, মুসলমান-পরিচালিত তরুণ-উদ্দিষ্ট পত্রিকায় ধর্মের ওপর যতটা নির্ভরতা বা সম্প্রদায়-কেন্দ্রিকতা পরিস্ফুট, হিন্দু সম্পাদকদের অনুরূপ পত্রিকায় মোটের ওপর তার থেকে অনেক কম। তবু হিন্দুত্বের গৌরবমূলক প্রবন্ধ কিম্বা কোন হিন্দু দেবতা বা সাধুসন্তের মাহাত্ম্যের প্রচার একেবারে অমিলও ছিল না। *তরুণশক্তি* তো প্রকাশিত হত প্রতি অষ্টমী তিথিতে, যার অনেকগুলিই কোন ধর্মীয় উৎসবের দিন(৪৮)। সেখানে শক্তিপূজার ওপর অনেক প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। জন্মাষ্টমী সংখ্যার একটি কবিতা আবার—'এমনিই এক অষ্টমীতে ভাদ্রমাসে এ ভারতে/জন্মেছিল তরুণশক্তি অন্ধকারার অন্তরেতে।' পরের দিকে প্রচ্ছদপটে লেখা থাকত 'গীতার কথা', তলায় রথারোহী অর্জুন ও সারথি কৃষ্ণের ছবিসহ। *যুবক* নামে পত্রিকাটি (এটি অবশ্য বিংশ শতকের প্রায় গোড়া থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল) শান্তিপুর অনাথ আশ্রমের হিতার্থে পরিচালিত; সেখানে করুণাময় পরমেশ্বরকে স্মরণ, সাধু-সন্ন্যাসী ও পূজার্চনা নিয়ে প্রচুর লেখা, অবশ্য কোন মুসলিম লেখকের 'ইসলাম ও মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে।(৪৯) একটা জিনিস পরিষ্কার যে ধর্ম ও সম্প্রদায়চেতনাকে একেবারে

বাদ দেওয়া অসম্ভব ছিল বেশিরভাগ হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষে। আর সম্প্রদায়-চেতনা সব সময় সাম্প্রদায়িকতা অর্থাৎ অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি চ্যালেঞ্জ হয়ে না উঠলেও একটা সংকীর্ণতা অবশ্যই তৈরি করত, সেটা যৌবনবাদের ঘোষিত চরিত্রের সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে বেমানান।

তাছাড়া এটা তো ঐতিহাসিক সত্য যে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার সবথেকে বিপজ্জনক উদ্যোগের সূচনা হয়েছিল এই সময়টাতেই। বাংলায় না হলেও, ১৯২৫-এ মহারাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯২৫ সালে কিশোর-যুবকদের শক্তির ওপর নির্ভর করেই, তাদের মধ্যে নিয়মিত প্রার্থনা, শরীরচর্চা ও সামরিক শিক্ষার শৃঙ্খলা তৈরির ভিত্তিতে, ক্রমে মুসলমানদের সঙ্গে দাঙ্গায় তাদের কাজে লাগিয়ে। বিশেষ দশকের শেষ দিক থেকে ভারতের অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ছিল আর এস এস।(৫০) বাংলায় তার প্রভাব কবে থেকে কিভাবে পড়েছিল? এ ইতিহাস আজো গুছিয়ে লেখা হয় নি।

সাহিত্য ও যৌবনবাদ

যৌবনবাদের অভিব্যক্তির সুযোগ সেযুগের রাজনীতিক বা সামাজিক কর্মসূচিতে যত না ছিল, তার থেকেও বেশি ছিল সাহিত্যক্ষেত্রে। কখনো সরাসরি যৌবনের গরিমা প্রচার করে, কখনো যৌবনবাদী স্বরভঙ্গি অবলম্বনে একটি যৌবনবাদী সাহিত্য বাংলায় এইসময় বিকশিত হয়েছিল—অলঙ্কারবহুল ভাষায়, চমকপ্রদ উপমা প্রয়োগে এবং প্রায়শই অতিশয়োক্তির মাধ্যমে। এই সাহিত্য অবশ্য প্রধানত কাব্য, গদ্য ততটা নয়।

প্রথমেই বলতে হয় রবীন্দ্রনাথের কথা, যাঁর তখন ষাটের ওপর বয়স, কিন্তু যিনি চিরনতুনের কবি। তাঁর হাতেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে সুরু হয়েছিল 'সবুজের অভিযান'। তার অনেক আগেই অবশ্য ভাগ্যদেবী ঠাকুরাণীর উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন 'হতভাগ্যের গান'—'যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে, মা, লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনে।' যৌবনবাদীদের নানা কর্মোদ্যোগে, সাম্যবাদী পত্রপত্রিকায় তিনি বারে বারে আশীর্বাণী পাঠিয়েছেন। কারারুদ্ধ নজরুলকে উৎসর্গ করেছেন গীতিনাট্য *বসন্ত*। *তাসের দেশ* নাটিকা, যেখানে ইচ্ছের জয়ঘোষণা, অচেনার আবাহন, চঞ্চল-অদ্ভুত বেড়া-ভাঙা ও ভুল করার সাহসের অধিকারী 'নূতন যৌবনেরই দূত'-দের জয়ধ্বনি, ১৩৪৫ সালে প্রকাশিত তার দ্বিতীয় সংস্করণটি উৎসর্গীকৃত দেশনেতা সুভাষচন্দ্রকে, 'স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ' এই কথা স্মরণ করে।(৫১)

নজরুল যৌবনবাদী সাহিত্যের মধ্যমণি। বাংলায় যৌবনবাদের জাগরণে নজরুলের যে ভূমিকা তা রাজনীতিকের ততটা নয়, যতটা সাহিত্যিকের। ১৯২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর জাতির পক্ষ থেকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও সুভাষচন্দ্র বসু তাঁকে যে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন, তার প্রত্যুত্তরে নজরুল বলেছিলেন 'যৌবনের

রক্তশিখা মশাল ধরে মৃত্যুর অবগুণ্ঠন মোচন করতে চলেছে যে বরযাত্রী, আমিও আছি তাদের দলে; তবে হাতের মশাল হয়ে নয়, কণ্ঠের কুণ্ঠাহীন গান হয়ে।'(৫২) সেই কুণ্ঠাহীন গান তিনি গেয়ে গেছেন অজস্র পদ্য ও গদ্য রচনায় *অগ্নিবীণা*(১৯২২) থেকে সুরু করে *প্রলয়শিখা* ও *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩০) পর্যন্ত একের পর এক কাব্যগ্রন্থে (যাদের অনেকগুলি সরকার নিষিদ্ধ করে)। *দুর্দিনের যাত্রীর* মত প্রবন্ধসংকলনও উল্লেখ্য। কখনো 'অরুণপ্রাতের তরুণদল', কখনো ছাত্রদলের উদ্দেশ্যে নিবেদিত তাঁর কবিতা, কখনো আবার 'অগ্রপথিক' সেনাদলের উদ্দেশ্যে— যে তরুণ 'কমরেড'রা আয়ার্ল্যাণ্ড, আরব, মিশর, কোরিয়া, চীন, নরওয়ে, স্পেন ও রাশিয়ায় নবশক্তিকে জাগিয়ে তুলেছে। আর নজরুল যৌবনের গরিমা প্রসঙ্গে শুধু রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক বিদ্রোহের কথাই বলেন নি, মাঝেমাঝেই বলেছেন মহাসমরের সৈনিক, ভৌগোলিক আবিষ্কারক, বৈমানিক, পর্বতশৃঙ্গারোহী তরুণদের কথাও।(৫৩) যৌবনের মানসিকতা হিসেবে অপরিমেয় আশাবাদ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন তিনি 'যৌবন জয়ী হোক, জড়তা ও জরা যাক/প্রতি নিঃশ্বাসে পাব বিশ্বাস বেঁচে থাক'। যৌবনের নীতি হিসেবে বলেছেন 'সুর ও তরবারি'র দুয়ের কথাই—'সুর আমার সুন্দরের, আর তরবারি সুন্দরের অবমাননা করে যে সেই অসুরের জন্য।'(৫৪) আর নজরুলের যৌবনোচ্ছ্বাসের একটি বড় দিক যে নারীপ্রেম, এ তো সুবিদিত।

যৌবনবাদী দলের আরো কিছু কবির কথা একটু যথেচ্ছভাবেই এক নিশ্বাসে বলে যাচ্ছি। যতীন্দ্রমোহন বাগচী বয়স্ক কবি। তাঁর *জাগরণী*(১৩২৯) কাব্যগ্রন্থে 'গান্ধী মহারাজের জয়', 'চরকা-সঙ্গীত' ইত্যাদি কবিতার সঙ্গে ছিল অন্যরকম রচনাও; যেমন 'বৈশাখ'—'হে নবীন, হে বন্ধু বৈশাখ', বা 'জাগরণী' যার 'নির্ঝরধারা বন্ধনহারা'য় স্পষ্টতই যৌবনবাদীর ঘোষণা। আর *কল্লোল* পত্রিকায় তিনি এসেছিলেন একেবারে মদির যৌবনের বেশে। প্যারীমোহন সেনগুপ্তও গান্ধীভক্ত, তবু *প্রবর্তক* পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১৩৩২) তাঁর 'যৌবন' কবিতায় অজ্ঞতা-মূঢ়তা-ধ্বংসী, অজানা-অচেনার সন্ধানকারী, অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিকারকারী 'যৌবনের উল্লাস-স্বপন'। বস্তুত, গান্ধীবাদের সঙ্গে যৌবনবাদের বিরোধও যেমন চোখে পড়ে তেমনি দুয়ের সমন্বয়ও দুর্লভ নয়। *তরুণশক্তি* পত্রিকায় (২২ সেপ্টেম্বর, ১৯২৮) প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর কবিতা 'যৌবন'। উল্লেখ্য সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের *রক্তরেখা* কাব্যগ্রন্থ, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ও বাজেয়াপ্ত। এবং তাঁর অন্য কিছু কবিতাও, যেমন ২২ মে, ১৯২৬, কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মেলনে পঠিত 'মুক্তিপূজা'; অথবা রাজবন্দী সুভাষকে 'হে তরুণ, হে নবীন সাথী' বলে সম্বোধন করে নবপত্রপুটে বসন্তের আনন্দলিপি পাঠানো (*বঙ্গবাণী*, যথাক্রমে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ ও আষাঢ়, ১৩৩০।) প্রেমেন্দ্র মিত্র *কল্লোল* পত্রিকায় লিখলেন 'কবি-নাস্তিক' (মাঘ, ১৩৩১), সেখানেও যৌবন-উল্লাস—'আজ দরজায়/তাই ত কবি ডাক দিয়ে যায়/ফাগুন ফুরায়/আগুন

জুড়ায়/মধুমাসের মহোৎসবে দস্যু হয়ে লুটবি কে আয়।' তাঁর *প্রথমা* কাব্যগ্রন্থে (১৯৩১) জীবনদেবতাকে বিদ্রোহীর নমস্কার জ্ঞাপন, 'বেনামী বন্দর' বা 'দ্বার খোল' কবিতায় নিঃসম্বল ক্ষুধাতুরদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে স্বার্থ-লালসা-ক্রূরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাও যৌবনবাদের সঙ্গে সুসঙ্গত। যুগমানসের বিশিষ্ট নমুনা হেমেন্দ্রকুমার রায়। উল্লেখ্য তাঁর কবিতা 'যৌবনের ঝড়ে' (*ধূমকেতু*, ২ কার্তিক, ১৩২৯), 'কালাপাহাড়ের উদ্বোধন' (*বিজলী*, ১১ শ্রাবণ, ১৩৩০), নামেই যেগুলির চরিত্র প্রকাশ। *প্রবাসীতে* প্রকাশিত (আশ্বিন, ১৩৩০) 'দরিদ্রের জাগরণ'-কেও এগুলির পাশাপাশি পড়া যায়। তাঁর একমাত্র কাব্যগ্রন্থের নাম *যৌবনের গান*। *কল্লোলে* পাই নরেন্দ্রনাথ দেবের 'তারুণ্য' (শ্রাবণ, ১৩৩৬)—জরাজীর্ণ জড়তাকে দৃপ্ত পদতলে দলে যাবার ঘোষণা। এঁরও বন্দী সুভাষকে নিয়ে কবিতা, যেটি *লাঙলে* বেরিয়েছিল (৭ মাঘ, ১৩৩২), নবযুগের মেজাজ থেকে উৎসারিত। *তরুণ* (বরিশাল, ভাদ্র, ১৩৩০) পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসুর 'প্রভাত আলো', যার বন্দনা আসলে তারুণ্যেরই বন্দনা—'সন্দেহ-মেঘ যাক কেটে আজ ঝোড়ো হাওয়ার নর্তনে,/মুক্তধারার মুক্তি-দূতের সন্ধানী,/বাধার ভয়ে মন যেন মোর অন্ধ না হয় অঞ্জনে,/বলুক সবাই—আমি আমি আমার মন জানি!/মুক্ত হাওয়ার মাঝখানেতে খারাপ হতেই চাই আমি,/চাইনে আমি নিখুঁত ভালো হতে।/ওরে আমার দুরন্ত মন, ত্যাগ কর আজ ভণ্ডামি,/চল আজ এ সত্য সরল পথে।' কিম্বা *কল্লোল*-পরিচালক গোকুল নাগের মৃত্যুতে ঐ পত্রিকাতে তাঁর শোকগাথা 'যৌবন-পথিক' শিরোনামে। তখনো কথাসাহিত্যিক হিসেবে খুব বেশি খ্যাতি না পাওয়া তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তারুণ্য-বন্দনা করে কবিতা লেখেন *কল্লোলে*। এই ধরনের বেশ কিছু কবিতা লেখেন শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক *বেণুতে* ও তার আগে *ধূমকেতুতে*। 'বেণু' শীর্ষক কবিতা থেকে উদ্ধৃত করছি—(বেণু, আষাঢ়, ১৩৩৫) 'অন্ধকারের কুক্ষি বিদারি ওঠে শাশ্বতধ্বনি/যৌবলীলার বন উদ্ভাসি জ্বলে বৈদুর মণি!/যুগে যুগে বেণু উঠিছে গরজি পাঞ্চজন্য রবে/বঞ্চিত প্রাণ চঞ্চলি ওঠে অধিকার অনুভবে।' যৌবনবাদী মেজাজের বেশ কিছু কবিতা লেখেন ক্ষিতীশচন্দ্র রায় *বেণু* পত্রিকায়। পরিমল ঘোষের 'বন্দী' *বঙ্গবাণীতে* (ভাদ্র, ১৩৩০) ও 'তরুণের জাগরণ' *তরুণ* পত্রিকায় (বরিশাল, আষাঢ়, ১৩৩০) প্রকাশিত। আব্দুল কাদের লেখেন 'নবীন' *তরুণ* পত্রিকায় (৩৩৫), 'মহাবিপ্লব' *গণবাণীতে* (১৪ জুন, ১৯২৮) ও 'জয়যাত্রা' সওগাতে (আষাঢ়, ১৩৩৬)—'নবযুগ ডাকিছে তোমারে/অনন্ত মৃত্যুরে লঙ্ঘি/হে নবীন, চলো অনায়াসে/মৃত্যুহীন জীবনের পথে।' মহীউদ্দীনের *সওগাত* পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি কবিতা—'বিশ্বমায়ের ব্যথার দুলাল তরুণরা সব কই' এবং 'মুয়াজ্জীনের কণ্ঠ ঘোষে উষার আশিসবাণী' (যথাক্রমে মাঘ ১৩৩৪ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫)। তাঁর কাব্যগ্রন্থ *পথের গান*-ও উল্লেখযোগ্য।

এমন কবি তো অজস্র যাঁদের একটিমাত্র কবিতাই পেয়েছি। যেমন, *ধূমকেতুতে* (২১ পৌষ, ১৩২৯) প্রবোধচন্দ্র সেনের 'নবীন বরণ'—'সমাজবিধি ধর্মবিধি শাস্ত্র

পুথির স্তূপের পর/অত্যাচার আর অন্যায়ের ঐ নিষ্ঠুরতার বুকের পর/গরীব-দুখীর রক্তে পোষা পক্ষপাতীর মুখের পর/আগুন জ্বাল আগুন জ্বাল/আজকে যে ভাই ক্ষেপিয়ে তোলে উন্মাদনার ফাগুন কাল।' *যুবক* (শান্তিপুর, মাঘ, ১৩৩৭) পত্রিকায় নিত্যগোপাল বর্মণের কবিতা 'যৌবন'—'যেন দখিনা পবন হিল্লোল,/যেন নির্ঝর-জল উচ্ছল-ছল চল-চঞ্চল কল্লোল,/যেন বৈশাখী ঝড় হর-শঙ্কর তাণ্ডব নাট-ভঙ্গি।' এখানে যৌবনের সৃজন ও সংহার এই দুই দিকের কথা বলে তাকে স্বাধীনতা মহাযাগে অগ্নিহোত্রী ঋত্বিকের পদে বরণ।

যৌবনবাদী বিদ্রোহীর মেজাজটা জড়িত ছিল পৌরুষের ধারণার সঙ্গে। নজরুলের ভাষায়—'এখন একজন শক্ত বেটাছেলের দরকার।' (৫৫) তবু মেয়েদেরও ছুঁয়ে গিয়েছিল এই মেজাজ (রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, এমনকি বিপ্লবী আন্দোলনেও, এই সময় মেয়েরা বেশ আসছিল, তা তো আগেই বলেছি)। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি মুগ্ধতাজ্ঞাপন, ভাই বলে তাদের উদ্বুদ্ধ করা, পাশে দাঁড়ানো, কখনো বা নিজের মধ্যেই বিদ্রোহী মেজাজের অনুভব, এমন সব কবিতা মেয়েদের কলমে পাওয়া গেছে *ধূমকেতু, কল্লোল, বেণু* প্রভৃতি পত্রিকায়; মিসেস আর এস হোসেন, সরলীবালা দেবী, বিভাবতী দেবী, প্রভাবতী দেবী প্রমুখের কলমে। *তরুণশক্তি* পত্রিকায় (১২ ভাদ্র, ১৩৩৬) অন্নপূর্ণা মিশ্রের 'রণসজ্জা' কবিতায় ভাইয়েদের সঙ্গে বোনেরাও রণাঙ্গনে যেতে উৎসুক। সুনীতি দেবীর কবিতা 'কল্লোল'-এ সামগ্রিকভাবে তারুণ্যের মেজাজটার অনুভব (*কল্লোল*, বৈশাখ, ১৩৩৩)—'বাংলাদেশের ঘরে ঘরে জাগল তরুণ প্রাণ।'

বিভিন্ন খ্যাত-অখ্যাত কবির কাব্যগ্রন্থ ও সমসাময়িক পত্রিকা থেকে সেযুগের যৌবনবাদী বিদ্রোহের মেজাজটা খুব ভাল ধরা যায়। উদাহরণের সংখ্যা আরো অনেক বাড়ানো যেত আমাদের দেখা *ধূমকেতু, গণবাণী, লাঙল, বঙ্গবাণী, সাম্যবাদী, বিজলী, বেণু, প্রবর্তক* পত্রিকা থেকে, যাদের প্রত্যেকটিরই পরিচালনায় ছিলেন সন্ত্রাসবাদী বা সাম্যবাদীরা। আমাদের আলোচ্য পর্বে বাংলা সাহিত্যে সবথেকে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল যে *কল্লোল* পত্রিকা (১৩৩০-১৩৩৬), সেখানেও যৌবনের জয়গানে উদ্বেলিত ও বিদ্রোহবার্তায় উদ্দীপিত কবিতা ছিল প্রচুর। *প্রবাসী* ও *বসুমতীর* মত একটু রক্ষণশীল পত্রিকাতেও মাঝে মাঝে এই ধরনের কবিতার দেখা মেলে। সরাসরি *তরুণ* বা *যুবক* নামাঙ্কিত যে বেশ কিছু পত্রিকা বেরিয়েছিল এই সময় (বেশির ভাগই বোধহয় স্বল্পায়ু) (৫৬)—*তরুণ* নামেই তিনটি পত্রিকা, তছাড়াও *তরুণ আলো, তরুণ পত্র, তরুণ লিপি, তরুণ শক্তি, যুবক* নামে দুটি পত্রিকা (একটি অবশ্য পুরোনো, ১৩১১ থেকে বেরোচ্ছিল), *যুবশক্তি* ইত্যাদি। এগুলিতেও কবিতায়, সম্পাদকীয়তে, বিভিন্ন খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রেরিত বাণীতে যৌবনের জয়গান সুপ্রচুর। কিন্তু উদাহরণ আর বাড়িয়ে লাভ নেই। তাতে শুধু একই বক্তব্য ও একই ধরনের অলঙ্কারের পুনরাবৃত্তি পাওয়া যাবে। রুদ্রের শঙ্খ,

ভৈরব গান, বজ্রবাণী, পাঞ্চজন্যের গর্জন, প্রলয়-বিলয়, ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণি, অগ্নিশিখা, উল্কাসম ধাওয়া, শীতের পরে বসন্ত, রাত্রির পরে প্রভাত, পাতায় পাতায় সবুজ রং ধরা, ফাগুনের গান, মরাগাঙে বান আসা, কখনো কালাপাহাড়ের ঘুম ভাঙা, কখনো রাক্ষসজয়ী তরুণ. রাজপুত্রের জীয়নকাঠির ছোঁয়ায় রাজকন্যা উদ্ধার, ইত্যাদি রূপকের আশ্রয়ে অশান্ত, স্পর্ধাবান, মুক্তিকামী, বিশ্বপ্রেমী, প্রবল আশা বিশ্বাস ও সাহসের অধিকারী, সুখ-দুঃখের প্রতি উদাসীন, মৃত্যুভয় তুচ্ছ করা, সংহার ও সৃষ্টি দুয়েই আগ্রহী বিদ্রোহী যৌবনের আবেগ সেদিন বাংলা সাহিত্যকে প্লাবিত করেছিল।

একটা কথা একটু বিশেষ করে বলে নেওয়া ভাল যে যৌবনের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিদ্রোহের ফাঁকে ফাঁকে তার একটা প্রেমিক ভাবমূর্তিও প্রায়শই ধরা পড়ত, সে প্রেম নর-নারীর। যৌবনসমাগমে 'জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত' এই অনুভূতির সঙ্গে 'সুখভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়, কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে' (৫৭) এমন রোমান্টিক উদ্বেলতা অবশ্য নতুন কিছু নয়। তবু এটা গণ্য না করলে আমাদের আলোচ্য যৌবনবাদকে পুরোপুরি বোঝা যাবে না। আর ঐ সময়ে রোমান্টিক প্রেমের শারীরী বাস্তবতার উন্মোচনও লক্ষণীয়। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক মোহিতলাল মজুমদার এ ব্যাপারে আধুনিকোত্তম ও নবীনদের গুরু বলে মান্য ছিলেন (পরে যদিও বিরোধ হয়, সে বোধহয় অনেকটা তাঁর অহম্-এর কারণে।) *কল্লোলে* প্রকাশিত নজরুলের কবিতা 'মাধবী-প্রলাপ' ও 'অনামিকা' তো হৈচৈ ফেলে দিয়েছিল। হেমেন্দ্রকুমার রায় 'মানবকের গীত' কবিতায় *(বিজলী*, ৭ আষাঢ়, ১৩৩০) বলেন—'দ্যাখ, বেলা বয়ে যায়,/যৌবন যে মাগিছে বিদায়।/আয় আয় আয়।/যৌবনের ফুলেল বাগানে,/অন্তর-বিতানে,/তোমা বই জানে নাকো থাকে যদি হেন কোন প্রিয়া,/তাকে নিয়া/বাহিরে পলায়ে এস, ঘরমুখো ভাবনা ভুলিয়া/বুকে বুক/মুখে দিয়া মুখ,/ঢুলে পড়া নয়নেতে রাখিয়া নয়ন/অধর-কুসুম তোর কর না চয়ন।' জনৈক নরেশ্বর ভট্টাচার্য 'যৌবনের গান'-এ সেই বধুয়াকে ফিরে চান যে 'যৌবনের নও-জোয়ারে হাসিত সদা মন জিনি/কাড়িয়া নিত রূপ-সায়রে জান!' *(যুবক*, চৈত্র-বৈশাখ, ১৩৩৮)। অবশ্যই এই প্রেমিক যৌবনের আবাহনেও রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয়। স্মর্তব্য তাঁর বৃদ্ধ বয়সের রচনা 'তপোভঙ্গ'(৫৭), যেখানে 'যৌবন-বেদনা রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি' ফিরিয়ে আনার আকুতি ধ্যানী সন্ন্যাসী সমীপে, তাতে অগ্নিতেজে দগ্ধ পঞ্চশর দ্বিগুণ উজ্জ্বল হয়ে বেঁচে উঠবে, এবং ব্যগ্রবেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে স্থবিরের শাসন-নাশন উড়িয়ে দিয়ে বার হয়ে আসবে বিদ্রোহী নবীন বীর, কবি যার সিংহাসন রচনা করবেন। (৫৯) *তরুণ* পত্রিকার (বরিশাল) প্রথম সম্পাদকীয় তারুণ্যের উজ্জীবনের সন্ধান করেছে 'চিরন্তন বৃন্দাবনকাহিনীর মর্মে'ও (ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৩৫)। পরের সংখ্যায় গান্ধীবাদী নেতা নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত 'তরুণের প্রতি বৃদ্ধের আশীর্বাদ'-এ তরুণের দাবি ও স্পর্ধা স্বীকার করে এবং তাকে দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে আহ্বান জানিয়ে তার 'গোপবেশে বেণুকর নবকিশোর নটবর' মূর্তিও স্মরণ করেছেন; বলেছেন যে রুদ্র সেই শ্যাম।

বাংলা সাহিত্যে আমাদের আলোচ্য কালের অনেকটাই 'কল্লোল যুগ' বলে খ্যাত। (*কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, উত্তরা* ইত্যাদি বেশ কিছু সাহিত্য-পত্রিকার আবহ মিলিয়ে)। বস্তুত ওপরে উল্লিখিত কবিদের—রবীন্দ্রনাথ, নজরুল থেকে সুরু করে—অনেকেরই অল্পবিস্তর আবেগগত সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল *কল্লোলের* সঙ্গে। *কল্লোলের* অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের স্মৃতিচারণায়(৫৯) পত্রিকাটি সম্পর্কে বারেবারেই 'যৌবনের মুক্ততীর্থ', 'উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দমতা', 'যৌবনদীপ্তি' গোছের শব্দসমূহ এসেছে, এবং এসেছে সেই যৌবনের বিদ্রোহ-ব্যাকুলতার কথা—'সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাৎ করার আলোড়ন।' *কল্লোলের* বিদ্রোহের একদিকে ছিল তরুণ লেখকদের বোহেমীয় জীবনযাপন—'অভাবনীয় অভাব'-এর মধ্যে (যারজন্য পারিবারিক পরিস্থিতি ছাড়াও নিজেদের ছন্নছাড়া স্বভাব অনেকটা দায়ী) অকারণ পুলক ও অহেতুক দুঃখকে অবাধ প্রশ্রয় দিয়ে দিনযাপন, থাকা-খাওয়া পোশাক-আশাকে বিরাট কৃচ্ছ্রসাধন ও অনিয়ম; অন্যদিকে সাহিত্যচর্চায় 'সত্যের সন্ধান'—বাংলা সাহিত্যের শার্সি-জানালা-দরজা খুলে দেওয়া। তার জন্য ভাব ও ভাষা দুয়েরই নতুনত্বের সন্ধান। ভাবের দিক থেকে প্রথমত গল্পে-উপন্যাসে অপধ্বস্ত জীবনের বাস্তবতা নিয়ে আসা—নিম্নবিত্ত কেরাণী, গরিব শ্রমজীবী, এমনকি চোর পকেটমার ভিখারী গুণ্ডাদেরও (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কয়লা খনিকদের গল্প, প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস *পাঁক*, অচিন্ত্যকুমারের *বেদে*, মনীশ ঘটকের *পটলডাঙার পাঁচালী*, ইত্যাদি), যেসব রচনা অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিকারচিন্তা না জাগিয়ে খুব হতাশাব্যঞ্জক বক্তব্যই রাখত; দ্বিতীয়ত গদ্য-পদ্য উভয়তই নর-নারীর প্রেমাসক্তির চিত্রণ, এবং একটু আগেই যা বললাম, এই প্রেম নিছক রোমান্টিক না থেকে ক্রমেই হয়ে উঠেছিল স্পষ্টস্পর্শ (বুদ্ধদেব বসুর গল্প 'রজনী হল উতলা' থেকে সুরু করে কিছু পরের দিকে রাধারানী দেবীর ইন্দ্রিয়াতুর কবিতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—দ্বিতীয় উদাহরণটি বিশেষ করে, কারণ এই প্রথম কবিতায় নারীর যৌনবিষয় হয়ে না থেকে বিষয়ীর ভূমিকা)। আর সেই সঙ্গে 'অতি-আধুনিক' নবীন লেখকরা 'বিবাহের চেয়ে বড়' বলে বিধবার প্রেম, গণিকার প্রেম ইত্যাদি সমাজগর্হিত বিষয়ের জোয়ার আনল। সে-ই তাদের অচলপ্রতিষ্ঠ সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সবথেকে বড় প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রমুখ বয়স্ক বিখ্যাতরা এদের শক্তিকে স্বীকার করেছিলেন এবং আংশিক প্রশ্রয়ও দিয়েছিলেন (প্রতিপক্ষতাও যে খানিকটা ছিল না তা নয়, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে), তবে ঘরে-বাইরে বৈরাচরণও ছিল যথেষ্ট—রুষ্ট অভিভাবক থেকে সুরু করে নীতিধ্বজ সমালোচকদের। এমনকি থানাপুলিশেরও নজর কেড়েছিল তাদের 'অশ্লীল' সাহিত্য, বোমাবারুদের মতই। তরুণ লেখকদের স্বঘোষিত 'বাস্তবতা' নিয়ে সেদিন বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবীণ-নবীনের বিতর্ক জমে উঠেছিল। জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা সদনে রবীন্দ্রনাথ আহূত বিতর্ক সভা (চৈত্র, ১৩৩৪) ও *বিচিত্রা* পত্রিকায়

নবীন দলের মুখপাত্র নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তর্ক (*বিচিত্রা*, শ্রাবণ ও আশ্বিন, ১৩৩৫) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত। (৬০) নবীনদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ ছিল 'কয়লা খনিক ও পানওয়ালীদের' অন্তরের তাগিদে নয়, কৃত্রিমভাবে সাহিত্যে নিয়ে আসার (অনেকটাই বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব বশে) ; এবং যৌন ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় আতিশয্যের।

কল্লোলীয় যৌবনকে অচিন্ত্যকুমার দেখেছেন 'যুগের যন্ত্রণাহত যৌবন' হিসেবে—আদর্শতাড়িত যুবকদের প্রতিকূল জীবনের প্রতিঘাতে নিবারিত হওয়ার ছবি হিসেবে, এবং তাদের বিদ্রোহকে তিনি সমকালীন রাজনৈতিক বিদ্রোহের পরিপূরক হিসেবেই গণ্য করেছেন—যেন তাঁরা 'রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদী'দের পাশাপাশি 'ভাবনৈতিক সন্ত্রাসবাদী'—'সঙ্গ বা পরিপার্শ্ব অনুসারে রাজনীতি না হয়ে আমাদের ভাগে সাহিত্য, নইলে দুই ক্ষেত্রেই বিদ্রোহের আগুন, ধ্বংসের অনিবার্যতা। এক কথায় একই যুগযন্ত্রণা।' তাছাড়া বাংলায় শ্রমজীবীদের প্রথম মুখপত্র বলে দাবি রাখা *সংহতির* সঙ্গে *কল্লোলের* সুসম্পর্কের কথাও তিনি বলেছেন—'একদিকে ভাঙা, আরেকদিকে সংগঠন, একীকরণ।' অন্তত দুটি বই বিক্রি করে তো *কল্লোলকে* সরাসরি রাজনৈতিক কারণেই পুলিশের কোপে পড়তে হয়—নজরুলের *বিষের বাঁশি* ও সনৎ সেনের *ফাঁসির গোপীনাথ*। রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যের এই পরিপূরকতার দাবি অবশ্যই গ্রাহ্য। কিন্তু শুধু সাহিত্যের কথা যদি ধরি, একটা জিনিষ আমাদের লক্ষ্য করতেই হয়—সমসাময়িক বাংলা গদ্যে যৌবন-বিদ্রোহ ব্যক্ত হয়েছিল প্রধানত নর-নারী প্রেমের ব্যাপারে পিতৃতন্ত্রের অনুশাসন ভঙ্গে। বাংলা কাব্যে যৌবনবাদের রাষ্ট্রনৈতিক ও সাম্যবাদী বিদ্রোহের দিকটির প্রকাশ যা ঘটেছিল, তার সামান্য ভগ্নাংশ গদ্যসাহিত্যে ধরা পড়ে নি। এ যৌবনবাদ আবেগময় কাব্যের, বাস্তবঘনিষ্ঠ গদ্যের ততটা নয়।

যৌবন ও যৌবনবাদের সম্পর্ক

যৌবনবাদ একটা আদর্শ, যা মোটেই যুবকদের একচেটিয়া নয়। তবু এই আদর্শ তো সত্যিকারের যৌবনের ধারণার ওপরেই প্রতিষ্ঠিত এবং যুবকদের কাছেই তার আকর্ষণ সর্বাধিক। সুতরাং যৌবন-বাস্তবের (সাধারণভাবে ও ঐ বিশেষ যুগে) সঙ্গে যৌবনবাদের সম্পর্কটা আমাদের বুঝে নেওয়া ভাল।

জীবনবৃত্তে যৌবন আসে অনিবার্যভাবেই, গৌরব বা নিন্দা যাই তার কপালে জুটুক, আদৌ কোন ভাবনা-চিন্তা তাকে নিয়ে করা হোক বা না হোক। যৌবন কাকে বলে সে ধারণা অবশ্য দেশ-কাল অনুযায়ী বদলায়। তবে মোটামুটি বয়ঃসন্ধির শেষদিক থেকে (আমাদের দেশে যাকে কৈশোর বলে তার শেষ থেকে, ইংরিজীতে বলতে পারি late teens) কুড়ির ঘরে, তারপর তিরিশেও গড়িয়ে যায় যৌবন। এই সময়টা শারীরিক সৌন্দর্য ও বলবীর্যের দিক দিয়ে জীবনের পরম লগন, প্রবল শারীরিক চাহিদা ও ভোগেরও সময়। এই সেই যৌবন যা যযাতি ভিক্ষা

চেয়েছিলেন তাঁর পুত্রদের কাছে। যৌবনের এই শারীরিক দিকটা নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই ওয়াকিবহাল বিভিন্ন সংস্কৃতি। তা নিয়ে নানা ভাবনা-চিন্তাও হয়েছে। বহু উপজাতীয় আচার থেকে আমাদের আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে তার প্রমাণ আছে। (৬০ক)

যৌবনের যে দিকটি নিয়ে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকদের আগে বোধহয় কেউ বিশেষ মাথা ঘামায়নি তা হল তার মানসিক সংকটের দিক।(৬১) পিছনে ফেলে আসা ছেলেবেলা থেকে রসদ নিয়ে ও সামনে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে মানুষকে যৌবনকালে ঠিক করে নিতে হয় জীবনের কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি, একটা প্রত্যয়ী আত্মপরিচয়ের সন্ধান করতে হয়। ঐতিহ্য ও সমাজ তার কাছ থেকে কি চায়, সে কতটা কিভাবে তার সঙ্গে মিলতে পারে বা পারে না, এসব বুঝে 'আমি কে' সেটা ঠিক করে নিতে হয়। এ নিয়ে তার অনেক উদ্বেগ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকতে পারে। সে সব পেরিয়ে তাকে একরকম দ্বিজত্বই লাভ করতে হয় যৌবনে। এ ব্যাপারটা একটা আবেগগত সংকটের জন্ম দেয়। কোন কোন ব্যক্তি শ্রেণী বা ঐতিহাসিক কালের ক্ষেত্রে এই সংকট ন্যূনতম—ব্যক্তি ছেলেবেলা থেকে খুব স্বচ্ছন্দে তৈরি হয়ে ওঠে স্বীয় সমাজে নিজেকে মানানসই করে নেবার জন্য; সেই উদ্দেশ্যে যৌবনে বড়জোর তাকে পরবর্তী জীবনের জন্য apprenticeship করতে হয়; তাকে দ্বিজ নয় একজাতই বলা যায়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে যৌবনের মানসিক সংকট অত্যন্ত তীব্র। কোন ব্যক্তির ছেলেবেলা যদি হয় অস্বাভাবিক রকম কঠিন-কঠোর, যথোপযুক্ত স্নেহ ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত, যদি তার বিশ্বাস ও ইচ্ছাশক্তির মধ্যে ভারসাম্য না তৈরি হয়, তবে তার যৌবন-সংকটও বেশি হবার কথা। অত্যধিক সংবেদনশীল ও প্রতিভাবান হলে তো কথাই নেই। তেমনি যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতি বেশ গোলমেলে, যেখানে সমাজটাই সংকটাপন্ন ও দ্রুত পরিবর্তনের কবলে, সেখানে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংগতি স্থাপনের ব্যাপারটা স্বভাবতই জটিল হয়ে দাঁড়ায়, ছেলেবেলায় শিক্ষাদীক্ষা হয়ত বিশেষ কাজে আসে না। তবে যৌবনের কিছু সুবিধেও তো আছে—তার প্রবল প্রাণশক্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষা (আর কিছু না হোক, সামনে বিরাট জীবন পড়ে আছে বলে), ইত্যাদি। কাজেই যৌবন-সংকটের প্রতিকার নিহিত থাকে অনেকটা যৌবনের মধ্যেই।

ব্যক্তি অনেকসময় স্বীয় প্রতিভা ও কর্মক্ষমতার প্রয়োগে যৌবন-সংকট কাটিয়ে ওঠে (না পারলে schizophrenia, melancholia অথবা আত্মহত্যা), হয়ত কোন বিশেষ ব্যক্তি বা কোন আদর্শবাদ তাকে এতে সাহায্য করে। আর, কোন সমাজগোষ্ঠীর তরুণ প্রজন্মের ক্ষেত্রে আদর্শবাদ প্রায়ই বড় প্রতিকারক ভূমিকা পালন করে। সেটা আধ্যাত্মিক আদর্শ হতে পারে (যৌবনে তাই মানুষ খালি যযাতি হয় না, নিমাই সন্ন্যাসীও হয়), রাজনৈতিক, সামাজিক যাহোক হতে পারে। একটা কোন আদর্শের জন্য মানুষ যৌবনে আঁকুপাকু করে, সে খুব অতিসরলীকৃত আদর্শ হলেও তাকে আঁকড়ে ধরে। পুরোনো প্রতিষ্ঠান, ঐতিহ্য ইত্যাদি থেকেই

তৈরি হয় সে আদর্শ; আবার হয়ত প্রাচীনের বিরোধিতাও করে, তাকে বদলাতেও চায়। সমাজ-সভ্যতাও তো এভাবেই এগোয়।

কোন একটা আদর্শে সামিল হওয়ার, একটা আনুগত্যের খুব প্রয়োজন যৌবনের পক্ষে—যা থেকে সে পাবে একটা যৌথ আত্মপরিচয়। আর এরই উল্টোপিঠে থাকে বিদ্রোহ ও ধ্বংসের প্রবণতা, অনেকসময় খুব অসহিষ্ণু ও ভাবনাহীন ভাবেই। এইভাবেই, মনস্তাত্ত্বিক Erik Erikson-এর মতে, 'Youth may exploit (and be exploited) by the most varied devotions'. তাই জাতীয়তাবদী সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ইত্যাদি প্রবলভাবে আলোড়িত করে তরুণদের। আবার এই একই কারণে হয়ত তারা অংশ নেয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায়—হিটলারের তরুণ আর্যবাহিনী 'হীন' ইহুদীদের ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা করে। আবার তরুণ মার্কিনিরা প্রাচ্যদেশীয় আধ্যাত্মিকতার একটা আদর্শের সন্ধান পেয়ে তাতেই মজে যায়, সে-ই তাদের স্বীয় সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আবার কখনো তেমন কোন আদর্শবাদ নয়, নিছক অ্যাডেভঞ্চারের মধ্যেও তরুণ খুঁজে পায় তারুণ্যের সংকট-মোচনের পথ—আকাশে উড়ে, পাহাড়ে চড়ে, ডুবুরি হয়ে সমুদ্রে নেমে; সে-ও তার গতানুগতিক জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

ব্যক্তি নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ আমাদের নেই। নজরুল তাঁর প্রতিভা, বঞ্চিত বাল্য ইত্যাদি নিয়ে যৌবন-সংকট বিষয়ক একটি মনস্তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় হতেই পারতেন। এই সংকটের একটি তীব্র রূপ tristitia বা গভীর বিষাদ তাঁর মধ্যে যে প্রবলভাবে ছিল সেটা তাঁর প্রথমদিককার লেখালিখিতে স্পষ্ট। নজরুলের লেখায় এ বিষাদ ব্যর্থ প্রেমের বিষাদ হিসেবে প্রতিভাত। কিন্তু সে ব্যর্থতার কোন সামাজিক বা পারিবারিক কারণ নেই, প্রেমিকা নিজে উদাসীন নয়। Tristitia কোন ব্যক্তির মধ্যে যে একলা ভাবের জন্ম দেয়, মানুষের সঙ্গে (সম বা বিপরীত লিঙ্গের) তার মেলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, এ হল সেই একাকিত্বের বেদনা। আরো অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তির মতই নিজের সৃজনক্ষমতার প্রয়োগে এবং প্রচলিত আদর্শবাদের সাহায্যে সেটা তিনি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন, দুঃখ থেকে গঠনমূলক আনন্দে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছিলেন। *বাঁধনহারা* উপন্যাসেই এই উত্তরণের ইঙ্গিত আছে, যা আরো স্পষ্ট 'বিদ্রোহী' কবিতায়। কিন্তু এ ব্যাপারে বোধহয় পুরো সফল হন নি নজরুল এবং Erikson-আলোচিত মার্টিন লুথারের মতই মধ্যবয়সে এসে প্রচণ্ডভাবে বিষাদ ও সংশয়ে পুনরাক্রান্ত হন তিনি, যার ফলে শেষপর্যন্ত নিজেকেই হারাতে হয়। কিন্তু এ আলোচনা আমরা কোন মনস্তত্ত্ববিদের জন্যই তুলে রাখলাম। শুধু নজরুল কেন, যৌবনবাদে সামিল অন্য অনেক ব্যক্তিকে নিয়েই তাঁরা এরকম আলোচনা করতে পারেন।

ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে কিন্তু যেটা আমাদের চোখে না পড়েই যায় না তা হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাংলার মধ্যশ্রেণীর জীবনের সংকট। চারিদিকে তার ভাঙন। কৃষিক্ষেত্রে ভূমির পরিমাণ ও উপার্জন পড়তির

দিকে, চাকরি দুর্লভ। গ্রামজীবন ছেড়ে চলে আসতে হচ্ছে নাগরিক জীবনের জটিলতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে। যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। ঔপনিবেশিকতার পীড়ন তো অনেকদিন ধরেই ছিল, জাতীয়তাবাদ দিয়ে পূর্ববর্তী প্রজন্ম তার মোকাবিলা করেছিল। কিন্তু এখন শুধু ঔপনিবেশিকতা নয়, বিশ্বব্যাপী আধুনিকতার আক্রমণের মোকাবিলা করতে হল মধ্যশ্রেণীকে। নিজেদের সমাজে ভাঙন তো বটেই, মোকাবিলা করতে হল চারদিকে শ্রমিক-কৃষকের জেগে ওঠার। হিন্দু মধ্যশ্রেণীকে মোকাবিলা করতে হল উঠতি মুসলমান মধ্যশ্রেণীর। মুসলমান মধ্যশ্রেণীকে মোকাবিলা করতে হল প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মধ্যশ্রেণীর। ওদিকে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাঙালির ভূমিকা গৌণ হয়ে উঠতে লাগল। এমন এক প্রজন্মের যুবকরা যে প্রবল মানসিক সংকটে পীড়িত হবে এটা স্বাভাবিক। এবং সেই সংকটে পুরোনো ধরনের সামাজিক মূল্যবোধ ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তাদের কাছে যথেষ্ট না মনে হবারই কথা। তাদের আশ্রয় নেবার জন্য অবশ্য সে সময়ে বিকশিত হয়েছিল নতুন নতুন আদর্শবাদ—জাতীয়বাদের নতুন গণমুখী বা জঙ্গী সব ধারা, তার সঙ্গে সমাজসাম্যেরও আদর্শ। কোন কোন ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক আদর্শও। আবার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে বিরাট পরিবর্তন প্রতিষ্ঠিত পিতৃতন্ত্রকে কোনঠাসা করে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পথও প্রশস্ত করল। আর এই সব কিছুর সঙ্গেই ছিল যৌবন নিয়ে আবেগ-উচ্ছ্বাস, যাকে আমরা যৌবনবাদ নাম দিয়েছি।

কিন্তু যৌবনের ওপরেই এতটা জোর পড়ল কেন? আগেই আমরা দেখেছি, বিশ্ব জুড়েই তখন যৌবনের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল বিশ্বযুদ্ধ। তরুণ ইংরেজ কবি Rupert Brooke, যিনি যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন, যুদ্ধের মধ্যেই শান্তিকে আবাহন করতে গিয়ে লেখেন—'Now God be thanked who matched us with his hour,/And caught our youth, and wakened us from sleeping.'(৬২) পৃথিবীময় সেই বিরাট ভাঙাচোরার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল—'এই লড়াই-এর মধ্য দিয়ে একটি সার্বজাতিক যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রক্ষা করার হুকুম এসেছে' এবং সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে ঘরছাড়া যুবকের দলই বেরিয়ে পড়েছে, তাদের গন্তব্য—যেখানে 'মৃত্যু-দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাক্ত অরুণোদয় আসন্ন'(৬৩)। দীর্ঘদিনের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অচলায়তনসমূহের বিরুদ্ধে 'তরুণ' আন্দোলনগুলির কথা আগেই বলেছি। এই উদার আন্তর্জাতিক যৌবনবাদ বাংলার জাতীয়তাবাদীদের মোহগ্রস্ত করল। নিজেদের সংকট ও সংকট-মোচনের প্রক্রিয়াকে বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিতে দেখতে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ও সাম্যবাদের একটা আন্তর্জাতিক মাত্রা যুক্ত করতেও সাহায্য করল।

জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম তখন গণ-আন্দোলন হয়ে উঠতে চাইছে। গান্ধী অবশ্য এ ব্যাপারে কৃষকদের অংশগ্রহণেই প্রধানত আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু ছাত্র-যুবকদেরও তাঁর প্রয়োজন ছিল। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের তো তরুণদের মধ্য থেকেই সংগ্রহ

করতে হত। সাম্যবাদী আন্দোলনেও তরুণদের আবশ্যক ছিল। এ কথা বলছি না যে ব্যাপারটা পুরোপুরি নেতাদের সচেতন কৌশল। কিন্তু নতুন কোন আদর্শকে দুহাত বাড়িয়ে গ্রহণ করা, তার জন্য প্রাণপাত করা, তাকে ব্যাপক-গভীর চেহারা দেওয়া—এ কাজ তো তরুণরাই করে থাকে। দেশে দেশে কালে কালে বড় মাপের অনেক আন্দোলনেই যৌবনের ওপর তাই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ফরাসী বিপ্লব, মাও সে তুং-এর আন্দোলন বা নকশাল আন্দোলনসহ ১৯৬০-এর দশকে বিশ্বজোড়া ছাত্রযুব আন্দোলনের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। 'Young Ireland', 'Young German', 'Young Italy' তো বটেই।

মনে পড়ে William Hazlitt-এর প্রবন্ধ 'On the Feeling of immortality of Youth'.(৬৪) যৌবনের প্রাণশক্তিতে লেখক অভিভূত। তিনি বলেন, কোন তরুণই বিশ্বাস করে না যে একদিন তার মৃত্যু হবে। সে যেন মন্ত্রপূত জীবনের অধিকারী। তাই অসীম তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, সেসব পূরণের সুযোগও যেন তার অপরিমেয়। বিশ্বজগতের সঙ্গে সদ্যঘটিত মোকাবিলা তাকে বিস্ময়মুগ্ধ করে, নিজেকেও সে সেই অবিনশ্বরতা ও সমারোহের অংশীদার মনে করে। হ্যাজলিটের ভাষায় 'Like a rustic at a fair, we are full of amazement and rapture, and have no thought of going home.' এটাও তিনি লক্ষ্য করেন যে যৌবনের প্রাণশক্তি এতটাই যে যুবকরা হল 'Like people intoxicated or in a fever, who are hurried away by the violence of their own sensation.' হ্যাজলিটের ক্ষেত্রে এই যৌবনোচ্ছ্বাস জড়িয়ে ছিল ফরাসী বিপ্লবের উত্তেজনার সঙ্গে। মানুষের মুক্তি সম্পর্কে বিপুল আশা জাগিয়ে তুলে, সেই আশা পূরণের সংগ্রামে অংশ নিতে আহ্বান জানিয়ে বিপ্লব উদ্দীপিত করে তুলেছিল তাঁর নিজের যৌবনকে। যেদিন স্বৈরতন্ত্রের তিমির রাত্রে সে আশার সমাধি হল, হ্যাজলিটের মনে হল সেদিন তাঁরও দুর্মর যৌবন হল অবসিত। ফরাসী বিপ্লব শুধু হ্যাজলিটকে নয়, শত-সহস্র তরুণকে তারুণ্যে অনুপ্রাণিত করেছিল। অনেকটা ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে বেড়ে ওঠা ইংল্যাণ্ডের রোমাণ্টিক প্রজন্ম ও সেই প্রজন্মের বিদ্রোহী তরুণ কবিরা Shelley, Keats ও Byron—এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আরো মনে রাখা দরকার, সাহিত্য-মনস্ক বাঙালি তরুণরা বরাবরই এই তরুণ কবিদের অনুরক্ত।

এইভাবেই বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলায় বিকশিত হল যৌবনবাদের আদর্শ। আবার বলছি, এ আদর্শ যুবকদেরই নয়। বয়স দিয়ে যৌবনের সংজ্ঞাও নিরূপণ করে নি যৌবনবাদ। নজরুল বলেছিলেন, 'বহু যুবককে দেখিয়াছি—যাহাদের যৌবনের উর্দির নীচে বার্ধক্যের কঙ্কালমূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি যাঁহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘ-লুপ্ত সূর্যের মত প্রদীপ্ত যৌবন।'(৬৫) প্রবল প্রাণশক্তি, আশা, উৎসাহ, ঔদার্য, সাধনা, সাহস ও সর্বোপরি বিদ্রোহকে যৌবনের অভিজ্ঞান বলে চিহ্নিত করেছিলেন তিনি। প্রথম চৌধুরী *সবুজপত্রে*, যৌবনবাদকে স্পষ্টতর আদর্শের চেহারা দেন যৌবনের কায়িক রূপের ভিত্তিতে নয়, তার আত্মার সংজ্ঞা

দিয়ে—যৌবন মানে মানব জীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি; যখন বাহ্যেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, অন্তরেন্দ্রিয় সব সজাগ ও সবল, যখন সৃষ্টির প্রেরণা অনুভূত। দেহের যৌবন ক্ষণস্থায়ী। দেহের যৌবন ও মনের যৌবনের একটা যোগাযোগ থাকলেও দৈহিক ও মানসিক যৌবন স্বতন্ত্র। চৌধুরীর মতে, এই মানসিক যৌবন লাভ করে সমাজে তা প্রতিষ্ঠা করাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, তাতেই তা স্থায়িত্ব লাভ করতে পারবে; 'যে সমাজের বহু ব্যক্তির মানসিক যৌবন আছে, সেই সমাজেরই যৌবন আছে।'(৬৬) তাই, আমরা দেখেছি, যৌবনবাদ বয়স্ক ব্যক্তিদেরও আকৃষ্ট করেছিল। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদি আদর্শের মত যৌবনবাদও কোন বিশেষ বয়সের একচেটিয়া নয়। তবে স্বভাবতই তরুণরাই এর প্রধান ধারক ও বাহক বলে গণ্য হত। বয়স্করা তাদের এই স্বীকৃতি দিতেন এবং তারা নিজেরাও এটাই বিশ্বাস করতে চাইত।

পৌরুষবাদ থেকে যৌবনবাদ

আদর্শ হিসেবে বাংলায় যৌবনবাদের একটি পূর্বসূরী ছিল। সেটিকে বলা যেতে পারে পৌরুষবাদ। উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদী আত্মপরিচয় গঠনের আদিপর্বে পৌরুষের ধারণটা খুব প্রাধান্য পেয়েছিল। 'পুরুষালি-মেয়েলি' দ্বৈততা জাতীয়তাবাদী চিন্তায় একটা বড় স্থান করে নিয়েছিল।(৬৭) সাহেব প্রভুদের দেওয়া 'অলস, ভীরু, মেয়েলি' অপবাদ বাঙালি যেমন গ্লানির সঙ্গে মেনে নিয়েছিল, তেমনি তা স্খালনের জন্য চিন্তাভাবনা ও কর্মোদ্যোগও অনেক হয়েছিল। পৌরুষ-প্রতিমার সন্ধান করা হয়েছিল জাতির অতীত ইতিহাস (ও পুরাণ) থেকে, বিশেষ করে মধ্যযুগের মুসলমান-বিরোধী রাজপুত-মারাঠা-শিখ বীরদের মধ্য থেকে। ভীরু পুরুষের বিপরীতে খাড়া করা হয়েছিল বীরাঙ্গনা প্রতিমাও—তেজস্বিনী সতী-সাবিত্রী, যাদের পাতিব্রাত্যজনিত আত্মত্যাগ দাম্পত্যজীবনে পুরুষের নিয়ন্ত্রণকে নিশ্চিত করে এবং এইভাবে তার পৌরুষকে তৃপ্তই করে। এরই পাশাপাশি ছিল বীরাঙ্গনা মাতৃমূর্তি, যার সর্বোচ্চ উদাহরণ আরাধ্যা দেবী শক্তি, দেশমাতাও যে শক্তির এক অভিব্যক্তি বলে গণ্য। এছাড়া, 'বীরদর্পে পৌরুষগর্বে' এগিয়ে যাবার জন্য হিন্দুমেলার সময় থেকে ব্যায়াম ও লাঠিখেলার আয়োজন হয়। আর সর্বোপরি তৈরি হয় রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যে নিবেদিত তরুণ 'বীর সন্ন্যাসীর' আদর্শ, যার পরিণত রূপ পরিদৃষ্ট বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীতে। বিবেকানন্দের এই পৌরুষ-আদর্শে বাহুবলচর্চা গুরুত্বপূর্ণ। তবে তা সাহেবদের পৌরুষ-আদর্শের মত নিছক বাহুবল নির্ভর নয়; ব্রহ্মচর্য, কঠোর শৃঙ্খলা ও চূড়ান্ত আত্মত্যাগ দিয়ে তৈরি আধ্যাত্মিক নৈতিক বলেই মহীয়ান এই বিকল্প পৌরুষ। এই শেষোক্ত পৌরুষ-প্রতিমা খুব প্রভাবিত করেছিল বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের। উনিশ শতকীয় এইসব পৌরুষ-প্রতিমার আধার অনেকক্ষেত্রেই যুবক, কিন্তু জোরটা তাদের যৌবনের ওপর ছিল না। মাৎসিনিকে (সঙ্গে গ্যারিবল্ডি)

বীর জাতীয়তাবাদী হিসেবে যত প্রশংসা করা হয়েছে, তাঁর 'ইয়ং ইটালি'র কথা সে তুলনায় কিছুই বলা হয়নি। স্বদেশি আন্দোলনের সময় উনিশ শতকীয় নানা পৌরুষ-প্রতিমা সমন্বিত হয় ও প্রাবল্য লাভ করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কিন্তু বহু বাঙালি যুদ্ধে যোগ দিয়ে ও সাহেবপ্রভুদের রক্ষকের ভূমিকা পালন করে পৌরুষের পরীক্ষায় সন্দেহাতীতভাবে উত্তীর্ণ হল। পৌরুষের ব্যাপারে সাহেবদের তুল্যমূল্য হবার জন্য যে উদ্বেগটা ছিল, সেটা তেমন রইল না। কিন্তু দৈহিক ও মানসিক তেজের একটা আদর্শ তখনো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রয়োজন। নানা কারণে বাঙালি মধ্যশ্রেণীর জাতীয়তাবাদীদের এখন পৌরুষের বদলে যৌবনের প্রকরটাই আকৃষ্ট করল। তাছাড়া, শুধু ঔপনিবেশিকতার বিরোধিতায় শুধু জাতীয়তাবাদ—পরিস্থিতিটা আর সেরকম ছিল না। এখন যে সংগ্রাম, তা ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে পৌরুষময় মরণ ও মারণ সংগ্রাম শুধু নয়, তার সঙ্গে কঠোর জীবনসংগ্রামও। এর জন্য নতুন জীবনচর্যার আদর্শের প্রয়োজন ছিল। মনে হল, যৌবনবাদ দিয়ে তা অনেকটা মেটানো যাবে। 'পুরুষালি-মেয়েলি' দ্বৈততার জায়গায় এখন এল 'যৌবন-বার্ধক্য' দ্বৈততা।

যৌবনবাদ পুরোনো পৌরুষবাদের প্রতিস্থাপক। তবে পৌরুষের আদর্শ তার মধ্যে থেকে গিয়েছিল। পৌরুষবাদ থেকে কোন কোন উপাদান তা ধারও করেছিল। যৌবনবাদ সচরাচর অতীতমুখী নয়, বরং অতীত ঐতিহ্যের অস্বীকার এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎমুখিতাই তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সুতরাং যৌবন-প্রতিমার জন্য পুরাণ-ইতিহাস বিশেষ ঘাঁটতে হয় নি যৌবনবাদীদের। ব্যতিক্রম শুধু যৌবনবাদের সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্র। আর শক্তিপূজাটাও সেখানে থেকেই গেছিল। যৌবনবাদের ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক দিকটি যে একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না, তা আগেই বলেছি। তবু যৌবনবাদের সবথেকে প্রিয় প্রতিমাগুলি সবই সমসাময়িক কালের—বিদেশের নানা যুব-বিদ্রোহ; আর হাতের কাছে প্রেমিক-বিদ্রোহী ও বোহেমিয়ান ভাবমূর্তির নজরুল; ব্রহ্মচারী আত্মত্যাগী জঙ্গী ও তীব্র দেশপ্রেমের আধার সুভাষচন্দ্র; সর্বোপরি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা যাদের বীর সন্ন্যাসী বলেই ভাবা হত। আর, গান্ধীর চিত্তবল দিয়ে অস্ত্রবল জয়ের আদর্শে দৈহিক বলবীর্য বিকাশের আগ্রহ প্রাধান্য না পেলেও বিপ্লবীদের মধ্যে এই চর্চা বাধ্যতই ছিল; ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র আয়োজিত সামরিক কুচকাওয়াজও উল্লেখযোগ্য।

এইখানে যৌবনবাদের মধ্যে একটা গোলমাল পরিলক্ষিত হয়। আমরা যে যৌবনবাদ নিয়ে আলোচনা করেছি, সেখানে নারী-পুরুষের প্রেমের আকুলতা ও যৌনতার বড় স্থান। জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম ছাড়াও প্রচলিত পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও সেযুগের যৌবন-বিদ্রোহের একটা বড় দিক, এবং হৃদয়ের প্রবণতা অনুযায়ী প্রেমের অধিকার দাবির মধ্য দিয়ে সেই বিদ্রোহ করেছিল সেদিনের যুবকরা। কিন্তু

ব্রহ্মচারী বীর সন্ন্যাসীর আদর্শও জনপ্রিয় ছিল, বিবেকানন্দ তখনো বরণীয়। আবার প্রথমোক্ত আদর্শটির সঙ্গে যদি খানিকটা কাব্যপ্রিয়তা, যথেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা জড়িয়ে থাকে, দ্বিতীয়টির সঙ্গে ছিল যাবতীয় পারিবারিক বন্ধনের প্রত্যাখ্যান, কঠোর সংযম, নিয়মানুবর্তিতা ও নেতার প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য। নজরুল যদি প্রথমটির প্রতীক হন, বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা দ্বিতীয়টির। সুভাষ বোধহয় ছিলেন দুটির মাঝামাঝি কোন জায়গায়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *নবনীতা* উপন্যাসে এই দুই যৌবন-আদর্শের টানাপোড়েনের চমৎকার চিত্র আছে।(৬৮) নায়িকার কাকারা তার প্রেমিকের বিরোধিতা করে, 'এমন কোন কারণে নয় যে পাত্র হিসেবে সে অযোগ্য বা জাতে-কুলে তার সঙ্গে ঘোর অমিল—একমাত্র কারণ হচ্ছে এই, সে নবনীতাকে, তাদেরই ঘরের মেয়েকে কিনা 'ভালোবাসে'! ভালোবাসা, যার মানে হচ্ছে কিনা চিত্তের রক্তাতিসার, ইন্দ্রিয়ের কালাজ্বর, স্নায়ুর ধনুষ্টঙ্কার। প্রেম হচ্ছে চরিত্রহীনতারই ছদ্মবেশ; আর ভালোবেসে বিয়ে করাটা হচ্ছে অভিচার করে গঙ্গাস্নান করার মতো। এর জন্যই কাকাদের আপত্তি—এই বয়সে কোথায় সে কুস্তি করবে, বিবেকানন্দ পড়বে, আর ফ্লাড বা ফেমিন-রিলিফে ভলান্টিয়ার হবে, তা নয়, খাচ্ছে সিগারেট, কামাচ্ছে গোঁফ, লিখছে কবিতা। এই বয়সে কাকারা ক্ষুর দিয়ে জুলপি পর্যন্ত কামান নি। কাপড়ের পাড়টা এক-ইঞ্চি না এক চুল এ-সব দিকে লক্ষ্যই ছিলো না। মেয়ে বলে সংসারে যে একটা উপসর্গ আছে, যে উপসর্গ বলপ্রয়োগ করে ধাতুকে এক অর্থ থেকে অন্য অর্থে নিয়ে যায়, সেটা তাঁদের কাছে জ্যামিতিক কল্পনা ছিল।'

দুই প্রজন্মের যুবকদের মধ্যে জীবন তথা যৌবন দর্শনের পার্থক্য হিসেবে যে ছবি এখানে উপস্থাপিত, তার তপশ্চারণিক ধারাটি বাংলায় আমাদের আলোচ্য সময়ে কতটা অবশিষ্ট ছিল সঠিকভাবে বলা মুশকিল। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে বেশ খানিকটা থাকার কথা। তাদের মনের জগতের ইতিহাস আজো ভাল করে লেখা হয় নি। আমাদের পড়াশোনা বেশিরভাগটাই সাহিত্যিক উৎসে সীমাবদ্ধ এবং সেখানে যৌবনবাদের রোমান্টিক ধারাটাই সেদিন জিতে গিয়েছিল। কিন্তু শুধু সাহিত্যেই বা কেন, পরিবারের মায়াবন্ধন ছেঁড়া, কাব্যিক উচ্ছ্বাসের দুর্বলতা পরিহার করা শৃঙ্খলাবদ্ধ বিপ্লবী জীবনচর্যাতেও কি তাকে একেবারে বাদ দেওয়া গিয়েছিল? দীনেশ গুপ্তও তো ফাঁসির আগে ভাবাপ্লুত হয়ে চিঠি লেখেন পরিবারের প্রিয়জনদের, রবীন্দ্রগীতি উদ্ধৃত করেন—'আমার দিন ফুরাল ব্যাকুল বাদল সাঁঝে।'(৬৯) নারী সম্পর্কিত দ্বন্দ্বও সম্ভবত অনেক বিপ্লবী তরুণকে তাড়িত করেছিল, বিশেষত যেহেতু ঐ সময় তরুণী মেয়েদের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে হচ্ছিল তাদের। গল্পে উপন্যাসে মাঝে মাঝে তার ছবি পাই।(৭০) মানসিক দ্বন্দ্ব শেষপর্যন্ত প্রেমে নিঃসংশয় চরিতার্থতা পেলে দলের মধ্যে যাই প্রতিক্রিয়া হোক, সাধারণ্যেও কি সেটা খুব গর্হিত বলে বিবেচিত হত? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমাদের জানা নেই। রোমান্টিক প্রেমিক সম্পর্কে সাধারণ মানুষের একটা প্রশ্রয় থাকেই। তবে উল্টোদিকে সুভাষচন্দ্রের

প্রেমঘটিত বিবাহের সংবাদে অবিশ্বাস ও সেটাকে একটা অন্যায় অপবাদ হিসেবে নেওয়ার প্রবণতা আলোচ্য সময়ের অনেকদিন পরেও লক্ষ্য করা গেছে। প্রেমকে যৌবনবাদের দুর্বলতার দিক হিসেবে খুবই দেখা হয়েছে। জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে নর-নারী প্রেমের সম্পর্ক সংশয়াতীতভাবে নির্ধারণ করতে পারেনি যৌবনবাদ।

পৌরুষবাদের যৌবনবাদে পরিণতি এবং নর-নারী প্রেমের ক্ষেত্রে হৃদয়াধিকারের উচ্চকিত দাবি কি জগৎ-জীবনের সর্বক্ষেত্রে নর-নারী সাম্যের সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলেছিল? যৌবনবাদে নারী-পুরুষ সাম্যের স্বীকৃতি কখনোসখনো পাওয়া যেত, যদিও খুব বেশি নয়। বস্তুত এতে পিতৃতন্ত্রের দ্বারা দমিত যুবকদের অধিকার দাবি যতটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে, মেয়েদের ততটা নয়। মেয়েরা নিজেরা এসময় নানা কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছিল, এমনকি তাদের দেখা যাচ্ছিল বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের দুঃসাহসিক অভিযানেও। তাতে তাদের নিজেদের নারীবাদী চেতনা কতটা জাগছিল সেটা বিতর্কের বিষয়।(৭১) তবে নিছক যৌবনবাদ তাদের সাম্য-প্রতিষ্ঠার পথে বিশেষ কিছু এগিয়ে দিতে পারে নি, তারা নিজেরা মাঝে মাঝে তার সুরে সুর মেলালেও। সাহিত্যে রাধারাধী দেবীর যৌনতার অধিকার দাবিও বোধহয় ব্যতিক্রম। পুরোনো পৌরুষবাদও যেমন মেয়েদের শক্তিবৃদ্ধি করে নি, শুধু মধ্যশ্রেণীর বাঙালি পুরুষের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের অস্ত্র হয়েছে, যৌবনবাদের ক্ষেত্রেও তার থেকে খুব অন্যরকম কিছু বলা যাবে না।

মধ্যশ্রেণীর বাঙালির মজ্জাগত কিছু মূল্যবোধে বিশেষ হেরফের ঘটাতে পারে নি যৌবনবাদ। যৌবনবাদী যুবকরা কৃষক-শ্রমিকদের দুঃখ বঞ্চনা নিয়ে দরদ ও ক্ষোভ প্রকাশ করলেও, কার্যক্ষেত্রে তাদের নিয়ে চলার মত মানসিকতা তাদের তৈরি হয় নি। কৃষক-শ্রমিকদের মধ্যেও যে তরুণ আছে এই সহজ সত্যটাই বোধহয় তারা উপলব্ধি করে নি। *ধূমকেতুর* নজরুল যুবকদের কাছে বীরের মর্যাদা পেলেও, তাঁর *লাঙ্গল* প্রকাশ করাটা তারা ভাল মনে নেয় নি, *লাঙ্গল* নামটাই তাদের পছন্দ হয় নি একথা জানিয়েছেন মুজফ্‌ফর আহমদ। দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জনে প্রস্তুত থাকলেও ভূমিতে তাঁদের স্বার্থ ছিল এবং চাষাভুষোদের প্রতি ছিল অবজ্ঞা(৭২)। এমনকি বামপন্থী আন্দোলনেও কৃষকদের সঙ্গে দূরত্ব কাটিয়ে ওঠা সহজ হয় নি। পৌরুষবাদের মতই আমাদের আলোচ্য যৌবনবাদ মধ্যশ্রেণীর যুবকদেরই আদর্শ।

যৌবনবাদে সংশয়

পৌরুষবাদের মতই যৌবনবাদেও দেখি একদিকে আদর্শের প্রচার, অন্যদিকে বাস্তব নিয়ে সংশয়। বাংলা কাব্যসাহিত্য যখন যৌবন-জোয়ারে প্লাবিত, তখনো যৌবন এমনকি যৌবনবাদ নিয়েই সংশয় প্রকাশ করেছেন অনেকে। একদিকে অভিযোগ করা হয়েছে যে এদেশে তরুণ নেই, শুধুই বৃদ্ধ (তরুণ বিপ্লবী দীনেশের ক্ষোভের

কথা আগেই বলেছি); অন্যদিকে যৌবনবাদেরই সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। *সবুজপত্রের* প্রথম সংখ্যায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আহ্বান 'যৌবনে দাও রাজটীকা' পড়ে কেউ তার এমন টীকা করেছিলেন—'যৌবনকে টীকা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য, তাকে বসন্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য। এস্থলে রাজটীকা অর্থ রাজা অর্থাৎ যৌবনের শাসনকর্তাকর্তৃক তাহার উপকারার্থে দত্ত যে টীকা সেই টীকা।' সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী অবশ্য এই সায়েস্তা খাঁ-সুলভ মনোভাবের প্রতিবাদ করে যৌবনের পক্ষে জোর সওয়াল করেছিলেন।(৭৩) কিন্তু যৌবনবাদের একটা পীড়াগ্রস্ত চেহারা যে সত্যি ছিল সেটা এমনকি অনেক সহানুভূতিশীল ব্যক্তিও লক্ষ্য করেছিলেন ও বাইরে থেকে না হলেও ভেতর থেকেই একটা নিয়ন্ত্রণের দাবি জানিয়েছিলেন।

যৌবনের সদর্থক ছবি অর্থাৎ তার শ্রেয়স্কর রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ার ছবির পাশাপাশি যৌবনের নিরর্থক নিষ্ফল উচ্ছ্বাসের ছবিটাও যৌবনবাদে খুবই প্রকট ছিল। হৃদয়োচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে ভাবনাচিন্তাহীন অতিকথন ও অসংলগ্নতা, অস্থিরচিত্ততা, অবিমৃষ্যকারিতা, উদ্ধত অহংবোধ এগুলিকেও গৌরবান্বিত করত যৌবনবাদ। এসব সত্যি করেই যৌবন-মানসিকতার লক্ষণ। কিন্তু এতে সুচিন্তিত নীতি বা গঠনমূলক কাজ থেকে দূরে সরে যাবারই কথা। এ যৌবনবাদকে দিয়ে মহৎ কোন কাজ খুব একটা হবার নয়। বয়ঃজ্যেষ্ঠ নেতারা প্রায়ই তরুণদের এ ব্যাপারে সাবধান করে দিতে চাইতেন। *তরুণ* পত্রিকার (বরিশাল) একটি সংখ্যায় (ভাদ্র, ১৩৩০) 'তরুণের প্রতি' রচনায় 'শুভাকাঙ্ক্ষী' বিপিনচন্দ্র পাল তরুণদের উৎসাহ দিতে গিয়েও একদিকে সংশয় প্রকাশ করেন বাংলায় সত্যি করে তরুণ বলে কোন বড় দল আছে কিনা—'তারুণ্যের কোন লক্ষণ তো এদেশে ফুটিয়া নাই! বাঙালী একেবারে বাল্য হইতে লাফাইয়া প্রৌঢ়ত্বে যাইয়া পড়িতেছে'—অন্যদিকে চারিদিকে 'অতি-প্রকাশে'র ঘটা দেখে এও বলেন 'যাহা বোঝ না তাহা কহিতে যাইত না। যাহা যখন যতটুকু বোঝ তার চাইতে বেশী একরত্তিও লিখিও না। নিজেদের ভাষার জালে নিজেদের তরুণ প্রাণকে জড়াইয়া পঙ্গু করিও না।' এই পত্রিকারই পরের সংখ্যায় বারীন্দ্রকুমার ঘোষ যে বাণী পাঠান তাতে যথারীতি যৌবনবাদের আলঙ্কারিক ভাষা ব্যবহার করলেও বলেন—বাচাল নয়, মাকাল নয়, পরের হাতে শক্তির ক্ষণিক স্ফুলিঙ্গ নয়, চাই স্থিতধী বোধশক্তিসম্পন্ন তরুণ।

তাছাড়া আলোচ্য যৌবনবাদ যে জিনিসটা নিয়ে খুবই ব্যাপৃত হয়ে ছিল, তা হল নর-নারী প্রেম। আমরা আগেই দেখেছি বাংলা গদ্যসাহিত্যে যৌবনবাদের চর্চার প্রধান জায়গা ছিল এটাই। যৌবন-মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে এটা স্বাভাবিক। এতে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও আছে। কিন্তু প্রেম নিয়ে নবীন সাহিত্যিকদের অত্যধিক উন্মাদনা সমসাময়িক অনেকের কাছেই হাসিঠাট্টার বিষয় হয়ে উঠেছিল। পরশুরামের গল্প 'কচি সংসদে' প্রেম ও কাব্য-বিলাসী হুতাশ হালদার, দোদুল দে, লালিমা পাল (পুং)-দের চরিত্রে সেই হাসির খোরাক আছে।(৭৪) *তরুণ-আলো* পত্রিকার

১৩৩৭-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'বেতারের বিষ্ণুশর্মা' নামের আড়ালে কেউ লেখেন—'বিবাহটাই সবচেয়ে বড় বন্ধন নয় এইটে প্রমাণ করতে তরুণের দল উঠে পড়ে লেগেছেন। প্রেম জিনিসটা মেয়ে কলেজের বাসের পেছন পেছন তাড়া করে, বাড়ীর ছাদে উঠতেই আরেক ছাদের মেয়েকে আঁকশি দিয়ে পাকড়ায়, রাস্তায় তরুণ চললেই দুধারের বাড়ীর জানালা থেকে প্রেম হ্যাঁকোচপ্যাঁকোচ করে, এই রকম কত কি!' লেখক মনে করিয়ে দেন, সাহিত্য শুধু নীতিশিক্ষার পাঠশালা নয় বটে, কিন্তু সাহিত্য ধাপাও নয়। *শনিবারের চিঠিতে* নীরদ চৌধুরী লিখেছিলেন(৭৫) 'আমরা যাহাকে সম্মুখে পাই তাহারই পায়ে হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা উজাড় করিয়া দিতে চাই, শুধু ব্লাউজ পেটিকোট পরা কেহ হইলেই হল।' আর, চৌধুরীর পর্যবেক্ষণে, এদের বাসনা বলতে দেশি ও চীনা রেস্টুরেন্টে একটু স্ফূর্তি করা, হ্যামসুন-গর্কির দু'একটা বই কেনা : 'আমাদের কামনা তো বেশী নয়। কিন্তু অত্যাচারী বিদেশী গভর্নমেন্ট ও তাহার নিষ্ঠুর আইন, নিষ্ঠুর অভিভাবক, নিষ্ঠুর সমাজ আমাদের এই সামান্য বাসনার পথেও কি বিরাট বাধাই না তুলিয়াছে।' তাছাড়া চৌধুরী বানিয়ে-তোলা সমস্যার বেসাতি করার অভিযোগও এনেছিলেন তরুণ সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে, সেটাও নিতান্ত ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণে, খুব চিন্তাহীনভাবে ও নিতান্ত ভাবাবেগবশত। মোটের ওপর তাঁর মতে, বাংলা সাহিত্য under-graduate-দের হাতে পড়েছে—এরা সবুজপত্রের পুচ্ছ-নাচানো বীরদের মত সবুজ নয়, কাঁচা-ডাশা সবুজ (বা অপক্ক কদলী): 'যখন দেখি এই বালকের দল সাহিত্য, আর্ট, সমাজ-সংস্কার, রাষ্ট্রবিপ্লব লইয়া ছেলেখেলা করিতেছে, তখন হঠাৎ ভয় হয় কখন বা ইহারা না জানিয়া, না বুঝিয়া, পরের মাথায় অযথা অথবা নিজের পায়েই কুড়ুল মারিয়া বসে।' নবীনদের সাহিত্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আপত্তির কথা তো আগেই বলেছি।

এমনকি যৌবনবাদের মধ্যমণি নজরুলকে নিয়েও কি সংশয় ছিল না? নীরদ চৌধুরীর উল্লিখিত প্রবন্ধে 'বিদ্রোহী' কবিতা সম্পর্কে সে সংশয় আছে—'ভগবান, ভগবান, এমন কে আছে যে ষোড়শী তরুণীর গালের গুলবাগে, শুভ্র গ্রীবার উপর, সুকোমল বক্ষঃস্থলে দিনরাত লুটোপুটি খাইবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারে? এ তো বিদ্রোহ নয়, এ যে আত্মসমর্পণ!' তাছাড়া, নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি অসার আত্মশ্লাঘামূলক প্রলাপের মতও হয়ত শুনিয়েছিল কারো কারো কাছে, অন্তত সজনীকান্ত দশকে প্যারডি রচনার সুযোগ দিয়েছিল সেটাই।(৭৬) (বস্তুত, আমাদেরও মনে না হয়ে পারে না যে নেহাৎ কবিতাটিতে বিক্ষিপ্তভাবে একটা মহৎ সামাজিক আদর্শ আছে বলেই তার অহংকারী প্রচারে যেন মানবতার মহিমাই ঘোষিত হয়, এবং গঠনমূলক বিদ্রোহের মূল্যেও তা ভূষিত হয়। নইলে তার বেশিরভাগটাই চটকদার প্রগলভতা।) শেষ পর্যন্ত নজরুল কতটা 'কাজের কাজী' হতে পারলেন (দাদাঠাকুর 'সাচ্চা কথার দাওয়াই' দিয়ে বেইমান পাজিদের জব্দ করার জন্য *ধূমকেতুর* নজরুলকে এই আখ্যা দিয়েছিলেন)(৭৭), আর কতটা

'Wild, exuberant, delirious, intoxicated and intoxicationg' (বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়)(৭৮) হয়ে রইলেন এ নিয়েও সন্দেহ থাকতেই পারে। প্রথম চৌধুরী বেশ মননশীল যৌবন আবাহন দিয়েই সুরু করেছিলেন। কিন্তু নজরুলে এসে বেশিরভাগটাই বড় বেশি আবেগ-উচ্ছ্বাস। দোষটা একা নজরুলেরই নয়। এমনকি সুভাষের মত রাজনৈতিক নেতা, যাঁর খুবই দায়িত্ববান হবার কথা, তিনিও যখন সেই আবেগ-উচ্ছ্বাসে ভেসে ভুল করার অধিকার দাবি করেন উচ্চকণ্ঠে, তখন যৌবনবাদের কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ জাগতেই পারে।

যুবকদের প্রচুর সাংগঠনিক আয়োজন সত্ত্বেও—তারা যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে চায় না, নিজেদের মধ্যে কলহ-বিবাদ করে, বন্যাত্রাণে তারা এগিয়ে আসছে না (*তরুণ*, বগুড়া, বসন্ত, ১৩৩০) এরকম অভিযোগ সেযুগে সুলভ ছিল। ছাত্রদের পড়াশোনার সংকীর্ণতা ও গ্র্যাজুয়েট হবার প্রবল তাগিদ নিয়ে অখুশি ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায় (*তরুণ*, বরিশাল, অগ্রহায়ণ ১৩৩০)। *শনিবারের চিঠিতে* যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখেছিলেন—'আজ বাংলার তরুণ অন্তরে অন্তরে অনুভব করে—জীবনের ক্ষেত্রে তার নূতন নূতন পথ কেটে বার হবার সাধনা নানা দিকে ব্যর্থ হয়েছে বলেই সে একমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রে কালিকলমের সাহায্যে তার তরুণত্ব সপ্রমাণ করতে বাধ্য হয়েছে' (পৌষ ১৩৩৪)। ১৯৩০ নাগাদ নির্মলকুমার বসু *নবীন ও প্রাচীন* নামে একটি বই প্রকাশ করেছিলেন।(৭৯) সেখানে 'আদর্শ ও অনুভূতি' শীর্ষক প্রবন্ধে বোধহয় সমসাময়িক নবীনদের কথা মনে রেখেই বলেছিলেন—শৈশব ও যৌবনের প্রারম্ভে মানুষের মনে যে আদর্শ তৈরি হয়, তার সঙ্গে জীবনের কার্যাবলীর সঙ্গতি স্থাপনের চেষ্টাকে সাধনা বলে। কিন্তু সঙ্গতি স্থাপন সহজ নয়। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে, পার্শ্ববর্তী অবস্থা থেকে নিজেকে ভিন্নরূপ করে, সংসারের দেওয়া দুঃখকষ্টকে সত্যসেবার উপহারস্বরূপ গ্রহণ করে এই সাধন করতে হয়। এর জন্য জীবনের পথে একাকী বিচরণ করতে হয়, যেটা অনেকের পক্ষে ভয়ের কথা। তারপর সংগ্রাম বাহির থেকে অন্তরে পর্যবসিত হলে সেই ঝড় অন্তরে বহন করার শক্তি সকলের থাকে না, তখন পরাজয় স্বীকার করতেই হয়। বসু বলেন—সংসারে অহরহ যেসব আদর্শ এইভাবে শুকিয়ে যায়, 'সেগুলির অধিকাংশ সামাজিক পরিবেশ হইতে আলগাভাবে সংগৃহীত, স্বীয় জীবনের অনুভব হইতে লব্ধ নয়।' যৌবনবাদসহ সেযুগের অন্যান্য মহীয়ান আদর্শগুলি কি সত্যি এমন ওপর ওপরই প্রবেশ করেছিল অধিকাংশ যুবকের মনে? সেগুলির জন্য সংগ্রাম করার মত অন্তরের গভীর অনুভব কি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল না?

'যুগের হুজুগ কেটে গেলে'

যৌবনবাদের কার্যকারিতার প্রমাণ সবথেকে বেশি পাওয়ার কথা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। আমরা জানি, রোমান্টিক কবি বায়রন, যিনি বন্ধুপত্নীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত

হয়েছিলেন অনায়াসে, তিনিই গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিয়ে প্রাণ বলি দিয়েছিলেন, আর বলেছিলেন "I have no consistency except in poitics."(৮০) যৌবনবাদ যতদূর সেযুগের রাজনৈতিক কাজকর্মে শক্তি যোগাতে পেরেছিল ততদূরই তার দৃঢ়-পিনদ্ধ চেহারা। আমাদের দেশে যৌবনবাদের উজ্জ্বলতম প্রকাশ ঘটে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে। মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে বিপ্লবী কাজকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত শত যুবক। কিন্তু সেখানেও দাদাগিরি, দলাদলি, সংকীর্ণতা, নীচতা, বিভ্রান্তি ছিল না যে তা নয়। সাম্যবাদ নিছক আবেগের ব্যাপার হিসেবে ছিল কাব্যিক অভিব্যক্তিমাত্র; সাম্যবাদী সক্রিয়তা যেটুকু ছিল, সেখানে দলীয় নীতিনিয়ম ও নিয়ন্ত্রণের প্রাধান্যে যৌবনবাদী উচ্ছ্বাসের সুযোগ তেমন ছিল না। কংগেসের ছাত্র আন্দোলনে যৌবনবাদের প্রচার খুব হয়েছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ছবিটা হতাশাব্যঞ্জক। শেষপর্যন্ত তা কংগ্রেসি আন্দোলনের লেজুড় হয়েই থাকে, নেতাদের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়, তাদের রক্ষণশীলতা ও দলাদলির সামিল হয়। রঞ্জিত রায় দেখিয়েছেন(৮১), শুধুমাত্র দেশাত্মবোধ নয়, শিক্ষার ক্ষেত্রে খরচ বাড়া, যথোপযুক্ত সুযোগসুবিধের অভাব, শিক্ষান্তে চাকরি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ছাত্রদের আন্দোলনমুখী করে তুলেছিল। নেতারা তাদের ক্ষুব্ধ অনিশ্চিত মানসিকতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। শহরতলি ও গ্রাম থেকে বড় শহরে পড়তে আসা ছাত্রদের ফাঁদ পেতে ধরা হত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে দলবদ্ধ হয়ে তারা ফেলে আসা পারিবারিক জীবনের যৌথতা খুঁজে পেতে চাইত, খানিকটা নিরাপত্তা অনুভব করত।

ব্যক্তিগত জীবনেও খুব বেশি যুবক বিদ্রোহ করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অভিভাবকরা ছেলেদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া পছন্দ করতেন না। ছেলে পাশ করে ভাল চাকরি করবে এই প্রত্যাশা এখনকার মত তখনও সমাজসত্য ছিল। প্রবল পারিবারিক চাপকে উপেক্ষা করা সহজ ছিল না। নরনারী-প্রেমের ক্ষেত্রে বাসনার বিপুল আলোড়ন দেখা দিয়েছিল, কিন্তু সেক্ষেত্রেও বাস্তবে বিদ্রোহ কমই হয়েছে। পুরুষ-নারীর সাম্যের অধিকারও প্রতিষ্ঠা করতে তেমন আগ্রহ দেখা যায়নি। দরিদ্রের দুঃখ দূরীকরণের ক্ষেত্রেও তাই। রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক কোন ক্ষেত্রেই খুব বেশি সাহসিকতা দেখানো কমসংখ্যক যুবকের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। যৌবনের যে সর্বজরহর ভাবমূর্তি এঁকেছিল যৌবনবাদ, যে মহৎ-বৃহৎ প্রত্যাশা তার কাছে রেখেছিল, তার বাস্তবায়নে এগিয়ে এসেছিল খুবই অল্প সংখ্যক যুবক। আর, যারা এগিয়ে এসেছিল, তারা নিছক যৌবনবাদের মধ্যে খুব বড় কোন শক্তির সন্ধান বোধহয় শেষপর্যন্ত পায়নি।

শেষপর্যন্ত কার্যক্ষেত্রে তেমন নয়, যৌবনবাদ তার ব্যাপকতম অভিব্যক্তি লাভ করে সাহিত্যক্ষেত্রে। তাও গদ্যসাহিত্যে তেমন নয়, প্রধানত কাব্যসাহিত্যেই। এবং সেখানে কিছু জমকালো শব্দ অতিব্যবহারে অর্থহীন হয়ে যায়। সমকালে বা কিছু পরে লেখা উপন্যাসে সেইসময়ের আদর্শবাদী যুবকদের, তাদের রাজনৈতিক ও

সমাজহিতের পথসন্ধান, তা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব, পরীক্ষানিরীক্ষার চিত্র আছে। সেযুগের মধ্যশ্রেণীর যুবকদের একাংশ যে দেশপ্রেম, গণসচেতনতা, নতুন রকমের মর্যাদাবোধ, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল তার পরিচয় আছে এগুলিতে। মনে পড়ে শরৎচন্দ্রের *পথের দাবি*, তারাশঙ্করের *ধাত্রীদেবতা*, গোপাল হালদারের *একদা*, ননদী ভৌমিকের *ধুলোমাটির* কথা।(৮২) প্রত্যেকটিতেই যুবক ও যৌবনের বড় ভূমিকা, কিন্তু যৌবনবাদী উচ্ছ্বাস কোথাও নেই। রাজনীতি বা সমাজসেবার বাস্তবঘনিষ্ঠ বর্ণনার মধ্যে সেটা অপ্রয়োজনীয়ই মনে হয়েছে! শুধু বনফুলের *সপ্তর্ষিতে*(৮৩) অন্যতম পথসন্ধানী যুবক রজতশুভ্র, কলকাতা কংগ্রেসে ডোমিনিয়ন স্টেটাস প্রস্তাবের পর আরো অনেক যুবকের মত নিরাশ, সারা ভারতের যত সদ্যগঠিত যুব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিচিত হতে আগ্রহী, কারণ গান্ধীর আপোস-উন্মুখতার বিপরীতে যুবকদের ওপরেই তার ভরসা। কিন্তু সে ভরসা শেষপর্যন্ত খুব একটা তার থাকে না। মোহভঙ্গ হয় সুভাষের ভোটবৃদ্ধি করে কংগ্রেস দখলের আহ্বানে, যে উদ্যোগ তার রুচিকর মনে হয় না।

নজরুল, যিনি বোধহয় সবথেকে প্রবলভাবে যৌবনবাদের দ্বারা উদ্বেলিত হয়েছিলেন, তিনিও ব্যাপারটাকে 'যুগের হুজুগ' বলে বর্ণনা করেছিলেন। 'পরোয়া করি না বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে/মাথার ওপর জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।'(৮৪) রবীন্দ্রনাথের গভীরভাবে অনুভূত যৌবনবার্তা, নজরুলের উচ্ছ্বসিত যৌবনবাদ, শত শত ছেলের সেই আবেগে ভেসে যাওয়াকে তাহলে 'যুগের হুজুগ' বলা যায়! যেন সেটা একটা স্নায়বিক পীড়া বা খ্যাপামি। সুতরাং খুব দ্রুতই 'ফাগুন ফুরায় আগুন জুড়ায়'। তিরিশের দশক থেকে যৌবনবাদী উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে এল। আইন-অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতা বিদ্রোহমনস্ক তরুণদের মনে আনল হতাশা ও অবসাদ। তাছাড়া ১৯২৯ থেকে বেশ কয়েক বছর ধরে বিশ্বব্যাপী মন্দার বাজার অর্থনীতির পক্ষে শুভ না হলেও, মধ্যশ্রেণীর চাকুরিজীবী, যাদের কোন পণ্য বিক্রী করতে হয় না, শুধু দোকানে জিনিস কিনে জীবনধারণ করতে হয়, তাদের বেশ খানিকটা স্বস্তি এনে দিল। এই সমাজের তরুণদের মধ্যে অসন্তোষ অনেক কমে এল। বিশের শেষ ও ত্রিশের প্রথমে বিপ্লবপ্রচেষ্টা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে চূড়ান্ত পরিণতি পায়। তারপরে আর সশস্ত্র বিপ্লব বাঙালি তরুণদের নতুন করে আকৃষ্ট করে নি। মধ্য-ত্রিশ থেকে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী প্রতিরোধ ও কমিউনিস্ট পার্টির 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট' নীতির ফলে বাম রাজনীতি ও সংস্কৃতি বরং দানা বেঁধে উঠল। ছাত্র আন্দোলন সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু মোটের ওপর যৌবনবাদী উত্তালতা অত ছিল না।

কর্মক্ষেত্রে যৌবনবাদের মহত্তম অভিব্যক্তি তরুণ বিপ্লবীদের মাহাত্ম্য পর্যন্ত বরবাদ হয়ে গেল ১৯৩৪ সালে রবীন্দ্রনাথের *চার অধ্যায়* উপন্যাসে।(৮৫) অথচ রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবীদের প্রতি গভীর সহানুভূতিই দেখিয়েছিলেন এতদিন। অবশ্য এটাও

ঠিক যে শেষপর্যন্ত কারারুদ্ধ বিপ্লবীরাই যৌবন-মাহাত্ম্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল গড় বাঙালির মনে। ১৯৩৭ সালে মনীশ ঘটক 'বাঙালির ছেলে' নামে একটি কবিতা লেখেন।(৮৬) কবিতাটি জুড়ে অপদার্থ, আদর্শহীন, অধঃপতিত বাঙালি যুবকের যে বর্ণনা (ক্লাস ফাঁকি, নোটবই-এর হোমিওপ্যাথিক ডোজে পরীক্ষার প্রস্তুতি, চায়ের দোকানে রাজাউজির মারা, পাড়ার মেয়েরা যথেষ্ট প্রগতিবাদিনী না হওয়ায় সোনাগাছি বা রামবাগান যাওয়া, ইত্যাদি), তার একেবারে শেষে আত্মত্যাগী বিপ্লবী তরুণদের কথা এক তীব্র বৈষম্যের ছবি ফুটিয়ে তোলে—'ওদিকে আন্দামানে/সিন্ধুর নীরে সন্ধ্যা ঘনায় দিবাবসানে,/দু'দশ হাজার তাজা জানোয়ার ঢালে কলিজার ধারা/ হয় কালো জল রক্ত পিছল, কাঁপে কংসের কারা।'

১৯৪৩ সালে নিজের মধ্য-তিরিশে বুদ্ধদেব বসু 'উত্তর-তিরিশ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখলেন(৮৭) 'আমার মনে হয় যৌবনকে নিয়ে কবিরা চিরকালই একটু বাড়াবাড়ি করেছেন এবং 'আমার বিশ্বাস জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় যৌবন নয়, জীবনের মাঝামাঝি অবস্থাই সবচেয়ে ভাল।' যদি বা ধরে নিই এ ধরনের উক্তির মধ্যে তাঁর নিজের হৃতযৌবনের জন্য একটু দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে ছিল, যেটা আমাদের পক্ষে আরো প্রাসঙ্গিক তা হল প্রবন্ধ জুড়ে তিনি সাবেকি ধাঁচে নিছক কায়িক যৌবনের কথাই বলেছেন, প্রধানত সেই অর্থে তার কামনা-বাসনার কথা বলেছেন, কিন্তু তার আদর্শবাদিতা ও বিদ্রোহী সাহসের কথা বলেননি একেবারেই।

অবশ্য বিশের দশকের যৌবনবাদের উত্তরাধিকার পরবর্তীকালে ক্বচিৎ কখনো দেখা গেছে। ১৯৩৬ সাল থেকে কমিউনিস্টদের ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠে; কিন্তু শুধু ছাত্র আন্দোলনের জন্যই নয়, সাধাণভাবেই কমিউনিস্ট রাজনীতির নানা পর্বে যুবশক্তিকে আবাহন করা হয়েছে। কমিউনিস্ট রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতেই তো সুভাষ মুখোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন 'যৌবন-আত্মা' চিনে নেবে দুর্যোগ-দুর্বোধ্য পথ, সুকান্ত ভট্টাচার্য লিখেছিলেন 'এ দেশের বুকে আঠার আসুক নেমে', কিম্বা সলিল চৌধুরী নওজোয়ানের গান বেঁধেছিলেন। কিন্তু অন্তত ব্যাপকতার দিক থেকে আমাদের আলোচ্য কালের মত যৌবনের মহোৎসব তৎকালীন কমিউনিস্ট রাজনীতিতে হয় নি।(৮৮) নকশাল আমলেও হয়ত বিশেষ করে তারুণ্যকে জাগানো হয়েছিল। মধ্যশ্রেণীর যুবকদের যৌবন-সংকট ছিল সেই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে, আন্দোলন প্রধানত যুবকদেরই। কিন্তু আন্দোলনের মধ্যে যৌবনবাদ আমাদের আলোচ্য কালের মত শক্তিশালী ছিল কি? (অবশ্য আন্দোলনের বাইরে সাহিত্যে-চলচ্চিত্রে নকশালদের তারুণ্য নিয়ে বেশ একটু আবেগ-উচ্ছ্বাস দেখা গেছে)। কমিউনিস্টরা বাধ্যত তরণদের থেকে বেশি আদর্শায়িত করে শ্রমিক-কৃষকদের। তাছাড়া কমিউনিস্ট আন্দোলনের আনুগত্য ও শৃঙ্খলার দাবি যৌবনবাদী উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বেশি দূর মেলে না। মধ্য-ত্রিশের পর থেকে যৌবনবাদ বোধহয় আর তেমন করে কখনো বাঙালির মন জুড়ে বসতে পারে নি।(৮৯)

প্রান্ত-টীকা :

১. অবশ্য সুমিত সরকার তাঁর *Modern India* গ্রন্থে (Macmillan India. Delhi. 1990 edition)-এ এবিষয়ে সামান্য আভাস দিয়েছিলেন এবং তনিকা সরকারের *Bengal : Politics of Protest. 1928-1934*-এ (Oxford University Press, Delhi. 1987)-এও এ নিয়ে যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় আছে। কিন্তু বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা এখনো বাকি।

২. নজরুলের বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণা *কেউ ভোলে কেউ ভোলে না*, নিউ এজ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫। এছাড়াও দ্রষ্টব্য মুজফ্ফর আহমদ, *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা* (১ম মুদ্রণ ১৯৬৫), ৮ম মুদ্রণ ১৯৯৫, পৃ. ৯-১০।

৩. রণাঙ্গনে রচিত নজরুলের লেখাগুলি *ব্যথার দান* ও *রিক্তের বেদন* গল্পগ্রন্থ এবং *হেনা* ও *বাঁধনহারা* উপন্যাস সবই পাওয়া যাবে *নজরুল রচনা সম্ভার*-এ (হরফ প্রকাশনী)।

৪. *সুভাষচন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৮, পৃ. ৫০-৫১। উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে সুভাষের অসমাপ্ত আত্মজীবনী "ভারত-পথিক" থেকে।

৫. একটি উদাহরণ—করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গান 'বাজে রণের ভেরিরে/আজি বঙ্গ জাগো রে', গীতা চট্টোপাধ্যায়ের *বাংলা স্বদেশি গান* (দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়) গ্রন্থে সংকলিত।

৬. *শেষ সপ্তক*-এর ৪৫ নং কবিতা।

৭. *বলাকার* প্রকাশকাল ১৩২১।

৮. *বলাকার* ৪ নং কবিতা।

৯. নিজেদের জাতীয় রাজনীতিতে দাগ কাটতে সক্ষম 'ইয়ং ইরানিয়ানস" বা দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে সোভিয়েটের হাতে দমিত 'ইয়ং তাতারস", 'ইয়ং বুখারানস" ইত্যাদি আন্দোলন অবশ্য আমাদের দেশে কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব রাখতে পেরেছিল বলে জানা নেই। অক্টোবর, ২০০৩-এ SEPHIS (South-South Exchange Programme for Research on the History of Development) তাসখণ্ডে "Young Movements" বিষয়ে একটি ওয়ার্কশপ করে। সেখানে বিংশ শতকের গোড়ায় ইসলামী দুনিয়ার এই ধরনের কিছু আন্দোলন আলোচিত হয়েছে, Sephis Newsletter, January 2004 no 9.

১০. যথাক্রমে *মোসলেম ভারত*, শ্রাবণ ১৩২৭ ও ভাদ্র ১৩২৭।

১১. দ্রষ্টব্য মুজফ্ফর আহমদের পূর্বোক্ত গ্রন্থের "সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ" শীর্ষক অধ্যায়।

১২. চিত্তরঞ্জন দাশ কারারুদ্ধ হলে তাঁর পত্নী বাসন্তী দেবীর অনুরোধে রচিত হয় "ভাঙার গান"। প্রকাশিত হয় বাসন্তী দেবী সম্পাদিত *বাংলার কথা* পত্রিকায়, ১৯২২-এর ২০ জানুয়ারি।

১৩. "বিদ্রোহী"র প্রথম প্রকাশ *বিজলী*, জানুয়ারি, ১৯২২; ও পরে *মোসলেম ভারত*, কার্তিক, ১৩২৮। *অগ্নিবীণা* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

১৪. কল্পতরু সেনগুপ্ত *জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম* গ্রন্থে (পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯২) এটি উদ্ধৃত করেছেন, পৃ. ২১।

১৫. ঐ, পৃ. ২১।

১৬. পরিমল গোস্বামী, *স্মৃতিচিত্রণ*, প্রতিক্ষণ সংস্করণ ১৪০০, ২য় মুদ্রণ, পৃ. ৮৯।

১৭. কবিতাটির নাম "সব্যসাচী"। *লাঙল* পত্রিকায় (৭ জানুয়ারি, ১৯২৬) প্রকাশিত হয়।

১৮. গোপাল হালদারের আত্মজীবনী *রূপনারানের কূলে*, ২য় খণ্ড, পুঁথিপত্র, ২য় সংস্করণ, পৃ. ২-৩।

১৯. *কল্লোল যুগ*, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৭, এম সি সরকার আণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ।

২০. গজেন্দ্রনাথ মিত্র ও সুমথনাথ ঘোষ সম্পাদিত *কথাসাহিত্য* পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ (নজরুল সংখ্যা)-এ প্রকাশিত প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রবন্ধ "অপরিমেয়" থেকে।

২১. তবে অনুশীলন দলের সঙ্গে নজরুলের ভুল-বোঝাবুঝি হয় *ধূমকেতু*-তে "আনন্দময়ীর আগমন" প্রকাশিত হলে (যে কবিতা লিখে নজরুলকে জেলে যেতে হয়)। অনুশীলনের সদস্যদের মনে হয়েছিল কবিতাটিতে অনুশীলন নেতা পুলিন দাস সম্পর্কে কটাক্ষ আছে।

২২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

২৩. কালীপদ চক্রবর্তী, *অগ্নিযুগের চট্টগ্রাম ও আন্দামান স্মৃতি*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯।

২৪. শৈলেশ দে রচিত *বিনয়-বাদল-দীনেশ* গ্রন্থে (কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, ১৩৭৬) জেলে বসে লেখা দীনেশের চিঠিগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে।

২৫. রণেন সেন, *বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ* (১৯৩০-৪৮), বিংশ শতাব্দী, ১৩৮৮, পৃ. ৩০।

২৬. তনিকা সরকার পূর্বোক্ত গ্রন্থে এটা লক্ষ্য করেছেন। ননী ভৌমিকের উপন্যাস *ধুলোমাটি*, আমাদের আলোচ্য কালের সমাজ রাজনীতি যার বিষয়বস্তু, সেখানেও পাই—'শুধু বীরু নয়, শুধু রতন নয়, সারা বাঙলা দেশের যৌবনটাই যেন তাদের পথ বেছে নিচ্ছে বুঝে না বুঝে। প্রতিরোধ! বুঝে না বুঝে মুঠো বাঁধতে চাইছে বাঙলার সাধারণ আবেগ। সে আবেগ কাউকে ছাড়তে চায় না, গান্ধীজীকেও নয়, চট্টগ্রামের রোমাঞ্চকেও নয়; না আইন অমান্যকে, না রাইটার্স বিল্ডিং-এর অভ্যন্তরে গুলির দুঃসাহসকে।' (বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৬৩, পৃ: ১০৮।)

২৭. *সুভাষচন্দ্র বসু রচনাবলী*, ১ম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

২৮. সেযুগের ছাত্র আন্দোলন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন রঞ্জিত কুমার রায়, "স্বদেশি থেকে আইন অমান্য; রাজ-এর বিরুদ্ধে বাংলার ছাত্র সমাজের সংগঠিত বিক্ষোভ" শীর্ষক প্রবন্ধে। এটি পাওয়া যাবে বরুণ দে সম্পাদিত *মুক্তি সংগ্রামে বাঙলার ছাত্রসমাজ* গ্রন্থে (পশ্চিম বঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ১৯৯২)। আমরা এই প্রবন্ধে পরিবেশিত বেশ কিছু তথ্য বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহার করব।

২৯. দ্রষ্টব্য Chhaya Dasgupta, *Youth and Student Movements in Bengal : A Historical Survey, 1919-1946* (Firma Klm Pvt. Ltd. Calcutta. 1995) গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়, যার শিরোনাম "Period of Consolidation (1928-1929)".

৩০. বরিশাল থেকে প্রকাশিত এবং সুকুমার দত্ত ও হীরালাল দাশগুপ্ত সম্পাদিত *তরুণ* নামে পত্রিকার ভাদ্র, ১৩৩০-এর সংখ্যায় সম্পাদকের বাড়ির ছাদে তরুণ সংঘের সাহিত্য (বিশেষত রবীন্দ্র-সাহিত্য) আলোচনার খবর পাই। এর কিছুদিন পর জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১-এর সংখ্যায় বরিশালে আনুষ্ঠানিকভাবে তরুণ সংঘ প্রতিষ্ঠার খবর পাওয়া যায়। বগুড়া থেকে প্রকাশিত ও এম মেছের আলী সম্পাদিত *তরুণ* পত্রিকাতেও (ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৩৫ থেকে সূচনা) "*তরুণ* মজলিশ" অংশে বগুড়ার নানা স্থানে সমাজসেবামূলক কাজ করা (প্রায়ক্ষেত্রেই জাতিধর্ম নির্বিশেষে) তরুণ সম্মীলনী, যুবক সমিতি ইত্যাদি নামের সংগঠনের খোঁজ পাওয়া যায়। এদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও জানা যায় এসব উৎস থেকেই।

৩১. বরিশালের *তরুণ* পত্রিকার একটি সংখ্যায় (আষাঢ়, ১৩৩১) তরুণ সংঘের জন্য এই খবর পরিবেশিত হয়েছে। দিলীপ কুমার রায় জার্মানিতে Wandervogel বা "উড়ো পাখি" নামে তরুণ-তরুণীদের যে সংগঠন দেখে এসেছেন তার দৃষ্টান্ত দিয়ে তরুণদের পদব্রজে দেশ-পর্যটনে উৎসাহ দিয়েছেন সম্পাদক, এবং তারপর বাংলার গ্রাম থেকে এই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

৩২. "তরুণের বিদ্রোহ" পাওয়া যাবে *শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ*, ১৩শ সম্ভারে (এম সি সরকার আণ্ড সনস প্রাঃ লিঃ)

৩৩. *জিঞ্জীর* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

৩৪. দুটি কবিতাই *অগ্নিবীণা* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

৩৫. *জিঞ্জীর* কাব্যগ্রন্থ।

৩৬. *নজরুল রচনা-সম্ভার*, ১ম খণ্ড।

৩৭. ঐ

৩৮. *সত্যাগ্রহী*, ১৮ই রমজানুল মোবারক, ১৩৪৫ হিজরী।

৩৯. *সাম্যবাদী*, আষাঢ় ১৩৩২।

৪০. *সাহিত্যিক*, ভাদ্র, ১৩৩৪।

৪১. রমনা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত, সম্পাদক মুহম্মদ ফযলুলকরীম মল্লিক। ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩২।

৪২. আবুল ফজল, "মাতৃভাষা ও বাঙ্গালী মুসলমান"।

৪৩. "জীবনী সাহিত্য" নামে প্রবন্ধ।

৪৪. *তরুণ*, শীত, ১৩৩৫।

৪৫. *তরুণ* পত্রিকার এই প্রবন্ধটির লেখক মোহম্মদ এসহাক্, প্রথম সংখ্যাতেই (ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৩৫) প্রকাশিত।

৪৬. সরকারের পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৪৭. শৈলেশ দে-র পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৪৮. ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৮ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক অন্নদাকুমার চক্রবর্তী।

৪৯. পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছিল ১৩১১ থেকে। আমরা এই পত্রিকার ১৩৩৬-৩৭-৩৮ নাগাদ প্রকাশিত সংখ্যাগুলি দেখেছি। "ইসলাম ও মুসলমান" প্রবন্ধটি লেখক মৌলভী আহকামদ্দীন আহমদ। প্রকাশিত হয় ১৩৩৭-এর কোন সংখ্যায়।

৫০. দ্রষ্টব্য Tapan Basu, Pradip Datta, Sumit Sarkar, Tanika Sarkar, Sambuddha Sen, *Khaki Shorts Saffron Flags : A Critique of Hindu Right*, Orient Longman, New Delhi, 1993.

৫১. "হতভাগ্যের গান" রচিত হয় ১৩০৪-এ। *কল্পনা* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। *বসন্ত* প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে। *তাসের দেশ*-এর প্রথম প্রকাশ ১৩৪০ সালে, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৮৫-এ। এগুলি যথাক্রমে *রবীন্দ্র রচনাবলীর* (বিশ্বভারতী) ৭ম, ১৫শ ও ২৩শ খণ্ডে আছে।

৫২. *নজরুল রচনা সম্ভার*, প্রথম খণ্ড, পৃ ৯৫।

৫৩. মনে পড়ছে "থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগতটাকে" কবিতাটির কথা। এছাড়া দ্রষ্টব্য ১৯৩২ সালে সিরাজগঞ্জে মুসলিম তরুণ সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে তাঁর ভাষণ, *নজরুল রচনা সম্ভার*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯-১০০।

৫৪. ১৯২৯ সালে চট্টগ্রাম এডুকশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ভাষণ, *নজরুল রচনা সম্ভার* ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭।

৫৫. বলাই দেবশর্মাকে লিখিত নজরুলের চিঠি, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৩২, *নজরুল রচনা সম্ভার*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৯।

৫৬. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যে পত্রিকাগুলি সংরক্ষিত আছে তাদের একটা তালিকা দিচ্ছি :
তরুণ (১৩৩০-৩১) সম্পা: সুকুমার দত্ত ও হীরালাল দাসগুপ্ত, বরিশাল
তরুণ (১৩৩৫-৩৬), সম্পা: এম মেছের আলী, বগুড়া

তরুণ (১৩৩৬-৩৭), সম্পা: সুধীরচন্দ্র সরকার
তরণ আলো (১৩৩৭), সম্পা: বরেন্দ্রসুন্দর চট্টোপাধ্যায়
তরুণপত্র (১৩৩২), সম্পা: মুহম্মদ ফযলুলকরীম মল্লিক, ঢাকা
তরুণ ভারত (১৩২৮), সম্পা: বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন (এটি মোটামুটি গান্ধীর *Young India*-র বঙ্গীয় সংস্করণ)
তরুণ-লিপি (১৩৩২-৩৩), সম্পা: অমরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
তরুণ শক্তি (১৩৩৫-৩৬), সম্পা: অন্নদাকুমার চক্রবর্তী
যুবক (১৩৩৭-৩৮), সম্পা: সুললিত সরকার
যুবক (১৩১১-৩৬)), শান্তিপুর অনাথ আশ্রমের হিতার্থে পরিচালিত
(এমন নয় যে বন্ধনীভুক্ত বছরগুলির সব সংখ্যাই সংরক্ষিত)
যুবশক্তি নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখেছি *তরুণশক্তি* পত্রিকায়। সম্পা: নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫৭. রবীন্দ্রনাথের *মায়ার খেলা* গীতিনাট্যের গানের পংক্তি। এটি তাঁর তরুণবয়সের রচনা। ১২৯৫ সালে প্রথম প্রকাশ। গীতবিতানের ৩য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৫৮. 'তপোভঙ্গ" রচিত হয় কার্তিক, ১৩৩০-এ। *পূরবী* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। *রবীন্দ্র-রচনাবলীর* (বিশ্বভারতী) ১৪শ খণ্ডে পাওয়া যায়।

৫৯. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *কল্লোল যুগ* (পূর্বোক্ত) সে যুগকে বোঝার জন্য অপরিহার্য গ্রন্থ।

৬০. দ্রষ্টব্য সুকুমার সেনের *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড, দশম অধ্যায়, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ৪র্থ সং ১৯৭৬। অচিন্ত্যকুমারের *কল্লোল যুগ*-ও দ্রষ্টব্য।

৬০ক. আমাদের আলোচ্য কালেও বাংলায় যৌবনের শারীরিক দিকটি নিশ্চয় উপেক্ষিত ছিল না। উল্লেখযোগ্য বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের *যুবক-যুবতী*, যেটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯১ সালে এবং ১৯২২-এর মধ্যে সাতবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। উনিশ শতকের শেষ থেকেই বিবাহিত জীবনের জন্য নির্দেশ সম্বলিত অনেক বই বেরোচ্ছিল। এদের মধ্যে সবথেকে জনপ্রিয় এই বইটি। নারীশরীর, যৌনতা, গর্ভাধান, সন্তান প্রসব, সন্তান-পালন ইত্যাদি বিষয়ে অনেক উপদেশ ছিল এখানে। যৌবনে যৌনতা যাতে উচ্ছৃঙ্খল ও বিপজ্জনক হয়ে না ওঠে, তাই তাকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস এখানে পরিলক্ষিত। দ্রষ্টব্য Dagmar Engels, Beyond Purdah? : Women in Bengal, 1890-1930, OUP, Delhi, 1996, Sexuality-বিষয়ক অধ্যায়।

৬১. আমরা এই মানসিক সংকটের ধারণা পেয়েছি Erikson-এর *Young Man Luther : A Study in Psychoanalysis and History* (first published in 1958, Norton paperback, New York and London, 1962, reissued 1993) থেকে।

৬২. Rupert Brooke, *The Complete Poems*, AMS Press, 2nd edition, June 1942, the poem entitled 'Peace' (one of the 'War Sonnets')

৬৩. *বলাকা* কাব্যগ্রন্থের পরিপ্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঐ যুদ্ধের সময়টাকে এইভাবে বর্ণনা করেছিলেন। দ্রষ্টব্য "গ্রন্থপরিচয়", *বলাকা*, *রবীন্দ্ররচনাবলী* (বিশ্বভারতী, ১২শ খণ্ড)।

৬৪. এটি আমি পড়েছি *Gateway to Great Books*, Vol. Xএ (Encyclopaedia Britannica, Inc. 1963)।

৬৫. সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের সভাপতির ভাষণ, পূর্বোক্ত।

৬৬. বীরবল ছদ্মনামে লেখা এই রচনাটির শিরোনাম "যৌবনে দাও রাজটীকা", *সবুজপত্র*, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১।

৬৭. এই বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করেছে ইন্দিরা চৌধুরীর বই *The Frail Hero and Virile History : Gender and the Politics of Culture in Colonial Bengal*. Oxford University Press. New Delhi, 1998, paperback 2001.

৬৮. আমি দেখেছি সিগনেট সংস্করণ, ১৩৬১।

৬৯. শৈলেশ দে-র পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৭০. উল্লেখযোগ্য শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যাকৃতি গল্প "অরণ্যে", রচনাকাল জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০, *শরদিন্দু অমনিবাস* (আনন্দ পাবলিশার্স, ৬ঠ খণ্ড)। এখানে বনে লুকিয়ে থাকা চারজন বিপ্লবীর মধ্যে (যাদের একজন মুসলমান ও একজন মেয়ে) জীবনকে উপভোগ করার বাসনা, কাব্যপ্রীতি, নারীর প্রতি আকর্ষণ—এইসব নিয়ে দ্বন্দ্বের কথা। আরো মনে পড়ছে এই সময়কার পটভূমিতে রচিত ননী ভৌমিকের উপন্যাস *ধুলোমাটি*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৬৩। এখানে বিপ্লবীদলে নারীপ্রেম নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের কথা।

৭১. ভারতী রায়ের প্রবন্ধ "The Freedom Movement and Feminist Consciousness in Bengal, 1905-1929" (in Bharati Ray ed. *From the Seams of History*, Oxford University Press, New Delhi, 1995) অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন মেয়েদের নারীবাদী চেতনার জাগরণে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল। তনিকা সরকার তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে এবং "Politics and Women in Bengal : The Conditions and Meaning of Participation" (*Indian Economic and Social History Review*, vol. 21, no. i, 1984) প্রবন্ধে কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীবাদী চেতনার তেমন কিছু বিকাশ দেখেন নি।

৭২. মুজফ্‌ফর আহমদের প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২২২। এর বিপরীতে মনে পড়ছে মাও সে তুং-এর যৌবন আবাহন, মে ফোর্থ আন্দোলনের বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে (৪ মে, ১৯৩৯), যেখানে চীনের মুক্তি আন্দোলনে চীনের ছাত্র-যুবকদের ভূমিকাকে সমূহ স্বীকৃতি দিয়েও তিনি বলেন—'The young students and intellectuals must unite with the broad masses of young workers and peasants' দ্রষ্টব্য Stuart R. Schram ed. *The Political Thought of Mao Tse-tung*, Penguin Books Ltd., Harmondsworth, revised edition, 1964, p.354.

৭৩. পূর্বোক্ত রচনা।

৭৪. *কজ্জলী* গল্পগ্রন্থের (১৯২৭) অন্তর্গত।

৭৫. 'বলাহক নন্দী' ছদ্মনামে "প্রসঙ্গ-কথা" শিরোনামে এই ব্যঙ্গরচনাটি লেখেন, *শনিবারের চিঠি*, কার্তিক, ১৩৩৪।

৭৬. সজনীকান্ত দাশ-কৃত প্যারডি—'আমি ব্যাং/লম্বা আমার ঠ্যাং', *শনিবারের চিঠি*, ৪ অক্টোবর, ১৯২৪।

৭৭. *নজরুল রচনা সম্ভার*, ৩য় খণ্ড পরিশিষ্টে "ধূমকেতুর নজরুল" রচনাটিতে দাদাঠাকুরের কবিতাটি উদ্ধৃত হয়েছে।

৭৮. বুদ্ধদেব বসুর *An Acre of Green Grass* গ্রন্থের (১৯৪৮, প্যাপিরাস পুনর্মুদ্রণ ১৯৮২) প্রবন্ধ "Nazrul Islam".

৭৯. আমি দেখেছি নির্মলকুমার বসু, *নবীন ও প্রাচীন*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৬। এখানে বছর ১৮/১৯ আগে লেখা *নবীন ও প্রাচীন* নামে প্রবন্ধপুস্তক থেকে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ নেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত প্রবন্ধটি তাদের অন্যতম।

৮০. উদ্ধৃত করেছেন রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত তাঁর "Byron in the House of Lords" প্রবন্ধে। এটি লেখকের *English Poets on India and Other Essays* (The Book House, Calcutta, 2nd edition, 1945) গ্রন্থের অন্তর্গত।

৮১. পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

৮২. *পথের দাবি* পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ১৯২৬, *ধাত্রীদেবতা* পুস্তকাকারে প্রকাশ ১৯৩৯, *একদা* ১৯৩৩, *ধুলোমাটি* ১৩৬৩।

৮৩. *সপ্তর্ষি*, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৫।

৮৪. "আমার কৈফিয়ৎ" কবিতা, *সর্বহারা* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, কলকাতা, ১৯২৬।

৮৫. ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত। *রবীন্দ্ররচনাবলী* (বিশ্বভারতী), ১৩শ খণ্ড।

৮৬. *মনীশ ঘটকের কবিতা সংগ্রহে* পাওয়া যায়।

৮৭. *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সংকলনের* অন্তর্গত, (দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬৬)

৮৮. যদিও আমি মনে করি কমিউনিস্ট রাজনীতিতে যৌবনকে কিভাবে দেখা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। বিশেষ করে এই রাজনীতি নর-নারীর প্রেমকে কিভাবে দেখেছে, পুরোনো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে এ বিষয়ে তার পার্থক্য কোথায়, সেটা আগ্রহের বিষয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটা সময়ে আমরা পেয়েছিলাম ব্রহ্মচারী জাতীয়তাবাদীর নারী-বর্জনের আদর্শ। তারপর আমাদের আলোচ্য কালে প্রেমের জোয়ারে ভেসে যৌবনকে উদ্দীপিত করে তোলা—একদিকে যে প্রক্রিয়ার পিতৃতন্ত্র-বিরোধী বিদ্রোহী মেজাজ সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছিল দেশের মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে, অন্য দিকে নিন্দিত হয়েছিল বিচ্যুতির অভিযোগে। কমিউনিস্টরা, অন্তত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের "মে দিনের কবিতা"য় যা পাই, প্রেমকে স্বীকৃতি দিয়েও তাকে "প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য" বলে আন্দোলন-অনুকূল করে তুলতে চেয়েছিল, এবং এইভাবে নতুন রকম একটা যৌবন-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চেয়েছিল নিজেদের মধ্যে।

৮৯. নকশাল আন্দোলনের যৌবন-সংস্কৃতি নিয়েও গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, সারা পৃথিবীই সেই সময়ে যুব-বিদ্রোহে উত্তাল হয়ে ওঠে। "তরুণরাই আজকের প্রোলেতারিয়েত"- এমন বক্তব্য সে সময়ে কমিউনিস্টদের মধ্যে শোনা গিয়েছিল।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার : অশোক সেন, প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, সুতপা ভট্টাচার্য, সুমিতা চক্রবর্তী, গৌতম ভদ্র, প্রশান্ত রায়, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদেষ্ণা চক্রবর্তী।

ছিম্‌ছাঙর দুটা পার

মানস রায়

একটি অসমীয়া উপন্যাস ও বাংলার ইতিহাস

গোপীনাথ বরদলৈ আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দর, গুয়াহাটি। ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা ছবির মতন সুন্দর বিমানবন্দর। দুহাজার চার সালের মে মাস। ভারতের অন্যত্র তাপপ্রবাহ চললেও এই অঞ্চলে আবহাওয়া এখনো উপভোগ্য। বিমানবন্দরে আজ বেশ উৎসব উৎসব হাওয়া। সদ্যনির্বাচিত লোকসভার বেশ কিছু সদস্য দিল্লীর 'উড়ান'-এর অপেক্ষা করছেন। বিভিন্ন দলের সাংসদ তাঁরা। কংগ্রেসীরা সংখ্যায় ভারী। তবে নির্বাচনী লড়াইয়ের তিক্ততা আজ উধাও। উপস্থিত সবাই বিজয়ী। আগামী পাঁচবছর দল ছাড়াও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করবেন এঁরা। দিল্লীতে বাসা বাধবেন। তাই দলের বাইরেও একটা জোটবদ্ধতা থেকে যায়। আর সদ্য জয়ের রেশ সবার চোখে মুখে। খুশী খুশী ভাব।

চড়

ঠিক এমন সময় রেবকুদ্দীনের হাতে চড় খেলেন পূর্ণ এ্যাজিটক সাংমা।

পূর্ণ এ্যাজিটক সাংমা, সংক্ষেপে পি. এ. সাংমা বললে সারা ভারতে সবাই চেনে। একদা কংগ্রেসী মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তুরা লোকসভা কেন্দ্র থেকে একাধিকবার বিজয়ী হয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে সামলিয়েছেন শ্রম, কয়লা, বাণিজ্য প্রভৃতি দপ্তরের দায়িত্ব। সাংমা সাহেবের পরিচিতি নতুন মাত্রা পায় যখন ১৯৯৬ সালে তিনি সর্বসম্মতিতে লোকসভার স্পীকার নির্বাচিত হন। দল-মতের কিছুটা ওপরে স্থান করে নেন তিনি এবং বাকী ভারতের সাথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানসিক দূরত্ব কমানোর প্রক্রিয়ার কিছু সহায়তা হয়।

অতএব পূর্ণ সাংমা গুয়াহাটি বিমানবন্দরে জমায়েত নবনির্বাচিত অন্যান্য সাংসদদের থেকে কিছুটা আলাদা, হেভীওয়েট।

সেই হেভীওয়েট পূর্ণ সাংমাকে দলবল নিয়ে, সংবাদমাধ্যম ও সাংসদদের সামনে অপমান করে গেল রেবকুদ্দিনরা যুবকংগ্রেসের পতাকা হাতে। অপরাধ? অপরাধ হল পূর্ণ সাংমা এইবার নির্বাচিত হয়েছেন বিজেপির সাথে হাত মিলিয়ে এবং সোনিয়াকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মানতে নারাজ।

গুয়াহাটি বিমানবন্দরের লাউঞ্জে দাড়িয়ে পূর্ণ সাংমা। উৎসবের রেশ কেটে গেছে। ফিস ফিস স্বরে কথা বলছে সবাই। লজ্জিত কংগ্রেসী সাংসদরাও। তাদের দলের পতাকা হাতে যারা আজ পূর্ণ সাংমাকে অপমান করে গেল তাদের ছোঁয়ার সাহস নেই কারুর। দল তাদের হাতে বন্দী। অসমের পঞ্চাশ শতাংশ বিধান সভা আসনের ফলাফল নির্ভর করে ওদের মর্জির ওপর।

আর পূর্ণ সাংমা? পাহাড়ের পেছনে অস্তগামী সূর্যের শেষ কিরণের করুণ আলোয় কি ভাবছেন আপনি? চল্লিশ বছর আগে এই রেবকুদ্দিনদের হাতে নিজেদের প্রাণ ও মেয়েদের মান বাঁচাতে এসেছিলেন হিন্দুস্থানে, অসমে, গারোহিলস ডিস্ট্রিক্টে। আপনি তো পূর্ণ এ্যাজিটক সাংমা। কিতাবের মানুষ*। আপনি (বা আপনারা) তো ভারতীয় (বা হিন্দু?) কুসংস্কারের অন্ধকার গহ্বর থেকে আলোকিত জগতে প্রবেশ করেছেন শতবর্ষ আগে মার্কিন পাদ্রীদের হাত ধরে। অতএব জন্মসূত্রে 'কমিউনাল' হওয়ার অভিশাপ থেকে মুক্ত আপনি। আচ্ছা, এই বিষণ্ণ বিকেলে কি আপনার মনে পড়ছিল সিমসাং-এর অন্য পারের কথা?

ছিমছাং ধলেশ্বরী

"গারো পাহারর সবাতোকৈ দীঘল নৈখন ছিমছাং। বাঘমারার কাষেদি মৈমনছিঙত সোমাই নাম লৈছে ধলেশ্বরী।"

সেই ধলেশ্বরী? যার তীরে

"পিসিদের গ্রাম—
তার দেওরের মেয়ে,
অভাগার সাথে তার বিবাহের ছিল ঠিক ঠাক।"

যে মেয়ের "পরনে ঢাকাই শাড়ী, কপালে সিঁদুর।"

যাক ধলেশ্বরীর কথা। এই কবিতা লেখার বছর পনেরো বাদেই হরিপদ কেরানিদের প্রেয়সীরা ধলেশ্বরীর তীর ছেড়ে মানসম্ভ্রম হারিয়ে/বাঁচাতে ভিড় করেছে শিয়ালদহ স্টেশনে। যে স্টেশনে একদা হরিপদ কেরানি যেত অন্য উদ্দেশ্যে।

"শেয়ালদা ইস্টিশনে যাই
সন্ধেটা কাটিয়ে আসি,
আলো জ্বালাবার দায় বাঁচে।"

অতএব ফিরে আসা যাক সিমসাং-এর পারে। কবিতা লেখার পনের বছর পরেও সিমসাং-এর পাড়ে শান্তি। ধলেশ্বরীর পাড়ে ছিল সিঁদুর পরা মালাউনরা, যাদের কোন 'কিতাব' নেই। তাদের 'শেয়ালদা ইস্টিশনে' পলায়ন অতি স্বাভাবিক। কিন্তু সিমসাংতো গারোদের নদী। গারো জনজাতি। যীশুর সুসমাচারে আলোকিত জনজাতি, সবুজ পাহাড় ও তার পাদদেশে বসবাসকারী জনজাতি। মালাউনদের অবস্থা তাদের হওয়ার কথা নয়। তাই ১৯৪৭-এ গারো জনজাতিদের বাসভূমির একটা অংশ যখন পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হল তখন পূর্ব পাকিস্তানের গারোরা খুব একটা মাথা ঘামায়নি।

ওতো হিন্দু মুসলমানের কাজিয়া। তবে ঐ যে, কে যেন লিখেছিল, প্রথমে ওরা এসেছিল ইহুদীদের ধরতে.....ইত্যাদি ইত্যাদি।

কবে ওরা এলো? রবীন্দ্রনাথের কবিতা (বাঁশী) লেখার পনের বছর পর ধলেশ্বরীপাড় থেকে শিয়ালদা ইস্টিশনে এলো হরিপদ কেরানি আর কপালে সিঁদুরওয়ালীরা। তার পনেরো বছর পর... "১৯৬২ চনরপরা ১৯৬৪ চনলৈ এই কালছোরাত, এই জনজাতি সকলের ওপরত কল্পনাতীত নৃশংস অত্যাচার আরম্ভ হল। অওশেষত, কোনো গত্যন্তর নোহোয়া হলত, এই লোকসকলে ১৯৬৪ চনত নিজর মাতৃভূমি ত্যাগ করি, নানা নির্যাতন আরু কষ্ট ভোগ করি, দালু, বাঘমারা আদি সীমান্তর বাটেদি ভগনীয়া হৈ গারোপাহারত সোমায়, হাজার হাজার মানুহর সেয়া এখন মর্মন্তুদ প্রব্রজন।"

উপন্যাস-হে-কাল্পনিক

হঠাৎ কোন ভাষার কোন ইতিহাস বই থেকে উদ্ধৃতি এসব? ভাষা অসমীয়া। ইতিহাস নয় স্রেফ এক উপন্যাসের 'পটভূমি' পৃষ্ঠার থেকে নেওয়া। পটভূমিতে লেখক নিজেই লিখছেন-"কোয়া বাহুল্য যে কিতাপখানি কোনো ইতিহাস নয়, উপন্যাস হে, কাল্পনিক"। অন্তত সেকুলার detoxification drive-এর আওতায় এই লেখাটি আসবেনা। এতো উপন্যাস।

'কিতাপ'টি না এলেও লেখক অবশ্যই আওতায় এসেছেন। আসলে detoxification একটি গত পঞ্চাশ বছর ধরে চলে আসা নীরব প্রক্রিয়া। এই 'কিতাপ' "ছিমছাঙর দুটা পার" (অহমীয়া 'ছ'র উচ্চারণ বাংলা 'স' বা ইংরেজী 'S') গুয়াহাটি থেকে প্রথম প্রকাশিত (প্রকাশক : সরস্বতী প্রতিষ্ঠান) হয় ১৯৬৫ সালে। লেখক উমাকান্ত শর্মা ঐ সময়ে পূর্ব পাকিস্তান-অসম (তখনো মেঘালয় রাজ্যের সৃষ্টি হয়নি) সীমান্তে রাজ্য সরকারের রিলিফ অফিসারের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন, ইসলামী অত্যাচারে জর্জরিত ভারতে আশ্রয় নেওয়া এই জনগোষ্ঠীকে খুব কাছের থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। সেই দেখার ফসল 'ছিমছাঙর দুটা পার' এক পারে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তান, অপর পারে হিন্দুস্থান। সেই অপর পারে উপস্থিত যীশুর সন্তানেরা। অপর পারও কি নিরাপদ? আপেক্ষিক ভাবে অবশ্যই। তবে জেহাদীদের জাল এ পারেও বিস্তৃত। ভারত সরকারের সেক্রেটারী পদে আসীন কোনো ব্যক্তি সম্প্রতি আমেরিকায় বসে ভারত সরকারের কাশ্মীর নীতির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে পারেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রেখে ভারত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করা, এমনকি আধা ফ্যাসিষ্ট প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ লেখাও সম্ভব। কিন্তু সিমসাং-এর অপর পারে সংঘটিত নির্মম ইসলামী অত্যাচারের বর্ণনা? সরকারী অফিসার ও লেখক উমাকান্ত শর্মা অবহিত ছিলেন detoxification নামক জেহাদী কর্মসূচীর। তাই ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত এই "কিতাপ"-এর লেখকের নাম ছিল পশুপতি ভরদ্বাজ। উপন্যাসটিকেও detoxify করার দায়িত্ব স্বহস্তেই নিয়েছিলেন উমাকান্ত শর্মা, ওরফে পশুপতি ভরদ্বাজ। অতএব

সমগ্র উপন্যাসে কোথাও ইসলাম, মুসলমান শব্দ নেই। কোনো মুসলমান নাম নেই। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র চিত্রামণি। "চিত্রামণি ধুনীয়া (সুন্দরী)…. কোমর খন সরু আরু গোটা, বুকুখন ওখ আরু উজ্জ্বল, আরু চকুদুটা দীঘল, সেমেকা। …." সেই চিত্রমণি নজরে পড়ল একজনের। কে সে? সি জীপ গাড়ীর ড্রাইভার। …সিদিনা সি সাজু হৈয়ে আহিছিল। তার লগত আরু তিনিজন মানুহ আছিল জীপত।" ওরা চিত্রামণিকে তুলে নিয়ে দিনের পর দিন ধর্ষণ করে। কিছুদিন পরে অর্ধমৃত চিত্রমণিকে উদ্ধার করে তার স্বামী কুণো। জীপগাড়ীর ড্রাইভার ও তার সঙ্গীদের নাম ধাম অনুচ্চারিত। এর পরে যে সব ঘটনাগুলি গারো গ্রামগুলিতে ঘটতে থাকে সে গুলিতে নতুনত্ব কিছু নেই। যুবতী নারীদের নিয়মিত উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া, জবরদস্তি ধান কেটে নেওয়া, দোকান লুঠ হওয়া এবং পুলিশ প্রশাসন নিস্ক্রিয় থাকা বা পেছন থেকে মদত দেওয়া—এগুলো পূর্ব পাকিস্তানে (এখন বাংলাদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলে কিছু কিছু জায়গায়) হিন্দুদের দেশছাড়া করার জন্য নিয়মিত করা হয়েছে। তফাৎ এটকুই এই উপন্যাসে মন্দির ভাঙ্গে না। ভাঙ্গে গির্জা। হরিপদ কেরানির বদলে নিহত হয় প্যাস্টর ডেভিডসন। ধর্ষিতা মেয়েদের কারুর মাথায় সিঁদুর থাকে না।

ভদ্র ইতিহাস

কিন্তু এতসব ঘটনা যারা ঘটায় তারা কারা? কেন তারা এই গারোদের দেশছাড়া করতে উঠেপড়ে লাগল? উমাকান্ত শর্মা সাবধানী মানুষ। জানেন পশুপতি ছদ্মনামে সরকারী কানুনকে ফাঁকি দিতে পারেন কিন্তু বাবারও বাবা থাকে। তারা আইন কানুনের উর্দ্ধে। কখনো কখনো দেশ বিদেশের সীমানা তারা মানে না। সাদুল্লা ফকরুদ্দিনের অসমে তাই দাউদ হায়দার, তসলিমা হওয়ার রাস্তায় যাননি উমাকান্তবাবু। তবে পশ্চিমবাংলার 'ভদ্র' ঐতিহাসিকদের মতন ইতিহাসকে মুছে না দিয়ে অত্যাচারিত মানুষের জীবন নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন। অত্যাচারীর পরিচয়, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নীরব থেকেছেন।

চল্লিশ বছর আগে প্রকাশিত এক অজানা অসমীয়া উপন্যাস। উপন্যাস হিসেবে কতটা সফল সেই আলোচনার জন্য এই লেখা নয়। এই উপন্যাস বাংলার ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকদের সম্পদ, বাংলার মানুষের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে লেখা এই পুরনো উপন্যাসটি সম্প্রতি অসমীয়া সংস্কৃতি জগতে পুনরালোচিত হচ্ছে। কারণ, কয়েকজন সাহসী অসমীয়া এই উপন্যাস অবলম্বনে তৈরী করেছেন একঘণ্টার টেলিফিল্ম গুয়াহাটি দূরদর্শনের জন্য। উপন্যাসে অত্যাচারীদের পরিচয় লুপ্ত করা হলেও ফিল্মে তা সম্ভব হয় নি। অত্যাচারীর মাথায় টুপি, গালে দাড়ি, পরনে লুঙ্গি। গুয়াহাটি দূরদর্শন ফিল্মটি গ্রহণ করলেও এখনো দেখায় নি। ফিল্মটির Detoxified Version দেখার আগ্রহ থাকল।

'ভদ্র' ঐতিহাসিকদের অননুমোদিত বাংলার ইতিহাসকে বিলুপ্ত না হতে দেওয়ার (অচেতন ভাবে?) তাগিদ বোধ করছেন কি বাংলার বাইরের মানুষরা? চট্টগ্রামের চাক্‌মাদের ইতিহাস রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন শরদিন্দু মুখার্জী। নামে বাঙালী হলেও

জন্ম-কর্ম সবই বাংলার বাইরে। একই ভাবে মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তু গণহত্যার ইতিহাসকে কেন্দ্রবিন্দু করে উপন্যাস The Hungry Tide লিখেছেন নিউইয়র্ক বাসী অমিতাভ ঘোষ। অথবা পশ্চিমবঙ্গবাসী কমিউনিস্ট ঐতিহাসিক প্রফুল্ল চক্রবর্তীকে তাঁর আকর গ্রন্থ Margind Men প্রকাশ করতে হয় নিজেকেই।

অপেক্ষায়

বিমান উড়েছে। গন্তব্য দিল্লী। টেকঅফ্ করেই দক্ষিণে দিকে ঘুরল বিমান। সাংমা সাহেব আপনি কি উইনডো সীট নিয়েছেন? তাহলে দেখুন নীচে গারো পাহাড়, আরো দক্ষিণে নজর করুন গারো পাহাড়ের পাদদেশে। ওটা বাংলাদেশ—ময়মনসিংহ। ওখানে এখনো একলক্ষ গারো রয়েছে। তাদের "চিত্রামণিরা" প্রত্যহ নির্যাতিত। এখানেই যখন রেবকুদ্দিনরা আপনাকে চড় মারার সাহস পায়, তখন ওখানে কি ঘটতে পারে তা বোঝার বুদ্ধি আছে আপনার। আপনি গারো, আপনি বাংলার মানুষও বটে। আপনি কি আরেকটা উপন্যাস লেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকবেন?

বিমান এবার পশ্চিমমুখী। দূরে চলে যাচ্ছে গারো পাহাড়। সিমসাং এর রূপালী রেখাও অদৃশ্য। 'অননুমোদিত' ইতিহাসকেও অদৃশ্যে রাখাই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ।

তবুতো কিছু বোকা থেকেই যায়।

মনি সিং-এর যোদ্ধারা—হাজং

মণি সিং। অবিভক্ত ভারতের কমিউনিষ্ট ও কৃষক আন্দোলনে এক উজ্জ্বল নাম। কলকাতায় জন্ম হলেও পিতার মৃত্যুর পর বড় হন ময়মনসিংহ জেলায় নেত্রকোনার সুসুঙ-এর মামাবাড়ীতে। মামারা সুসুঙের রাজা (বা বড় জমিদার)। রাজপরিবারের ছেলে হলেন কমিউনিষ্ট কৃষকনেতা। শুধু কৃষকনেতা বললে ভুল হবে জঙ্গী কৃষক আন্দোলনের নেতা। ত্রিশের দশকের শেষভাগে ময়মনসিংহে (বিশেষ করে নেত্রকোণা শেরপুরে) জঙ্গী আন্দোলন সংগঠিত করেন খাজনার টঙ্কা ও নানকার নিয়মের বিরুদ্ধে। সাথী কৃষকেরা প্রধানত গারো ও হাজং জনজাতির। রাজপরিবারের ছেলে প্রজাদের নেতা, প্রজাদের সঙ্গে খাওয়া-থাকা-ডিক্লাসড্ হওয়ার আদর্শ উদাহরণ। মণি সিং হয়ে উঠলেন কিংবদন্তীর নায়ক। এর পর তেভাগা। আবার উত্তাল উত্তর বাংলা এবং সক্রিয় কমরেড মণি সিং তাঁর যোদ্ধাদের নিয়ে।

তারপর দেশভাগ। পাকিস্তান গঠনের সমর্থক কম্যুনিষ্ট পার্টির হিন্দু নেতারা শোরে জোরে চাঁদ তারা পতাকা তুলে চুপচাপ হিন্দুস্তানে কেটে পড়তে থাকেন। মাটি কামড়ে পড়ে থাকেন একমাত্র মণি সিং। তাঁর কমরেডদের, গারো, হাজং কৃষকদের নিয়ে।

কাফেরদের স্থান নেই পাক জমিনে। অতএব মণি সিং-এর যোদ্ধাদের দেশ-ত্যাগী হতে হল। অধিকাংশ গারো এবং হাজংদের। গারোদের স্বজাতিরা রয়েছে হিন্দুস্থানের অসমে (বর্তমান মেঘালয়ে), সীমান্তর ওপারে। অতএব তারা ভিড় করল অসমের গারো হিলস্ অঞ্চলে। হাজংরা সংখ্যায় অল্প। তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল পূর্ব পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে। এরা হিন্দু। গারোরা যখন ইসলামী অত্যাচারে দেশ ছাড়ছে (১৯৬২-১৯৬৪) তখন হাজংদেরও একটা বড় অংশ চলে আসে অসমে।

অসমের বিভিন্ন জায়গায়। একটা বড় সংখ্যাকে বসানো হয় তদানীন্তন NEFA-য় (বর্তমান অরুণাচল প্রদেশে)। চল্লিশ বছর ধরে অরুণাচলে বাস করেও ভোটাধিকার জোটেনি হাজংদের। অরুণাচলের সরকার ও ছাত্র সংগঠন ক্রমাগত এদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে।

লোধা, শবর, কোচ, রাজবংশীদের মতন হাজংরাও সম্পূর্ণ ভাবে বাংলার মানুষ। কিন্তু কিউবা-ভিয়েতনাম-ফিলিস্তিন-ইরাক-গুজরাত-বিশ্বায়ন নিয়ে ব্যস্ত বাঙালী রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবিরা হাজংদের নিয়ে ভাবার সময় পাননি। এদের হয়ে সুপ্রীম কোর্টে লড়ছে PUCL এবং দিল্লীর কয়েকটি সংগঠন। বাঁচার তাগিদে হাজংরা তাদের দেশত্যাগের কারণটিকে detoxify করেছে। ইসলামী অত্যাচারের কথা চেপে গিয়ে দেশত্যাগের কারণ কাপ্তাই নদীর বাঁধ প্রকল্পকে দেখাচ্ছে। তারা environmental refugee। কিছুটা ফল ফলেছে। নির্বাচন কমিশন অরুণাচল সরকারের ওপর ক্রমাগত চাপ দিচ্ছেন এদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য।

নীট ফল। একদা নিজেদের বাঙালী সমাজের অঙ্গ মনে করা হাজংদের নতুন প্রজন্ম নিজেদের আদৌ বাঙালী বলে মনে করে না।

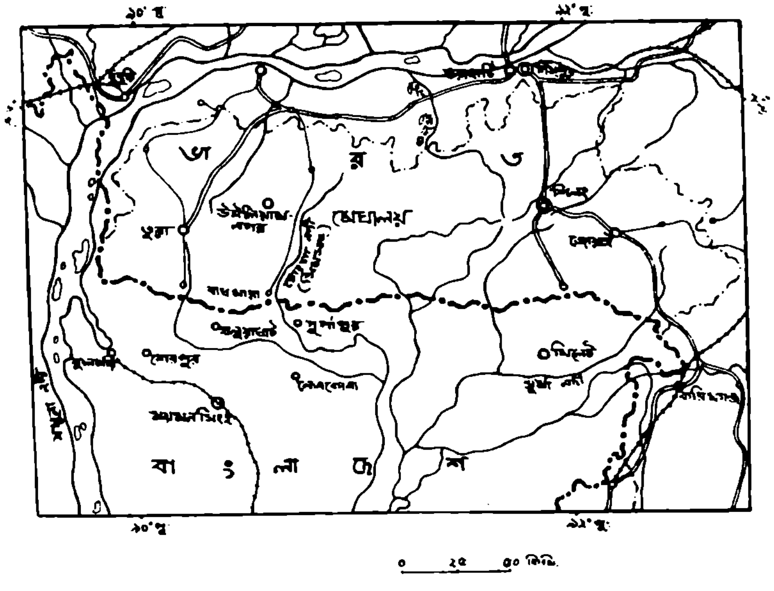

উখান : নেপালী প্রবাদ

কর্ণ থামী ও শৈবাল রায়

বাংলায় যাকে বলি প্রবাদ নেপালীতে তারই নাম উখান। সুতরাং সাধারণভাবে প্রবাদের যা বৈশিষ্ট্য উখান তার থেকে ভিন্নতর কিছু নয়—কী উৎপত্তিগত দিক থেকে কী উদ্দেশ্যগত কারণে। তবে আঙ্গিকগত দিক থেকে উখানের সঙ্গে প্রবাদের প্রবল সাযুজ্য থাকলেও সামগ্রিকভাবে নেপালীতে উখান দুভাগে বিভক্ত : উখান এবং তুক্কা। 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা' যদি হয় উখান, তবে 'হাতি ঘেশড়া গেল তল/ ভেড়শ বলে কত জল' হলো তুক্কা আর এই উখান-তুক্কা দুয়ে মিলেই বাংলার প্রচলিত প্রবাদ। তবে ছন্দোবদ্ধ দ্বিপদী কিংবা চতুষ্পদীকে তুক্কা বলা হলেও সে নিছকই ব্যাকরণগত দৃষ্টিতে। বাস্তবে প্রবাদের উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখে তুক্কাকে উখানেরই কাব্যিকরূপ বলা যেতে পারে মাত্র এবং সেইহেতু তুক্কাও উখানই।

'উখান' শব্দ সংস্কৃত 'উপাখ্যান' জাত বলে নেপালী ভাষার পণ্ডিতদের অনুমান। তবে উপাখ্যান শব্দের সঙ্গে গল্পের যে একটা গলাগলি ভাব আছে উখান শব্দে তা মূলত অনুপস্থিত। উখান সূত্রবদ্ধ কথা যাতে প্রাত্যহিক গ্রাম্য জীবনের আনাচ কানাচ থেকে উঠে আসা অভিজ্ঞতাসমূহের ঘনসংবদ্ধ বাক্যরূপের উপস্থাপনা। তবু, অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবলে উখান আর উপাখ্যানের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। কেননা, এই সূত্ররূপ তথা সমাজ-দর্শনের অন্তরালে প্রায়শই একটা গল্পের আভাস থাকেই। তবে সেই গল্পকে কিন্তু এখানে চুম্বকে পদ্য কিংবা গদ্যধর্মী কাব্যরূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা দেখা যায়। এদিক থেকে ঈশপের গল্পের আঙ্গিক সাধারণভাবে প্রবাদের জন্মের ইতিহাসের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। ঈশপ আসলে গল্প বলার জন্য গল্প বলেন না। সূত্রাকারে গ্রথিত তাঁর উপদেশকে মনোগ্রাহী এবং কার্যকরী করার জন্যই তিনি গল্পের কথাকতা করেন। অন্যদিকে প্রবাদকর্তার উদ্দেশ্য গল্পের ঘটনাটাকে আড়ালে রেখে তার থেকে নির্যাসটুকু নিয়ে সমাজ-জীবনের প্রয়োজনীয় পাথেয় প্রদান। যে বা যাঁরা ছিলেন তথাকথিত শিক্ষায় আলোকবঞ্চিত গেঁয়োলোক প্রবাদের সেইসব সৃষ্টিকর্তাকে তাই সমাজদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গিতে দার্শনিক বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। আর প্রবাদ যে টিকে আছে, আজকের ভোটযুগের আবহেও সে সম্ভবত এই দর্শন-জাত সত্যের অবিনশ্বরতার জন্যেই। নেপালী প্রবাদ উখানের বেলায়ও সমান ভাবেই এটি প্রযোজ্য।

প্রবাদের প্রাণশক্তির তুলনা নেই—একথা সত্যি হলেও অব্যবহারে এরও অর্ধমৃত অবস্থা ঘটে এবং পরিশেষে অপমৃত্যুও কিছুমাত্র আশ্চর্যের নয়। এটুকু মনে রেখেই কবি

ঘোতীরাস ভট্ট প্রথম ব্যক্তি যিনি উখান বিষয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরবর্তীকালে পাদরী গঙ্গাপ্রসাদ প্রধান সহ অন্যান্য বহু কবি-সাহিত্যিক-ভাষা তাত্ত্বিক এবিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করলেও উখান নিয়ে গভীর এবং ব্যাপক কাজের সূত্রে পুষ্কর শমসের-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নেপালী উখান আর তুক্কার বর্ণানুক্রমিক উপস্থাপনাকেন্দ্রিক তাঁর দুটিখণ্ডের কোষগ্রন্থ নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

এইসব কাজ থেকে উখানের যে সামগ্রিক চিত্ররূপটি বেরিয়েছে তাতে নেপালী উখানের সমৃদ্ধির আভাস মেলে যা উদার আত্মীকরণের পথে সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে সংস্কৃত বাংলা-হিন্দি ভারতীয় ভাষার এই ত্রিবেণী সঙ্গমই যে শুধু ঘটেছে তা-ই নয়, এমনকি বিদেশী ভাষা ইংরেজি থেকেও প্রচুর পরিমাণে প্রবাদ নেপালী ভাষার অন্দরমহলে ঠাঁই পেয়েছে কখনো কুটুম্বরূপে, কখনো বা আত্মীয়সম। তবে এরই পাশাপাশি খাঁটি ভূমিজ উখানের প্রাচুর্যও বড় কম নয়। নেপালী প্রবাদ পড়া কিংবা শোনার ক্ষেত্রে তাই একটু চোখ-কান খোলা রাখলেই এই অন্দর-বাহিরের দৃশ্যপট নজরে পড়ে। 'আখি সমঝে সদা সুখী, পছি সমঝে সদা দুখী' তাই মনে পড়িয়ে দেয় 'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না' কিংবা 'এক মাঘলে জাড়ো জাঁদৈন' প্রতিরূপ হয়ে ওঠে বাংলা প্রবাদ 'এক মাঘে শীত যায় না'-এর। যেমন, 'আক্ষৈ মপাই হুনু' যা 'সেল্ফ প্রেইজ ইজ নো রেকমেণ্ডেশন' এই ইংরেজি প্রোভার্বের নেপালী উখান-রূপ প্রাপ্তির উদাহরণ। আবার, নিজের করে নেওয়ার তাগিদে অন্য ভাষার প্রবাদকে পারিপার্শ্বিকতার স্পর্শে অকৃত্রিম রূপ দিতেও দেখা যায়। যেমন, 'রথ দেখা, কলা বেচা' তাই উখানে হয়ে যায় 'পশুপতিকো যাত্রা, সিদ্রাকো বেপার।' অন্যদিকে, খাঁটি নেপালী প্রবাদ তার নিজস্ব ঘরানার রূপায়ণে, তার কৃষ্টি-সংস্কৃতির পরিস্ফুটনে এবং সর্বোপরি সরল পর্যবেক্ষণে ভূমিজ শব্দ ও ঘটনার অনন্য ব্যবহারের মাধ্যমে আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। 'পহাড়েকো সম্লা, খরাণীকো ডল্লা' এমনি একটি তীব্র কৌতূক এবং আত্ম-কষাঘাতে ভরপুর অসাধারণ দেশীয় প্রবাদের উদাহরণ।

নেপালী প্রবাদের ক্ষেত্রে এই আত্মীকরণের প্রক্রিয়া কবে কীভাবে ঘটেছিলো তার ইতিহাস সময়ের গর্ভে সুপ্তিমগ্ন। এই ঘুম ভাঙ্গানোর মাধ্যমে স্বীকারোক্তির উজ্জ্বল-উদ্ধার গবেষকদের কঠিন শ্রম দাবী করে। প্রায় দুশ উখানের উল্লেখসহ বর্তমান রচনা অবশ্য গবেষণার ক্ষুরধার পথ পরিহার করে কৌতূহলী বাঙালী পাঠকের কাছে নেপালী প্রবাদের প্রাথমিক রূপরেখা প্রদান করে মাত্র।

অ

অন্ধারোকো কাম, খোলাকো গীত।
অন্ধকারে কাজ করার মতো নালার গান গাওয়া অর্থহীন।

অঘি সমঝে সদা সুখী, পছি সমঝে সদা দুখী।
আগে চিন্তা করে কাজ করলে সুখী হওয়া যায়, পরে করলে দুখী হয়।
তুলনীয় : ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।

অগুন্টোলে হানেকো কুকুর বিজুলী চমকদাঁ তর্সন্দ।

পোড়া চ্যালাকাঠের ঘা খাওয়া কুকুর বিদ্যুৎচমকে ভয় পায়।
তুলনীয় : ঘরপোড়া গরু সিন্দুরে মেঘ দেখে ভয় পায়।

অচানোকো পীর খুকুরীলে জান্দৈন।
মাংসকাটার গুঁড়ির ব্যথা কুকরি জানে না।
তুলনীয় ঃ পটু যেন নাহি জানে পিষ্টকের স্বাদ—কৃত্তিবাস ওঝা

অন্ধা দেশমা কানু রাজা।
অন্ধদেশে কানারাজা।
তুলনীয়ঃ শিবঠাকুরের আপনদেশে/আইন-কানুন সর্বনেশে—সুকুমার রায়

অর্তী র ওখতী ধৈরৈ চাহিদৈঁন।
উপদেশ আর ওষুধ বেশী লাগে না।

আ

আক্ষৈ বোকশি আক্ষৈ ধামী।
নিজেই পেত্নি নিজেই ওঝা।

আকাশলাই থুকী আক্ষনৈ মুখমা ছিটা।
আকাশে থুতু ফেললে নিজের মুখে এসে পড়ে।

আক্ষু ভলো ত জগৎ ভলো।
আপনি ভালোতো জগৎ ভালো।

আক্ষৈ মপাই হুনু।
আত্মপ্রশংসা করা।

অকবরী সুনলাই কসী লাউনু পর্দৈন।
আকবরী সোনার জন্য কষ্টিপাথর লাগে না।

আক্ষনো আঙ্গকো ভৈঁসী ন দেখনে/অর্কাকো আঙ্গকো জুম্রো দেখনে।
নিজের অঙ্গের মোষ দেখতে না পেলেও পরের অঙ্গের উকুন দেখতে পায়।
তুলনীয়ঃ : সূচ বলে চালুনি তোর পিঠে কেন ছ্যাঁদা।

আক্ষু ত মহাদেব কো দিনে বর।
স্বয়ং মহাদেবকে কে দেবে বর।

ই

ইন্দ্রকো অগাড়ি স্বর্গকো বয়ান।
ইন্দ্রের সামনে স্বর্গের বর্ণনা।

ইমান ভনেকো লাখ হো, ধন ভনেকো খাক হো।
সততা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ইলমীকা ভাগমা মাছা র মাসু অলছীকা আঁখমা আঁসু।
উদ্যমীর ভাগে মাছ আর মাংস, অলসের চোখে জল।
তুলনীয়ঃ : উদ্যোগী পুরুষই লক্ষ্মীলাভ করে।

ঈ

ঈশ্বরলে দিয়ে বালুয়া নিচোরে তেল আউঁছ।
ঈশ্বরের দেওয়া বালি নিঙড়ালে তেল বেয়ে।

উ

উপকারী সদা ভিখারী।
উপকারী লোক সর্বদাই ভিখারী।

উঁটকো মুখমা জীরা।
উটের মুখে খুদে জীরে।
তুলনীয় : মরুতে একবিন্দু জল।
উত্তাউলী গাই বাঘলে খাই।
চঞ্চল গরুকে বাঘে খায়।

উদ্যোগীলে জোগী হুনু পর্দৈন।
উদ্যোগী মানুষের যোগী হওয়ার দরকার নেই।

উল্টৈ চোর কটুয়াল ডাঁট।
চোর উল্টে ধমক মারে।
তুলনীয় : চোরের মায়ের বড় গলা।

এ

একতা নৈ বল হো।
একতাই বল।

এক মাঘলে জাড়ো জাঁদৈন।
এক মাঘে শীত যায় না।

এক হাতলে তালি বাজদৈন।
এক হাতে তালি বাজেনা।

এক দামকো লয়াঙ, দশ দামকো স্বয়াঙ।
এক পয়সার লবঙ্গ, দশ পয়সার ফোটানি।

এক বৃহস্পতি ঝুটা।
একাকী বৃহস্পতি গুরুত্বহীন।

ও

ওরালো লাগেকো মির্গলাই বাছালে পনি খেদ ছ।
ঢালে পড়লে হরিণকে বাছুরও তাড়ায়।

তুলনীয় : হাতি দহে পড়লে চামচিকেও লাথি মারে।

ওস চাটের তির্খা মর্দৈন।
শিশির চেটে তৃষ্ণা মরে না।

ওখলমা হাত হালনে লাই মুসলকো কেকো ডর?
হামানদিস্তায় হাত ঢুকিয়েছে যে মুষলে তার আর ভয় কী?

ঔ

ঔঁলার দিঁদা ডুঁডুলো নিলনে।
আঙ্গুল দিলে হাত চায়।
তুলনীয় : খেতে পেলে শুতে চায়।

ঔঁলা টেকে পো পৈতালা টেকন পাইন্থ।
আঙ্গুল ঠেকালেই পায়ের পাতা ঠেকতে পায়।

ঔসর আউছঁ পর্খন্দৈন।
সুযোগ কারোর জন্য অপেক্ষা করে না।
তুলনীয় : সময় কারোর জন্য বসে থাকে না।

ক

কঁহা জালাস মছলী খেঁরে তরিয়া।
কোথায় যাবি মাছ, শেষেতো আমার
তুলনীয় ঃ নিয়তি কেন বন্ধতে।

কুকুর ভগতৈ ছ, হাতী লমকঁদৈ ছ।
কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, হাতি লম্বাপায়ে হাঁটে।
তুলনীয় : হাতি চলে, হাজার কুত্তা ভোকে।

কুকুরলাই মাসু পৈঁচো।
কুকুরকে মাংস দিলে ফেরৎ মেলেনা।

কুণ্ড কুণ্ড পানী, মুণ্ড মুণ্ড বুদ্ধি।
কুণ্ডে কুণ্ডে জল, মুণ্ডে মুণ্ডে বুদ্ধি।

কুকুরকো পুচ্ছর বারবর্ষ ঢুঙ্গরোমা হালে পনি বাঙ্গোকো বাঙ্গোই।
কুকুরের লেজ বারো বছর ধরে সোজা করার চেষ্টাতেও বাঁকাই থাকে।

কাটেকো ঘাওমাথি নুনচুক।
কাটাঘায়ে নুনের ছিটে।

খ

খতিকো বেলা মতি আউদৈঁন।
বিপদের সময়ে বুদ্ধি জাগে না।

খায়েকো বিখ পো লাগছ নখায়েকো বিখ লাগদৈন।
খেলেতো বিষক্রিয়া হবে নাখেলে হবে কেন।

খুকুরী ভন্দা কর্দ লাগনে।
কুকরির থেকে ছোটকুকরি ধারালো।
তুলনীয় : বাঁশের চেয়ে কঞ্চিদড়।

খানে মুখলাই জুঙ্গালে ছেকদৈন।
যে-মুখ খায় গোঁফ তার কাছে বাধা নয়।

খানে বেলাসা ঘীন নসমঝনু, সতনে বেলাসা রিন নসমঝনু।
খাওয়ার সময় ঘৃণ্য বিষয়ে চিন্তা না করা, শোবার সময় ঋণের বিষয়ে চিন্তা না করা।

গ

গর্জনে মেঘ বর্ষান্দৈন
গর্জানো মেঘ বর্ষায় না।

গুরু গুড় চেলা চিনী।
গুরু গুড় চেলা চিনি।

গাই ন গোঠ, লবর-লবর ওঠ।
না আছে গরু না গোয়াল, ঠোঁটের লক-লকানি আছে।

গুন গর্দো হলো কপাল ছেঁড়ী সাঙ্গদো।
ভালো কাজ করা হালের কপালে জোটে গর্ত।

গর্নে বেলা হাতঘুট্টা গল্লা, খানে বেলা বড়া বড়া ডল্লা।
কাজের বেলা হাত-পা জড়, খাবার বেলা বড় বড় গ্রাস।
তুলনীয় ঃ কাজে কুঁড় ভোজনে দেড়ে।

ঘ

ঘিউ ন তেল পকা বুঢ়ী সেল।
না আছে ঘি-তেল, বউকে বানাতে বলে পিঠে।
তুলনীয় : ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা।

ঘরকো বাঘ বনকো স্যাল।
ঘরেই বাঘ বনে শেয়াল।

ঘাঁটী হেরী হাড় নিলনু।
গলা দেখে হাড় চিবোনো।
তুলনীয় : অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা

ঘোড়া চঢ়নে লড়ছে।
ঘোড়ায় চড়লে পড়তে হয়।

তুলনীয় : জলে না নামলে সাঁতার শেখা যায় না।

ঘুমীক্ষিরী রুমটার।
দেশবিদেশ ঘুরে শেষে নিজের গাঁয়ে।
তুলনীয় : তাই মা তোমার কাছে এসেছি আবার—দেবেন্দ্রনাথ সেন

চ

চোরমাথি চকার
চোরের উপর বাটপাড়।
চম্পা ক্ষুলছ কঁহা, সুবাস পুগছ কঁহা!
চাঁপা ফোটে এখানে, গন্ধ ছড়ায় সর্বত্র!
তুলনীয় : বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।
চরীকো ধন চুচ্চো।
পাখির সম্পদ ঠোঁট।

চোরলাই চৌতারো সাধুলাই সুলী।
চোরের জন্য আসন সাধুর জন্য ফাঁস।

চিপ্লা মুখকো ধখিলো পেট।
চিকনমুখীর কালো পেট।

ছ

ছুন গেঁড়ী সবৈ সেরী, ছৈনন গেঁড়ী সবৈ বৈঢ়ী।
ধন থাকলে সবাই আছে, না থাকলে সবাই কেটে পড়ে।
তুলনীয় : সুসময়ের বন্ধু।

ছাতা ওঢ়নু ঘামমা হীরা ক্ষোর্নু কামসা।
রোদে ছাতা খোলো, কাজে হীরে ছড়াও।

ছিনমা তোলা ছিনমা মাসা।
ক্ষণে হালকা ক্ষণে ভারী।

ছুচুন্দ্রাকো টতিকামা চমেলীকো তেল।
ছুচোর মাথায় চামেলীর তেল।
তুলনীয় : কানাছেলের নাম পদ্মলোচন।

ছোরীলাই ভননু, বুহারীলাই সুনাউনু।
মেয়েকে বলে বউকে শোনানো।
তুলনীয় : ঝিকে মেরে বউকে শেখানো।

জ

জঁহা ক্ষল পাকছ, তঁ্যহী চরী নাচছ।
যেখানে ফল পাকে, সেখানে পাখি নাচে।

তুলনীয় : ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।

জসলাই তির্খা লাগছ, ওহী খোলো ধাউঁছ।
যার তৃষ্ণা পায় সে নদীতে ছোটে।

জিউঁদাকো জন্তী র মর্দাকো মলামী।
জীবৎকালের বরযাত্রী আর মরণকালের শবযাত্রী।
তুলনীয় : অসময়ের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু।

জস্তো দেওতা উস্তৈ পূজা।
যেমন দেবতা তেমনি পূজা।
তুলনীয় : যে পূজোয় যে মন্ত্র।

জোগীকা ঘরসা সন্যাসী পাহুনা।
যোগীর ঘরে সন্ন্যাসী অতিথি।

জোর জোর উসকো ঠুলো স্বর।
যে চোর তার বড় গলে।
তুলনীয় : চোরের মায়ের বড় গলা।

ঝ

ঝগড়াকো বীউ রোপনু পর্দৈন।
ঝগড়ার বীজ লাগাতে হয় না।

ঝগড়েনী স্বাস্নী কাউশাকো মালা।
ঝগড়ুটে বউ বিছুটির মালা।

ঝিঙ্গাঁকো সরাপলে ডিঙ্গা মর্দৈন।
মাছির অভিশাপে গরু মরেনা।
তুনলীয় : শকুনের অভিশাপে গরু মরেনা।

ঝিজাঁলে মুরো পোলছ, লহরালে পহরো তানছ।
খড়কুটো দিয়ে গুঁড়ি জ্বালানো, লতায় পাহাড় হেলানো।
তুলনীয় : পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘন।

ঝুটোলাই সাঁচো পার্নু সুর্ঙ্গুরলাই হাত্তী বনাউনু হো।
মিথ্যাকে সত্য বানানো শুয়োরকে হাতি বানানোর মতো।

ট

টাউকো দুগছ, নাইটোমা ওখতী।
মাথা ব্যথা, নাভিতে ওষুধ।
তুনলীয় : উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।

টায়াকো সাইনু, দেব্রে ন দাহিনু।

দূরের কুটুম্ব না বাঁয়ে না ডাইনে।
টেকনে হাঁগো ন সমাউনে ভালো।
না সরু ডাল না মোটা ডাল।

টোপীকো ইজ্জত গর্দা পগরী পায়ব।
টুপিকে সম্মান দিয়ে গিয়ে পাগাড় হারানো।

ঠ

ঠক্কর নখাই বুদ্ধি আউর্দৈন।
ঠোকা নাখেলে বুদ্ধি আসেনা।
তুলনীয় ঃ ঠেকে শেখা।

ঠাঁউ ন ঠহর বুঢ়ীকো রহর।
চালচুলো নেই বউয়ের সখ।

ঠুলো চরী পাসা পরী, সানো চরী উদেকলে মরী।
বড় পাখি জালে পড়ে, ছোটো পাখি অবাক হয়।

ঠুলো রুখকো ওত লাগে এক ঝর পানী টর্ছ।
বড়গাছের তলায় বসে এক পশলা বৃষ্টি এড়ানো গেলো।

ড

ডাক্যো ন বোলায়ো লিঁড়ে পুচ্ছর ডোলায়ো।
না হয়েছে ডাকা না বলা, ক্ষুদে লেজ নাড়ানো চলছে।

ডুঙ্গা সড়কমা হিড়োঁস ন গাড়া পানীসা হিঁড়োস।
নৌকা সড়কে চলেনা, গাড়ি জলে চলে না।

ডিলমনি জন্তী আয়ে, মাগল সিকাউর্দৈ ছন।
উঠোনে বরযাত্রী এসে গেছে, স্বাগত সঙ্গীত শেখানো চলছে।

ডোকো বোকছ, সুপারী টোকছ।
বইছে ঝুড়ি, চিবোচ্ছে সুপারী।
তুনলীয় : মা খায় ধান ভেনে, ব্যাটা খায় এলাচ কিনে।

ডেঢ় অক্কলীকো মামা লালবুঝক্কড়।
আধাবুদ্ধি মামার সবজান্তাভাব।
তুলনীয় : অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।

ঢ

ঢুঙ্গাকো ভর মাটো, মাটাকো ভর ঢুঙ্গো।
পাথরের আধার মাটি, মাটির আধার পাথর।
ঢুঙ্গো খোজদা ছেউতা মিলনু।

নুড়ি খুঁজতে দেবতা পাওয়া।

ডোকো ছোড়ী ঝ্যালবাট পসনু হুদৈঁন।
দরজা ছেড়ে জানলা দিয়ে ভেতরে ঢোকা ঠিক নয়।

টাঁটকো নিমতো খাই পত্যাউনু।
ভুয়ো নেমন্তন্ন খাওয়ার পরেই বিশ্বাস করতে হয়।
তুলনীয় : না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

টাঁটেকো কুরা কাটে মিলদৈন।
মিথ্যে কথা কখনো মেলে না।

ত

তীন সুকাকো খুকুরী, নউ সুকাকো বিড়।
তিন সিকের খুকুরী, নয় সিকের বাট।
তুলনীয় : জামার চেয়ে গেঞ্জি বড়।

তীন হাতে মানিসকো নউ হাতে জুঙ্গা।
তিনহাতী মানুষের নয়হাতী গোঁফ।
তুলনীয় : বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি।

তীতাকো পাতে নছোঁউ, মীঠাকো জেরৈ নছোঁড়ু।
তেতো পাতা কেউ ছোঁয়না, মিঠে মূলও কেউ ছাড়ে না।

তৈ রানী মৈ রানী কো ভর্লা কুবাকো পানী।
তুইও রাণী আমিও রাণী কে আনবে জল।

তলাঁই খানে বাঘলে মলাই পানি খাচ্ছ।
তোকে খাওয়া বাঘ আমাকেও খাবে।
তুলনীয় : ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে।

থ

থোপা থোপা পানীলে ঘড়া ভরিঙ্ছ।
বিন্দু বিন্দু জলে ভরে ঘড়া।
তুলনীয় : বিন্দু বিন্দু বারি নিয়ে সমুদ্র।

থাকেকো খুট্টালে ঘর সমঝঙ্ছ।
ক্লান্ত পা ঘর খোঁজে।
থোত্রো ঘরসা মুসাকো রজাঁই।
পুরনো ঘরে ইঁদুরের ফূর্তি।

থিতি ন বিতী অনরীতি।
যথাসময়ে কাজ না করা রীতিবিরুদ্ধ।

থাল খানু ন ভাত খানু।
থালা খাবো না ভাত খাবো।
তুলনীয় : সোনার হাতে সোনার কাঁকন কে কার অলঙ্কার।

দ

দুধকো সাক্ষী বিরালো।
দুধের সাক্ষী বিড়াল।

দুধ দিনে গাইকো লাত সহনু পর্ছ।
দুধ-দেওয়া গরুর লাথি সইতে হয়।

দুঃখকো বেলা সবৈকো হেলা।
দুঃসময়ে সবাই অবহেলা করে।

দাজ্যুসঙ্গ খানে, ভাইজ্যুসঙ্গ উঠনে।
দাদার সঙ্গে খেতে বসা, বৌদির সঙ্গে খেয়ে উঠা।

দুই জোইকো পোই কুনা পসী রোই।
দুই সতীনের স্বামী কোনে বসে কাঁদে।

ধ

ধন হুনেক মন ছৈন, সন হুনেক ধন ছৈন।
ধনবানের হৃদয় নেই, হৃদয়বানের ধন নেই।

ধেরৈ খায়ে অমৃত পনি বিখ হুচ্ছ।
অমৃতও বেশী খেলে বিষবৎ হয়।

ধন দেখে সহাদেবকো তীননেত্র।
ধন দেখে সহাদেবেরও তৃতীয়নেত্র চক চক করে ওঠে।

ধেরৈ জোগী মঠ উজাড়।
বেশী যোগীতে মঠ উজাড়।
তুলনীয় : অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

ধোবীকো কুকুর ঘরকো ন ঘাটকো।
ধোপার কুকুর না ঘরের-কাজে না ঘাটের-কাছে।

ন

ন হুনু ভন্দা কানৈ মামা নিকো।
নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

নয়াঁ জোগীকো বাকলো খরানী।
নয়া যোগীর বেশী ভস্ম মাখানো।

নঙলে চিমোটে হুনেলাই বচরো কিন লাউনু?
নখের চিমটিতেই যেখানে কাজ সেখানে কুড়োল আনা কেন?

নাঙলো ঠটারের হাতী তর্সাউনে।
কুলো বাজিয়ে হাতিকে ভয় দেখানো।

নজীককো তীর্থ হেলা।
কাছের তীর্থকে অবহেলা।
তুলনীয় : দেখা হয় নাই...একটি ধানের শিষের উপর একটি শিশির বিন্দু-রবীন্দ্রনাথ

নাচনু জাদৈঁন আঁগন টেঢ়ো।
নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা।

প

পহাড়েকো সল্লা, খরানীকো ডল্লা
পাহাড়ীদের শলা-করামর্শ ভস্মের ঢেলা।

পশুপতিকো যাত্রা সিদ্রাকো বেপার।
পশুপতি যাত্রা সিদ্রামাছের ব্যবসা।
তুলনীয় : রথ দেখা কলাবেচা।

পীঠোসঙ্গ ঘুন পনি পিঁধিছ।
আটার সঙ্গে ঘুণপোকাও পেষা হচ্ছে।

পোহোর মরিন সাসু, অহিলে আয়ো আঁসু।
আগেই মরেছে শাশুড়ি, এখন এলো কানা।

পহিলে খায়ো দাল ভাত, পছি সোধ্যো জাতপাত।
আগে হলো খাওয়া-দাওয়া, পরে জানতে চায় জাতপাত।

ফ

ফল খুয়াউনু, বোট নচিনাউনু।
ফল খাওয়ানো, গাছ না চেনানো।
ফুলকো বাস্না ওরিপরি, মানিসকো বাস্না ভাঁড়াপরি।
ফুলের সুগন্ধ এখানে ছড়ায়, মানুষের কীর্তি সংসারে ছড়ায়।

ফল হেরে বোট চিনিছ।
ফল দেখে গাছ চেনা।

ফূল পার্নে এওটা, বচ্চা কৌরলনে অর্কো।
ডিম পাড়লো একজনে, বাচ্চা ফোটালো অন্যজনে।

ফূল ফুলন্তী কোপিলা হুসন্তী, আজ মলাই ভোলী তঁলাই।
ফুল ফুটছে কুঁড়ি হাসছে, আজ আমার দশা কাল তোর দশা।

ব

বেল পাকের কাগলাই হর্ক ন বিস্মাত।
বেল পাকলে কাকের না হর্ষ না বিষাদ।

বুঢ়ী লাগী রসিতামা শ্যাললে কুখুরা বোক্যো।
বউ ব্যস্ত হল্লাবাজিতে শেয়ালে নিলো মুরগি।

বাঁদর আফ্নো ঘর পনি বনাদৈঁন, অর্কাকো ঘরপনি রাউদৈন।
বাঁদর নিজের ঘর বানায় না, অন্যের ঘরও রাখে না।

বুড়কো পুতা এতা ন উতা।
অতিবৃদ্ধের ছেলে সামলানো ঝকমারি।

বুঢ়া মরে কুরা সরে।
বুনো মরে, কথা পরম্পরায় চলে।

ভ

ভলাসঙ্গ লাগে গুয়াপান, নরামরো লাগে নাক-কান।
ভালোর সঙ্গে মেলে মিষ্টিপান, খারাপের সঙ্গে ইজ্জত নষ্ট হয়।

ভাই ভত্র ভরোস, গাই ভত্র গোরস।
ভাই থাকলে ভরসা, গরু থাকলে দুধ।

ভাগ্যমানীকো ভূতৈ কমারো।
ভাগ্যবানের চাকর ভূত।

ভীরকো চিণ্ডো উধোঁ ন উঁভো।
ঢালের লাউ না নিচে না উপরে।

ভাঙ্গরাকো টৌপীলাই গুহেলীকো ফূল।
বিছুটির ছালে তৈরী টুপিতে গোঁজা গুহেলী ফুল।

ম

মুখমা রাস রাস বগলীমা ছুরা।
মুখে রাস রাস পকেটে ছোড়া। তুলনীয় : ভূতের মুখে রাম নাম।

মনকো লড্ডু ঘিউসঙ্গ খানু।
কল্পনার লাড্ডু ঘি সহযোগে খাওয়া।
তুলনীয় ঃ আকাশ কুসুম কল্পনা।

সাকুরাকো জাল ঝিঙ্গাকো কাল।
মাকড়শার জাল মাছির কাল।

মহীপনি মাগনু, ঢুঙ্গপ্রো পনি লুকাউনু।
ঘোল চাওয়া হলো, লুকিয়ে ফেললো পাত্র।

মূলকো পানী ফুলকী ছোরী।
মূলধারার জল, সদ্‌বংশের মেয়ে।

য়

য়ো কানলে সুন্নু উ কানলে উড়াউনু।
একানে শোনা ওকানে বের করে দেওয়া।
য়াঁলী-য়্যাঁলী দিন গুমাই, জুনেলী রাতমা বিকুন সুকাই।
এলে বেলে ভাবে দিন কাটলো, কাঁছনী রাতে শুকোনো হচ্ছে খাবার-দাবার।

র

রাজাকো কাম, কহিলে জালা মাস।
রাজার কাজ কখন রোদ ওঠে তা দেখা।

রাজা সবৈকা সাঝা।
রাজার উপর সবার অধিকার।

রছানলাই চলায়ো মুখভরি ছিটা।
মলের পাত্রে ধাক্কা মারলে মলের ছিটে মুখে লাগে।
তুলনীয় : যেমন কর্ম তেমন ফল।

রোটী চিপ্লো মিঠা, কুরা খসরা মিঠশ।
নরম রুটি ভালো, সোজাকথা ভালো।

রত্নকো কদর জোহরীলে গর্ছ।
রত্নের কদর জোহরীই করে।

ল

লোগনে-স্বাস্নীকো ঝগড়া, করালকো আগো।
স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, খড়ের আগুনের মতো।
লোহাকো বৈরী লোহা।
লোহার শত্রু লোহা।
তুলনীয় : ঘরের শত্রু বিভীষণ।

লোভলে লাভ, লাভলে বিলাপ।
লোভে লাভ, লাভে বিলাপ।
তুলনীয় : লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

লাতকো ভূত বাতলে মান্দৈন।
লাথি খাওয়া যার স্বভাব কথায় সে কান দেয় না।
লঙ্ক মার্নে হনুমান, জস পাউনে ঢেঁড়ু।
লঙ্কা জয় করে হনুমান, যশ পায় বাঁদর।

লগনকো বেলা হগন।
শুভলগ্নে হাগতে যাওয়া।

ব

বন ভড়েকো সবৈলে দেখছন, সন ভড়েকো কোহী দেখতৈনন।
বন পুড়লে সবাই দেখে, সন পুড়লে কেউ দেখতে পায় না।

বারহ বর্ষ রামায়ন পঢ়ায়ো, সীতা কসকী জোই।
বারো বছর রামায়ণ পড়ে সীতা কার স্ত্রী।

বাঁদরকো হাতমা নরিয়ল।
বাঁদরের হাতে নারকেল।
তুলনীয় : বাঁদরের গলায় মুক্তের হার।

বোলনেকো পীঠো বিকছ, নবোলনেকো চামলপনি বিকতৈন।
মুখবাজের আটা বিকোয়, মুখচোরার চালও বিকোয় না।

শ

শুভস্য শীঘ্রম।
শুভকাজ শীঘ্র করা।

শরীরকো শোভা শির, বড়াকো শোভা ধীর।
শরীরের শোভা মাথা, মহতের শোভা ধৈর্য।

শিরমা টোপী ছৈন, খুট্টামা খোল।
মাথায় টুপি নেই, পায়ে জুতো।

শীত উখাই খৈলা ভরিন।
শিশির তুলে ঝুড়ি ভরানো যায় না।
শ্রদ্ধাকো গহনা অশ্রদ্ধাকো খজনা।
শ্রদ্ধায় গয়না অশ্রদ্ধায় খাজনা।

স

সুই ভয়ের পসনু ফলি ভরের নিষ্কনু।
সূঁচ হয়ে ঢোকা ফাল হয়ে বেরোনো।

সরাদ্ধ গর্নু ভন্দা সিধা পুর‍্যাউন গারহো।
শ্রাদ্ধের চেয়ে সিধে জোগাড় কঠিন।

সর্পকো খুট্টা সর্পলে দেখছ।
সাপের পা সাপই দেখে।
তুলনীয় : রতনে তরন চেনে।

সাঁউ ভন্দা ব্যাজ প্যারো।
মূলধনের চেয়ে সুদ প্রিয়।

সবৈ জোগী মরে মেরৈ তুম্বা ভরে।
সব যোগী মরে আমার থলি ভরে।

সৌতাকো ছোরো, মুটুকো কীলা।
সতীনের ছেলে বুকের পেরেক।

সর্প পনি নমরোস, লঠ্ঠি পনি নভাঁচিয়োস।
সাপও না মরে, লাঠিও নাভাঙ্গে।

সবুর গরে মেওয়া ফলছ।
সবুরে মেওয়া ফলে।

সবসে ভলা চুপ।
সবচেয়ে ভালো চুপ থাকা।
তুলনীয় : বোবার শত্রু নেই।

সোঝো ওঁলালে ঘিউ আউন্দৈন।
সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠেনা।

হ

হুলমুলমা জীউ জোগাউনু, অনিকালমা বীউ জোগাউনু।
ঝুটঝামেলা থেকে নিজেকে বাঁচানো, দুর্ভিক্ষে বীজ বাঁচানো।

শুনে বিরুয়াকা চিপ্লোপাত, নহুনে বিরুয়াকা ফুরসাপাত।
হবু গাছের চিকন পাতা, মুমূর্ষর পাতা খসখসে।

হিঁড়নে গরুকো পুচ্ছর নিমোঠনে।
চলন্ত ষাঁড়ের লেজ মুচড়নো।
হাতী দিঁউলা ভরেসিত বোকো মাগী হেরনু।
হাতি দেবে বলেছে যে তার কাছে পাঠা চেয়েই দেখো।

হিঙ ন ভয়ে পনি হিঙকো টালা ত ছ।
হিঙ না থাকলেও হিঙের ন্যাকড়া তো আছে।

এক গুচ্ছ কবিতা

যুগান্তর চক্রবর্তী

দ্বৈত সংগীত

১. ক্ষুধার্ত সংগীত

ক্ষুধার্ত মানুষও গান গায়
গানও গায় ক্ষুধার্ত মানুষ
ক্ষুধার্তেরও গান আছে, গান
ক্ষুৎকাতর গান ক্ষুধার্তের

ক্ষুধার্ত মানুষও কিছু খায়
মানুষ থাকে না অনাহারে
অনাহারে মরে কি মানুষ?
মানুষ কি হাঁটে চার পায়?

ক্ষুধার্তরা বেঁচেবর্তে থাক
যেন তারা খেয়ে বা না-খেয়ে
আহা যেন রোগে-শোকে ভুগে
মারা যায় না, কষ্টে সৃষ্টে বাঁচে

আজ যদি নিজ ভক্তগণে
বুদ্ধ* এসে দৈবাৎ শুধান
'ক্ষুধিতেরে অন্নদান সেবা
কেবা নেবে?' তবে আমাদের

আমাদেরও নাগরিক মনে
আমাদেরও নাগরিক মায়া
যেন নয়া বাস্তবতা পাবে
জেগে উঠবে মায়া-বাস্তবতা

---

*বলা হয়ত বাহুল্য নয় যে, উল্লিখিত 'বুদ্ধ' স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ, এবং প্রসঙ্গসূত্র স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কবিতা 'নগরলক্ষ্মী'র নিম্নোক্ত প্রথম স্তবক :

দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে
জাগিয়া উঠিল হাহারবে
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে শুধালেন জনে জনে
ক্ষুধিতেরে অন্নদান সেবা
তোমরা লইবে বলো কেবা?

ক্ষুধার্ত সংগীত/২

ক্ষুধার্তের মায়াময় গান
আজ নব মায়ার খেলায়
নিরুত্তেজ নগরজীবনে
এনে দেবে মায়া-বাস্তবতা

ক্ষুধার্তের কণ্ঠাগত প্রাণ
ক্ষুধার্তের কণ্ঠগত গানে
ম্রিয়মান. নগর সন্ধ্যায়
আনে যেন নব আন্দোলন

ক্ষুধিতের ক্ষুধার্ত উৎসব
যেন নব্য চলচ্চিত্রপ্রায়
মায়া মুগ্ধ নন্দনকাননে
সংবৎসর চলে নামগান

ক্ষুধার্তরা দীর্ঘজীবি হোক
দীর্ঘজীবি ক্ষুৎকাতর গান
দীর্ঘ হোক ক্ষুধার বিরুদ্ধে
মানুষের আজন্ম সংগ্রাম

২. জনগণ সংগীত

আমাদের জন্মদিন নেই
আমাদের মৃত্যুদিন আছে
আমাদের মৃত্যুর খবর
ছাপা হয় না দৈনিক কাগজে

আমরা অতি সাধারণ জন
আমরাই জনসাধারণ
আমাদেরই জনগণ নামে
আদর করেন জননেতা

আমরাও চাই উন্নয়ন
ভারীশিল্প, তথ্যপ্রযুক্তির
আমরা তাই চাই বন্ধ থাক
শিল্পোদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন

আমাদের অভিযোগ আছে
আমরা তবু চাই বন্ধ হোক
শ্রমিকের জঙ্গি আন্দোলন
ধর্মঘট বন্‌ধ্ বা হরতাল

আমাদেরও চাওয়া-পাওয়া আছে
ফ্রিজ টিভি ওয়াশিং মেশিন
নিম্নতম মজুরির মতো
এসব তো ন্যূনতম চাওয়া

আরও কিছু আছে দাবিদাওয়া
চাদ্দিকের এত যে মোচ্ছব
এতসব বীভৎস মজার
আমাদেরও ভাগ দিতে হবে

হবে হবে সব হবে হবে
ভূতের রাজাই দেবে বর
এইতো একটা নির্বাচন গেল
সামনে আছে আরও নির্বাচন

আমাদের আছে নেতা, দল
আছে মন্ত্রী, এম এল এ, মস্তান
আছে দৈব ভাগ্য ভগবান
সর্বোপরি আছে ধর্মভয়

আমরা অতি সাধারণ জন
আমরাই জনগণ মন।

শবযাত্রা

কাঁধবদল করছে শববাহকেরা—
পা ফেল সাবধানে
বাঁ-দিকে পড়ছিল একটু বেশি ঝোঁক,
ডানদিক সামলাও
এবার ডানদিকে চাপ রাখতে হবে,
ভারসাম্য বজায়
রাখতে হবে, ডাইনে-বাঁয়ে, পদক্ষেপে,
শবযাত্রী সাবধান
শক্ত হাতে ধরা থাক শবাধার
ছুঁয়ে থাক শব
মিলিত গতির ছন্দে—শ্বাসাঘাতে—

মৃদুমন্দ আন্দোলিত মাথা
হাত মুষ্টিবদ্ধ নয়, উত্তোলিত নয়,
অধোমুখ—
কণ্ঠের অনুচ্চ ধ্বনি
বাতাসে ছড়ায় অমঙ্গল
নিজেদেরই ভয় ভাঙাতে
থেকে-থেকে দু-একটা হুঙ্কার
চারদিকে ছড়াচ্ছে ত্রস্ত প্রতিধ্বনি
গা-ছমছম ভয়

এখন ডানদিকে চাপ রাখতে হবে
বাঁয়ে যারা—নিজেরা সামলাক

পিছনে, অজ্ঞাতবাসে, রাত জাগে
সশস্ত্র সন্ত্রাস

দুটি কবিতা

নির্মল হালদার

আলো বাতাস

বাতাস তখন ছুটে বেড়াচ্ছে
আমিও তখন তোমার দিকে
জলে-স্থলে-অন্তঃরীক্ষে

না, আমি কোথাও নেই
তুমিও নেই
বাতাসই ছুটে বেড়াচ্ছে

বাতাসই ছুটে বেড়ায় বাতাসের সঙ্গে
আমরা শুধু ধুলোবালি, অথবা
ধুলোবালিও না

না, আমি কেউ না
তুমি কেউ না
বাতাসই থাকে আলোবাতাসে

সাক্ষরতা

মাটির লেখা পড়তে পারি না।
কি পড়বো
আমি নিরক্ষর।
মায়ের মুখের লেখা পড়তে পারি না
কি পড়বো
আমি নিরক্ষর।

যারা সাক্ষর করতে এসেছে, তারাও নিরক্ষর
খিদের ভাষা পড়তে পারে না
আকাশের লেখা পড়তে পারে না
পাতার শিরা-উপশিরা পড়তে পারে না

বটতলায় বসেছে মিটিং
দ্বিপ্রহরের স্তব্ধতা পড়িতে পারে না

সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

আঁধার বেলার কবিতা

আঁধার

তুমিও ভাবছো সুষনি পাতায় ঘুম
চোখে ডেকে নিয়ে মেঘের খচিত কণা
বাতাসে গোপন চিহ্নমোচন খেলা
না জাগলে আমি সত্যিই বলব না।

দিনের মধ্যে ভাঙছে কাচের চুড়ি
একা থাকা ভুল শঙ্খমালার দেশে
গোলকধাঁধায় ঢাকা পড়ে ধুলোপথ
মিছে চোখভাষা সিঁড়ি পাতা দিনশেষে...

তুমুল হিংসা নির্বাক আবরণে
কাছে পড়ে থাকে আঁধার বেলার গান
পুড়ে গেলে আজ জমানো নির্জনতা
মিছে হাহাকারে হৃদয়ের সন্ধান।

কিসে

তরুতলে থেকে যায় পরিশিষ্ট কিছু শান্ত দিন
বুকের পাথরে তবু ঝরে পড়ে দামিনীর গান
এত বর্ষার ঘোর দুটি চোখ কিভাবে আগলায়
এর মাঝে শিকারীর ফাঁদগুলি শিস দিয়ে ডাকে।

রূপা দাশগুপ্ত

পাখিজন্ম

একশ' আটত্রিশ।

ঘৃণার পরত তুলে ছুঁড়েছি আগুনে
ঘৃণা হোক ক্রোধ
আর ক্রোধের ফণায় নাচো অজস্র ঝড়

হাওয়া তাকে কী দিয়েছে এযাবৎ
সেসব হিসাব নিতে পেতে
নিঃশ্বাস ডুবে যায় শহর ম্যানহোলে

ঝাড় কৃষ্ণপক্ষ দোলে
বিবমিষা হাজার বছর

নক্ষত্রকে প্রাণ দিক ইস্পাতফলক।

একশ' উনচল্লিশ।

তোমার পদ্মের কাছে স্থির
পলক রোদন
কেউ কেউ পরিযায়ী, ওলন
চঞ্চল
এভাবে হাত মুক্তি পায়ে পা
ভিজেছে শোনিত
আরো কিছু বয়ঃসন্ধি নীল
বিসর্জন।

অজিত বাইরী

চাবুক

দাগ দেখা যাচ্ছে না; কিন্তু আছে
চামড়ার নিচে জমাট বেঁধে আছে রক্ত।
যেহেতু চামড়া ফুঁড়ে বেরুচ্ছে না
দড়ি পাকানো চাবুকের দাগ, ভেবো না,
একটুও নির্যাতন সইতে হয়নি আমাকে।

আমি পিঠ পেতে নিয়েছি চাবুক
প্রতিবার কুঁকড়ে উঠেছে শরীর
প্রতিবার বেঁকে গেছে চোয়াল

কিন্তু আমি সহ্য করেছি দাঁতে দাঁত চেপে।
ধনুকের মতো বেঁকে যাওয়া শরীর
সোজা করে নিয়েছি চাবুকের বিরতির ফাঁকে।

চাবুক নিজেই যখন ক্লান্ত, তখনই
আমি বুঝতে পেরেছি প্রতিটি দাগের
নিস্ফলতা; চিনতে পেরেছি নিজের
ভেতরের শক্তিকে, আমার বলতে বাধছে না
আমার চামড়ার নিচে লুকিয়ে আছে
একজন অকুতোভয় ভারতীয় গেরিলা যোদ্ধা।

চলেছি নিঝুমপুর

চলেছি নিঝুমপুর। গাড়িঘোড়ার বালাই নেই। পায়ে হেঁটে। দু'পাশে বুক উদম মাঠ। নাড়া খড়। সাপের খোলশ। ধোঁয়ার কুন্ডলী পাকিয়ে উঠছে মাঠের কিনারে। শীতভোর। খেঁজুর গাছে ভাঁড়। কালভার্টের উপর ন্যাংটো বালক। আদুল গা। তেল-চক্‌চকে মোষের শরীরে সকালবেলার হলুদ রোদ। পিঠের উপর দু'পাশে পা ঝুলিয়ে বাগাল।

সামনে জলা। কঞ্চির আগায় হিমে ভেজা বক। ধূসর। ডানা মোড়া। রোগা-পানা একটা লোক ঘুনুই ঝাড়ছে। ঝরে পড়ছে রুপোলি চাঁদা, খল্‌শে। রোদ চড়ছে। স্পষ্ট হচ্ছে দূরের দৃশ্য। গাঁয়ের বউ-ঝিদের কোলে কাঁখে ছানাপোনা। ঘোমটা-টানা মুখ। উনুনে জ্বাল ঠেলছে। শুকনো পাতাপুতো পুড়ছে দাউদাউ। দুপাকা উনুনে সেদ্ধ হচ্ছে ধান। জোয়ান মরদরা গাদা দিচ্ছে খামারের উঠোনে খড়ের আঁটি। মাটির দেয়ালে, পাঁচিলে, ছাঁচতলায় গড়িয়ে নামছে ছায়া। খোড়ো-চালের উপর ধোঁয়াশার আচ্ছাদন। ঝিঁঝির শব্দ উঠছে। নৈঃশব্দ্য ভারী হচ্ছে। পায়ের নিচে খানা-খোদল। একটি দুটি জ্বলে উঠছে কেরোসিনের কুপি, একটি দুটি নীলাভ তারা। বনতুলসীর ঝোপ। কোথায় ফুটে আছে ম্লান মাধবী, কার আঙিনায়? চলেছি নিঝুমপুর। নিঝুমপুর কতদূর!

হিন্দোল ভট্টাচার্য

যক্ষপুরী

যে কোনও হিংসার পাশে চোরাকুঠুরির মতো গোপনে তোমার হাত দেখি।
যেন সান্ত্বনার ডাকটিকিট লাগানো আছে, যেন ব্যান্ডেজের নিচে তুমি ক্ষতস্থান,—

দেখি ছোট্ট বিন্দুর পাশে দীর্ঘ একটা সরলরেখায়
ম্যাপে আঁকা বাড়িঘর, দোকানপাট, শীতের চাদরে
কমলালেবুর সূর্য আঁকা
কমিকস্ট্রিপের থেকে উঠে আসা হুহু মুখ, 'লঘু মুহূর্তের' মতো এ ঘরে ও ঘরে...

আমিও ক্রমশ সেই সরীসৃপ হয়ে যাই, বুকে ঘর্ষণের শব্দ, পতঙ্গের দিকে
নিঃশ্বাস বন্ধের পর নিঃশব্দে ছিলার টান, কী বিদ্যুৎ তখন শরীর।

গোপনে তোমার হাত, হাতে রক্ত, দেওয়ালের পিঠে পিঠ, অতি বিষণ্ণতা
এভাবে আসেনা আর, আচমকাই উড়ে যায় রাতের মাছির অন্ধ ডানা।

কোথায়? কোথায় উড়ব? পাশে চলমান সিঁড়ি, মাথায় কুয়াশা।

ঈশ্বর

জীবন গরিব খুব, হাত পাতে, যেন শুকনো পাতা
বোবা পাথরের সামনে বোবা কিছু কথার ভঙ্গিমা।
বুঝি নিভে যায় সব। উন্মাদ মুহূর্তগুলো পুড়ে
গলন্ত মোমের ফোঁটা ছড়িয়ে দেয় হাতের তালুতে।

টাইপমেশিনের দ্রুত পদধ্বনির পায়ে পায়ে
লিখি বিপর্যয়, লিখি, —'আর কিছু বলার কথা নেই?'
শুধু টেবিলের পাশে গুঁড়ি মেরে থাকে অন্ধকার
আর জানলা খুলে মাঠ, মাঠে গর্ত,—নীচে আরও মাঠ!

একটি পুকুরে যেন জল তুলছে ভোরবেলার মেয়ে
গায়ে ভিজে গামছাগন্ধ, গন্ধ পেয়ে সোঁতা মাটি থেকে
এসেছে ছটফটে শিশু, চোখ তার বাবুই পাখির।

প্রিন্ট আউট—মিশে যাচ্ছে ঘাসের ভেতরে সারাদিন
আচমকা গুনগুন করছে গরিব মাথার মধ্যে পোকা
দেখি আরও ঝুঁকে পড়ে ভোরের প্রথম স্কুলে যাওয়া
ছেলেটির চোখে জল, পায়ে কাদা, হিম পড়ে ভিজে।

হাত কুঁকড়ে যায়, চামড়া বুড়ো হয়ে এখন ক্রমশ
নিজেকে ভাসিয়ে দেয় রূপকথায়, চোখের পলকে
খুব রক্তপাত, গল্পে মুছে গেলে হিমশান্ত পুকুরের
বুকে একটা গোল বৃত্ত ধীরে ধীরে চওড়া হয়ে যায়।

সৌমনা দাশগুপ্ত

পাথরের ভেতরে পাথর

কবিতার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে শাখামৃগ।
হুপহাপ ডানা ছিঁড়ছে, ফল খাচ্ছে।
আর ভুলে যাচ্ছি সব শব্দ। ভোলামন!
প্রতিরাতে হলুদ ঈশ্বর আমাকে ডাকেন—
'পাপ করো, পাপ বড়ো মনোরম।' আর
পাথরের মূর্তি ভেঙে উঠে আসে আরো
একটা পাথর। নদীর কাছে চলে যায়, ধীরে।
স্রোতকে কামড়ে ধরে চলমান উদ্বাস্তু পাথর।

বিসর্জন

স্বপ্নের ফুটন্ত গালা নেমে আসে চোখে।
সে যেন গৃহস্থ বধূ অবগাহনের কালে
কোন অজানিত অভিমানে চলে গেছে
বামনপোখরির অতলে। হায় গো হস্তির কন্যা,
বিষাদ হলো ভরা কোটাল—থমথমে দেহ।

ব্রাহ্মণ ঘরণী—ঘর কি ছিল কোনদিন!
দিন আনি দিন যাই যজমানি : সিধে, আলোচাল,
লালপাড় শাড়ি-তাও ফুরিয়েই যায়। হাতের আতপ
গন্ধে জল ঢেলে নিভেছে আগুন, পাতার জীর্ণ আঁচ।
এরপর আছে অপবাদ। চেয়েচিন্তে, ধার করা
চাল ডাল তেল নুন সবকিছু বাকি পড়ে,
বাড়ন্তের সংসার। বিমূর্ত ছবির ধাঁচে ভেঙে আসে
পাড়, লালপাড় শাড়ি। ও শাশ্বত কুমারী গো!
তুমি কি বামনপোখরিতে খুঁজেছ নারী?

সমস্ত লঙ্গল ফুঁড়ে দৌড়ে বেড়ায় মাহুত।
গাছ চিনে খোঁজে বৃক্ষ। হাওদা ছাপিয়ে
উড়ছে জীবাণু। অলক্ষিতে স্বপ্নকীর্ট কুরে কুরে
খায় গামছার লাল প্রতিশ্রুতি। আর পেরিয়ে গিয়েছ
এতক্ষণে তোমার গুঞ্জর অভিলাষ। সরে যাচ্ছে
শনশনে ঘাস। আমার মাহুত বন্ধুরে, গেইলে
কি আসিবি ফিরে? হাহুতাশ,
কন্যার তর্পণ ছিঁড়ে কপাল আলেখ্য।

অর্ণব পাণ্ডা

প্রতীক্ষা

প্রজাপালনের দেশে গিয়ে বাবা আর ফেরেনি কখনও।
আমরা যমজ ভাই মার সঙ্গে কুটিরেই থাকি,
দুজনে একটি গান সারাদিন বনে বনে গাই
যেখানে বনের শেষ তারপর সূর্যাস্তের শুরু
বাবার পায়ের ছাপ চিনে গেছি তবু কেন বাবাকে চিনি না!
আমরা দেখেছি এক জলভরা মেঘ
আজও স্থির লুব্ধকের কাছে।

তৃষ্ণা

গাধার মুখের মতো ছাত্রগুলি একমনে গুরুবাক্য শোনে।
অথচ ঐক্য নেই বইগুলির পৃষ্ঠা এলোমেলো
ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ আর কাগজের নৌকা পালহীন
সামান্য হাতের ঢেউয়ে ভেসে গেছে সেই দেশে
যেখানে অন্ধ বাবা মা এখনও
একা একা পাতার শব্দের দিকে চেয়ে আছে।

বল্লরী সেন

বিশ্বায়ন

ক.
দেবীর বুকের জল কালো মিশমিশে
রোদ্দুর, বজ্র-বাঁকানো সেই ছিলা ধনুকের
তুমি তার শিরোনাম, প্রথম পাতার কাগজ
আনন্দবাজার। অক্ষরে তৈরি হয় আমার গুজব
পোস্টমডার্ন ডানা পৌঁছে দাও ঘর থেকে ঘরে

খ.
চিরকুট ফেলার পোড়া দিন ঘরকুনো
মৃত্যু মুখে নেয়, খিঁচে নেয় জ্বরের
মধ্যস্থ বিষ, বিষভাণ্ড কলসের প্রায়
আসঙ্গ তোমার বিষ আরো কালো ঐ
অমৃত। কলাপাতা-ছেঁড়া চিঠি, কলাপাতা
ফেলে দিলে পাপ। মৃত্যুতে নামি শঙ্খলাগা
দুই মেয়ে দুজনেই বান্ধবী। নভেম্বরে জন্ম
তোর, দুজকেই সহধর্মিনী

কবি, হরিজন

পূর্বমেঘ ডুবে গেছে ইস্কুলের রোদে
খামারের খড়, ভাত, একঘর গোয়াল
খানা-খন্দে কচু-কাটা আশ্বিনের জল
শিউলিডাগর পাতা পালান সাঁপুই

যে-এসেছো প্রতিরাতে সিঁদুর পরাতে
অন্যজন বন্দী থাকে ল্যাবোরেটরি ঘর
১০৮ জপমালা ফিল্ম-ফেস্টিভাল
বসে থাকে আড়-ভাঙা নীলাচলে প্রভু
পদ্মফুলে পূজো করি টেলিফোনে বিমানবন্দর
ভারতবর্ষ ছিঁড়ে যায় আমি ছাই আমার
ছাওয়াল

জয়ন্ত জয় চট্টোপাধ্যায়

বিষাদ

চোখের জল আড়াল করে, হেসে
অসম্ভব জেনেও ভালবেসে
তোমার কাছে আমার ছুটে আসা

উদাস, তুমি ফিরিয়ে দিলে তা'কে
হারিয়ে গেল বনপথের বাঁকে
অন্ধকারে বিষাদ পেল ভাষা

পালক

যদি কোনোদিন মৃত্যু আসে
নক্ষত্রের দীপ অন্ধকার রাতের আকাশে
আমরা দুজন শান্ত, হাতে হাত, শুয়ে থাকবো ঘাসে

একটা পালক শুধু ভেসে যাবে অনন্ত বাতাসে...

কবিতাবলি

আনন্দ ঘোষ হাজরা

নিমেষ

তোমার নিমেষপাতে জল
ফুলে ওঠে, প্রগাঢ় কাঁপন
শুরু হয়; জীবনযাপন
আমাদের, সহায় সম্বল—
তোমার নিমেষপাত
তোমার আচ্ছোদ করতল।

সরিয়ে নিওনা যেন মুখ
দূরে ছুঁড়ে ফেলো না কমল
আমাদের অসহ্য অসুখ
আতসের জীর্ণ অবতল
সব ভেঙে টুকরো হয়ে যাক
সব পুড়ে ছাই হয়ে থাক।

থাকুক অচ্ছোদ করতল
আমাদের সৃষ্টির কাঁপন
আমাদের জীবন যাপন
আমাদের সহায় সম্বল.....

বিশ্বনাথ গরাই

আমলাশোল

কেবল অন্যকথার ঘাস ও বিচালি
রোমন্থন শেষ হলে পশ্চিম প্রবাসে
হঠাৎ অশনিপাত। কারা সেই মৃত্যুর মিছিলে
কাদা ছোঁড়ে সপার্ষদ; কারা এই আত্মঅবমাননার
মিথ্যা চতুরালি দিয়ে বোনে সরু কল্পকাঁথাকানি!

থালা-বাটি ঝনঝন—মুরোদ ফুরোলে কীটদল
হামা দেয় চালচুলোহীন; বসন্তকোকিল পুনঃ হাঁক দেয়
অপুষ্টিজনিত মৃত্যু, মানুষেরা কেন যে বোঝে না!

সৌগত চট্টোপাধ্যায়

ফুলের জন্য

বাসি ফুল তোমার জন্য একটি কবিতা
ফুলদানি তোমার জন্য একটি স্তবক
বেলফুল তোমার জন্য কয়েক পংক্তি প্রেম
লাল গোলাপ তোমার জন্য ফুলের টব বাগান।

বৃষ্টি তোমার জন্য অবাধ ধান ক্ষেত
সমুদ্র তোমার জন্য ফসফরাস্ ঢেউ
শব্দ তোমার জন্য বম্বে ডাইং
স্তব্ধতা তোমার জন্য ফুলের কবিতা।

রুদ্র পতি

বর্ষার কবিতা

সেই মধ্যযুগ থেকে একইভাবে চলমান নীতি
রাজ্যের প্রয়োজনীয় খরচ ছাড়াও রাজা জমিদার এবং তাঁদের সঙ্গীসাথীদের
বিলাস আর শখের সব খরচ যোগাতে হয় আজো
দেখি চাষিদের ওপরে বাড়ে চাপ, সারের দাম বাড়ে
অথচ উৎপাদিত ফসলের দাম নামিয়ে দেয় এমন সরকার
আমি কী আর করবো
চতুর শহর আমাকে দেখে মুখ বেঁকায় ভেংচায়
তুমিও বিদ্রুপ করো
এম.এসসি সম্পূর্ণ করিনি তাই মধ্যযুগ থেকে পাওয়া পৈত্রিক
আটবিঘা জমিতে বনে গেলাম প্রান্তিক চাষা
দেখি হরিজন নদীস্রোতে এলোমেলো ঝুমুর অলচিকি ভাষা
দেখি নদী পাড়ে শাঁখ বাজে
শালগাছের তলায় বিয়ে হয় সাঁওতাল বরকনের

নিপীড়িত এই আমার জীবন আলোচনা করে দেখি
মাটির ব্যবহারে এখন সমস্তই মাটি
আমি ভুলে গেছি হায়ারম্যাথ ভুলে গেছি ম্যাক্সওয়েলের ল;
হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে দ্রাবিড়মূর্তি
ভালোবাসা চেয়ে জননকাঙ্ক্ষায় সে উন্মাদ হয়
বর্ষা নামে চাষাদের গ্রামে

শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চে, আমি আর মেয়েটা

চে গেভারার রোলেক্স ঘড়িটার দিকে
আমার ভীষণ রকমের লোভ ছিল
যতবার ছবিটা দেখেছি আমি ততবারই আমার দুচোখ
লোভে চকচক করে উঠেছে নিজেই...

আসলে বিভ্রান্ত আমি, ভয়াবহ রকমের গণ্ডগোল নিজেরই ভেতরে
চে'র জামা, চুরুটের ঘোর, নাকি শুধু হাঁপানিটুকুই
নাকি অন্য সব
ঠিক কোনটা আমাকেই, শুধু আমাকেই কবি করে দেবে

দোষটা আমার নয়। মেয়েটার। যে আমাকে তাতিয়ে দিয়েছে

পটাপট লোকে কালা হয়ে যাচ্ছে এরম শহরে
প্রত্যেকটা ট্র্যাফিক সিগন্যালে বেটি বড়ো বড়ো আর্শি বসিয়েছে

আমাকেও তো কিছু একটা করতে হয়। কিন্তু ওই!

আমাকে উচ্ছন্নে টানছে চে-র সেই গল্‌ফ খেলা....
আহা সেকি টান....

সব্যসাচী মজুমদার

প্রচ্ছন্ন

কতগুলো মুহূর্ত আছে—সেগুলো গচ্ছিত থাকে কেবল
নিজেকে ছোটো ভাববার জন্যে

মায়াবী হরিণ প্রত্যাখ্যানের পরও বুকের ভেতর হিমহিম কুয়াশা জমে ওঠে
শান্ত ক্যাবলা-মার্কা অন্ধকারে

সুদূর শিখরে উদ্ধব নাচিকেত হয়ে বারবার মৃত্যুকে অনুসন্ধিৎসু করে তোলা
যাযাবরীদের মতো

যা হয় একটা ভেবে নিলেই মুহূর্তরা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে
হয়ে হয়ে খুন হয়ে যায়

মাঝে মাঝে ও বিষাদ, তোর স্বেদসিক্ত হাতে, গোপন অংশে
কয়েক পশলা মৃত্যু খুঁজে পাওয়া যায়

সেই মুহূর্তে নিজেকে চন্দন লেপা কুকুরীর মৈথুনজাত যন্ত্রণা মতো মনে হয়

গালভাঙা দিনগুলোরও হিসাব রাখতে রাখতে পশ্চাতে লাথি হয়
চোখ রাঙানিয়া কাকডাকা ভোরে

আসল কথাটা হলো আমরা সবাই একান্তই মুহূর্ত ভেদক
অজ্ঞাত সন্তান

অর্ণব চক্রবর্তী

ক্রমমুক্তি

সবুজ মাঠের ঘাসে এসে পড়েছে হলুদ আলো
আলো গনে গাইছে, আমার মুক্তি আলোয় আলোয়
এই আকাশে, আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায়...
কী অবিস্মরণীয় এই গান। আলোর চোখ তখন উজ্জ্বল।
নাকের দুপাশে কী এক অনন্ত তৃপ্তি।....

... হঠাৎ আলোর সুর খাদে নামে, সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে
এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে...হঠাৎ কেন মুক্তির কথা এল—
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ; এ বাতাস কি...
সুচেতনা, কেন আপনি এইভাবে অধিবাস্তব খুঁড়ে খুঁড়ে
বের করেছেন আপনার প্রেম—তাই তো দেখতে পাচ্ছি
আপনি ঠিক বাইসনের মতো, বসে আছেন যুদ্ধবিমানে...আপনি কি
আমায় আক্রমণ করবেন, সুচেতনা—দাঁড়ান জীবনানন্দকে
ডেকে আনি, এই যে হাতে লাল মচকা ফুলের মতো মোবাইল...
জীবনানন্দ তারপর নিজস্বগলায় আবৃত্তি করবেন,
এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা সত্য; তবু শেষ সত্য নয়
কলকাতা একদিন....

দূরে, আকাশে, ঝরে পড়া নক্ষত্রের কাছে
একটা মহাকাশযান, জীবনানন্দ নেমে আসছেন পৃথিবীতে

অভিমন্যু মাহাত

পত্র

নীল খাম খুলতেই
উড়ে এল জোনাকি
জোনাকির আলোয় পত্রপাঠ।
পত্রে হলুদের কাছে ভিক্ষে চেয়েছ তুমি

হলুদ এখন প্রজাপতির ডানায়

পত্রে আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছ তুমি
আমি পাঠালাম শাদা খামে রামধনু

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

শুধু কাহিনীমূলক পদ্য

কারখানাতে বোনাস হয়নি পুজোয়
অফিসার তাই মরেছেন বিক্ষোভে
টেলিভেশনের কভারেজ বেশ ভালো
মৃতের মা আর বোনের দিকেই তাক করে আছে আলো...

এতো আলো কেন? ঝাপসা আসবে ছবি
আলো কি কখনও ভাতের গন্ধ আনে!
পচা, গলা সেই মৃতদেহ ছিল চৌবাচ্চার জলে
বোনাস হয়নি পুজোতে এবার মৃতদেহ কিছু জানে!
সারা শরীরই তো রক্তশূন্য ধপ্‌ধপে আলো মাখা
মর্গ যখন লাশ চিবোচ্ছে আনন্দে একা একা

খিদের খিদেয় জ্বলছে মানুষ, মিডিয়াও তাই জ্বলে
খিদে রাক্ষুসে, প্রতিদিন চাই খাবার নতুন খবর
ঘোমটা দেওয়ার শাড়ি নেই তাই বউটি তুলসীতলায়
সন্ধ্যাবেলায় যেতেও লজ্জা পায়...
ছ-আটমাস মাইনে হয়নি, নতুন জামা বা জুতো
বাবা কি কিনেছে ছেলের জন্য? চুম্মুর ঠেকে গেছে
বিনা নোটিশেই মালিকপক্ষ ক্লোজার আনতে পারে,

মিডিয়া খুঁজছে আত্মহত্যা, সন্ত্রাস আর ভিড়
দুর্গা এবার কিসে এসেছেন? কি ফল হবে তার
নতুন শিল্পী ক্যানভাসে আঁকে বিষাদ, অন্ধকার
তরুণ কবিটি শ্লোগান লিখেছে, কবিতা হয়না আর

শিউলি ফুলেরা ভোর লেখে আর? বাজেট ক'লাখ টাকার?

স্নেহাশিস পাল

বদনাম

আয়ুর রসাতলে যা থাকে সর্বনাশ তা তো হীরকোজ্জ্বল সলতে!
ছড়িয়ে পড়ছে সংকার—ছাই-ভস্ম, ঔরস...মন্থনে মুখোসের দলা দলা লাভা
তা দিয়ে আমরা দেব-দেবী গড়বো, বীজের গর্ভগৃহে থাকবে
কুমারীর প্রথম রজনিঃসরণ; বন্ধনে আমাদের লালায়িত জিহ্বা-বীর্যে অঙ্কুশ...
শ্রাবণের চাঁদের মতো পরিচয় শান্ত-ধীর-স্থির চেহারা পৌরুষ।
প্যান্টে-পায়ে গড়িয়ে যাচ্ছে পাগলের পেচ্ছাপ, ওটাই আমাদের ১০৮টা নামের
একটির প্রতিনাম; ভাবো হাসপাতালের একদিকে মর্গ উল্টোদিকে প্রসূতিসদন
অন্ধলোকটি এই মাত্র খবর নিয়ে এলো ওর শিশুটিও অন্ধ হয়েছে।
পরিপূরকে আপ্লুত মরণ, যেন হারিয়ে যাওয়া নাবিক ভাবে—
কত সুবিশাল এই জলরাশি, এই খিদে
কেন ঐ জীবিকার বদনাম...

সোনালি বেগম

অর্কিড, কমলালেবুর ক্ষেত

অপেক্ষমান দর্শক সমালোচক। হাততালি কখনও বা মন্দ-বর্ষণে সিক্ত খেলোয়াড় অনির্দেশ সংশোধনে মগ্ন থাকেন। নিশ্চেষ্ট অভিজ্ঞান বোধহয় কখনও ভুল করেন না। কর্মযজ্ঞ সচল হলে সমুদ্রে ভেসে ওঠে মুক্তো, অ্যাডভেঞ্চার-স্পষ্ট চিত্র জ্ঞাপন করে। সমালোচনার বিরাট প্রশ্নচিহ্ন দেখে নেয় প্রগতিশীল গাড়ির চাকা। শ্রমশীল মৌমাছির গুঞ্জন ভরে ওঠে বাগান, চাকভর্তি মধু। ধৈর্যের প্রাচীর স্থির ইচ্ছাশক্তির কিরণ ছড়িয়ে দেয়। মাটি জন্ম দিতে থাকে অসংখ্য বৃক্ষ। সূর্যের রশ্মি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জড়িয়ে ধরে। উচ্চশিক্ষার ব্যাপক প্রসার, সংগত আইন-শৃঙ্খলায় উজ্জ্বল আগামী প্রজন্ম। কলেজের দোরগোড়ায় রাখীর গুচ্ছ হাতে ভালবাসার স্তবক। আন্তরিকতার সম্পর্ক শ্রদ্ধার গভীরে শিকড় ছড়িয়ে দেয়। সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই স্বচ্ছ আবরণে উপস্থিত হয়। আদর্শবাদী ব্যক্তি কৃচ্ছ্রসাধনে ধারাবাহিক পথে জীবিকা সন্ধানে ব্রতী হোন। সমগ্র জনসমাজ মাদার টেরেসার সেবাধর্ম নতমস্তকে স্মরণ করতে যাকে। অসংখ্য সংলাপের পর সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রানার চলেছে রানার...' ধ্বনিত হয়। স্বতঃস্ফূর্ত দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণার দ্যুতিতে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মধ্যাহ্ন সূর্য ছুঁয়ে সচিত্র সংবাদ হয়ে যান। বাতাসে দুলতে থাকে অসংখ্য অর্কিড, পরিব্যাপ্ত রৌদ্রোজ্জ্বল কমলালেবুর ক্ষেত....

বিশ্বজিৎ মাইতি

যাত্রাপালা বিষয়ে একটি মিথ্যা কবিতা

কবরস্থানের পাশ দিয়ে রাস্তা বেঁকে গিয়েছে নদীর দিকে—কবরস্থানের উপর একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ। আমি এই গাছের ছায়ায় বসব, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে, এমন কী 'মজনু মজনু'-বলে ঢিল ছুঁড়লেও ঔদাসীন্যের ভাব এবং মাঝে মাঝে মুখে মিটি মিটি হাসি ছাড়া কিছু থাকবে না। এই দৃশ্যে গায়ে থাকবে রংচটা জরির জোব্বা, মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি। এই দৃশ্যে মুখে কোনো সংলাপ থাকবে না। মজনুর বিরহকাতর অভিব্যক্তি ছাড়া এই দৃশ্য ঘটনাবিহীন। এই দৃশ্যে লায়লার প্রবেশ ঘটবে না। অধিকারী মশায়ের নিপুণ নির্দেশনায় সব জানা হয়ে আছে।

মুখে তাই ঔদাসীন্য ফুটে ওঠে, মুখে তাই ফুটে ওঠে হাসি—মুখে তাই চিন্তার রেখা। গ্রিনরুমে লায়লার জরির ওড়নাখসা বুকে অধিকারী মশায়ের মুখ চিন্তা করি। পরবর্তী বছরের আগাম খোরাকি আজই দেওয়া হবে, প্রাণপণে পাগলের ঔদাসীন্যের ভাবটুকু মঞ্চে তাই ফুটিয়ে তুলতে থাকি আমি

রবীন দত্ত

মাটিতে মৃত্যুর গন্ধ

বুকে ওল্টানো এক পাখি
স্বর নেই—
ডানা ঝাপটানো নেই—
এখনও বাঁচার আশায়
আকাশ খোঁজে
খোঁজে মাটি।
বুকের ওপর আকাশ গেছে মিলিয়ে
নীচে সরে গেছে মাটি
তাই ঝুলেই আছে
নিশ্চিত পতনও তাকে ঝুলিয়ে রাখে
মানুষকে দাঁড় করিয়ে রেখে।

দিলীপকান্তি রায়

"কে আগে"

ভার নাই—
শূন্য তাই, পৃথিবীর ওপরে
শূন্য পূর্ণ, পূর্ণ শূন্য
আসলে সবাই
শূন্যের মধ্যে শূন্য,
একলব্য কর্ণ শূন্য, শূন্যর
পাঞ্চালি পঞ্চপাণ্ডব পূর্ণ, অপূরি
দুর্যোধন ভাগ্যহত, স্বর্গে,
লালসা কামনা ক্ষুধা তৃষ্ণা
হাসনুহানা সুগন্ধি কামিনী
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পৃথিবীতে রক্তের ঢেউ
পৃথিবী ছেড়ে নরক কোথাও নেই।
তৃণ নেই শিশির নেই
নেই শিশিরভেজা শিউলি
খ্যাতি, ঐশ্বর্য্য, রাজ্যপাট, অনন্তজীবন
হুরি পরা মিথ্যকথা-স্বগে কিছু নেই।
কে আগে
পৃথিবীর নরকের পথ পার করে
দুর্যোধনের অনেক পরে
যুধিষ্ঠির অবশেষে স্বর্গে।
পৃথিবী ছেড়ে কেই বা স্বর্গে যেতে চায়।

মৌসুমী চক্রবর্তী

সমুদ্র সৌধ

সবুজ যান্ত্রিক হাওয়ায় লক্ষ আলো চোখ
কোথায় গেলে স্বপ্ন সৌধেরা
এসো এসো চোখের পরে
সামুদ্রিক রক্ত সৌধেরা
নিভিয়ে দাও আলো লক্ষ চোখ
জেগে থাক চোখের পর অপার তটরেখা

এ কোন ঘুমের দেশ বালুকাময়
অনন্ত তুই অশ্রান্ত তুই আমার তুই
রক্ত বন্য সামুদ্রাধিক গহীন

অস্ফুট চোখ মেলে যন্ত্রণা কাটা কাটা
তুলোফুল কপালে আমার
সমুদ্র সৌধ......

অসিত দাস

উত্তরসুনামিপর্ব ও মৎস্যকন্যা

এক ফুঁয়ে তুই নিবিয়ে দিলি ফুকেত
এবার নাগাপত্তিনমের পালা
সমুদ্র তোর মারণ-সুনামিতে
মছলিগাঁয়ে ঢেউ-এর চিতা জ্বালা।

কালোমেয়ের কাজলকালো চোখে
নেমেছে জল ভীষণ ফটোজিনিক
এবং বুকের গভীরক্ষত থেকে
ঢেউএর দোলে রক্ত তোলে ফিনিক।

একলামেয়ে পুরুষ-পৃথিবীতে
গাছের ভেলায় বাঁচবে কতক্ষণ
সমুদ্র তোর গভীর জলের স্রোতে
টানবে তাকে পাষণ্ড একজন।

আর এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিবি দিন
সমুদ্র তুই রাতের শিখা জ্বালা
ওই মেয়েটা খারাপ হয়ে গেলে
আসবে তখন আরেক মেয়ের পালা।

তমাল মুখোপাধ্যায়

অনুবাদ

ছবি যেই টুকে ফেলতে পারি প্রায়-প্রায়—
দৃশ্যটি এঁটো হয়ে যায়,
রোচে না সে এই চোখে উপর্যুপরি

ছায়াপথ, তারার আঁধার

এরকমই কিছু কিছু অসময়ে যাক
অনুবাদে সব আমি বাসি হতে দেবনা কখনো.....

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভবিষ্যৎ

যখন ব্রোঞ্জের স্ট্যাচু অনায়াসে দেশ-কাল পার হয়ে যায়ব
বছরান্তে একটি সন্ধে-সমাধির সামনে জ্বলে মোম
না হওয়া প্রেমের কোনও ত্যাড়াব্যাঁকা প্রতিশোধ নিতে
সুন্দরীর জানলার নীচে ছোকরা রেখে আসে চকোলেট বোম।

ল্যাজায় মুড়োয় গাড়ি বাড়ায় মন্ত্রীর কনভয়
কোথাও কোথাও টাকা কোথাও শুধুই খই ওড়ে
মাগুর মাছের মতো লাফিয়ে ওঠেন পরিস্থিতি
বিপ্লবী গা-ঢাকা দেয় জঙ্গলের আর একটু ভিতরে।

চাপ-চাপ রক্তের মধ্যে ঘন হয় আমোদ-প্রমোদ
বর্ষার নদীর মতো কুকুরের কৃতজ্ঞতাবোধ
ফুলে, ফেঁপে, ফুঁসে ওঠে—ডাস্টবিনে আস্ত হাড় পেলে
হাতির দঙ্গল ভরা ধানখেতে নেমে পড়ে, গোরুগুলো ঘুমোয় গোয়ালে
তখন সামান্য ঝুঁকে চুমু খেতে গিয়ে আমি দেখতে পাই তোমার কপালে
ছেলে আছে, ছেলে আছে, ছেলে।

শোভন ভট্টাচার্য

চাঁদে-পাওয়া লোক

এ-বাড়ির জান্‌লা ও-বাড়ির
পাঁচিলে ভোরের চোখ ঘোলে;
ও-বাড়ির খুন্তি এ-বাড়ির
হাঁড়িতে কড়ায় ধ্বনি তোলে।

ওখানে লাগায় ঠোকাঠুকি
এ-বাড়ির নীচু কিছু কথা;

ওরা দেখতে পায় মুখোমুখি
পুরুষে প্যাঁচানো এক লতা।

তবু কল্পনার বুনো চাঁদে
পাওয়া প্রেতাত্মার মতো লোক,
একপ্রকার ঘরকুনো, ছাদে
হাঁটে রাত্রিবেলা শত হোক্।

গাঁটে গাঁটে অশ্বত্থের চারা
ফাটায় পাঁচিল, ফাটে পাড়া।

সুস্নাত চৌধুরী

সান্ধ্যসফর

আমি যেন ঘাস-পাতা, ছোটো ছোটো উপবন
দ'লে দিয়ে চলে যাই পথের অপর পারে
আরো এক পথের মতন।
প্রথাগত ইন্দ্রিয়ের সংবেদনে বোঝা যায়
কাকে বলে অতিক্রম,
অভিবাদন কীভাবে আসেন....
অভিবাদন এসেছিলেন বিখ্যাত কবির মতন—
সান্ধ্যসফরে

পথ ছিল সামনের দিকে—
অতিক্রম, পিছন সারিতে।

গল্প

শিকড়

অভিজিৎ সেন

আমিও এভাবে ঠিক চারদিকে সাতবার ঘুরে। শরীর জাগাতে পারি শিরায় জাগাতে পারি স্মৃতি।/মানচিত্রে জল পড়ে, মানচিত্র ডুবে যায় জলে। সেই জলে একবার স্নান করে ফিরে যেতে পারি। —*স্থলপদ্ম, শঙ্খ ঘোষ*

পয়তাল্লিশ বছর একটা যে সে সময় নয়। আর পাঁচটা বছর এর সঙ্গে যোগ দিলে সব হিসেবেই সময়টাকে দু-পুরুষের কাল বলে সবাই মেনে নেবে। সময়টা পুরানো পাপ, পুরানো দুঃখ, পুরানো অপমান, অনুশোচনা, প্রেম, অর্থাৎ যাবতীয় পুরানো স্মৃতির উপরে গাঢ় যবনিকা ফেলে দিতে পারে। মানুষের জীবনকে আমূল পাল্টে দেওয়ার জন্য এতটা সময় যথেষ্টর থেকেও অনেক বেশি, এরকমই এতকাল ধারণা ছিল দেবব্রতর।

তার অর্থ অবশ্য এমনও নয় যে এই পঁয়তাল্লিশ বছর ধরেই যে কোনো প্রবল স্মৃতিকে মনের মধ্যে লালন করেছে। হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে প্রথম দিকের বছর পনেরো সে একটা অসম্ভব শক্তিশালী ক্ষয়ের মধ্যে ছিল, দৈহিক এবং মানসিক আঘাতজনিত ক্ষয়, যা তার ভিতরে জন্ম নিয়েছিল ভারী শক্তিশালী ট্রমার আকারে।

কালক্রমে সবই ধূসর হয়ে গেছে। নিস্তেজ হয়ে গেছে যাবতীয় হতাশা আর আক্ষেপ। ক্ষুধা আর অপমানের স্মৃতি আছে কিন্তু সে সব যেন এক সময় মনোরম প্রাচীন গীতিকবিতার মতো হয়ে গিয়েছিল, একটা নৈর্ব্যক্তিক শিল্প সামগ্রী যেন, যার জন্ম হয়েছে অবশ্য সেই ট্রমার আক্ষেপেই।

এমন মনে হয়েছিল তার, কেননা জীবনে স্থিতি এসেছে, সমৃদ্ধি এসেছে। মনে হয়েছিল সেই অতীত তার তো কোনো স্থায়ী ক্ষতি শেষ পর্যন্ত করতে পারেনি।

এমন সময় একদিন জ্ঞাতি ভাই প্রদ্যুম্নের সঙ্গে দেখা হল।

'তুই দেবব্রত না?'

'প্রদ্যুম্ন! ওর কত দিন পরে!'

দুজনে একটা রেস্তোরাঁয় বসল। পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বছর আগে তারা একই বাড়িতে জন্মেছিল। প্রায় একই সময়েও জন্মেছিল তারা। দশ-এগারো বছর বয়স অবধি এক

সঙ্গেই বড় হয়েছে। তারপর দেশভাগ হয়েছে। তাদের সেই জন্মস্থান পড়ল পাকিস্তানে। দেবব্রত তার পরিজনদের সঙ্গে কলকাতায় চলে এল। প্রদ্যুম্ন আরো অন্তত বারো চোদ্দ বছরের জন্য থেকে গেল ও দেশে। তাদের বহু শরিক অধ্যুষিত বড় বাড়িটার আরো অনেকেই অবশ্য থেকে গিয়েছিল যাদের মধ্যে দেবব্রতর বাবা মা এবং ছোটো ভাই বোনেরাও ছিল।

প্রদ্যুম্নর সঙ্গে ফের দেখা সাক্ষাত শুরু হল ওই বারো চোদ্দ বছর পরে। অবশ্যই মাঝেমধ্যে। শেষে একটা সময় যোগাযোগ ক্ষীণই হয়ে গেল।

রেস্তোঁরার চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে প্রদ্যুম্ন বলল, 'বাড়ি যাবি?'

'কার বাড়ি? তোর!' দেবব্রত প্রসঙ্গটা ধরতে পারেনি প্রথমে। পরে বুঝল প্রদ্যুম্ন দেশের বাড়ির কথা বলছে। পূর্ববঙ্গের অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের গ্রামে ফেলে আসা বাড়িটাকে এত বছর পার করেও "বাড়ি" বলার মতো নসটালজিয়া দেবব্রতর অন্তত নেই।

'পাগল নাকি তুই? কী বলতে যাব?'

'দেখতে। দেখতে ইচ্ছা করে না তোর? সেই বাড়িটা যেখানে আমরা জন্মেছি! তুই ন-দশ বছর বয়স পর্যন্ত জীবন যাপন করেছিস! জীবনের প্রথম ন-দশ বছর যে কী ভীষণ বর্ণময় তা তো তুই তুই ভালো করেই জানিস!'

তা সে জানে। সেই সময়েইতো মা বাবা, ভাইবোন, চেনা পরিচিত জগৎ সব কিছু থেকে বঞ্চিত করে সময় তাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল কলকাতার দয়ামায়াহীন, কঠোর, প্রাণান্তকর একটা ব্যবস্থার মধ্যে। বড় কষ্ট হয়েছিল সে সময়। খাওয়া থাকার ব্যবস্থাও ঠিকমতো ছিল না। রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেওয়ারও তেমন অভিভাবক ছিল না। প্রতিপদে নিপীড়িত হওয়ার আতঙ্ক এবং যাদের উপরে অগত্যা দায় চেপেছিল, রেহাই পাবার জন্য তাদের নির্যাতনে ওই বয়সেই জীবনের উপরে বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। দেবব্রতের মনে আছে, গল্প কথার পাখি হয়ে উড়ে যাওয়ার মতো আগ্রহ তাকে দীর্ঘদিন এমন একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিল যে প্রায় পাঁচ বছর ধরে স্বপ্নে সে গঙ্গা পার হয়ে, রূপসা পার হয়ে, বিশখালি কিংবা মধুমতী পার হয়ে সেই স্থানে পৌছবার জন্য একটা আর্ত, ঝড়ে ডানা ভাঙা প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে, যেখানে সে আর কোনোদিনই পৌছাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত শরীরে বয়ঃসন্ধি বা যৌবনারম্ভ শুরু হওয়ার পর তার স্বপ্নের ডানায় নতুন এবং অপরিচিত রঙের পালক গলাতে শুরু করলে সে রেহাই পেয়েছিল।

প্রদ্যুম্ন সেই দেশে যাওয়ার কথা বলছে এত গুলো বছর পার হয়ে যাবার পর।

'কে আছে আর এখন সে বাড়িতে? বাড়িটা খাড়া আছে? কে থাকে সেখানে?' দেবব্রত বলল।

প্রদ্যুম্ন টের পেল দেবব্রত জেগে উঠছে। উঠতেই হবে। নিজের উপর তার অগাধ আত্মবিশ্বাস। ইতিমধ্যে গত দশবছরের মধ্যে সেই এক সময়ের বিশাল একান্নবর্তী, পরে পৃথগান্ন, তারও পরে ছন্নছাড়া পরিবারের অন্তত পনেরোজন স্ত্রী পুরুষকে তাদের জন্মভিটেতে নিয়ে গিয়ে স্মৃতিতর্পণ সে করিয়েছে। কখন যেন একাজটা অভ্যাসের মতো তার স্বভাবের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

'প্রতুলদার পরিবার এখনো ওখানে থাকে। তারা তো এদেশে কখনো আসেনি। আর আসবেও না।'

'ওই অতবড় বাড়িটাতে ওই একটা পরিবার!'

'না, আছে আরো দু একটা পরিবার। তার মধ্যে জগদীশদার বউ ছেলে মেয়ে, যোগেন কবিরজের ছেলে শশাঙ্ক এবং তার আরো এক আধজন তাই সপরিবারে।' জগদীশদাকে দেবব্রত চিনল। তারা পুরুষানুক্রমে তাদের বাড়িতে ভৃত্যের কাজ করত। কিন্তু যোগেন কবিরাজ নামটা স্মৃতিতে এখনো লেগে থাকলেও ঠিক শনাক্ত করতে পারল না দেবব্রত।

'তা হলে কথা পাকা?' প্রদ্যুম্ন একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল।

দেবব্রত চমকে উঠল। যদিওটের পেল যে প্রদ্যুম্ন কী যেন একটা সূক্ষ্ম তন্তুর মতো অদৃশ্য বস্তু তার স্নায়ুর ভিতর দিয়ে চালিয়ে দিয়েছে। বলল, 'পাগল নাকি! নাকি পাগলা কুকুরে কামড়েছে আমাকে? অন্য কথা বল। কোথায় থাকিস আজকাল? প্রায় দশ বছর পরে বোধহয় দেখা হল তোর সাথে, না?'

অন্য কথা হল। সবার খোঁজখবর নেওয়া হল। টেলিফোন নম্বর, ঠিকানা সব দেওয়া-নেওয়া হল। সব শেষে বিদায় নেওয়ার সময় প্রদ্যুম্ন বলল, 'কথাটা মনে রাখিস। আমার শালা দিব্যেন্দু ওর বড় মেয়ের বিয়ের বাজার করতে দিন সাতেকের মধ্যে কলকাতা আসছে। ওকে নিয়ে তোর বাসায় যাব একদিন।'

দেবব্রত বলল, 'খুব ভালো হবে। টেলিফোন করে আসিস।'

দেবব্রত নিজে এখনো কলকাতার বাসিন্দা নয়। গত তিরিশ বছর ধরে সে থাকে কলকাতা থেকে পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে দূরবর্তী জেলা কোচবিহারে। সেখানে সে স্কুলশিক্ষকতা করে। তার স্ত্রী বিনতাও স্কুল শিক্ষক ছিল। দু-জনের কেউই কোচবিহারের মানুষ নয়। তারা দুজনে দুই ভিন্ন কারণে কোচবিহারে এসে পড়েছিল। বিনতার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল একেবারেই আকস্মিক। দেবব্রত একসময় বিশেষ প্রয়োজনে তার কাছে আশ্রয় নিতে এসেছিল। তিরিশ বছরের মধ্যে আর ফিরে যাওয়ার কথা ভাবেনি সে। তিরিশ বছর পার করে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কথা যখন তারা ভাবল তখন তাতে যে বাস্তব কারণ অবশ্যই কিছু ছিল, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেসব যে অবহেলা করা যেত না, এমন নয়। তবুও বিনতা যখন হঠাৎ একদিন বলল যে

কলকাতা ফিরে যাবে, দেবব্রর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল সে যেন দেবব্রতর মনের কথাটাই বলল।

অথচ কোচবিহার শহরে তারা সংসার শুরু করেছিল। তাদের ছেলেমেয়ের জন্ম, বড় হয়ে ওঠাও এই শহরে। জমি কিনে বাড়িঘর করেছে তারা, গাছপালা লাগিয়েছে, সে সব গাছ বড় হয়েছে, আকাশও ছুয়েছে কেউ কেউ। অথচ বিনতা একদিন বলল, 'চল, কলকাতা ফিরে যাব।' দেবব্রত বলল, 'আমিও সে কথাই ভাবছি।'

ইতিমধ্যেই দেবব্রতর সঙ্গে আলোচনা করেই বিনতা শিক্ষকতা থেকে স্বেচ্ছা অবসর নিয়েছিল। তার শরীরে কিছু জটিল রোগ বাসা বেঁধেছিল। ডাক্তার তাকে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দেয়। পড়াশুনার কারণে ছেলেকে দীর্ঘদিন যাবৎ কলকাতা থাকতে হচ্ছে। উপরন্তু, তার যা বিষয় তাতে শিক্ষায়তন থেকেই বছর খানেকের মধ্যে তার চাকরি হয়ে যাবে এবং তারপক্ষে কোনোদিনই কোচবিহারে থাকা সম্ভব হবে না।

কিন্তু এসব কারণ খুব গৌণ। দেবব্রত এবং বিনতা দুজনেই বুঝতে পেরেছিল তিরিশটা বছর পার হলেও কোচবিহার সম্পর্কে কোনো মোহ বা বিশেষ আবেগ তাদের কারো মনেই দানা বাঁধেনি।

কেন এমন হয়? দেবব্রত আশ্চর্য হয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছিল কিন্তু কোনো উত্তর খুঁজে পায়নি।

প্রদ্যুম্নর সঙ্গে কথা হওয়ার দিন তিনেক বাদে দেবব্রত টের পেল যে রাত্রের ঘুম বিঘ্নিত হচ্ছে তার এবং শৈশবের বিক্ষুব্ধ স্বপ্নরা আবার ফিরে আসছে। কোচবিহার ছাড়ার সিদ্ধান্তের পরিণতিতে বিনতা চাকরি ছেড়ে ছেলেমেয়েসহ কলকাতার ফ্ল্যাটে এবং দেবব্রত অবসরের সময় পর্যন্ত কোচবিহার থাকার বন্দোবস্ত করেছিল। এর মধ্যে কোচবিহারের বাড়ি বিক্রির ব্যবস্থাটা একটা বড় কাজ। কোচবিহার ফিরে যাওয়ার আগের রাত্রে দেবব্রত স্বপ্ন দেখল, শীতের কুয়াশা মাখা ভোরে সে তার ঠাকুরদাদার ঘরের সামনে কুলগাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে তার ঠাকুরদাদা সাধু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। মূল বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে ফলফুলের বাগানসহ একটা কুটির বানিয়ে সেখানে থাকতেন তিনি। দেবব্রত দেখল সেই বাগানের ভিতরের কুলগাছের নীচে সে দাঁড়িয়ে আছে। মুখেচোখে কুয়াশার জলবিন্দু আটকে থাকা মাকড়সার জাল লেগে গেছে। হাত দিয়ে সেই জাল সরিয়ে সে দেখল ঠাকুরদাদার পুকুরের জলের উপর অন্তত তিন-চার হাত উঁচু কুয়াশার স্তর জমে আছে। মাঝপুকুরে পোড়া একটা বাঁশের খুঁটো তারও উপরেও অন্তত দু-হাত। বাঁশের খুঁটোর উপরে বসে আছে একটা নীল সবুজে মেশানো মাছরাঙা। মাছরাঙাটা হঠাৎ কুয়াশা ভেদ করে জলে ঝাঁপ দিল।

এই স্বপ্ন দেখার পর দেবব্রতের মনটা কেমন টনটন করে উঠল। পুব বাংলার সেই গ্রামটি যেখানে তার জন্ম হয়েছিল এবং জীবনের প্রাথমিক দশটি বছর কেটেছিল,

জীবনের পঞ্চান্ন বছরেরও অধিক সময় কেটে যাবার পরও কেন ভুলতে পারে না তাকে? কেন সেই গ্রাম, তার অনুষঙ্গ এখনো ইন্ধন পেলে ঘুরেফিরে আসে!

সকালে উঠে অনেক সময় সে বিষণ্ণ হয়ে বিছানায় বসে থাকল। বিনতা বলল, 'কী হল,? উঠছ না যে? যেতে হবে না?'

দেবব্রত বলল, 'ভাবছি।'

'ভাবছ কী গো? সোমবার ইসকুল খুলবে না?' বিনতা এ কথা বললেও মনে মনে খুব খুসিও হল। চাকরি ছেড়ে, কোচবিহারের সারাজীবনের ঘরসংসার ছেড়ে, তিলতিল করে তৈরি করা বাড়িঘর ফেলে সে ছেলেমেয়ে নিয়ে কলকাতায় চলে এল। দেবব্রতকে তো এখনো পাঁচ বছর ওখানে থাকতে হবে। একা থাকতে হবে। কীভাবে যে এত বছর থাকবে এভাবে! কাজেই যে কোনো অজুহাতে দেবব্রতর কোচবিহার যাওয়া বন্ধ হলে সে মনে মনে ভারী খুসিও হয়।

'শরীরটা ঠিক ভাললাগছে না। রোববারেই যাব বুঝলে?' দেবব্রত বলল।

চা, জলখাবার খেয়ে সে তিস্তা-তোরষা গাড়িটার টিকিট এবং সংরক্ষণ পালটাতে বেরিয়ে গেল। টিকিট ইত্যাদি পাল্টে সে প্রদ্যুম্নর বাড়িতে গিয়ে হাজির হল এবং ঘণ্টাখানেক পরে টেলিফোনে বিনতাকে জানালো যে এবেলা সে প্রদ্যুম্নর বাড়িতেই খাবে। রাত্রিবেলা বিছানায় বিনতার পাশে শুয়ে আরো একবার স্বপ্ন দেখার প্রস্তুতি নিয়ে সে গাঢ়স্বরে বলল, 'বুঝলে, যে যাই বলুক না কেন, চোদ্দপুরুষের একটা ব্যাপার আছে, জ্ঞাতিগোষ্ঠীর একটা বিশিষ্ট এবং রহস্যময় রক্তের সম্পর্ক থাকে। কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত, কবিরাজ, কুলগুরু, পুরোহিত, শিক্ষক, যাদের নিয়ে আমার পূর্বপুরুষ গ্রাম স্থাপন করেছিল, তারা কে কোথায় আছে, কেমন আছে, জানতে আমার কেন এমন ঐকান্তিক আগ্রহ হয়? বুঝলে, এর নামই বোধহয় শিকড়। উপড়ে তুলে আনতে গিয়ে অর্ধেকেই মাটির ভিতরে থেকে গেলে। ছেঁড়া শিকড় কত জায়গাতেই তো ফের রোপণ করবার চেষ্টা করলাম। হয়নি। নতুন করে আর মাটি আঁকড়ে ধরে নি সেই ছিন্ন মূল। চারিয়ে যায়নি নতুন শাখাতন্তুতে। না হলে, ভেবে দেখ, তিরিশটা বছর কোচবিহারে কী বিস্ময়, ছেড়ে এলাম প্রায় এক কথায় এবং কোনো কষ্টতো দূরের কথা কোনো অভাবও তো বোধ হচ্ছে না! তোমার হয়েছে?'

বিনতা বলল আরো অদ্ভুত কথা, বলল, 'ধুর! কোচবিহার আমার কোনোকালেই ভালো লাগেনি।'

শেষে দেবব্রত বলল, 'একবার যেতে হবে, বুঝলে, প্রদ্যুম্নর সঙ্গে সেসব নিয়েই সারা দিন আলোচনা করলাম।' সে যেন এতদিনে বুঝতে পেরেছে কোচবিহার ত্যাগের সিদ্ধান্তে তাদের কোনো অস্বস্তি কেন হল না।

অবশেষে পুজোর মাসখানেক বাদে প্রদ্যুম্নর সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ল। বাংলাদেশ

নয়, পূর্বপাকিস্তান নয়, অবিভক্ত ভারতবর্ষ নয়, সে সেই দেশ দেখতে গেল যেখানে তার নাড়িপোঁতা আছে, যেখানে তার পূর্বপুরুষেরা কয়েকশো বছর বসবাস করেছে।

ভোররাত থাকতে বেরিয়ে সকাল হওয়ার আগেই তারা পেটরাপোলে এসে হাজির হল। প্রদ্যুম্ন অনেকবার যাতায়াত করে খুবই অভিজ্ঞ। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এর খোঁজ, ওর নামধাম জিজ্ঞেস করা, ফেরার পথে ভি আই পি লাগেজটা দিয়ে যাবে এমন অঙ্গীকার, অথবা গায়ের শালখানা ফেরত পথে তো দেওয়াই যেতে পারে কিংবা, 'এনামুল সাহেব কোথায়? আরে খুলনার এনামুল হক', এ রকম নানা ধরণের চালবাজি করতে করতে প্রায় দুঘণ্টা পার করে তার কাস্টমস চেকিং থেকে ছাড়া পেল।

সেখান থেকে বাসে উঠে যশোর শহর। যশোর থেকে মিনিবাসের মতো আকৃতির গাড়ি, যার নাম কোস্টার, চেপে রূপসা নদীর পাড়ে। দেখার মতো নদী। বিশাল আকারের বার্জে উঠে নদী পার হল তারা।

সেখান থেকে ফের কোস্টারে। শীতের বেলা শিগগিরি শেষ হয়ে এল। দু-পাশের জলা জায়গার মাঝখান দিয়ে উঁচু এবং বেশ প্রশস্ত রাস্তা। মাঝেমধ্যে গ্রাম, বিষণ্ণ এবং ছায়াছন্ন।

কোস্টার অনেক সময় ধরে চলার পর এসে থামল আরেকটি বড় নদীর পাড়ে। নদীর নাম মধুমতী। খুব তাড়াহুড়ো করে খেয়া নৌকায় নদী পার হয়ে এপাড়ে এসে তারা অটোতে উঠল। বেশ বড় আকারের অটো, তাতে অন্তত দশজন লোক তো ধরেই।

বেলার আলো আরো কমে আসছিল। অত্যন্ত বাজে রাস্তা ধরে অটো ছুটল। ঘণ্টাখানেক চলবার পর গাড়ি সেখানে এসে থামল, সে জায়গাটার নাম পিরোজপুর।

সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে এসেছে। প্রদ্যুম্ন খেয়াঘাটে খোঁজ নিয়ে জানল তাদের গন্তব্য ঝালকাঠি যাবার শেষ ভুটভুটি ছেড়ে চলে গেছে।

অভিজ্ঞ প্রদ্যুম্ন একান্তে স্বগতোক্তির মতো বলল, 'রাত্রে এ জায়গায় থাকা খুবই বিপজ্জনক। অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

শেষ ভুটভুটি ফেল করা আরো কয়েক জন লোক বিক্ষিপ্তভাবে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছিল। তাদের মধ্যে ছিল পাঁচ-সাত জনের একটি দল ছিল যারা বয়সে সবাই যুবক। তাদেরই একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'প্রাইভেটে একটা ভুটভুটি ভাড়া করলে যাবেন নাকি?' প্রদ্যুম্ন বলল, 'বিলক্ষণ।'

উদ্যোগী ছেলেটি বলল, 'ভাড়া কিন্তু একটু বেশি লাগবে, মুরুব্বি।'

প্রদ্যুম্ন বলল, 'সেতো লাগবেই।'

অল্প সময়ের মধ্যেই সব ব্যবস্থা হল। বিশ-বাইশ জন মানুষ বিশাল একটি নদীর

ভিতর দিয়ে যেন নিরুদ্দেশে যাচ্ছে। নৌকা যাচ্ছিল জোয়ারের দিকে। নদীর বিস্তার সে দিকে যেন সীমাহীন। এই অন্ধকার নদীপথে তিনঘণ্টার যাত্রা দেবব্রতর কাছে টাইমমেশিনের ভিতর দিয়ে অতীতের দিকে যাত্রার মতো মনে হল। নদীর বিশাল বিস্তৃতি জুড়ে অন্ধকার। সেই অন্ধকারকে আরো ঘন করে মাইল-মাইল দীর্ঘ বড় আকৃতির কচুরিপানার ঝাঁক আসছে একের পর এক। নৌকাতে একটি মাত্র কালিপড়া লণ্ঠন। বিস্তৃত আকাশ আর দিগন্ত-ছোঁয়া নদী ছাড়া মাঝেমধ্যে দু-একখানা লঞ্চ বা জাহাজের দ্রুত অপস্রিয়মান আলো।

প্রায় সাড়ে দিন ঘণ্টা লাগল তাদের গন্তব্যে পৌঁছতে। এ-নৌকো ও লনচের পাশ ঠেলে তাদের ভুটভুটি জেটিতে এসে লাগল। পয়তাল্লিশ বছর আগে দেবব্রত এক সন্ধ্যায় এই বন্দর ছেড়ে স্টিমারে উঠেছিল নানা দুর্যোগ, নানা আশঙ্কা এবং ভীতি মাথার মধ্যে নিয়ে। বন্দরের মাটিতে পা-রাখার সঙ্গে সঙ্গে এই পঁয়তাল্লিশটা বছর যেন জীবন থেকে আচমকা উবে গেল। কেমন বিহ্বল এবং ভয় লাগতে লাগল দেবব্রতর।

সে রাতটা প্রদ্যুম্নর ভায়রার বাড়িতে অতিথি হয়ে থাকল তারা। পরদিন সকলে উঠে সাইকেল রিকসায় করে তারা প্রদ্যুম্নর শ্বশুর বাড়ির গ্রামে গেল। রিকশার প্রাণান্তকর রাস্তা শেষ হল কীর্তিপাশা গ্রামে ঢোকার মুখে বাঁশ ও কাঠের তৈরি একটি সেতুর সামনে। রিকসা থেকে নেমে দেবব্রত আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। শৈশবে অন্তত দু-দুবার সে এই সেতু পার হয়েছিল। দু বারের স্মৃতিই তার এখনো পরিষ্কার। প্রথমবারে বাবার হাত ধরে কীর্তিপাশার বাজারে আর দ্বিতীয় বার খোঁয়াড়ে ধরা পড়া বাঘ দেখতে সে আর তার উপরের ভাই কীর্তিপাশার জমিদার বাড়ির উঠানে এসেছিল। সেই পরাক্রান্ত ক্রুদ্ধ চিতাবাঘটির আস্ফালন তার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে উল। সেই সময়ে তার বয়স হবে সাত-আট বছর।

প্রদ্যুম্নর শাশুড়ি, দুই শ্যালক এবং এক শালাবউ গ্রামের বাড়িতে থাকে। তাদের আপ্যায়ন এবং প্রদ্যুম্নর বন্ধুবান্ধবদের অনবরত আসা যাওয়ার মধ্যে দেবব্রত ক্রমশ বিষণ্ণ এবং অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। তার মনের ভিতরে সেই চোদ্দপুরুষের শিকড় যেন নড়েচড়ে উঠল। এক ফাঁকে প্রদ্যুম্নকে সে জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ি যাবি না?'

'বাড়ি' অর্থাৎ সেই পিতৃপুরুষের ভদ্রাসন!

প্রদ্যুম্ন বলল, 'দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর যাব। আমাদের বাড়ির সামনের খাল প্রায় মজে গেছে, জোয়ার এলে ছোটো ডিঙিনৌকা কোনোমতে ঢুকতে পারে।'

শুনে দেবব্রতর খুব তাজ্জব লাগল। অতবড় খাল মজে এই অবস্থা!

দুপুরের পর জোয়ার আসল খালে। কীর্তিপাশার খাল ধরে খানিকটা এগিয়ে দেবব্রতদের গ্রামের খালের মুখে ঢুকল নৌকা। শৈশবে ভরাভর্তি ছিল এই খাল।

জোয়ারের সময় স্টিমলঞ্চ পর্যন্ত ঢুকতো, বাজনা বাজিয়ে বড় গয়নার নৌকা যেত। এখন ছোটো ডিঙি কোনোমতে ঢোকে, তাও জোয়ারের সময়!

তিন-চার কিলোমিটার খালপথ পার হয়ে দেবব্রত খানিকটা দূর থেকে নিজের বাড়ির ঘাট দেখল। ঘাটে নেমে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল তারা বাড়িটার দিকে। এই খালপাড় থেকে মূল বাড়িটা দেখতে পাওয়ার কথা নয়। সেই শৈশবে এখান থেকে দৃষ্টি প্রথমে আটকাতো মাঝখানের দুখানা বড় বড় বৈঠকখানা ঘরে, তারপরে একখানা দুর্গা এবং একখানা মনসা মণ্ডপ সহ দুখানা টিনের চালার ঘরে। তার কাছাকাছি একদিকে ঠাকুরদাদার বাগানসহ কুটির। পূর্বপুরুষ, পূর্বরমনীদের চিতার উপরে তোলা পাশাপাশি তিনখানা সমাধিমঠ।

সে সবের একটারও অস্তিত্ব নেই। গাছপালা কেটে সব পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। খালপাড় থেকে মূলবাড়ি পর্যন্ত পুরোটাই ধানখেত। মাঝখানে লতাগুল্মে জড়ানো অবশিষ্ট একমাত্র সমাধিমঠটিকে দূর থেকে দেবব্রতর মনে হয়েছিল একটা ঝাপড়া গাছ।

বাড়িটা তাদের শৈশবেই যথেষ্ট জীর্ণ ছিল, এখন তার শেষ অবস্থা। হিসাবমতো একশো পনেরো বছর পার করেছে এই বাড়ি। দেবব্রত, প্রদ্যুম্নর ছোটো বেলাতে বাড়িটা যেন অনেক বড় ছিল! গ্রামের আশপাশের গ্রামের সব মানুষ বাড়িটাকে 'বড়বাড়ি' বলত।

উঠান থেকে প্রশস্ত বেশ কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠতে হয়। দেবব্রতর মনে হচ্ছিল সে যেন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারছে না। কেউ যেন ভিতর থেকে সতর্ক করছে তাকে। যেন নিষেধ করছে, উঠোনা! যেওনা ভিতরে! সে ভারী আশ্চর্য হল।

প্রদ্যুম্ন ততক্ষণে বারান্দায়। বলল, 'আয়!'

বারান্দায় রুগ্ন, জীর্ণ চেহারার বিভিন্ন বয়সী অনেকগুলো ছেলেমেয়ে এবং সম্ভবত তাদের মা, এক বৃদ্ধা।

'রাঙাবৌদি, প্রতুলদার স্ত্রী। মনে আছে তোর?' প্রদ্যুম্ন পরিচয় করিয়ে দিল।

হ্যাঁ, মনে আছে দেবব্রতর। তাদের ছোটোবেলাতেই প্রতুলদা বিয়ে করে সংসারী হয়েছিল প্রতুলদা, তাদের শরিক এবং জ্ঞাতি ভাই। তার অন্যান্য ভাইদের মতো কলকাতায় যায়নি সে।

আরো কয়েকজন মানুষ অন্তত জনা পনেরো হবে স্ত্রীপুরুষ এবং বালক-বালিকা মিলে নির্বাক এবং বিস্ময় নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রত্যেকটি চেহারাতেই হতাশা, রোগ এবং দারিদ্র প্রকট। তারা সে সব জামাকাপড় পরে আছে তাতেই বোঝা যায় তাদের দারিদ্র্য এবং অসহায়তা কোন পর্যায়ের।

ভারী পা ফেলে সিঁড়ি ভেঙে একতলার বারান্দায় এসে দাঁড়াল দেবব্রত। সব

কিছু বিবর্ণ, অলীক এবং অর্থহীন লাগছে তার। এমনকি এত উদ্যোগ করে তার এখানে আসাও। তার পা ফেলা, এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত, থমকে দাঁড়ানো, সামনে এগিয়ে চলা এবং বৃদ্ধার দন্তহীন মুখের ধারাবিরণী সবই অর্থহীন। বহু পুরানো, হাত দিয়ে ধরলে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে এমন দলিলের মতো মনে হতে লাগল দেবব্রতর এবং একই সঙ্গে খুব হতাশার কেননা দলিলটা সারা জীবন ধরে তার কাছে ভীষণ মূল্যবান ছিল।

'তোমারে দ্যাখলাম কত বছর না পরে।'

বাক্যের মধ্যে কত কিছু আছে। এই স্ত্রীলোকটি দেবব্রত কিংবা প্রদ্যুম্নর থেকে বয়সে সামান্য কিছু বড় ছিল সেই সময়। সুন্দরী ছিল। তাদের যখন নয়, দশ, এর তখন পনেরো, কি ষোলো। স্পষ্ট মনে আছে, ঘোমটা তুলে ধরলে নতুন বউটি চোখ বন্ধ করে থাকত। আরো মনে আছে, কয়েক দিনের মধ্যেই সে তাদের লুডো খেলার সঙ্গী।

'চলো, উপরে চলো। তোমার দাদা তো খুব অসুস্থ।'

দেবব্রতর পা ভাঙাচোরা মেঝেতে আটকে আটকে যাচ্ছিল। প্রদ্যুম্ন স্বাভাবিক পুরোপুরি না হলেও দীর্ঘদিন আসা যাওয়ার কারণে অভ্যস্ত।

'এই ঘরখান তোমার বাবা-মার আছিল, দেবু। মনে আছে?'

বাইরের দিক থেকে এখনো পরিষ্কার বোঝা যায় দেয়ালের শাদা পলেস্তারার উপরে 'ধোপাকে ৪ খানা শাড়ি ও ২ খানা ধুতি দেওয়া হইল, ১৪ই আশ্বিন, ১৩৫২' মায়ের হাতের স্পষ্ট লেখা। আশেপাশে আরো তারিখ, আরো সাংসারিক লেনদেনের ছোটোখাটো হিসাব।

বৃদ্ধা চাবি দিয়ে দরজার তালাটা খুলে দিল। 'ভিতরে যাবা না?'

অন্ধকার, মাকড়সার জাল, স্যাঁতসেতে ঘরে দীর্ঘদিনের জমে থাকা চিমসে গন্ধ।

ভিতরে যেও না, দেবব্রত, খবরদার ভিতরে যাস না!

কেউ যেন তাকে আবার সাবধান করল।

আর একটা দরজা খুলল কেউ।

'এবারেও দুর্গাপুজা সারছি কোনোমতে।'

অন্ধকার ঘরে ফসিলের মতো দুর্গা সপরিবারে। তাদের শৈশবের মণ্ডপের প্রতিমার গঠনের অনুরূপ হলেও আকৃতিতে অনেক ছোটো, পুতুলের মতো।

'এই ঘরে তোমরা পিসিমার খাটে রাত্রে শুইতা, মনে আছে?'

মনে আছে দেবব্রতর। বড় ঘরখানার দেয়ালে অনেকগুলো ছবি এবং ফটো টাঙানো ছিল। তার মধ্যে বাড়ির মৃত স্বজনদের ছাড়াও ঠাকুর দেবতা ও সাধু সন্ন্যাসীর ছবিও ছিল। এক দিকে ঘরের অর্ধেকটা জুড়ে একখানা সুদৃশ্য পালঙ্কের উপর

পিসিমার ঠাকুরের আসনে অসংখ্য ফটো, শালগ্রাম শিলার অনুরূপ প্রস্তরখণ্ড, কোশাকুশি, শঙ্খ, ঘণ্টা, খড়্গ এবং রামদা, আরো অজস্র হিন্দুর ধর্মীয় আয়োজন। অন্যপাশে জোড়া দেওয়া তক্তপোষে পিসিমার তত্ত্বাবধানে বালকবালিকা এবং মায়েদের কোল পরের ভাই কিংবা বোনের জন্য ছেড়ে দিয়ে আশা শিশুদের শয্যা। পরের ভাই দেবব্রতকে এক বছর বয়সেই মায়ের কোল থেকে উৎখাত করেছিল। এই ঘরে সেই হিসাবে সে আটবছরেরও বেশি সময় পিসিমার কাছে শুয়েছে। অসংখ্য কথা, গল্প, পূর্বপুরুষ, পূর্বরমনীদের কথা, ধর্ম এবং অধর্মের কথা, পুরাণ কথা সে শুনেছে এই ঘরের ঘাটে শুয়ে।

'ঘরে ঢোকপা একবার?'

'না! না!' দেবব্রত এবার যেন আর্তনাদই করে উঠল এবং প্রতিক্রিয়ায় নিজেও চমকে উঠল।

'তয় উপরে চল, তোমাগো দাদায় উপরে শুইয়া আছে।'

ভাঙা ইঁটের সিঁড়ি, বেশির ভাগ জায়গাই ক্ষয়ে নোনা ধরে বিপজ্জনক। বৃদ্ধার পিছন পিছন তারা দোতলায় উঠল। দোতলার চওড়া দীর্ঘ বারান্দার সঙ্গে তিনজোড়া ঘর। তার মাঝের অংশের দরজা খোলা।

বৃদ্ধা সেই দরজার ভিতরে ঢুকে বলল, 'আসো।'

দেবব্রতর মাথার ভিতর থেকে ফের তাকে কেউ সতর্ক করল।

'শুনছো, কইলকাতা থিকা তোমার ভাইরা আইছে। আসো, দেবু ভিতরে আসো।'

বৃদ্ধা আরো ভিতরে ঢুকে গিয়ে দেবব্রতকে অনেকটা জায়গা করে দিল।

ভিতরের নিষেধকে সে আর আমল দিতে পারল না। চেষ্টা করে, শক্ত হয়ে থাকা পা টেনে ভিতরে ঢুকল দেবব্রত।

নোংরা বালিশ এবং বিছানার মধ্যে জবুথবু হয়ে এক বৃদ্ধ বসে হাঁফাচ্ছে। হাঁফানিও নয়, যেন গোঙাচ্ছে সে। হাঁফরের মতো ওঠানামা করছে তার দেহ। সম্ভবত, তার দেহে কোনো ভয়ংকর মারণ রোগ আছে। শারীরিক লক্ষণে তার মৃত্যু আসন্ন। দেবব্রতর মনে হল, সে শুয়ে থাকতে পারছে না শারীরিক অসাচ্ছন্দ্যের কারণেই।

'কী অসুখ প্রতুলদার?' সে চেষ্টা করে একটা প্রাসঙ্গিক কথা বলল।

'রক্তবাহ্য রক্তবমি, হাঁফ—'

'ডাক্তার?'

'আর ডাক্তার! শুনছো ওরা আইছে। কইলকাতা থিকা তোমার ভাইরা আইছে।'

বৃদ্ধ একটা বিকৃত ঘর বের করল তার মুখ থেকে।

'কী? কী? ভাবর দিমু? বেডপ্যান?'

দেবব্রতর আর সহ্য হল না। পিছন ফিরে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এল সে। তার মনে হচ্ছিল এই মুহূর্তেই ওই বৃদ্ধ মারা যাবে। সে যেন কেমন করে তাকাল তাদের দিকে! কেমন একটা শব্দ করল!

সে প্রদ্যুম্নকে বলল, 'চল, চল!'

'থাকবানা দুটা দিন? আহা এতদিন পারে আইছ!' সিঁড়ির মুখে এসে বৃদ্ধা তাদের ধরে ফেলল।

দেবব্রত প্রদ্যুম্নর হাতের উপরে একটা চাপ দিল। ভিতর থেকে তার নির্দেশক তাড়া দিচ্ছিল। বলল, শিগগির বেরিয়ে পড়! কোথাও কোনো চক্রান্ত হচ্ছে। তোমাকে আটকে ফেলতে চায়। শিকড় একবার ছিঁড়ে গেলে সে শিকড় নতুন মাটিতে যেমন আকর্ষ ছড়ায় না, তেমনি পুরানো শিকড়ের সঙ্গেও জোড় লাগে না! মূর্খ তুমি! কেন এখানে এসেছ?

কিন্তু সিঁড়ি যেখানে মোড় নিয়েছে সেখানে এসে ফের থমকে দাঁড়াল দেবব্রত। বাঁ-হাতে যেখানে গরাদ দেওয়া জানালা ছিল সে জায়গাটা এখন একেবারেই উন্মুক্ত। সেই ফাঁকা দিয়ে বাড়ির পিছনের দিকটা প্রায় সম্পূর্ণই দেখা যায়।

প্রথমেই তার যা চোখে পড়ল, তা হল একটা পশুর করোটি। অতি বৃহৎ করোটি দেখামাত্র বিহ্বল দেবব্রত। একটা হাতির করোটি। মরা হাতি লাখ টাকা কথাটা সেই শৈশবের বিস্ময় নিয়ে এখন আবার নতুন করে মনে এল তার। সে বৈঠকখানা ঘরখানা এখন নেই সেখানে অন্তত পঞ্চাশটি বুনো মোষ, একশোটি হরিণ এবং একটি হাতির করোটি সাজানো ছিল। মোষ এবং হরিণের মাথাগুলো বাহারি সিংসহ বড় ঘরটার চারপাশের দেয়াল জুড়ে সাজানো। শূন্যে বিশাল একটা বা একাধিক ময়ালের চামড়া একধার থেকে অন্যধার পর্যন্ত কাগজের শিকলির সজ্জায় টাঙানো ছিল আরো অনেক টুকিটাকি যা সুন্দরবনে জমি হাসিল করার পারিবারিক স্মৃতি। হাতিটি জঙ্গলে যাতায়াতের জন্য ব্যবহার হত। একটা কাঠের টেবিলের উপর যাবতীয় হাড়সহ মুণ্ডটি সাজিয়ে রাখা ছিল।

'মরা হাতি লাখটাকার' মুণ্ডটি আঁস্তাকুড়েতে অবহেলায় পড়ে আছে। সেদিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে দেবব্রত প্রদ্যুম্নের হাত ধরে নির্লজ্জের মতো টান দিল।

'চল চল!' যেন পিছন থেকে কেউ তাকে ধাক্কা দিচ্ছে। ধাক্কা দিয়ে বলছে, বেরোও এখান থেকে শিগগিরি, বেরোও। শৈশবের লুডো খেলার সঙ্গী সেই কিশোরী, বর্তমানের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোলচর্মা, দাঁতহীন, বয়সের থেকে অনেক বেশি বুড়িয়ে যাওয়া সেই বৃদ্ধা বলল, 'থাকপা না একটা দিনও?'

দেবব্রত তার চোখের থেকে নিজের চোখ সরিয়ে নিল। প্রদ্যুম্ন বলল, 'থাকার উপায় নাই, বৌদি। সবইতো জান। আমরা যে বারবার এখানে আসছি, তাতে অনেকেই অনেক কিছু সন্দেহ করছে। রাত্রে থাকতে সাহস করি না।'

একটা ঘোরের মধ্যে আরো একটা দিন এবং দুটো রাত প্রদ্যুম্নর শ্বশুর বাড়িতে কাটল দিবাকরের। ভালো করে খেতে, ঘুমোতে পারছিল না সে। সমস্ত ইন্দ্রিয় জুড়ে কেমন একটা অস্থির তাড়া। দুদিন পরে ঝালকাঠি থেকে জাহাজে উঠল তারা ঢাকা যাওয়ার জন্য। শীতের বেলা শেষ হয়ে আসছে। ম্লান সূর্য নারকেল গাছের মাথায় দিনশেষের আলো ছড়িয়ে রেখেছে। নদীর ওপারের ঝোপজঙ্গলের আড়াল এক ঝাঁক কোড়াল ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঘন্টি বাজল এবং বিশাল জলমাটির প্রপেলার সমস্ত দেহকে কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠল। প্রপেলার গর্জন করে উঠতেই জাহাজের বাইরে নদীতে ভাসমান পাওরুটি, ডাব, পরোটা বিক্রেতাদের ডিঙ্গি নৌকাগুলো দ্রুত বৈঠা চালিয়ে দূরে সরে গেল। ঠিক যেমনটি হয়েছিল পঁয়তাল্লিশ বছর আগে। সেই পঁয়তাল্লিশ বছর আগে এই মুহূর্তটিতেই প্রথম বুকের ভিতরে তীব্র যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে উঠেছিল। তার আগে পর্যন্ত সমস্ত পরিবারের মধ্যে একটা গোপন চক্রান্তের আবহাওয়ায় তারা টেরই পায়নি তাদের জীবনে কী হতে যাচ্ছে।

জাহাজ ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে দিবাকরের বুকের মধ্যে পুনরায় হু হু করে উঠল। চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই বাড়িটি, ছোটোবেলায় ঠিক যেমনটি দেখেছিল। তীব্র হাহাকার নিয়ে ভিতরের অবরুদ্ধ বাতাস বাইরে বেরিয়ে এল। বন্দর নদীর বাঁকে অদৃশ্য হতে পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে অবরুদ্ধ থাকা হাহাকার দেবব্রতর অন্তরাত্মাকে আবার আশ্রয় করল।

ক্রোড়পত্র : ১

সিনেমা

'পথের পাঁচালী'

পঞ্চাশ বছর

উন্নয়ন পথের পাঁচালি
সৌরীন ভট্টাচার্য/২১৩

'পথের পাঁচালী'র পঞ্চাশ বছর
সুনীত সেনগুপ্ত/২২৮

'পথের পাঁচালী' সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রে
মানসকুমার কুণ্ডু/১৩৬

প্রসঙ্গ : 'পথের পাঁচালী'র ৫০ বছর
নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায়/২৪২

দুর্গার প্রত্নপ্রতিমা
প্রবীর বসু/২৪৬

আলোকিত পঞ্চাশ, বিস্মৃত পঁচাত্তর
সোমেশ্বর ভৌমিক/২৫২

উন্নয়ন পথের পাঁচালি

সৌরীন ভট্টাচার্য

গল্প-উপন্যাস, নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদি নিয়ে কথা বলতে গেলেই যে ভালো-মন্দের রায় দিতে হবে কিংবা তাদের শৈল্পিক গুণাগুণ নিয়ে বিচার করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। সাহিত্য শিল্পের ওইসব প্রকরণে আমাদের আরো অন্য ধরনের গরজ থাকতে পারে। রামায়ণ-মহাভারতের ভালো-মন্দ বা শিল্পকুশলতা নিয়ে কি আমরা সত্যিই তেমন করে মাথা ঘামাই! অথচ এ জাতীয় ক্ল্যাসিক সৃষ্টি নিয়ে আমাদের কত কথাই বলার থাকে। শুধু এ ধরনের প্রাচীন মহাগ্রন্থই বা কেন, অনেক অর্বাচীন কালের সৃষ্টি নিয়েও আমরা যখন কথা বলি তখন কেবলমাত্র তাদের ভালো-মন্দ, শিল্প-সুষমা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকি না। এ সবের মধ্যে আমরা ইতিহাসের তথা সমাজবিন্যাসের উপাদান তো খুঁজেই থাকি। সত্যি কথা বলতে কী, অনেক প্রসঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে ভালো-মন্দ বিচারের তেমন কোনো মানে নেই। শিল্পকর্ম গ্রহণের দিক থেকে ভাবতে গেলে দেখব যে আমাদের মতো স্তর বিন্যস্ত সমাজের স্তরে স্তরে গ্রহণচিহ্নের এত নানা লক্ষণ বর্তমান যে সাধারণ কোনো একটা মানে পৌছতে গেলে জোরজার খাটাতেই হবে। একজনের গ্রহণকে আর একজনের গ্রহণ থেকে খাটো করে দেখতে হবে। সামাজিক অবস্থান, শিক্ষাদীক্ষা, রুচি ও মননের ভিন্নতা মেনে নিলে এই জোর খাটানো মনে হতে পারে অহেতুক, অন্তত তার পিছনে নৈতিক সমর্থন জোগাড় করা বেশ মুশকিল। তাই ভালো-মন্দের ফতোয়া জারির চেষ্টায় খুব বেশি উশুল হবার সম্ভাবনা নেই। তা বলে শিল্পসৃষ্টির কলকব্জা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই তা কেউ বলবেন না। এমনকী সেসবের খুঁটিনাটি বিচারের পরে বাহুবলে কোন শিল্পী কত বলীয়ান তার বিচারও যথেষ্ট জরুরি। তাতার দস্যুর মতো কোন শিল্পীর কব্জি কত শক্তিধর তা আমরা নিশ্চয়ই জানতে চাইব। কিন্তু সমাজ-সংস্কৃতির অক্ষাংশে দ্রাঘিমাংশে স্থাপন করে শিল্পকর্ম বিষয়ে আরো কিছু কথা বলার থাকে।

ইতিহাসের উপাদান যে পাওয়া যেতে পারে সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এই কথার খেই ধরে আমরা আর একটু সরে যেতে পারি। গল্প উপন্যাস চলচ্চিত্র মহাকাব্য ইত্যাদির মধ্যে প্রায়ই একটা কাহিনী তো থাকেই। সেই কাহিনীর শরীর থেকে আমরা খুঁটে খুঁটে ইতিহাসের নানা উপাদান তুলে নিতে পারি। তখনকার সমাজে বর্ণপ্রথা প্রচলিত ছিল কিনা, সমাজে মেয়েদের স্বাধীনতা কতদূর

বিস্তৃত ছিল, বিধবাবিবাহের চল ছিল কিনা, কিংবা দেশ কোনো বিদেশি শক্তির অধীন ছিল কিনা, এসব খবর তো আমরা পেয়ে যেতেই পারি। এইসব প্রত্যক্ষ লক্ষণগুলো ছাড়িয়েও আরো একটু যাওয়া সম্ভব। সমাজ-সংস্কৃতি অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি ও চারপাশের চালচলনের এক নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠে এক একটা শিল্পকর্ম। গিরিগুহার অভ্যন্তরে যে-শিল্পী একদিন মূর্তি খোদাই করেছিলেন আর আধুনিক স্টুডিয়োতে যে-পরিচালক তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন তাঁরা ভিন্ন পরিমণ্ডলের শরিক এই শরিকানার শর্তও ভিন্ন ভিন্ন। এই ভিন্নতা তাঁদের সৃষ্টিকর্মে টের পাওয়া যায়, সেখান থেকে এই ভিন্নতা খুঁজে নিতে হয়। ঠিকমতো খুঁজে নিতে পারলে আমরা লাভবান হই, কারণ তখন ওই শিল্পকর্মটিকে আমরা ছুঁতে পারি তার গোটা পরিমণ্ডল সমেত। আমাদের নন্দনে এক নতুন মাত্রা যোগ হয় তাতে।

দুই কালের দুই পরিমণ্ডলের শিল্পকর্মের কথাটা যেভাবে বলা হলো তাতে মনে হতে পারে যে হিসেবগুলো খুব সোজাসাপ্টাভাবে পাওয়া সম্ভব। এক কাল ও তার পরিমণ্ডল সেই কালের শিল্পকর্মের মধ্যে যেন একটা নির্দিষ্টরকমভাবেই তার ছায়া ফেলে। কাল ও কালের ছায়াপাত এত সোজা সরল রাস্তায় ঘটে না। কারণ শিল্পকর্ম যিনি সৃষ্টি করেন তাঁর মাথায় যে কী আছে তা কে জানে। কালের মূর্তি যে শিল্পকর্মের গায়ে উৎকীর্ণ হয়ে থাকে সেটা অনেক সময়েই শিল্পীর সচেতন চেষ্টার ফল নাও হতে পারে। এখানেই উঠে পড়ে আখ্যানের ভূমিকার কথা। এক অর্থে আমাদের সব কাজ, সব কথাই বিচ্ছিন্ন, টুকরো টুকরো তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব যেন। কিন্তু ওইসব টুকরো কোনো একটা সম্পর্কের টানে না বাঁধতে পারলে তো ছবি তৈরি হয় না, গল্প বলা যায় না, মূর্তি গড়ে ওঠে না। সম্পর্কের টানে এই বুনোট তৈরি করাটা আখ্যানের কাজ। একই রকম উপাদানে যে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যান বানানো সম্ভব তার রহস্যও এখানে নিহিত। সম্পর্কের টানে বদল ঘটলে আখ্যানেও বদল এসে যাবে। এই আখ্যানেরও আছে দুটো স্তর—রচনার বা রচয়িতার আখ্যান এবং গ্রহণের বা গ্রহীতার আখ্যান। রচয়িতা হয়তো পরিষ্কার জানেনও না কোন আখ্যান কখন কীভাবে তিনি রচনা করে চলেছেন। তিনি তো গল্পই বলছেন, ছবিই আঁকছেন, মূর্তিই বানাচ্ছেন কিংবা চলচ্চিত্রই নির্মাণ করছেন। কিন্তু তাঁর উপাদানগুলোকে তাঁকে সাজাতেই হচ্ছে আর সেখানেই জেগে উঠছে এক আখ্যান। এই আখ্যান রচনায় তাঁর রুচি ঝোঁক কাজ করে। সে সবের মধ্যে দিয়ে তো বটেই, অন্যান্য সুবাদেও কালচিহ্ন ঢুকে পড়ে তাঁর আখ্যানে। আর ওই যে গ্রহণের স্তর, সেখানেও গ্রহণকালে আমরা আমাদের আখ্যান বানিয়ে চলেছি। রচয়িতার আখ্যানে আর গ্রহীতার আখ্যানে যে সব সময় মিল হবে তারও কোনো কথা নেই। সেখানেও থাকে কালের ফারাক, এক কালে বসে আর এক কালের সৃষ্টির মুখোমুখি আমাদের হতেই হয়। আর একই কালে

হলেই বা কী, কালের শরিকানার শর্ত তো ভিন্ন হতেই পারে। আধুনিক কালের জন্য কথাটা আরো বেশি করে প্রযোজ্য। গোষ্ঠী জীবনের শাসন যখন তেমন করে শিথিল হয়নি, তখন ওই শরিকানার শর্তে অনেকটা সমতা নিশ্চয়ই প্রত্যাশিত। কিন্তু ব্যক্তির স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে ওই সমতায় চিড় খায়, কালের শরিকানার শর্তে বৈচিত্র্য দেখা দেয়। সেই আধুনিক দিনে সমতা ফেরাতে গেলে বাইরের দাপট লাগে, ফতোয়ার জোর খাটাতে হয়। তাই গ্রহণের বেলাতে গ্রহীতা তাঁর নিজের মতন একটা আখ্যান সাজিয়ে তোলেন। কালের ছায়াপাত থাকে, সেসব সুদ্ধই আখ্যানের জোড়গুলো একরকমভাবে তৈরি হয়ে ওঠে।

তাহলে দুটো খোলা জায়গা পাওয়া যাচ্ছে। রচয়িতার ভূমিকায় উপাদানগুলো যেভাবে বুনে তোলা হচ্ছে, যার মধ্য দিয়ে আখ্যান সূচিত হয়, সেখানে একটা খোলা জায়গা রয়েছে। সচেতন, অর্ধসচেতন, এমনকী হয়তো অসচেতনভাবেও রচয়িতা তাঁর আখ্যান-বুনোটের মাঝে কিছু কথা বলে ফেলেন। কিন্তু কী বলেন তিনি? আর কীভাবেই বা সে বলাতে পৌঁছব আমরা? গ্রহীতার খোলা জায়গাটা এখানেই জরুরি হয়ে ওঠে। রচনার কাছে, রচয়িতার কাছে গ্রহীতাকেও পৌঁছতে হচ্ছে আখ্যান মাধ্যমে। রচয়িতার উপাদানসমূহ তাঁরও হাতের উপাদান, তাদের উপরে ভর রেখেই গড়ে উঠবে তাঁর আখ্যান। কিন্তু আখ্যান সাজাতে গিয়ে তিনি আর রচয়িতার শর্তে আবদ্ধ থাকেন না, অন্তত থাকতে বাধ্য নন। এটাই তাঁর খোলা আকাশের অবকাশ। এই অবকাশ আছে বলেই সাবধান থাকতে হয়, যা খুশি করা চলে না। রচনাকর্মটির উপর আমরা আমাদের স্বাধীনতার সুবাদে যা ইচ্ছে তাই চাপিয়ে দিতে পারি না। কতটা ভার সইবে, তার একটা হিসেব কোথাও ধরা থাকে। সে হিসেব হয়তো আধাখেঁচড়া, হাতের মুঠোয় স্পষ্ট করে পাওয়া যায় না। কাণ্ডজ্ঞানে ভর করে জমি জিরেত মাপতে মাপতে একটু একটু করে টের পাওয়া যায় আখ্যানের ভার কতটা সইবে বা সইবে না। আখ্যান মিলল কিনা একথা ফস করে জানার মতো কোনো জাদুমন্ত্র হাতে থাকে না, থাকার কথাও না। গায়ের জোর এসে না পড়ে, এটা সব সময় খেয়াল রাখতে হয়। শিল্পসংস্কৃতি কর্মের আধুনিক পাঠে এই আখ্যান ধারণার সাহায্যে কেবলমাত্র আভ্যন্তরিক পাঠ থেকে বেরিয়ে আসবার একটা প্রশস্ত পথ পাওয়া গেছে। সুবিধা এই যে, একবার বাইরে বেরোতে পারলে অনেক কিছু দেখতে দেখতে এগোনো যায়, সেখানে আর পাঁচজনের হাত ধরা যায়।

আমাদের চলচ্চিত্র চিন্তায় রাষ্ট্র, জাতি, জাতি-রাষ্ট্রের একটা আখ্যানের ধারা বেশ কিছুদিন ধরে বর্তমান আছে। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' এবং সেই সূত্রে অপু ত্রয়ীর প্রসঙ্গে এই আখ্যানটা নিয়ে বেশ নাড়াচাড়া করা হয়েছে। দিল্লি থেকে প্রকাশিত *জার্নাল অব আর্টস্ অ্যান্ড আইডিয়াজ*-এর ১৯৯৩-এর জানুয়ারি সংখ্যা (২৩-২৪)-তে গীতা কাপুর আমাদের স্বাধীনতার পরবর্তী প্রথম দশকের

সৃষ্টিকর্ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সে-আলোচনায় ওঁর প্রধান উদাহরণ সত্যজিৎ রায়। নতুন স্বাধীন এক আধুনিক জাতি-রাষ্ট্র তখন গড়ে উঠছে বা সেইভাবে তাকে গড়ে তোলবার চেষ্টা হচ্ছে। সে যেন এক উদ্দীপনাময় যুগ, অন্তত সে-উদ্দীপনা তখনকার সমাজের যে-অংশটুকুকে স্পর্শ করতে পেরেছিল সেখানে তেমনিই মনে হয়েছিল তাকে। আধুনিকতায় উত্তরণের এই লগ্নে সত্যজিতের অপু ত্রয়ীকে রাষ্ট্রীয় আখ্যানের এই পৃষ্ঠপটে দেখে নেবার ইচ্ছে কিছু অস্বাভাবিক মনে হবার কারণ নেই। কিন্তু ওই যে আখ্যানের খোলা আকাশের কথাটা তুললাম, সেটা মাথায় রেখে এগোলে হয়তো দেখতে পাব যে, ওই আখ্যান ধারায় অন্য উপাখ্যানও গড়ে তোলা সম্ভব। খোলা আকাশের স্বাধীনতাকে এমনিভাবে আমরা সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করতে পারি।

সত্যজিৎকে ছুঁয়ে থেকে স্বাধীনতার পরবর্তী প্রথম দশকের সৃষ্টি আখ্যানের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কথাও তুলতে হয়েছে। তা তো হতেই পারে। বাইরের দিককার একটা আপতিক যোগ তো অন্তত আছেই। সত্যজিতের শিল্প শিক্ষানবিশির পর্ব শান্তিনিকেতনেই কাটে। তখন অবশ্য রবীন্দ্রনাথের একেবারে শেষবেলা। শান্তিনিকেতনের আকাশে সে অস্তরাগ সত্যজিৎ পেয়েছিলেন। সেখানে তিনি যখন কাগজে তুলিতে প্রকৃতির রং ফোটাচ্ছেন তখন 'সিটিজেন কেন' কলকাতার প্রেক্ষাগৃহ ঘুরে যাচ্ছে, তাঁর দেখা হচ্ছে না, তা নিয়ে আফশোসও থাকছে।

সত্যজিৎ, শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রনাথ, বাংলার রেনেসাঁস, একেবারে উনিশ শতকী রাষ্ট্রচিন্তার উন্মেষ। এইসব নিয়ে বেশ একটা আদল গড়ে উঠছে। এই আদলেরও একটা আখ্যান রচিত হয়ে যাচ্ছে। ব্রাহ্ম নৈতিকতা, সাহিত্য-ঐতিহ্যে লগ্ন থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণ, উনিশ শতকী আধুনিক মননের রেশ, এই সবই সত্যজিৎ রায়ের শিল্পমানসের নির্মাণ উপাদান। এই আদলেই ঢুকে পড়ছে রবীন্দ্রনাথ-শান্তিনিকেতনেরও এক আখ্যান কথন। শান্তিনিকেতন সর্ব-এশীয় পুনরুজ্জীবনের প্রতীক, আর রবীন্দ্রনাথ যেন একটু শিল্প-আধুনিকতার বিপরীতে গ্রামীণ কারুকর্মমুখী। আর এ সবই ১৯৪৭-এ অবসিত। তারপর আসছে নতুন কালে, নতুন জমানায়, নতুন আধুনিকতার যাত্রা-সূচনা। এরকম একটা আদল যে আমাদের খুব অচেনা তা নয়। গান্ধীকে তো বটেই, রবীন্দ্রনাথকেও অনেক সময়ে পিছন দিকে তাকানোর অভিযোগ শুনতে হয়েছে। দেশে বিদেশে অনেক ক্ষেত্রে তা নিয়ে বিড়ম্বনাও কিছু কম হয়নি। ভিন্ন সময়ের মেজাজ-মর্জিতে মিল না হওয়ায় বিতর্কিত অতিথি হয়তো কখনো অস্বস্তিরও কারণ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে সরাসরি যন্ত্রসভ্যতার বিপরীতে স্থাপন করতেও আমরা সব সময়ে কুণ্ঠিত হইনি। তবে শ্রীনিকেতন সমেত শান্তিনিকেতনের গল্পটাকে অন্যভাবেও যে সাজানো সম্ভব তারও নজির একেবারে বিরল নয়। এমনকী ওই প্রকল্পে অনেকেই আরো অন্তরঙ্গ আধুনিকতর এক অর্থে আধুনিকতার সূত্রসন্ধান

পেতে চাইছেন। সচরাচর আধুনিকতার যে-মাত্রায় আমরা কথা বলি তা বড়ো বেশি সরলরেখায় সাজানো। যেন আধুনিকতার প্রত্যয়ে দেশ-কালের কোনো ছোঁয়াচ লাগে না। সে-আধুনিকতা অনেকের কাছে মনে হতে পারে কিছুটা নিরবয়ব। তাই তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার আধুনিকতার কথা ভাবতে চান।

আধুনিকতার আখ্যানের এই জায়গায় পৌছতে পারলে আমাদের আধুনিকতার সন্ধানের একটা দায় আমরা মাথায় তুলে নিতেই পারি। শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন ভাবনায় সেই দায় পালনের কোনো অঙ্গীকার কি টের পাওয়া যায়? সাফল্য-ব্যর্থতার ফেরে আটকে গিয়ে লাভ নেই, কথাটা হচ্ছে ভাবনা স্পর্শ করতে পারা না-পারা নিয়ে। আধুনিকতার যে-প্রত্যয় ব্যক্তিময় সেখান থেকে তাকে সরিয়ে এনে আত্মতায় রূপ দেবার এই কর্মাত্মক ঝোঁকের মধ্যে আমাদের আধুনিকতার কিছু প্রাপ্য নেই? আধুনিকতার অন্য আখ্যানে অনেকেই এরকম প্রাপ্য কিছু খুঁজে পেতে চাইছেন।

পরিবেশ ভাবনায়, জলের সন্ধানে, জৈব সারের ব্যবহারে, ছন্দোময় সমবায়ী জীবনের আনন্দ অভিধায় যে-উজ্জীবনের প্রবর্তনা তা কি আধুনিকেতর? সে ব্যাপারে আমরা অতটাই নিঃসংশয়? আবারও বলছি, দোষ-ত্রুটি, ফাঁক-ফোকর, এমনকী বাস্তব প্রয়োগসম্ভাব্যতার আদৌ কোনো কথা তুলছি না। কথা বলছি ভাবনা স্পর্শ করার দায় নিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের এক রকমের আখ্যান থেকে যেমন আমরা সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী' কিংবা অপু ত্রয়ীর আধুনিকতার এক রকমের একটা আখ্যানে পৌছতে পারি, তেমনি সে-আখ্যান ভাঙতে পারলে সত্যজিতের আধুনিকতারও অন্য আখ্যান ছুঁতে পারা সম্ভব। 'পথের পাঁচালী' উনিশশো পঞ্চান্নর ছবি। মধ্য পঞ্চাশের সেই সময়টাকে উন্নয়নের মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত করায় সম্ভবত খুব একটা আপত্তির কিছু নেই। ভারতীয় স্বাধীনতার, অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের, অর্থাৎ প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তরের এক দশক তখনো পূর্ণ হয়নি। প্রাথমিক তেরঙা রঙিন আবেগ তখনো অবসিত হয়নি তো বটেই, এমনকী সে আবেগ ঈষৎ উষ্ণতায় জীইয়ে রাখার বাসনাও তখনো অক্ষুণ্ণ। অন্তত আমার সমবয়সী যাঁরা তাঁদের মনে থাকার কথা যে উনিশশো সাতান্নর ১৫ অগস্ট উপলক্ষে ১৫-১৬ দুদিনই স্কুল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিতে স্বাধীনতা দিবসের ছুটি ঘোষিত হয়েছিল। সে ছিল আমাদের স্বাধীনতার প্রথম দশক উদ্‌যাপন। জাতীয় ছুটি ঘোষণাই এসব উদ্‌যাপনের প্রকৃষ্ট পন্থা কিনা তা নিয়ে বিতর্ক হতেই পারে, তবে এ কথাটা অস্বীকার করার জো নেই যে আমাদের সমাজমানসের রাষ্ট্রীয় নির্মাণে এসব চিহ্ন স্বতঃসিদ্ধ। এই সিদ্ধিতেই কানপুর ক্রিকেট টেস্টের 'ঐতিহাসিক' জয়ের জন্য আমরা জাতীয় ছুটি পেয়ে থাকি। উনিশশো এগারোর মোহনবাগনের বিখ্যাত শিল্ড বিজয়েও অনুরূপ ছুটি একই বিচারে আমাদের প্রাপ্য

ছিল। পেয়েছিলাম কি? সে-স্মৃতি আমার থাকার কথা নয়। যাঁদের তা থাকার কথা তাঁরা সে-কথা বলার জন্য বড়ো কেউ এখন আর নেই আমাদের মধ্যে। এ বিষয়ে মহাফেজখানার নথি কি কিছু বলে? তখনকার রাষ্ট্রীয় সংবেদনে সমাজমানসের এ-চিহ্ন গ্রাহ্য হবার কথা নয়। আর গ্রাহ্য যদি নাই হয়ে থাকে তাহলে মহাফেজখানা কীই বা বলবে।

মধ্য পঞ্চাশের ওই সময়টাকে উন্নয়নের মুহূর্ত বলা যেতেই পারে। বস্তুত এক অর্থে সময়টা ছিল উন্নয়ন মুহূর্তের প্রায় মধ্যবিন্দু। স্বাধীনতায় পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীর উন্নয়ন বিভাজনে সাধারণত মধ্য ষাটের পর থেকে অবসান বিন্দুর সূচনা বলে ধরা হয়ে থাকে। সত্তর-আশির দশক রীতিমতো সংকটের দশক আর নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে উন্নয়নের এক নতুন অর্থ যোজনার সূত্রপাত। এরকম মোটা দাগেও যদি আমরা কথাবার্তা বলি তাহলে খেয়াল রাখতে হয় যে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি নাগাদ একটা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সমাপ্তির পথে যাচ্ছে। সেই প্রথম পরিকল্পনাকে খুব বড়ো মাপের কোনো পদক্ষেপ হিসেবে কেউ হয়তো দেখেন না, তখনো হয়তো কেউ তা দেখেননি, তবে ওই পর্বেই পরিকল্পনা ব্যাপারটা নিয়েই যে-আগ্রহের ও উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল তা অবশ্যই স্মরণযোগ্য। এই পরিকল্পনার পথেই যে ভারতের ক্রমমুক্তি হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ পোষণ করা তখন ঠিক রেওয়াজ ছিল না।

এইরকম এক মানসমুহূর্তে এল সেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জোয়ার। সে ১৯৫৬ সাল। এই সেই বিখ্যাত মহলানবীশ মডেলের সময়, এই সেই নেহরু সমাজতন্ত্রের শিখরবিন্দু, পরিকল্পিত অর্থনীতি, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব, জাতীয় কংগ্রেসের আবাদি অধিবেশন থেকে চালু-হওয়া সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ইত্যাদি তখনকার চলতি বুলি। সে সময়টা ছিল যেন ঘটনা ঘটবার, আর ঘটনা যেন ঘটছিলও তখন। তখনকার হাওয়ার মধ্যেই ছিল উন্নয়ন, উত্থান, উপরের দিকে তাকানো, এগোনো। উন্নয়ন (উৎ-√নী-অ) শব্দের ব্যুৎপত্তির মধ্যে ছিল উপরের দিকে নিয়ে যাওয়া, টেনে তোলা। এই নিজস্ব ধারণা রাষ্ট্রীয় প্রগতিচিন্তায় অন্তর্নিহিত ছিল। প্রগতির পরিণাম নিয়ে অন্তহীন জিজ্ঞাসার দিন তখনো আসেনি। এর একটু আগের পর্বে, যখন দামোদর উপত্যকার উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে অস্থির মাতামাতি চলছে, তখন স্কুলের বালকদের কাছেও পৌঁছে গিয়েছিল সেই উন্নয়ন নিশানার অলক্ষ্য হাতছানি। তখনকার দিনে খুব জাঁকজমক করে যে বড়ো শিল্পমেলা বসেছিল ইডেন উদ্যানে, তার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল দামোদর পরিকল্পনার মডেল। কোথায় নদীতে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে, কোথায় জলাধারে জল ধরে রাখা হচ্ছে, কোথায় কীভাবে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে, এসবের এক বিস্মিত আগ্রহ সঞ্চার করা হচ্ছে তখন কিশোর মনেও। এই প্রসঙ্গেই তখন মুখে মুখে ফিরছে মার্কিন দেশের টেনেসি উপত্যকার বার্তাও। উন্নয়ন ভাবনার একটা আদল সরল জলস্রোতের

মতো প্রবাহিত হতে শুরু করেছে যেন। ভাকরা-নাঙ্গাল ও আরো আরো অনেক নদীবাঁধ পরিকল্পনা নিয়ে রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন চিন্তা তখন বেশ মশগুল। বিবাদী স্বর কিছু ছিল না তা নয়, ছিল তবে তা কানে তোলার মতো গরজ তখন তৈরি হয়নি। সে-গরজ তৈরি হতে ঢের সময় লাগবে, আজো তা ঠিক তেমন করে হয়নি এখনো। এই সেই কালপর্ব যখন নেহরু বলছেন, এইসব নদীবাঁধ ও তাদেরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা যে-সব বহুমুখী প্রকল্প তারাই সেদিনের নতুন ভারতের মন্দির। ওই তুঙ্গ মুহূর্তেও জবাহরলাল নেহরুর মতো মানুষকেও যে মন্দিরের রূপকে কথা বলতে হয়েছিল সে কথাটা লক্ষণীয়। সে কি এই কারণে যে মন্দিরের ভাষাতে অনুবাদ না করে নিতে পারলে সে-বার্তা ঠিকমতো ভারতবাসীর কাছে পৌঁছবে না? নেহরু কি এ সত্য বুঝেই কথাটা বলেছিলেন? না কি কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল? না কি অবচেতনের শাসন নেহরুও এড়াতে পারেননি? এসবের মধ্যে হয়তো সংকটের বীজ কিছু নিহিত ছিল।

এই যে উন্নয়ন ও উন্নয়নের স্মৃতি নিয়ে এত কথাবার্তা, এ কাদের কথাবার্তা? মনে রাখা ভালো এ মূলত যারা আমাদের মতো এসব স্মৃতির অংশীদার তাদেরই কথাবার্তায় ভরা। তার বাইরে যারা, সম্ভবত তারা অনেক, হয়তো তারাই অনেক, তারা এসব কথাবার্তা, কিংবা এসব কথাবার্তার স্মৃতি থেকে কার্যত বহিষ্কৃত। এই বহিষ্কার প্রক্রিয়া সাধিত হতে পেরেছে সমাজসংস্কৃতি ও শিক্ষাদীক্ষার নানান পাকেচক্রে। আমাদের এইসব উন্নয়ন প্রচেষ্টার কোনো প্রভাব সেই বহিষ্কৃত মহলে পড়েনি, সে-মহল যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেছে, এরকম কোনো স্থিরচিত্রের কল্পনা করার কথা আদৌ বলা হচ্ছে না, এবং তার কোনো প্রয়োজনও নেই। উন্নয়নের প্রভাব পড়া এক কথা, আর তার রোমাঞ্চসুখে বিভোর থাকা অন্য কথা। এই বিভোর থাকার জন্য অন্য এক আখ্যানের শরিক হওয়া দরকার। বহিষ্কৃত যারা তারা উন্নয়নের স্পর্শ পেলেও উন্নয়ন আখ্যানের শরিক নাও হতে পারে নানা কারণে। তাই আমাদের উন্নয়ন মুহূর্ত নিয়ে কথা বলতে গেলে এই দুই গল্পের ফারাক খেয়াল রাখা চাই। উন্নয়নের একটা গল্প, আর উন্নয়ন আখ্যানের আর একটা গল্প, এ দুটো গল্প এমনিতে আলাদা। কোথাও কখনো গল্প দুটো এক বিন্দুতে এসে মিলে যেতেই পারে, সেটা অন্য কথা। মিলছে কিংবা মিলছে না, সমাজসত্যের কিছু নিহিতার্থ এ বিচারের মধ্যে থেকে যেতে পারে।

পঞ্চাশের দশকের উন্নয়ন-আখ্যানের গল্পে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসূচিত উল্লাসই কিন্তু একমাত্র উপাদান নয়। আরো অনেক জরুরি উপাদান ছিল সেখানে। মনে রাখতে হবে সে সময়টা ছিল স্নায়ুযুদ্ধেরও জমাট মুহূর্ত। বিশ্ব ঘটনাবলিকে তখন আমরা দেখতে শিখছি এক দ্বিমেরু ব্যাখ্যানের সূচকে। একদিকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমি পুঁজিবাদী গণতন্ত্র, অন্যদিকে সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক জনগণতন্ত্র। আন্তর্জাতিক ঘটনা সংস্থান সবই এই দুই মেরুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। দু-পক্ষের

পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অবিশ্বাস, অসহিষ্ণুতা নিশ্ছিদ্র। সোভিয়েত বৃত্তের সমাজতন্ত্র তখন নিজের পায়ে জোর পেতে চাইছে, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নে সে তখন পশ্চিমকে টক্কর দিতে চলেছে। পশ্চিম রীতিমতো তটস্থ। পারমাণবিক শক্তিতে পূর্বী সমাজতন্ত্র তখনই তুল্যমূল্য। তার উপর ১৯৫৭-র সোভিয়েত স্পুত্‌নিক ভূমিকম্পের মতো কাঁপন ধরিয়েছিল পশ্চিমি দুনিয়ায়। এই যখন সময়ের মেজাজ, তখন প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার সংজ্ঞাও যেন ছিল অনেকটাই সুসজ্জিত। প্রতিক্রিয়া পারমাণবিক সমরায়োজনে ব্যস্ত থাকে, প্রগতি শান্তি আন্দোলন গুছিয়ে তোলার চেষ্টা করে। প্রতিক্রিয়া সংহার মূর্তি ধারণ করে এগিয়ে চলে বিশ্বজয়ের অভিযানে, একান্ত সহায় ক্রমপুঞ্জিত দাপুটে পুঁজি ও লগ্ন বশংবদ বিজ্ঞান-প্রযুক্তি আর প্রগতি তখন প্রতিরোধে ব্যস্ত, ক্ষীণবল, উচ্ছন্ন ও ছন্নছাড়া বিজনে তখনো বাঁশের কেল্লাই সম্বল, তেমন কোনো গড় জোটেনি তখনো। বাঁশের রূপকটা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নয়, পশ্চিমি অনুষঙ্গে সোভিয়েত তন্ত্রের পরিচয় তখন লৌহ যবনিকার আর চীনাতন্ত্রের বাঁশের যবনিকা। আধুনিক প্রযুক্তির নিরিখে কে কতটা এগিয়ে বা পিছিয়ে সে বিষয়ে পশ্চিমি বোধের একটা পরিচয় ধরা ছিল এই বর্ণনায়। সোভিয়েত ও চীনের কথাটা যে পাশাপাশি এসে পড়ছে তার কারণ সমাজতন্ত্রের বিকাশে চীন তখন সোভিয়েতের সহগামী, অন্তত তাই ছিল প্রচলিত প্রত্যয়। সোভিয়েত তখন প্রগতির প্রতীক, আর সে-বিচার তখনো নিরঙ্কুশ। সোভিয়েত-চীন সংকট ঘনীভূত হতে তখনো দেরি আছে, আর ভারত-চীন সংকট সে-ও দূরে। বিশ্ববোধের এই যখন হালচাল, তখন মিশরের নাসের ও যুগোস্লাভিয়ার তিতোর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নির্জোট আন্দোলন গড়ে তুলছেন আমাদের নেহরু। ১৯৫৫-তে অনুষ্ঠিত বান্দুং সম্মেলনের বার্তা ছিল নতুন স্বাধীন এক রাষ্ট্রের স্বস্থ আত্মপরিচয় আবিষ্কারে এক ঝলক তাজা হাওয়ার মতো। তারও আগে কোরিয়া যুদ্ধে শান্তিস্থাপনে ভারতের ভূমিকা ছিল খুবই উজ্জ্বল, অন্তত সেইরকমই কথিত, এবং ওই উন্নয়ন-আখ্যানের গল্পটা গড়ে তোলায় এসব কথনের দারুণ ভূমিকা ছিল।

উন্নয়ন-আখ্যানের এই গল্পে রাষ্ট্র অবিসংবাদিতভাবে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ। সেটাই ছিল তখনকার প্রগতির পথ। রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্বকে ক্রমশ প্রায় সার্বিক ভেবে বসেছিলাম আমরা, মেনেও নিচ্ছিলাম সহজ চিত্তে। শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় ভূমিকাকে আমরা বেশ স্বাগতম জানিয়েছি তখন। রাষ্ট্রও দিয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা। গড়ে উঠেছে সাহিত্য অকাদেমি কিংবা সংগীত নাটক অকাদেমির মতো প্রতিষ্ঠান। এসব প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টার ভালোমন্দ বিচার অন্য প্রশ্ন। কিন্তু এদের মধ্যবর্তিতায় অন্তত শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে সর্বভারতীয়ত্বের ধারণা প্রতিষ্ঠার দিকে কিছুটা এগোনো সম্ভবপর হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রতিষ্ঠালগ্নে সে-চিন্তা অত স্পষ্ট করে কারো মাথায় ছিল কিনা তা বলা শক্ত। তবে আঞ্চলিক

শিল্পকর্ম যে এইসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কিছুটা পরিমাণে ভারতীয় মঞ্চ দখল করতে পারল সে কথা মেনে নিতে অসুবিধে নেই। এইসব প্রতিষ্ঠানের সম্মান পুরস্কার ফেলোশিপ অবশ্যই সর্বভারতীয় পরিচিতি এনে দেয়। তাছাড়াও বিচারের মানদণ্ডে যে সর্বভারতীয় মানের প্রশ্নটা উঠে এল সেটা জরুরি কথা। আঞ্চলিক ভাষার কোনো নাট্যকর্ম কিংবা চলচ্চিত্র এখন অনেক সহজে ও স্বাভাবিকভাবে সর্বভারতীয় মানদণ্ডে বিচার্য হতে পারল। আঞ্চলিক ভাষা সংস্কৃতি ঐতিহ্যের মধ্যে দাঁড়িয়েও এই বিস্তার সম্ভাবনা খুব ফেলনা কথা নয়। সচেতনভাবে না হলেও এক ধরনের রাষ্ট্রীয় মনস্কামনা এর মধ্যে পূরণ হচ্ছিল। 'একটাই ভারতীয় সাহিত্য বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়ে চলেছে', সাহিত্য অকাদেমির এই স্বীকৃত অবস্থান সর্বভারতীয়ত্ব অর্জনের পথে এক জরুরি ধারণা। সাংস্কৃতিক আঞ্চলিকতা এতে করে পিষ্ট হচ্ছিল না পুষ্ট হচ্ছিল সে কথা যেমন বিচার্য, তেমনি বিচার্য রাষ্ট্রের হাত এতে করে অবাঞ্ছিতভাবে প্রসারিত হচ্ছিল কিনা। সর্বভারতীয় এক জাতি-রাষ্ট্রের গড়ন সংগঠিত পুঁজির চাহিদার অনুকূল। আঞ্চলিকতার বোধ সেখানে বেশি বাদ সাধলে বিরোধ সংঘাত অনিবার্য। আবার সাংস্কৃতিক আঞ্চলিকতার পুষ্টিসাধনে আঞ্চলিক জাতিসত্তার বিকাশও প্রায় অবশ্যম্ভাবী। সূচনাপর্বের এইসব বিরোধাভাসই কি কালে কালে রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছে? সে প্রক্রিয়ার মধ্যে আরো অনেক জটিলতা থাকাই সম্ভব। কিন্তু এটুকু বোধ হয় লক্ষ করা চলে যে, পঞ্চাশের দশকের নতুন শিল্পায়ন ভাবনার সঙ্গে রাষ্ট্রপ্রসার ও রাষ্ট্রিক সংস্কৃতিকর্মের বিস্তারভাবনা বেশ মানানসই ছিল। সাহিত্য, সংগীত, নাটক, ললিতকলার সঙ্গে চলচ্চিত্র ক্ষেত্রেও সরাসরি রাষ্ট্রীয় সহায়তার বিস্তার লক্ষ করা গেল। এই আদলের মধ্যে নয়, ঘটনাচক্রে হয়তো আপতিকভাবে, 'পথের পাঁচালী' নির্মাণপর্বে অর্থসংকট কাটিয়ে উঠতে যে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের হাত দরকার হয়েছিল তা কারো কারো মনে হতে পারে ইঙ্গিতবহ। তবে সেই সুবাদেই 'পথের পাঁচালী'কে রাষ্ট্রীয় ভাবনার আখ্যান হিসেবে দেখতে চাইলে তা হবে খুব যান্ত্রিক বিচার। যাঁরা 'পথের পাঁচালী' সেভাবে দেখতে পছন্দও করেন তাঁরাও নিশ্চয়ই ওই কারণে করেন না।

সমাপতন যাই হোক না কেন, পঞ্চাশের দশক নাটক ও চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও শত জলঝর্ণার ধ্বনির শতক। ১৯৫৪ নাট্যপ্রযোজনা 'রক্তকরবী'র বছর, আর ১৯৫৫ চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালী'র। সময়টা ভাবা যাক, শম্ভু মিত্র, সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক সব একই সঙ্গে দাপটে কাজ করছেন। দশক বিচারের খাঁচাটার বিশেষ কোনো মানে নেই, তবুও বলতে তো হয় যে, এই একই দশকে প্রায় সমসাময়িক সত্যজিৎ আর ঋত্বিকের উত্থান। 'নাগরিক' বরঞ্চ 'পথের পাঁচালী'র আগেরই তৈরি ছবি। 'পথের পাঁচালী' পেরিয়ে 'অপরাজিত' (১৯৫৬)-র পথে সত্যজিতের কাজ এগিয়ে চলে আর 'নাগরিক'-এর ঋত্বিক ক্রমে পৌঁছে যান

'অযান্ত্রিক' (১৯৫৮), 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৬০), 'কোমল গান্ধার' (১৯৬১) আর 'সুবর্ণরেখা'য় (১৯৬৫)। মনে হতে পারে এসব হঠাৎ কোনো বিস্ফার। এইসব পরিচালকেরা নিজেরা নিজেদের কে কেমনভাবে কোন উত্তরাধিকারের শরিক হিসেবে ভাবতেন সে অন্য কথা। অনেকেই তেমন করে হয়তো বাংলা চলচ্চিত্রের ধারায় নিজেদের স্থাপন করে দেখেননি। কিন্তু নেই নেই করেও 'পথের পাঁচালী'রও একটা ইতিহাস হয়তো আছে, দেশি চলচ্চিত্রেই আছে। ঠিক প্রভাবের কথা বলছি না আমি, যতই ক্ষীণ হোক যেন একটা পরম্পরার দেখা পেতে পারি। নীতিন বসুদের কথা যদি ছেড়েও দিই, অন্তত 'উদয়ের পথে' (১৯৪৪) থেকে তো ভাবতেই পারি। এ ছবির চলচ্চিত্রধর্মিতার বিচারের কথা ভাবছি না এখন। এ ছবির ভাবনা, তার নির্মাণ প্রক্রিয়া, সমসাময়িক সাংস্কৃতিক চালচিত্রে তার অবস্থান, এসব কথা বিবেচনা করলে এ ছবিকে পরম্পরার একটা উল্লেখযোগ্য বিন্দু হিসেবে ভাবা চলে। আমাদের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে চলচ্চিত্রের যে-অবস্থানে আজ আমরা অভ্যস্ত সেটা তো চিরকালের নয়। চলচ্চিত্রকে সে অবস্থান অর্জন করে নিতে হয়েছে, সমাজ-সম্পর্কের নানা উত্থান-পতনের কাহিনী তার মধ্যে নিহিত আছে। সাংস্কৃতিক মান্যতার এই যাত্রায় 'উদয়ের পথে' নিশ্চয়ই এক লক্ষণীয় মুহূর্ত। এরপর নেহাতই আচমকা দু-একটা নাম বলতে গেলেও বলা চলে 'অঞ্জনগড়' (১৯৪৮), 'ছিন্নমূল' (১৯৫১), 'পথিক' (১৯৫৩), 'নতুন ইহুদি' (১৯৫৩), 'দুঃখীর ইমান' (১৯৫৪), এসব ছবির কথা ভুললে কী লাভ হবে আমাদের?

তাহলে চলচ্চিত্রের বৃত্তটাও উন্নয়নের মুহূর্তে স্পৃষ্ট। অন্তত সময়ের বিচারে তো বটেই। আর সেটা বোধ হয় একটা কারণ যে জন্য উন্নয়ন মুহূর্তের অনুষঙ্গে আধুনিকতার দিকে এক আখ্যান হিসেবে চলচ্চিত্র 'পথের পাচালী'কে আমরা কখনো কখনো দেখে থাকি। এবং অপু ত্রয়ীকে সেরকম দৃষ্টিতে দেখার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে কোনো লাভ নেই। রেলগাড়ির মোটিফ, দুর্গার মৃত্যু, গ্রামীণ সামন্ত 'স্নিগ্ধতা'র অবসান, পরিবারগতভাবে পাড়াগেঁয়ে দারিদ্র্য থেকে মুক্তির সন্ধান, ক্রমে দ্বন্দ্ব সমাকীর্ণ রূঢ় জগতের দিকে অপুর অনিশ্চিত পদক্ষেপ, সমস্ত অতীতের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে বিষাদের পথে ব্যক্তিবিকাশ, এরকম একটা আখ্যান আমরা সাজাতেই পারি। আর এই যাত্রার পথে ইঙ্গিতময় বাঁকে বাঁকে মৃত্যু ছড়ানো। দিদির মৃত্যুর পরে অপুরা কাশী চলে যায়, বাবার মৃত্যুর পরে কাশী থেকে প্রস্থানপর্ব, আর গ্রামের বাড়িতে মায়ের নিঃসঙ্গ মৃত্যুর পরে অপু চিরকালের মতো সরে যায় গ্রামীণ জীবন থেকে। শেষমেশ অপর্ণার মৃত্যুতে অপু পাড়ি দেয় সব চেনাজানা তীর ও বন্দর ছেড়ে দিয়ে। এই টুকরোগুলো থেকে সোজা সামনের দিকে যাত্রার আখ্যান যেমন সাজানো চলে, তেমনি টুকরোগুলোর মধ্যেকার আগুপিছু টানটোনের দিকে নজর দিয়ে অন্যরকমের একটা আখ্যানও সাজানো সম্ভব। কাশীর অপচয় ও অবমাননার থেকে সরে আসবার জন্য গ্রামবৃদ্ধ আত্মীয়ের হাত ধরে

অপুরা মনসাপোতায় ফিরে আসে। আর সর্বজয়ার দিক থেকে এ সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা ছিল নিশ্চয়ই, তবে বড়লোক বাড়ির সিঁড়িতে দাঁড়ানো তাঁর নির্বাক চাউনি এ বিষয়ে অনেক কথা বলে। কাজেই এ সিদ্ধান্ত ভাগ্যের হাতে একেবারে অসহায় আত্মসমর্পণ নয়। ডুবতে ডুবতেও যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তের কিছুটা জোর যেন টের পাওয়া যায়। এর মধ্যে আধুনিকতার আর একরকম চেহারার উঁকিঝুঁকি একটু আধটু দেখতে পাব না আমরা? কুলবৃত্তির পথে অপুর একরকমের আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাবনা সর্বজয়ার মাথায় ছিল। অপুর ভাবনার সঙ্গে সে ভাবনার বনিবনা ছিল না ঠিকই, এবং সর্বজয়ার মৃত্যুতে সে ভাবনারও সমাধি। মায়ের শ্রাদ্ধ কলকাতায় কালিঘাটে করে নেবে, এ কথা বলতে বলতে পুঁটলি বেঁধে নিয়ে অপু যে সামনের দিকে হেঁটে যায়, সে-পথও কিন্তু অত সোজা ছিল না। নিরুদ্দেশ ভবঘুরে পর্ব পেরিয়ে এসে অপু কিন্তু কাজলকে কাঁধেই তুলে নেয়। আর কাজল তো অপুর কাছে অতীতের বিষাদ চিহ্ন, অপু তো তাকে টপকে যেতেই চেয়েছিল। আমরাও দেখলাম যে পর্বান্তর পেরোনো এত সহজ কাজ নয়। আমাদের আজকের আধুনিকতার তর্কে দাঁড়িয়ে এরকম একটা আখ্যান সাজালে ক্ষতি কী? কোন আখ্যান কখন কীভাবে আমরা সাজাব তার উপরেও আমাদের সমাজ-সময়ের ছায়াপাত থাকে। সেই সুবাদেই খেয়াল রাখা ভালো যে, এক পর্বে 'পথের পাঁচালী' বা অপুর চলচ্চিত্র কাহিনী আমরা যে-চোখে দেখেছি, আজও সেই চোখেই যে দেখতে হবে তার কোনো মানে নেই। আজ কী চোখে দেখব তা আজকের সময়ের সঙ্গে মোকাবিলার কথা। সেই মোকাবিলার জন্যই শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন আখ্যান ভেঙে নেবার কথা তুলেছিলাম। সেখান থেকে আধুনিকতার অন্য কোনো ইশারা তুলে নিতে পারলে আমরা নির্ভেজাল আধুনিকতার চাপ থেকে খানিকটা মুক্তি সন্ধান করতে পারি।

সেদিনের জমাট-বাঁধা উন্নয়নের সেই গল্প আর তার সেই আখ্যান দুইই কিন্তু আজ ভেঙে গেছে। ভেঙে গেছে মানে এ নয় যে আজ আর আমরা উন্নয়নের কথা বলি না বা তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। উন্নয়নের কথা আমরা আজো বলি, হয়তো একটু বেশি করেই বলি, ঠিক এই মুহূর্তে এখানে তা সত্যিই বেশি করে বলছি আমরা। বর্তমানে আমাদের রাজনীতি যেন সর্বতোভাবে উন্নয়নে পর্যবসিত। তার চেয়ে বড়ো কোনো লক্ষ্য বা আদর্শ যেন রাজনীতির জন্য নয়। আজকের এই উন্নয়নময় রাজনীতির দিনেও উন্নয়নের গল্পটা কিন্তু এক অর্থে ভেঙে গেছে। ভেঙে গেছে মানে এই যে, উন্নয়নের গল্প আজ আর তেমন সোজা পথে সরলভাবে মসৃণ কোনো সরলরেখায় এগোতে পারছে না। তা হয়তো কোনোদিনই তেমন করে এগোয়নি। কিন্তু তার ভাঙচুর, খানাখন্দ, এবড়ো খেবড়ো গর্তগুলো আমরা একদিন ঠিক খেয়াল করতাম না। তা-ই ছিল সেদিনের উন্নয়ন-আখ্যানের কেতা। এখানেই আখ্যানের গুরুত্বটা এসে পড়ে। উন্নয়নের গল্পটা কী দাঁড়াচ্ছে

সেটার জন্যও আসলে তাকাতে হয় উন্নয়ন-আখ্যানের গল্পটা কী চেহারা নিচ্ছে তার দিকে। আজকের উন্নয়ন আখ্যানের হাত ধরে এগোতে গেলে আমরা দেখতে পাই যে, শুধু রাষ্ট্রীয় ফরমানে বেশি দূর আয়ত্তে আনা যায়নি। গ্রামের বুক চিরে একটা পিচের রাজপথ বানাবার খরচ যোজনা খাতে মঞ্জুর করা যেতেই পারে, কিন্তু সে-রাজপথ সত্যিই কতটা কীভাবে বানানো হবে, তা আর পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় সমীক্ষা-নিরীক্ষা-পরিদর্শনের হাতে থাকে না। সেখানে নানা ফাঁকে ফিকিরে সমাজসংস্থান ও সমাজসম্পর্ক বাধ সাধে। আর ধরা যাক রাজপথ বানানো হলো, ঠিকমতোই তা হলো, তাতেই বা উন্নয়নের কতটুকু ধরা গেল? ওই গ্রামের তাতে কতটা এল গেল? ওই রাজপথ দিয়ে যে পণ্য পরিবাহিত হবে তার সুফল-কুফল জনপদ জীবনে ঠিক কীভাবে দেখা দেবে? আর ওই রাজপথ নির্মাণের সুবাদে এই অঞ্চলটা যদি আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্য চলাচলের পথের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়? উন্নয়নের এই সব দিকে যে আজ নজর পড়ছে, উন্নয়ন বিচারে এসব দিকেও যে নজর দিতে হয় সে শিক্ষা কিন্তু নতুন উন্নয়ন-আখ্যানের শিক্ষা। তাই বলছিলাম মসৃণ উন্নয়ন পথ যে আজ ভেঙে গেছে বা ভেঙে যাচ্ছে তাতে নতুন উন্নয়ন-আখ্যানের অনেক কারসাজি আছে। তবে এ কারসাজিও আকাশ থেকে পড়েনি। উন্নয়নের গল্পটাকে সমাজ অভিজ্ঞতায় জারিয়ে নিতে নিতে আস্তে আস্তে নতুন এই আখ্যানদৃষ্টি লাভ করা গেছে। এখানেও মনে রাখা চাই যে এ আখ্যানদৃষ্টির চেহারা না স্থাণু, না স্বচ্ছ। অনেক ঘোলাজলের অস্পষ্টতার মধ্যে থেকে একটা ছাঁদ যেন একটু আধটু টের পাওয়া যায়। এর বেশি পরিচ্ছন্নতায় পৌঁছনোর জোরাজুরিতে খুব লাভ হবে না।

জমাট গল্পের ভাঙন থেকে শুধু এই কথাটা আপাতত তুলে নিতে চাই যে সমাজসম্পর্কের জটিলতার কথাটা সম্ভবত প্রথম পর্বের উন্নয়ন বোধে তেমন করে ঠাঁই করে নিতে পারেনি। জীবনের জটিলতা যে কত জাল ছড়াতে পারে তার হদিশ তখনো তেমন করে মেলেনি। আর সে অলিগলির চোরাপথে অনেক কিছুই হারিয়ে যাওয়া সম্ভব। কাজেই শুধু ছিমছাম যোজনা প্রতিকল্প বানানো বা বাহারি প্রকল্পের ব্যয় মঞ্জুরির মধ্যেই যে প্রকৃত উন্নয়নের সব রহস্য লুকিয়ে থাকে না, এ বিচারে খুব অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। জনপদ জীবন, সেখানকার মানুষে মানুষে রাগদ্বেষ স্নেহপ্রীতি স্বার্থসংঘাত শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও আরো হাজারো নানান আড়াআড়ি সম্পর্কের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াতে না জানলে এসব সমাজপ্রক্রিয়ায় খুব বেশিদূর এগোনো শক্ত। সি ডি পি (কমিউনিটি ডিভেলপ্‌মেন্ট প্রজেক্ট), আই আর ডি পি (ইন্‌টেন্‌সিভ্ রুরাল ডিভেলপ্‌মেন্ট প্রোগ্রাম), সি এ ডি পি (কম্‌প্রিহেন্‌সিভ্ এরিয়া ডিভেলপ্‌মেন্ট প্রজেক্ট), ইন্দিরা রোজগার যোজনা ইত্যাদি হরেক নামের রাষ্ট্রীয় প্রকল্প থেকে প্রকল্পান্তরে আমরা সরে যেতে পারি, কিন্তু জনপদ জীবনের ভিতর মহলে পৌঁছনোর দিক থেকে তাতে যে খুব সুবিধে হবে তা মনে হয় না। ভিতর

মহলে তেমন করে পৌঁছতে না পারলেও এক রকমের উন্নয়ন যে কিছুমাত্র সম্ভব না, একথা বলা কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এক ধরনের উন্নয়ন সেভাবেও অন্তত কিছুদূর পর্যন্ত হওয়া সম্ভব, আধুনিক প্রযুক্তিও সেই পথে খানিকটা পরিমাণে হস্তগত হতেই পারে। জনপদ জীবনের ছোঁয়াচ রহিত সে উন্নয়ন একটু বহিরঙ্গ ময় ও বহির্মুখী হয়ে থাকার আশঙ্কা থাকে। আর তাতে অন্য বিপদ হানা দিতে পারে।

উন্নয়ন-আখ্যানের এরকম একটা মুহূর্তে দাঁড়িয়ে চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালী'কে কি আমরা একটু সাবধানবাণী হিসেবে দেখব? হয়তো সচেতন নয়, তাতে কিছু এসে যায় না। আমরা বলি এক কথা, আর যে মানে করে সে করে তার মতন, এ অভিজ্ঞতা তো আমাদের হামেশাই হয়। তাই এ নিয়ে বেশি বিস্মিত হয়ে লাভ নেই। তবে মানে তো আর একেবারে মনগড়া যা খুশি হয় না। তারও কিছু একটা ধরনধারণ থাকে। তা এই যে 'পথের পাঁচালী' ছবির অন্য কোনো মানে পেতে চাই, ছবির শরীরে তার কি কোথাও কোনো ইঙ্গিত আছে? জনপদ জীবনে এত অন্তরঙ্গ আশ্লেষে তৈরি একটা ছবি, রাষ্ট্রীয়তার বহিরঙ্গপ্রবণ নিয়মতান্ত্রিক মেজাজের টানটোনের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় কি? এই প্রশ্নের খেই ধরে আমরা একটু আধটু ইঙ্গিত সন্ধান করতে পারি।

ছোটোখাটো সাক্ষ্য প্রমাণ একটু দেখা যাক। সত্যজিৎ রায় কেন করেছিলেন ছবিটা? উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'র কী তাঁকে টেনেছিল? আর সে টান এতই অমোঘ যে অনেকদিনের বাসনার 'ঘরে বাইরে' সরিয়ে রেখে তিনি গড়িয়া-বোড়াল-মল্লিকপুরে চললেন লোকেশন খুঁজতে? টাকা পয়সার বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই, চললেন রীতিমতো ঝুঁকি নিয়েই। আবার 'ঘরে বাইরে'ও কিন্তু ভোলেননি তিনি। বছর তিরিশেকের জন্য সরিয়ে রেখেছিলেন, এই মাত্র। এবং সেও ছিল ওই ঘর আর বাইরের দ্বন্দ্ব। বিভূতিভূষণের লেখার দৃশ্যগত গুণের কথা সত্যজিৎ বারবার বলেছেন তাঁর লেখাপত্রে। কিন্তু 'পথের পাঁচালী' শুধু কি তাই? কেন তিনি 'পথের পাঁচালী' ছবির জন্য বেছেছিলেন এ বিষয়ে পরিচালকের নিজের জবানিতে পাই : 'I chose Pather Panchali for the qualities that made it a great book : its humanism, its lyricism and its ring of truth." [*Our Films, Their Films,* ১৯৭৮) খুবই স্বাভাবিক সব কারণের জন্য তিনি 'পথের পাঁচালী'কে বেছে নিয়েছিলেন। এর মধ্যে মানবধর্মিতা আর লিরিকধর্মিতার কথা প্রায়ই শোনা যায়, উপন্যাসের প্রসঙ্গে আর চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গেও। কান চলচ্চিত্রোৎসবেও ছবিটি নন্দিত হয়েছিল তার মানবতাবাদী গুণের জন্য। এখানে 'ring of truth' কথাটা বিশেষ করে নজর করা দরকার। আমাদের লেখা বা বলা সবই তো এক অর্থে বানানো কথা। তা সত্ত্বেও কোনো কোনো কথা,, কোনো বর্ণনা বা কোনো উচ্চারণ কানে ঠিকমতো বাজে, মনে হয় কথাটা ঠিক

ঠিক বলা হলো। লেখা বা বলার কোন গুণে এটা হয় তা বলা খুব শক্ত, তবে এই সত্যবোধ জন্মায়।

এই সত্যবোধ জন্মানো যে কী অসাধ্যসাধন তা যাঁরা জানেন তাঁরা জানেন। তাহলে এই দুর্লভ জিনিসটা পরিচালককে টেনেছিল। আর ছবিটা কীভাবে বানানো উচিত হবে সে বিষয়ে ভাবতে গিয়ে ওই একই লেখাতে পরিচালক বলছেন "I felt that to cast the thing into a mould of cut-and-dried narrative would be wrong. The script had to retain some of the rambling quality of the novel because that in itself contained a clue to the feel of authenticity : life in a poor Bengali village does ramble." ছবি তৈরির আঙ্গিকের কথা ভাবতে গিয়ে পরিচালক কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছেন। উপন্যাসের 'ring of truth' বা সত্যবোধ তাঁকে টেনেছিল। এখন দেখা যাচ্ছে উপন্যাসের এক ধরনের 'rambling quality'ও তাঁর নজরে আছে। সরল সোজা এক অভিমুখের বদলে এদিকে মোড় ফেরা, ওদিকে বাঁক নেওয়া, থামতে থামতে আঁকাবাঁকা পথে এগোনো, কখনো দ্রুতগতি, কখনো খুবই ধীর লয়। আমাদের কথনশিল্পে এই ইতস্তত বয়নের ভূমিকা যে কতটা মূলস্পর্শী সে বিষয়ে আমাদের বোধ ক্রমে ক্রমে উন্মোচিত হচ্ছে। তাঁর ছবিতে authenticity-র প্রয়োজনে সত্যজিৎ ছবির শরীরে rambling quality-র দরকার বোধ করছেন। এর কারণ বলতে গিয়ে তিনি অন্য একটা সমাজসত্যের উচ্চারণ করে বসলেন—life in a poor Bengal village does ramble. দরিদ্র গ্রাম বাংলার এই বীক্ষণ তাহলে মিশে যাচ্ছে ছবির আঙ্গিক বোধের সঙ্গে। 'পথের পাঁচালী'র দৃশ্যময়তাই তাহলে শুধু একমাত্র টান ছিল তা নয়, আরো নানান টানে 'পথের পাঁচালী' তাঁকে টেনেছিল।

এই সূত্রে তাহলে কি এক ভিন্নতার সন্ধান করতে পারি আমরা? মধ্য পঞ্চাশের উন্নয়ন মুহূর্তের গল্পপ্রচেষ্টা ও তার আখ্যান ছিল তুলনায় অনেকটা সোজাসাপটা, rambling-এর আঁকাবাঁকা স্রোতের টানের জন্য তখনো তার প্রস্তুতি ছিল না। এই চোরা টান যে কত জরুরি তা আজ হয়তো অনেক ঠেকে আমরা কিছু কিছু বুঝতে শিখেছি বা যথেষ্ট শিখিওনি হয়তো এখনো। কিন্তু আজকের আখ্যানে আমরা সেদিকে তাকাতে চাই। তাই এই আখ্যানবিন্দুতে দাঁড়িয়ে সত্যজিতের সেই ১৯৫৫-র উচ্চারণকে আমরা কি একটু সাবধানবাণী হিসেবে শুনতে চাইব।

হ্যাঁ, একটা কথা। ওই rambling, ওই ইতস্ততের সন্ধান, ওটা কিন্তু সত্যজিতের কাছে ঠিক পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনার মতো ছিল না। ওটা তাঁকে অর্জন করার চেষ্টা করতে হয়েছিল, অর্জিত হতে পেরেছিল কিনা, বা কতদূর পেরেছিল সেটা অন্য প্রশ্ন। আগে যে-লেখাটির উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৭৮-এর সেই লেখার মধ্যে সত্যজিৎ এই স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছেন : "What

I lacked was first-hand acquaintance with the *milieu* of the story". গল্পের পরিমণ্ডলের সঙ্গে সরাসরি পরিচয়ের অভাব তাঁকে পীড়া দিয়েছিল, কিন্তু প্রতিহত করেনি। যা জানা নেই তাকে জানবার চেষ্টা করতে হয়। তিনি জানতেন যে এই জানবার জন্য শুধু মূল উপন্যাসের উপরে নির্ভর করা 'was not enough'। তা যে যথেষ্ট নয়, সেই বোধ থেকে তাঁকে পথে বেরোতে হয়েছিল। শুধুই ইতালীয় নয়া বাস্তবতায় সে-প্রেরণার সবটুকু বোধ হয় নিহিত ছিল না। লোকেশনে জন্য পথে বেরিয়ে যাদবপুর-গড়িয়া ছাড়িয়ে একেবারে বোড়ালে গিয়ে নোঙর ফেললেন। দেশভাগের ধাক্কায়, নতুন উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় যাদবপুর, বাঘা যতীন, বিজয়গড় ইত্যাদি অঞ্চলে তখন পরিবর্তনের আঁচ লেগেছে। বোড়াল তখনো অনাহত। এখানেই সেই rambling quality-র সন্ধান। এর থেকে যে পুষ্টি মিলেছিল পরিচালকের ভাষায় তার পরিচয় : "While far from being an adventure in the physical sense, the explorations into the village nevertheless opened up a new and fascinating world. To one born and bred in the city, it had a new flavour, a new texture : you wanted to observe and probe, to catch the revealing details, the telling gestures, the particular turns of speech."

পথে বেরোলে তাহলে কত কী পাবার আছে। হঠাৎ চোখে-পড়া ছোটো কোনো ডিটেল, অঙ্গভঙ্গির ভাষা আর মুখের বুলির কত রকমফের। এই সবই তো জনপদ জীবনের প্রবেশ পথ। সে পথে পা না বাড়ালে পুষ্টি মিলবে কোথায়। আমাদের উন্নয়নের গল্প ও আখ্যান কি এই পুষ্টির অভাবে শীর্ণ রয়ে গেল?

কৃতজ্ঞতা : মৈনাক বিশ্বাস, শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ রায় ও চলচ্চিত্রবিদ্যা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং সম্পাদক, বারোমাস।

‘পথের পাঁচালী’র পঞ্চাশ বছর

সুনীত সেনগুপ্ত

‘আম আটির ভেঁপু’-বইটির অলংকরণের সূত্রেই ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের পরিচয়। এর আগে মূল উপন্যাসটি তিনি পড়েন নি। শুধু এটা কেন, তখনকার সময়ের নামকরা অনেক বাঙালী সাহিত্যিকের লেখাও পড়েন নি বলে দিলীপকুমার গুপ্তের কাছে ধমক খেয়েছিলেন। ডি কে গুপ্ত তাঁর সংগ্রহ থেকে একরাশ বাংলা বই দিয়ে বলেছিলেন ‘এগুলো পড়ো।’ গল্প বা উপন্যাসের ইলাস্ট্রেশন হল লিখিত ঘটনা বা ভাবের চিত্রময় প্রকাশ। চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য লেখার সময় যেভাবে ভিস্যুয়াল কমিউনিকেশানের দিকে নজর রাখতে হয় তারই সংক্ষিপ্ত প্রকাশ বইয়ের ইলাস্ট্রেশনে তুলির আঁচড়ে করতে হয়। ‘আম আটির ভেঁপু’-র ইলাস্ট্রেশনের সুবাদে তাঁর মনে হল এরকম একটি কাহিনিকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ পরিবেশে একটি শিল্পসম্মত ছবি করা যায় যাতে রূপময় বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যর পরিপ্রেক্ষিতে পল্লীজীবনের মানুষের আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার পাশাপাশি বেঁচে থাকার ইচ্ছাকেও প্রকাশ করা যাবে। শান্তিনিকেতনে শিল্পশিক্ষার রীতি ও ধরন তাঁকে দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে— কিভাবে একটি বিষয়কে দেখতে হয় ও তাকে প্রকাশ করতে হয়। মাস্টারমশাই নন্দলাল বসু শিখিয়েছেন বস্তুর মধ্যে অন্তর্নিহিত প্রাণছন্দকে অনুভব করে তাকে প্রকাশ করার রীতি প্রকরণ। বিষয়ের স্বাভাবিক উন্মেষ ও প্রকাশের আনন্দরূপ মূর্ত করাই শিল্পীর কর্তব্য ও সাধনা। বিনোদবিহারী শেখালেন বিষয়বস্তুর পারস্পরিক টেনশনের সংগে মিলিয়ে সমগ্র কম্পোজিশনের টেনশনকে প্রকাশ করার কায়দা। শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভের ফলে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন শিল্পে দেশীয় ঐতিহ্য ও প্রকৃতির অন্তরাত্মাকে প্রকাশের আর শিল্প ভাবনায় ভারতীয়ত্বের গুরুত্ব। সত্যজিৎ রায় স্বীকার করেছেন যে, “আমি জানি না আমার পক্ষে পথের পাঁচালী করা সম্ভব হত কি না যদি না শান্তিনিকেতনে শিক্ষানবিশীর সুযোগ আমার জীবনে ঘটতো। ঐখানেই আমি শিখেছি প্রকৃতিকে কি করে দেখতে হয় কিভাবে প্রকৃতিকে উপভোগ করতে হয় এবং কি করে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ছন্দকে অনুভব করতে হয়।” নন্দলাল বসুর সম্পর্কে বলতে গিয়েও তিনি লিখেছেন, “আমার পথের পাঁচালীর ভিসুয়ালের মধ্যে যা সাদা কালোর ডায়ানামিক্স ও সামঞ্জস্য রয়েছে সেটা নন্দলালের দান বলে আমি মনে করি।” চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁর অনুরাগ জীবনের একেবারে গোড়ার দিকে আর পাঁচজনের মত ছিল নায়ক-নায়িকা ভিত্তিক। ক্রমে সেটা হল পরিচালক-ভিত্তিক। চলচ্চিত্রের বিচার চলে দুদিক থেকে— ভিতরের বস্তু আর বাইরের রূপ। তিনি এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, “কাহিনির গঠন, সৃষ্ট

চরিত্রের সমস্যা, তাদের চরিত্ররূপ, পরস্পরের সম্পর্কঘটিত নাট্যগতির রস আর তাদের হৃদয়াবেগের প্রকাশভঙ্গী—এ সব হচ্ছে এক শ্রেণীর বিচার্য। কিন্তু ফিল্মের যেটা দৃশ্যরূপ—চোখের সামনে আমরা কি জিনিস দেখছি এবং কোন জিনিস কিভাবে দেখান হচ্ছে তার সমস্যা হচ্ছে চলচ্চিত্রের নিজস্ব সমস্যা। পরিচালক তাঁর ক্যামেরার সাহায্যে কি করছেন তার উপরেই এই দৃশ্যরূপের নির্ভর।" অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রতি আকর্ষণ কাটিয়ে যখন ভিন্ন ভিন্ন পরিচালকের পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রয়োগনৈপুণ্যের দিকে নজর এলো, তখন থেকে তিনি একজন স্রষ্টার দৃষ্টিতে ছবি দেখতে শিখলেন, সেই সাথে ছবির রসাস্বাদনও গভীর হল। ছবি তৈরী করার কথা তখনও মাথায় আসে নি। চাকরী করে মাকে নিয়ে আলাদাভাবে থাকার ব্যবস্থা করা গেছে। বিয়েটা ছিল জরুরী, কেননা সে সম্পর্কটা অনেক দিনের। তাই এসব কর্তব্য মুলতবী রেখে সিনেমার পরিচালক হওয়া প্রায় বিলাসী কল্পনা। অফিসের কাজে দক্ষতার জন্য তাঁকে কয়েক মাসের জন্য বিদেশ পাঠান হল, সেখানের অফিসে কাজ করা ও কাজ শেখা। বিদেশে সময়টা ব্যবহার করলেন দুভাবে—পেশাগত কাজে আর নিজের শখ মেটাতে। যে জন্য তাঁকে বিদেশে পাঠান হয়েছে সে কাজে অবহেলা করার মত মানসিকতা তাঁর নয়। নিষ্ঠাভরে সে কাজ করেছেন, সেই সাথে বাকী সময়ের থেকে কিছুটা উদ্বৃত্ত করে তিনি সস্ত্রীক ছবি দেখেছেন নিয়মিত, প্রায় প্রতিদিনই। ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটল, একজন উচ্চপদস্থ সহকর্মীর ব্যবহার ও মনোভাব তাঁকে যথেষ্ট পীড়িত করল। তিনি চাকরীর নিরাপত্তার সাথে সীমাবদ্ধতারও হদিশ পেলেন। চাকরী হল অনেকটাই অফিসের উপরওয়ালার নির্দেশ মানা ও ক্লায়েন্টের চাহিদা মেটান। দুটোতেই মৌলিকত্ব বা নিজস্বতা খর্ব হতে বাধ্য। এ জন্য চিন্তার স্বাধীনতা কমে যায়। ব্যক্তিত্ববান মানুষের দ্বন্দ্বটা শুরু হয় এখান থেকেই। যাঁরা কর্মক্ষেত্রে আপোষহীন, যাদের আত্মসম্মান, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সেই সাথে আত্মবিশ্বাস আছে তাঁরা এ অবস্থায় এমন সব সিদ্ধান্ত নেন যেটা সাধারণ মানুষের ছা-পোষা ধারনায় মনে হবে প্রায় আত্মহত্যার সামিল বা নির্বোধ অপরিণত বাস্তববুদ্ধির পরিচয়। বিলেতে থাকাকালীন তাঁর দেখা অসংখ্য ছবির মধ্যে এমন কয়েকটি ছবিও ছিল যাদের সিনেমার সমালোচকদের সংজ্ঞায় বলা হয় নিও-রিয়েলিস্টিক। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বাইরের চাকচিক্য একটু বিসর্জন দিয়েও অল্প খরচায় জরুরী প্রাসঙ্গিক ও নিজস্ব বক্তব্যকে প্রকাশ করা। ভিত্তোরিও ডি সিকার 'বাইসাইকেল থীভস্' হল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই ছবিটি সত্যজিৎ রায়ের ধারনার ভিত নাড়িয়ে দিল। তাহলে কমপয়সায় ছবি করা যায়। অপেশাদার অভিনেতা অভিনেত্রী নিয়ে, ষ্টুডিওর ভাড়া বাঁচিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাকৃতিক আলোছায়াতে ছবি করা সম্ভব হলে, নিজস্ব ভাবনাচিন্তাকে রূপায়িত করার জন্য, লাভের কথা চিন্তা না করেও একেবারে আর্থিক ভরাডুবির মত পরিস্থিতিকে বাঁচিয়ে যদি ছবি তৈরী করা যায় ত মন্দ কি? 'পথের পাঁচালী'র কাহিনি হল সে দিক থেকে একেবারে মনের মত, যাকে বলা যায় আদর্শস্থানীয়। ব্যস্ আর কি? চুসান নামক জাহাজটিতে করে দেশে ফেরার পথেই 'পথের পাঁচালী'র প্রথম খসড়া তৈরী।

শিল্পকর্মে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও মৌলিকতার ছাপ রাখার প্রধান শর্ত হলো দেশজ

ভাবধারা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে নিজস্ব বোধকে অবলম্বন করে প্রকাশমাধ্যমের রীতি প্রকরণকে বাছাই করা। সত্যজিৎ রায় তখনকার সময়ের দেশী বিদেশী ছবির খোঁজ খবর রাখতেন, এবং সে সম্পর্কে তাঁর পড়াশুনাও যথেষ্ট। তিনি বুঝেছিলেন যে শিল্পের অন্যশাখায় ভারতীয় শিল্পের যথেষ্ট অগ্রগতি হলেও এই নবীন শিল্পমাধ্যমটিতে অনেক নতুন কিছু করার সুযোগ আছে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সংগীত, চিত্রশিল্প, নাট্যকলা ও সাহিত্যে ভারতীয়ত্বের ছাপ সুস্পষ্ট, একমাত্র চলচ্চিত্রে এর বিকাশ অপূর্ণ। তিনি চাইলেন এ ক্ষেত্রে তাঁর শান্তিনিকেতনের শিক্ষার উপর নির্ভরশীল হতে হবে। আনন্দ থেকেই বিশ্বভুবনের উৎপত্তি—যে আনন্দ সমস্ত সুখ-দুঃখ নিয়ে অথচ সুখদুঃখের অতীত। সকল শিল্পকলার মূল লক্ষ এই দিকে। কবিতা, চিত্র গান, নাচের মত চলচ্চিত্রেও সৃষ্টির মূল আনন্দের ছন্দকে তার আপন ছন্দে প্রকাশ করতে হবে। পরবর্তীকালে পৃথ্বীশ নিয়োগীর সঙ্গে শিল্পবিষয়ে কথোপকথনে দেখতে পাই দেশের ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর টান। গাছ যেমন প্রাণশক্তি পায় মাটিতে পোঁতা শিকড় থেকে, শিল্পেরও শিকড় ছড়িয়ে আছে দেশের মৃত্তিকার গভীরে। তাই তিনি কোন অতিকথনের মধ্যেও না গিয়ে পল্লীজীবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে প্রকাশ করলেন, নিপুণভাবে বাছাই করা কয়েকটি দৃশ্যের মাধ্যমে, পল্লীর সন্ধ্যাবেলার রূপ, মাঠজোড়া সীমাহীন আকাশ, দিগন্তবিস্তীর্ণ কাশবন, উজাড় করে দেওয়া বৃষ্টির সৌন্দর্য। এর পাশাপাশি গ্রামের মানুষের ব্যবহারিক ক্ষুদ্রতা তার পাশে সহানুভূতি, রুক্ষ কর্কশ ব্যবহারের পাশে স্নেহময় মাতৃত্ব, আশায় গড়ে ওঠা দিনের পাশে দারিদ্রের নিষ্করুণ প্রকাশ, বাঁচার ইচ্ছার পাশে মৃত্যুর হাতছানি। 'হাসি কান্না হীরা পান্না দোলে ডালে/ কাঁপে ছন্দ ভালো মন্দ তালে তালে/ নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে/ তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।' জীবনের এই ছন্দোময় প্রকাশ 'পথের পাঁচালী'র পরও সত্যজিৎ রায়ের অনেক ছবির মূল সুর রচনা করেছে। তিনি এ ছবির জন্য মাধ্যমটির প্রয়োগগত দিককে সমৃদ্ধ করার কথা ভাবলেন : পাশ্চাত্ত্য সংগীতের প্যাটার্নকে অবলম্বন করে নয়, ভারতীয় মার্গসংগীতের উপর নির্ভর করে। এইখানেই, এই ছবিতে রবিশঙ্করের স্মরণীয় ও আশ্চর্য অবদান। আমরা আজও 'পথের পাঁচালী'কে মনে রাখি ছবির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যপ্রকাশের কাব্যময়তা, বিষয় উন্মোচনের সহজ সরল ভাবের জন্য। সেই সঙ্গে নিঃসন্দেহে রবিশঙ্করের বাজনায় লৌকিক প্রকৃতির সহজ ও আন্তরিক প্রকাশের জন্য। দৃশ্যার্থ যেখানে দৃশ্যময়তার গণ্ডী ছাড়িয়ে সীমাহীনতায় গিয়ে পৌঁছয়। পল্লীজীবনের দৃশ্যাবলী যেন আমাদের ধরাছোঁয়ার সীমার মধ্যে এসে পড়ে। রূপ ও বর্ণের সঙ্গে যেন সোঁদা গন্ধও নাকে এসে লাগে। এসব সম্ভব হয়েছে সুব্রত মিত্রের ক্যামেরাচালনায় ব্যবহারিক দক্ষতার জন্য। ছবি তৈরীর ব্যাপারে বংশী চন্দ্রগুপ্ত আর সত্যজিৎ ছিলেন একে অপরের পরিপূরক। দুজনেই চিত্রশিল্পী ও প্রয়োগধর্মী শিল্পী। তাই বংশী চন্দ্রগুপ্তর কাজ আর সত্যজিৎ রায়ের ভাবনা মিলে মিশে এক হয়ে বাস্তবতার এক ঘন সংবেদ্য প্রকাশ ঘটিয়েছে এই ছবিতে।

১৯৫৫ সাল। আমরা তখন কিশোর। 'পথের পাঁচালী' ছবিটির সঙ্গে প্রথম পরিচয় দৈর্ঘ্য-প্রস্থে কুড়ি ফুট বাই আট ফুট একটি বিশাল বিজ্ঞাপন, ইংরেজিতে যাকে

বলা হয় বিলবোর্ড, তার মাধ্যমে। ঠিক চৌরঙ্গীর চাররাস্তার সংগমস্থানে। ধবধবে শাদা প্রকাণ্ড আকারের বিজ্ঞাপন প্রচারচিত্র, তাতে তুলির টানে ছন্দোময় ভাবে লেখা 'পথের পাঁচালী'। শব্দকটি যেন রেখার বাধাকে অতিক্রম করে অনির্দিষ্টের দিকে উড়ে যাওয়ার ইংগিত দিচ্ছে। আর বর্ষাকালের কালো বিশাল একখানা মেঘের নীচে প্রাণচঞ্চল দুটি ছেলে মেয়ের ছুটে যাওয়ার আনন্দময় প্রকাশ। সিনেমার বিজ্ঞাপন যে এমন হতে পারে তখন তা ছিল আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে। হিসেবী লোকের সাধারণ চোখে মনে হবে স্পেসের কি অপচয়। পাত্র-পাত্রীর পরিচয় বা অভিনেতা-অভিনেত্রীর ছবি কিছু নেই। থাকবেই বা কি করে? কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী ও রেবাদেবী চলচ্চিত্র জগতের সংগে যুক্ত থাকলেও খুব জনপ্রিয় নন। চুনিবালার বহুদিন যাবৎ এ জগতের সঙ্গে কোন যোগসম্পর্ক নেই। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, 'জনান্তিক' ও 'প্রতিধ্বনি' নামে সলিল চৌধুরীর দুটি নাটকে অভিনয়ও করেছেন ১৯৫০ সালে। তবে এঁদের কারুরই প্রচারমূল্য এমন নয় যে ছবির বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা জরুরী হয়ে পড়বে। যাই হোক এই ছবিটি যে একটু স্বতন্ত্র ধরনের হবে ঐ বিজ্ঞাপন তারই ইংগিত দিচ্ছে। ছবির মুক্তির আগে বেশ কিছুদিন ধরে শহরের বিভিন্ন জায়গার টাঙানো এমন নতুন ধরনের বিজ্ঞাপন আমাদের কল্পনাকে প্রসারিত করতে ও নানা শাখাপ্রশাখায় বিস্তার করতে সাহায্য করেছে। অপু আমাদের খুব প্রিয় চরিত্র। আমরা তখনও তার মতো অবাক হই, বিস্ময় বোধ করি, স্বপ্ন দেখি। আমরা সবাই তখন আশায় ভবিষ্যৎ গড়ার কাজে- মশগুল। ভারতবর্ষ মাত্র কয়েকবছর হল স্বাধীন হয়েছে। যে সময়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে, তখন তার অর্থনীতি প্রায় সম্পূর্ণ গতিহীন। পরিসংখ্যান রায় দেয় যে ব্রিটিশ শাসনের শেষ দশকগুলিতে ভারতের অর্থনৈতিক গতির চাকা ঘুরছিল উল্টোদিকে। স্বাধীনতার কিছুদিন আগে, ১৯৪৩ সালে, এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের গ্রাসে পড়তে হয় দেশকে। বাংলায় ঐ অখ্যাত পঞ্চাশের মন্বন্তরে প্রায় তিরিশ লাখ লোক প্রাণ হারায়। এর জের কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর দেশবিভাগ বাঙালীর জীবনকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দেয়। অখণ্ড বাংলার চারভাগের প্রায় তিনভাগ তখনকার পূর্ব পাকিস্থানের ভাগে পড়ার জন্যও বিপুল সংখ্যক হিন্দু বাঙালী এই বাংলায় জড়ো হয় উদ্বাস্তু হিসেবে। তথাকথিত কোমলপ্রাণ, অলসচিত্ত বাঙালী এই বিপর্যয়কে মোকাবিলা করে কিভাবে নিজেদের পুনর্বাসন ও নবজীবন গড়ে তুলেছে সে হল পঞ্চাশের ইতিহাস। এই বাংলার পূর্বকথা হল 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট। দেশের স্বাধীনতা লাভ, যে রকমই হোক না, মানুষের মনের রুদ্ধ আবেগকে অনেকটা মুক্ত করে দেয়। সেই মনের ভাব নিয়েই চারিদিকের হতশ্রী অবস্থার মধ্যেও আমরা ডাক শুনেছি তখনকার সরকারের—পঞ্চপার্ষিকী পরিকল্পনা, পঞ্চশীল নীতি, মুদ্রার দশমিকিকরণ নানা পদক্ষেপে নতুন ভারত গড়ার আহ্বান। পশ্চিমবঙ্গে দেশভাগ-জনিত সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়কে রোধ করার জন্য শিল্পী সাহিত্যিকরা দৃঢ় সংকল্পে স্থির এক সুস্থ সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় স্বাধীন মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার, যা কিছু জীর্ণ পুরাতন অক্ষম তা ভেঙে ফেলার।

এমন পরিস্থিতিতে 'পথের পাঁচালী'কে আমরা স্বাগত জানিয়েছি মুক্ত চিত্তে। নিজেদের ভাবনা আশা কল্পনা আর ইচ্ছাকে রূপায়িত করার বাসনায়। নাট্য আন্দোলন এগোচ্ছে জোর কদমে। গ্রুপ থিয়েটারের আন্দোলন তখনও প্রবলভাবে দানা বাঁধে নি। বিজন ভট্টাচার্যর 'নবান্ন' সকলকে চমকিত করেছে আর বহুরূপীর দল একের পর এক নতুন নতুন প্রযোজনায় ধারাবাহিক ভাবে আমাদের রুচি বদলের কাজ করে যাচ্ছে। কষ্ট করেও ভাঙা মঞ্চে শিশির ভাদুড়ী করে যাচ্ছেন তাঁর শেষ অভিনয়গুলি। অন্য দিকে শিল্পসাহিত্য নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। সাহিত্যপত্রের জোয়ার তখন। চতুরঙ্গ, পরিচয়, কবিতা, পূর্বাশা, উত্তরসূরী, নতুন সাহিত্য, সুন্দরমের মত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। সব মিলেমিশে সাংস্কৃতিক জগৎকে মাতিয়ে রেখেছেন শিল্পী সাহিত্যিকেরা। সে তুলনায় একমাত্র চলচ্চিত্রেই তেমন উৎসাহব্যঞ্জক কিছু হচ্ছিল না। যদিও মোটামুটিভাবে বলতে গেলে চল্লিশের দশক থেকে বাঙলা ছবিতে কিছুটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই বিষয়বস্তুতে সমাজচেতনা, তারকাপ্রথা অগ্রাহ্য করে আনকোরা নতুন অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে কাজ করা আর সেই সঙ্গে চলচ্চিত্রের উপযুক্ত চিত্রনাট্য ও কাহিনি বিন্যাসের ঢঙ থেকে। তবে সেসব ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দু একটা ছবিতেই। তখনকার দিনে সবচেয়ে সাড়া জাগানো ছবি 'উদয়ের পথে'। দেশাত্মবোধের আবেদন দেখা যায় 'ভুলি নাই', '৪২'-এ। 'বসু পরিবার', 'সাড়ে চুয়াত্তর' চিত্রোপযোগী গুনে উৎরে যাওয়া ছবি। নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' আর একটা সাড়া জাগানো ছবি। এমন কয়েকটি হাতে গোনা ছবির প্রচেষ্টা দেখা গেলেও প্রধান লক্ষ ছিল দর্শকের মামুলি প্রথায় মনোরঞ্জনের। বিষয়বস্তুর গভীরতায় এবং চরিত্র ও পরিবেশের ব্যঞ্জনাময় ডিটেলসমৃদ্ধ চলচ্চিত্রধর্মী প্রকাশের ফলে ছবিও যে স্মরণীয় শিল্পসৃষ্টি হয়ে উঠতে পারে এরকম গভীর চিন্তা বা নিষ্ঠাবান প্রচেষ্টা কারুর মধ্যে দেখা যায় নি। সে হিসেবে 'পথের পাঁচালী' ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতে এক সুস্পষ্ট দিকচিহ্ন। থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়ের পৌনঃপুনিকতার অবসান ঘটিয়ে এই ছবির আবির্ভাবের পর বাংলা ছবি তার রূপৈশ্বর্য খুঁজে পেল। যে কোন যুগান্তকারী সৃষ্টির পেছনে এক নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট পরম্পরা লক্ষ করা যায়। চলচ্চিত্র যেহেতু বিশ্বজনীন শিল্পমাধ্যম তাই এর ভাষার বিকাশের পরিক্রমার চিহ্ন পাই সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য চিত্রসৃষ্টির প্রচেষ্টায়। গ্রিফিথ, আইজেনস্টাইন, চ্যাপলিন, দোভজেঙ্কো, পুদভকিন, দনস্কয়, অরসন ওয়েল্‌স, রেনোয়া, ডি সিকার সৃষ্টিতে যে ভাষার বিকাশ তারই উত্তরসূরী এই 'পথের পাঁচালী'। তবে, এর বৈশিষ্ট্য হলো বিন্যাসে ভারতীয় শিল্পপ্রকরণের ছাপ যা বিষয়ের সঙ্গে মিলে এক অনাস্বাদিত কাব্যিক অনুভূতির সঞ্চার করে। এমন ছন্দে এমন রূপে পরিচালক তাঁর নিজস্বতার প্রকাশ ঘটালেন, যার মৌলিকত্বে সারা দুনিয়া স্তম্ভিত ও অভিভূত। বিশ্বের মানচিত্রে সকল ভারতীয়ত্ব নিয়ে হাজির হল একটি বাংলা চলচ্চিত্র চরম আর্থিক দৈন্যদশার মধ্য দিয়ে যেটা তৈরী। কিন্তু প্রকাশভঙ্গীতে মোটেই দীনহীন নয়, বরং অহংকারী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সত্যজিৎ রায় নিজেও সে কথা বলেন, "আমার প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী' যে ভীষণ অন্যরকমের কিছু হবে, তা নিয়ে আলোচনা

বিতর্ক হবে তা আমি জানতাম। সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষাতেই ছবিটা করেছিলাম।'' 'পথের পাঁচালী' আমাদের আশাকে সীমাহীন করার সাহস জুগিয়েছে, নতুনত্বের প্লাবন এনে দিয়েছে—সেই জোয়ারেই চলে এল এক সঙ্গে একরাশ নতুন ভাবনার পরিচালক। ঋত্বিক ঘটক সমাজ সচেতনতায় তাঁদের মধ্যে পুরোধা ও বলিষ্ঠ।

১৯৫৫। শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন মারা যান এবছর। প্রেসিডেন্সী কলেজের শতবর্ষ পূর্ণ হল। হিন্দু বিবাহ আইন প্রণয়ন হল পার্লামেন্টে। আর কলকাতায় ৪টি প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হলো 'পথের পাঁচালী'। ২৬ অগষ্ট ১৯৫৫। অনেক দর্শক এমন একটি ছবিকে গ্রহণ করতে অপ্রস্তুত ছিলো। সেটা নিতান্তই ছবি· সম্পর্কে তাদের ব্যক্তিগত ধারনা ও প্রত্যাশার ভিত্তিতে। আবার অনেকের কাছে এ ছবিটি বিস্ময়কর বোধ হয়েছিল। এও ছবি সম্পর্কে তাদের প্রত্যাশার মাপকাঠিতে ও শিল্প সম্পর্কে সামগ্রিক বোধের ভিত্তিতে। এ ছবি নিয়ে যত লেখা হয়েছে হয়ত আর অন্য কোন ছবি নিয়ে ততটা হয় নি। দেশে বিদেশে এ ছবি কি রকম হৈ চৈ ফেলেছিল তার খবর প্রায় সকলেরই জানা। পঞ্চাশ বছর পার হয়ে আসার পর তার আবেদন কি কিছু কমেছে? ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত উপন্যাসটির আবেদন কিন্তু প্রকাশের পঁচাত্তর বছর পার হয়ে আসার পথে অনেকটাই ম্লান। উপন্যাসের বিবৃত জগৎ এখন অচেনা লাগে, লেখকের বিস্ময়বোধ ও মুগ্ধতাকে একটু সরলমাত্রিক মনে হয়। সত্যজিৎ রায় বিষয়টিকে দেখলেন বিভূতিভূষণের চোখ দিয়ে না, নিজস্ব উপলব্ধিতে। উপন্যাসের অবাক করা বিহ্বলতাকে তিনি পাল্‌টে প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ঘাত প্রতিঘাতের উপর জোর দিলেন। সামাজিক অর্থনৈতিক কারণে একটি পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে গ্রামের মধ্যে, গ্রাম থেকে। আর সেজন্য তারা গ্রামছাড়া হয়ে যাচ্ছে। কালের অমোঘ নিয়মে মানুষের সৃষ্ট পারিপার্শ্বিকতাই মানুষকে সনাতন জীবনযাত্রার কেন্দ্র থেকে ছিট্‌কে ফেলে অন্যত্র, এ যেন এক অদৃষ্ট নিয়তির খেলা। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' মনে পড়ে যায় এই সূত্রে।

ছবির 'পথের পাঁচালী'কে আমি অপুর পাঁচালী বলব না। বরং এ ছবি ইন্দির ঠাকুরণের, সর্বজয়ার, দুর্গার। অপু এখানে দর্শকমাত্র, যে এই জটিল রহস্যময় নিষ্ঠুর জগৎকে দেখছে শিশুমন দিয়ে। ছবিতে তার ভূমিকা অনেকটাই গৌণ। তার অবাক করা চোখে সে দেখছে প্রকৃতি, নিসর্গ, রেলগাড়ি, কাশবন আর চেনাশোনা মানুষদের। উপভোগ করে সে মায়ের স্নেহ, বাবার প্রশ্রয় আর দিদির শাসন জড়ানো ভালবাসা। পিসির কাছে সে রূপকথার গল্প শোনে, দিদির সঙ্গে অচেনা অজানা জায়গায় বেড়াতে যায়, রেলগাড়ির রহস্য তাকে টানে, সে বিশ্বাস করতে চায় না দিদি পুঁতির মালা চুরি করেছে। দিদির মৃত্যুর পর লুকানো জায়গা থেকে সেটা বের হওয়া মাত্র ছুড়ে পাঠিয়ে দেয় লোকচক্ষুর অন্তরালে। তবু সে 'পথের পাঁচালী'র প্রধান চরিত্র না। তবে কে? অনেকে বলবে গ্রাম বাংলা। তাও না। গ্রাম বাংলা শুধুই প্রেক্ষাপট, তার সৌন্দর্য আর নিষ্ঠুরতা নিয়ে। এই ছবির প্রধান চরিত্র মানুষেরা। একে একে এক একটি চরিত্র

প্রধান হয়ে ওঠে। এক সময় মনে হয় ইন্দির ঠাকুরণ এ ছবির অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। এমন একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্রকে পরিচালক তাঁর ছবির বিন্যাসে একটা বিশেষ গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। অস্তিত্ব নিয়ে সংকট আর আশ্রয়হীনতা ছবির বিষয়ের একটা দিক হিসেবে ভাবা হলে ইন্দির ঠাকুরণ তার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। 'হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল পার কর আমারে'। মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমান এই দীন মানুষটি জীবনের শেষ কটি দিনের জন্য একটু আশ্রয় চায়। সব খুইয়েও যেন আত্মসম্মানের তলানিটুকু নিয়ে বাঁচতে পারে। তাই সম্বলহীন নিঃসহায় নিরাশ্রয় মানুষটির ঠাঁইয়ের জন্য এত আকুতি। সর্বজয়াও দারিদ্রের শিকার। সে ছাড়া আর বাকী তিনটে মুখের অন্ন যোগাতেই সে দিশেহারা। তার কাছে আর একটি মুখের অন্ন যোগান যেন বাড়তি বোঝা। অবস্থাই তাকে হীনমনা করে তুলেছে। নিষ্ঠুর আচরণ যেন না খেতে পাওয়ার মত অবস্থায় পড়ার আশঙ্কার বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ ব্যবস্থা। তাই ইন্দির ঠাকুরণের স্থান হয় না। মৃত্যুর জন্য তার একটু আশ্রয়ও জোটে না। মরে বাঁশবাগানে লোকচক্ষুর অন্তরালে। স্নেহ মমতা ত দূর অস্ত (পঞ্চাশের দশকের বাংলার অবস্থা ছিল এমন-ই)। দুর্গা এ-ছবিতে দাপিয়ে বেড়ায়। তার প্রাণোচ্ছল প্রকৃতি কোন আবরণ কোন সামাজিক বাছ-বিচার, ভালমন্দ মানে না। সে চুরি করে হ্যাংলামি করে। প্রাণের উচ্ছলতায় সে সব কিছু উপভোগ করতে চায়। ভালো অবস্থা খারাপ অবস্থার ভেদাভেদ সে জানে না। মনেও আসে না। সেটা বড়রা করে। তাই সে স্বীকার করে না তাদের দীন অবস্থাকে। পেড়া খাবার ইচ্ছায় সে ছুটে যায় ভাইকে নিয়ে চিনিবাস কাকার পেছন পেছন। মুখুজ্যে গিন্নী, সেজবউর মুখ ঝামটা সহ্য করেও সে বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলে অনায়াসে, হয়ত খাওয়ার লোভে। পুঁতির মালাটা তার এত পছন্দ যে সেটাকে পাবার জন্য চুরি করতেও পেছপা হয় না, বাড়ির লোকের তাকে লেখাপড়া শেখানর কোন আগ্রহ নেই বা ভাইয়ের সঙ্গে মায়ের ব্যবহারের পার্থক্য তার মনে কোন অভিযোগ তোলে না। পিসিকে ছাড়া তার চলে না, তার জগতে পিসির আশ্রয় নির্দিষ্ট। সে ফল চুরি করে আনে পিসিকে খাওয়ানর জন্য, বাড়ি থেকে রাগ করে চলে গেলে পিসিকে জোর করে ডেকে আনতে যায়, পিসি বাড়ি ফিরে এলে সে সবচেয়ে বেশী খুশী হয়। বাড়ির সামান্য দুধটুকুরও ভাগ দেয় তার পোষা বেড়ালছানাকে। আচার খাওয়ার সঙ্গী করে ভাইকে, স্কুলে পাঠানোর সময় চুল আঁচড়ে তাকে সাজিয়ে তোলে। পূণ্যিপুকুর ব্রত করে আর বন্ধুদের সাথে চড়ুইভাতি। অপুকে নিয়ে কাশবনে বেড়াতে চলে যায়, রেলগাড়ির শব্দ তার মনকে টানে, যদিও শেষ পর্যন্ত তার আর রেলগাড়ি দেখা হয় না। বৃষ্টিতে ভিজতে ভালবাসে প্রাণভরে। এই দুরন্ত প্রাণবন্ত মেয়েটি 'পথের পাঁচালী' ছবির সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র। তার মৃত্যুতে আমরা টের পাই ছবির আগাগোড়া সে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে ছিল। আমরা কি এতক্ষণ তার প্রতি খেয়ালশূন্য ছিলাম? আমাদের নজর কি অপুর দিকে ছিল? হরিহরের আর্তনাদ আর সর্বজয়ার ভেঙ্গে গড়ার মুহূর্তে আমরা অনুভব করি কাহিনির কতখানি হৃদয় জুড়ে ছিল এই কিশোরীটি। তাই তার মৃত্যু ছবির পরিণতির সূচনা করে। এরপর আর যেন

কিছু বলার থাকে না। আমাদেরও আকর্ষণও ফুরিয়ে যায়। তার মৃত্যুশোক পরিবারকে গ্রাম ছাড়া করে।

'পথের পাঁচালী' ছবিটি নিয়ে গত পঞ্চাশ বছরে অসংখ্য লেখালেখি হয়েছে দেশে বিদেশে সর্বত্র। এত সংখ্যক লেখা তাঁর আর কোন ছবি নিয়ে হয়েছে কি না, অনুমান-সাপেক্ষ। সত্যজিৎ রায় পরবর্তীকালে আরও পরিণত আরও সুদক্ষ ছবি তৈরী করলেও তাঁর নাম যেন আষ্টেপৃষ্টে এই ছবির সঙ্গেই জড়িয়ে আছে, এর কারণ হয়ত এই যে এমন একটা টাটকা তাজা ছবি যা প্রয়োগের সব চিন্তাকে তছনছ করে দিয়ে আমাদের সেই পঞ্চাশের দশকে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত প্রাণমন মাতিয়ে দিয়েছিল।

'পথের পাঁচালী'র প্রস্তুতকালীন কষ্টসাধনের কথা প্রায় কিংবদন্তী হয়ে গেছে। এ ছবির পুরস্কারের তালিকা সব চেয়ে দীর্ঘ এবং এ ছবি থেকে রোজগারের অংশটাও বেশ পুষ্ট। তবে একে কি সত্যজিৎ রায়ের শ্রেষ্ঠ ছবি বলে গণ্য করা হয়? সত্যজিৎ রায় অবশ্য বলেছেন পথের পাঁচালীর কয়েকটি দৃশ্যে ঠিক জায়গায় ক্যামেরা বসান হয় নি বা উপযুক্ত লেন্স ব্যবহার করা হয় নি বলে কিছু কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে, যেটা শোধরাতে হলে নতুন করে শুটিং করার দরকার হত। একেবারে আনকোরা হাত, তার সঙ্গে চরম আর্থিক টানাটানি, তাই বারবার ভাঁড়ার শূন্য হয়ে যাওয়ার জন্য হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা, আবার টাকার জোগাড় হলে ছবির কাজ শুরু করা, এ রকম পরিস্থিতিতে ছবির মান কিছুটা ত খর্ব হবেই। এসব সত্ত্বেও 'পথের পাঁচালী' শুধু বাংলা ছবির ক্ষেত্রে না সমগ্র ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যা আমাদের আজও মুগ্ধ করে, শতাব্দী জুড়ে আরও অসংখ্য মানুষকে মুগ্ধ করে রাখবে। আশা রাখি, তখনও ছেলেমেয়েদের মধ্যে চিরকালীন অপুর দেখা মিলবে, যারা অবাক হতে পারে, বিস্ময় বোধ করে, স্বপ্ন দেখে। জ্ঞানের সীমা যাদের কল্পনার জগৎকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলে নি। শিল্প যেহেতু সৃষ্টি, তাই জীবধর্মী, জীবের মত তার অস্তিত্বের ধারা প্রবহমান কাল ধরে চলে। চিরায়ত শিল্পের এটাই লক্ষণ।

এই ছবির শেষ দৃশ্যে মুখুজ্জ্যে গিন্নী সেজবউ সর্বজয়াকে বলে, 'বছরের পর বছর একজায়গায় গুণ পুঁতে বসে থাকা—এ ভালো না ছোট বউ। এতে মানুষের মন বড় ছোট হয়ে যায়।' তাঁর শেষ ছবি 'আগন্তুক'-এর শেষ দৃশ্যে মনোমোহন তার তৃতীয় প্রজন্মের বাবলুকে বলে, 'এইবার ছোট দাদু দেবে ছুট। ...এবার তুমি আসবে আমার কাছে, আর কোন জিনিসটা কখনো হবে না কথা দিয়েছ? কূপমণ্ডুক। মনে থাকে যেন।'

সীমাকে লঙ্ঘন করে বেড়িয়ে পড়ার এই ডাক শোনা যায় তাঁর প্রায় সব ছবিতেই।

‘পথের পাঁচালী’
সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রে

মানসকুমার কুণ্ডু

চলচ্চিত্র যখন নির্বাচন করে সাহিত্যের আখ্যান, এক পাঠ থেকে অন্য পাঠে বদলে যায় স্বর : এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে ঘটে পুনর্নির্মাণ। ‘গল্প’ আর ‘গল্পবলা’ মাধ্যমের পার্থক্যে বদলে যায়। ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাস যেমন চলচ্চিত্র-পাঠে বদলে গেছে। চলচ্চিত্রের নির্বাচনে প্রধান কথা গ্রহণ-বর্জন। উপন্যাস থেকে গ্রহণ-বর্জনের প্রকৃতি-ই শেষপর্যন্ত জন্ম দেবে এক নতুন পাঠের। চলচ্চিত্রের আখ্যানকার বলছেন নতুন গল্প, আর এই গল্পবলা তার নিজস্ব মাধ্যমের উপর একান্ত নির্ভরশীল। কথনের এই নতুন বিন্যাস নিয়ে ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের জন্মলগ্নেই, ১৯২৯ সালে সারকথাটি বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ : ‘দৃশ্যের গতিপ্রবাহ...রূপের চলৎপ্রবাহই বা কেন একটি স্বতন্ত্র রসসৃষ্টিরূপে উন্মেষিত হবে না।’[১] দৃশ্যের সঙ্গে দৃশ্য জুড়ে যে দ্বিমাত্রিক রসসৃষ্টির কল্পনা, সাহিত্যের ভাষাবাহিত ব্যাখ্যানের ক্রিয়াশীলতার সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। পার্থক্যের এই বোধ থেকে প্রস্তুত হবে চিত্রনাট্য আর ক্যামেরা-প্রেক্ষণের নির্দিষ্ট সংস্থান।

শেক্সপিয়ারের দর্শনভাষ্য পোলানস্কির চলচ্চিত্রভাষায় রূপান্তরিত হয়নি : পোলানস্কির ‘ম্যাকবেথ’ নিয়ে এই ছিল তারকোভস্কির আপত্তির কারণ। ঔপন্যাসিক স্তানিসোয়াভ লেম তাঁর উপন্যাসের অন্তর্গত ভাষ্য খুঁজে পান না তারকোভ্স্কির ‘সোলারিস’ ছবিতে। সাহিত্য আর চলচ্চিত্রের ভিন্ন পাঠ নিয়ে বিবদমান দুইপক্ষের সংঘাত পৃথিবীর সবদেশেই একটা সাধারণ ঘটনা। সত্যজিৎ রায়, বাংলা সাহিত্য থেকে যখন তাঁর ছবির গল্প নির্বাচন করেন, ‘পথের পাঁচালী’ থেকে ‘ঘরে বাইরে’ বর্যন্ত সমালোচনার একটি প্রধান বক্তব্যই তৈরি হবে, সত্যজিতের চলচ্চিত্রভাষ্যকে কেন্দ্র করে। চলচ্চিত্র পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রের দর্শককে দীক্ষিত করাও হবে সত্যজিতের একটা প্রধান কাজ। পরিচালনার জগতে আসার কিছু পূর্বে, ১৯৪৮ সালে, সত্যজিৎ বুঝতে চান, ‘What is Wrong with Indian Films?’ : ‘In the adaptations of novels, one of two courses has been followed : either the story has been distorted to conform to the Hollywood formula, or it has been produced with such devout faithfulness to the original that the purpose of a filmic interpretation has been defeated.’[২] আখ্যানের বিকৃতি নয়, পুঙ্খানুপুঙ্খের উপস্থাপন-ও

নয়, কেবল গল্পের অবয়বটুকু : এই হলো নির্বাচনের কোনো একক মাত্রা। "পথের পাঁচালীতে আমি...একটা সাহিত্যের ক্ল্যাসিককে ধরে রূপ দিচ্ছিলাম এবং সেখানে মানুষে মানুষে সম্পর্ক, দারিদ্র, এটাই ছিল বড় ব্যাপার, তার মধ্যে, ফ্যামিলি ইউনিটের মধ্যে কি কি সমস্যা আসে, আসতে পারে, থাকতে পারে..."[৩]

নিঃসন্দেহে 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের এটাই একমাত্র স্তরমাত্রা নয়। পাঁচালীর সংস্থান আরো বড়। 'বল্লালী বালাই' থেকে 'অক্রূর সংবাদ' পেরিয়ে 'পথের দেবতা' উপন্যাসের ফ্রেম-কে 'জানার গন্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশে...' নিয়ে যায় : 'অনির্বাণ তার বীণা শোনে শুধু অনন্তকাল আর অনন্ত আকাশ...'। সত্যজিতের পাঠ তাঁর নিজস্ব পাঠ। সত্যজিতের পাঠ সময় আর পরিসরকে সংক্ষিপ্ত করা, কাহিনির মন্থর আভাস জাগানো, কার্যকারণ সম্পর্কসূচক এক ফ্রেম। উপন্যাস সেই ফ্রেম-কে ভেঙে দিয়েছিল।

সত্যজিৎ বলতে চেয়েছিলেন : 'ছবিতে আমাদের গল্প বলে একটা জিনিস থাকে। সেই গল্পটাই ছবির চরিত্রকে নির্ধারিত করে। মানে ছবির ফর্মটাকে সেই গল্পটাই তৈরী করে, সৃষ্টি করে, উদ্বুদ্ধ হয়।'[৪] ফর্ম আর কনটেন্ট যে অবিচ্ছেদ্য, এটা কোনো নতুন কথা নয়। কিন্তু মাধ্যমভেদে ফর্ম আর কনটেন্টের সাঙ্গীকরণ পৃথক। 'লিখিত ভাষা' আর 'গতিশীল ছবি' : দুই আবেদনের ভিন্নমাত্রায় সত্যজিৎ বলবেন 'উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে আজ অবধি এমন কোন সার্থক চলচ্চিত্র রচিত হয়নি, যেখানে পরিচালককে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি।'[৫] সত্যজিতের দৃষ্টিভঙ্গি 'অনন্তকাল আর অনন্ত আকাশ'-এর প্রেক্ষাপট থেকে এক মানবীয় আবেদনের গল্পকে নির্বাচন করে। চলচ্চিত্রের সংহত প্রেক্ষণে দেখা যাবে ভিন্ন কথক, অনূদিত বাচনে 'পথের পাঁচালী'র ভিন্ন বিন্যাস। 'গল্পবলা' আর তাকে গতিশীলতায় প্রকাশ : চলচ্চিত্রের এই 'সংজ্ঞা'য় মাধ্যমের পৃথক ভাষা নির্মাণ করবে পাঠের পৃথক ভাষ্য।

২

'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্ররূপের মুক্তি ১৯৫৫ সাল। তারও বছর তিনেক পূর্বে ১৯৫২ সালে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবছিলেন : 'পদ্মানদীর মাঝির চিত্ররূপ হবে বাংলা ছবির মোড় ঘুরবার প্রথম সার্থক নিদর্শন'।[৬] কারণ 'শুধু রোমান্স, রোমাঞ্চ, পুরাণ, ধর্ম' নয়, নতুন যুগের দাবি—'বাস্তব মানুষের বাস্তব জীবন।' শিল্পের বাস্তবতা কিছু একমাত্রিক ব্যাপার নয়। সাহিত্যের সমসাময়িক তিন বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তবতারই বহুমাত্রিক বর্ণালীর জন্ম দিয়েছেন। 'তখন কল্লোল যুগের সমারোহ কিন্তু আমি টের পেয়েছিলাম সাহিত্য যে মোড় ঘুরছে কল্লোলী সাহিত্য তার লক্ষণমাত্র, আসল পরিবর্তন আসবে অন্যরূপে—সাহিত্য ক্রমে ক্রমে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে।'[৭] কিন্তু বাস্তবধর্মিতার তাত্ত্বিকভিত্তি নিয়ে বিভূতিভূষণ ভাবিত নন। বিভূতিভূষণের অন্বিষ্ট 'সত্যিকার ইতিহাস' : 'মানুষের মনের ইতিহাস, তার প্রাণের ইতিহাস'।[৮] সেও বাস্তবতারই কাহিনি। অন্তর্লীন এই বাস্তবকে তিনি রূপ দিতে চান এক প্রাকৃতিক পটে। পটধৃত বালকের

যাত্রাপথ উপন্যাসে যুক্ত হবে কালের বিরাটত্বের প্রতিমায়। আদি-মধ্য-অন্তহীন উপন্যাসে এক ভারতীয় বাস্তবেরই প্রাধান্য। প্রবাহের বোধ এখানে স্থায়ীরসের কাজ করে।

একদিকে বিরাট অন্যদিকে ক্ষুদ্র, একদিকে অশেষ অন্যদিকে তুচ্ছ : জীবনপ্রবাহের এক সমগ্রতাই বিভূতিভূষণের কাম্য। 'পথের ধারে যেসব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে—তাদের কথাই বলতে হবে, তাদের সে গোপন সুখদুঃখকে রূপ দিতে হবে।'[৯] 'পথের পাঁচালী' অন্যদিকে আমাদের সেই গোপন সুখদুঃখের পাঁচালী। জীবনের ভারে জমে থাকা 'কোটরগত অনেকখানি জল' যখন 'শীর্ণ গাল-দুটো বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল', তখন 'বিরাগ ভরা বিবেকে'র বাস্তব স্তম্ভিত হয়। কিন্তু এক বল্লালী বালাইর মৃত্যু 'গ্রামে সেকালের অবসান' মাত্রই। কথকের নির্লিপ্তি আমাদের আরো বৃহৎ বাস্তবের মুখোমুখি করে। বিনা বাক্যব্যয়ে 'পথের বাঁকের আড়াল হইতে একট ছয় সাত বছরের ফুটফুটে সুন্দর, ছিপছিপে চেহারার ছেলে ছুটিয়া' আসে। 'হরিহর বলিল আবার পিছিয়ে পড়লে এরি মধ্যে? নাও এগিয়ে চলো—'

সাহিত্যের প্রবাহ ভাষাবাহিত সংরচনা। চলচ্চিত্রের প্রবাহ একাধিক দৃশ্যচ্ছবির সংযুক্ত বয়নে গ্রথিত। বিষয় আর টেকনিকের বাস্তবতা চলচ্চিত্রে দেখা অন্তর্নিহিত ডিটেলের ঐক্যবোধে। সত্যজিৎ বলবেন : 'কাহিনী কাল্পনিক হলেও পাঠকের মনে সেটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে ডিটেলের সাহায্যে তার একটি বাস্তব পটভূমিকা রচনা করে নিতে হয়।'[১০] ডিটেল অলংকারমাত্র নয়, ডিটেলের বোধ পাঁচালীর পঞ্চত্রিংশটি অধ্যায়কে ভেঙে দেয় এগারোটি নিটোল বিন্যাসে। সর্বজয়া-ইন্দিরের বিরোধ আর ছোট্ট দুর্গার স্নেহের প্রচ্ছায়ায় অপুর জন্ম থেকে হরিহরের নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগের মধ্যে দিয়ে কাহিনির সমাপ্তি। মধ্যবর্তী ঘটনাপর্ব পারিবারিক সম্পর্ক আর সংঘাতের দৃশ্যে নির্মিত। প্রত্যেকটি দৃশ্যের থাকবে একটি কেন্দ্রীয় বোধ। অন্তর্দৃশ্যগুলি জুড়ে জুড়ে যার সৃষ্টি। ধরা যাক গুরুত্বপূর্ণ এই পঞ্চম দৃশ্যটি—স্বরতরঙ্গ প্রথমে উচ্চগ্রামে বাঁধা। সেজো বউ-এর অভিযোগ, সর্বজয়ার দারিদ্রের অপমানের ক্ষোভক্লান্তি। পরিণতি দুর্গার লাঞ্ছনা। রুদ্ধ সংগীতের ভিতর ইন্দিরের 'কী হলো? কী হলো?' ডাক আর শেষপর্যন্ত অসহায় চেয়ে থাকা। অপু বই খুলে বসে। চতুর্থ দৃশ্যে ছিল এক সংলগ্ন সন্ধ্যার ছবি, আজ প্রদীপের আলো থমথমে। 'দুর্গা পিসির কোলে মাথা রেখে শুয়ে, অপু দুর্গার গা ঘেঁসে।' ইন্দির রূপকথার গল্প শোনায়। হরিহরের প্রবেশ। মাছ এনেছে। দুর্গা রান্নাঘরে, সর্বজয়া অভিব্যক্তিহীন। হরিহর তিনমাসের বকেয়া মাইনে সর্বজয়ার হাতে দেয়। কিন্তু অর্থহীন সকালের অপমান দিনান্তকে স্তব্ধ রাখে। পরবর্তী তিনটি ছোটো অন্তর্দৃশ্যে হরিহর সর্বজয়ার সাংসারিক কথোপকথনে হরিহরের আশ্বাসবাক্যের মধ্যেই অপু দুর্গাকে জিজ্ঞাসা করে চুরির বিষয়; শোনা যায় ইন্দিরের একাকী গান। শোনা যায় রেলইঞ্জিনের বাঁশি। সর্বজয়া কাশীর কথা বলে।

প্রত্যেকটি দৃশ্য এক-একটি ডিটেল, দৃশ্যচ্ছবির বাস্তববিন্যাসে অর্থবহ। একটি দৃশ্য পরবর্তী দৃশ্যকে নিয়ে যাবে পরিণতির দিকে, জন্ম দেবে এক কেন্দ্রীয় নিটোলতা। জন্ম নেবে 'basic aspects of Indian life, where habit and speech, dress and

manners, backround and foreground, blend into a harmonious whole'।[১১] একই বাস্তবের মেলডি খুঁজবে উপন্যাস, দৃশ্যসংস্থানের ভিন্ন বিন্যাসে চলচ্চিত্র তাকে বদলে নেবে 'hormonious whole'-এ।

চলচ্চিত্রে 'বল্লালী বালাই'-এর সম্প্রসার দীর্ঘ, 'অক্রূর সংবাদ' বর্জিত হয়েছে। 'আম-আঁটির ভেঁপু'-ই চলচ্চিত্রের প্রধান নির্বাচন। চলচ্চিত্রের ঘনসংবদ্ধ বিন্যাসটি এখানে স্পষ্ট। চিত্রনাট্যের বিন্যাসের গাঁথনিতেই 'ছবির ভাষায় লিখিত ইঙ্গিত' থাকে। উপন্যাস আর চলচ্চিত্রের লক্ষ্য এখানে পৃথক। সত্যজিতের পাঠ এক মাইক্রো-র উপস্থাপনা। উপন্যাসের দীর্ঘ অংশ জুড়ে থাকে এক বাল্যের চোখ ও মন। চলচ্চিত্রের প্রেক্ষণ এখানে পৃথক। 'তথাকথিত ঘাত-প্রতিঘাত প্লটের অভাবে ঘটনার এই ওঠাপড়ার সাহায্যে সচেতনভাবে ছবিতে একটা ছন্দ আরোপ করা হয়েছিল।'[১২] 'গ্রামজীবনের নিস্তরঙ্গ মন্থর গতি' চলচ্চিত্রে বদলে গেল দৃশ্যের 'উত্থান-পতনে'। ফলে 'পথের পাঁচালী উপন্যাসের বারো আনা ঘটনাই ছবিতে ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি'। চলচ্চিত্রের প্রেক্ষণ এখানে প্লটনির্মাণ আর চরিত্রবিন্যাসের প্রতি যত্নশীল। প্লটের পূর্বস্মৃতি উপন্যাসে পাত্তা পায়নি। ফর্মের এই ভিন্নতা, স্বাভাবিকভাবেই, কনটেন্ট-কেও বদলে দেয়। সত্যজিতের ট্রিলজি আমাদের আলোচ্য নয়, কিন্তু 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের যদি হয় রৈখিক চলন, চলচ্চিত্র তবে তাকে বৃত্তাকারে অনুবাদ করেছে।

৩

এক প্রখ্যাত চিত্রকর লক্ষ করেছিলেন, 'পথের পাঁচালী'র scribbled visuals-এর 'dramatic' আর 'photographic' বৈশিষ্ট্য : '...in the tone and texture of image or image detail,....conjuring up an atmosphere changed with various shades of emotion'।[১৩] চিত্রশিল্পের বিদ্যা 'আম-আঁটির ভেঁপু'-র অলংকরণকে প্রসারিত করেছে চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যরচনায়। এত দিনে আমরা জানি, ছবি তৈরির পর্বে 'পথের পাঁচালী'র কোন সম্পূর্ণ লিখিত চিত্রনাট্য ছিল না। চিত্রনাট্যের নানান খশড়া থাকলেও, দৃশ্যের বিন্যাস ছিল মূলত ওয়াশ পদ্ধতির একাধিক স্কেচে। এছাড়া, 'চরিত্রগুলির চেহারা ও পোশাক, প্রাকৃতিক দৃশ্য, নানা অ্যাকশন ও কম্পোজিশনের সংকেত দেওয়া এইসব ছবি একটা খাতায় এঁকেছিলেন সত্যজিৎ রায়।'[১৪] এই চিত্রদৃশ্যই প্রাথমিক সংবেদনের উদ্‌গাতা। পাঁচালীর বিষয় আর আবহ নির্মাণে ওয়াশ মাধ্যমের ব্যবহারও লক্ষণীয়। চলচ্চিত্রের দৃশ্যভাবনা চিত্রবিন্যাসের স্পষ্টতায় অন্বিত। নিঃসন্দেহে এ হবে ডিটেলের এক মগ্নমাত্রা।

পরিচালকের ভূমিকা নিয়ে সত্যজিৎ ভেবেছিলেন, 'He (পরিচালক) has only to keep his eyes open, and his ears'। শিল্পের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা নিয়ে বিভূতিভূষণেরও ছিল অনুরূপ অনুভব : 'আসলে দেখে চোখ আর মন'। তুলি আর ক্যামেরার একটি সামান্যধর্ম বিভূতিভূষণও তাঁর উপন্যাসে প্রয়োগ করেন : 'দৌড়, দৌড়, দৌড়— নবাবগঞ্জের লাল রাস্তা ক্রমে অনেকদূর পিছাইয়া পড়িল—রোয়ার মাঠ, জলসত্রতলা,

ঠাকুরঝি পুকুর বামধারে, ডানধারে দূরে দূরে পড়িয়া রইল—সামনে একটা ছোটো বিল নজরে আসিতে লাগিল। তাহার দিদি হাসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল মা টের পেলে কিন্তু—পিঠের ছাল তুলবে। অপু একবার হাসিল—মরীয়ার হাসি। আবার দৌড়, দৌড়, দৌড়—জীবনে এই প্রথম বাধাহীন, গন্ডীহীন মুক্তির উল্লাসে তাহাদের তাজা তরুণ রক্ত তখন মাতিয়া উঠিয়াছিল—পরে কি হইবে, তাহা ভাবিবার অবসর কোথায়?'[১৫]

ঘটমান বর্তমানের এই বাক্যপ্রবাহ সংক্ষিপ্ততম সজীব সংলাপের নিঃশ্বাস ফেলেই পুনরায় ধাবিত হয়েছে। 'মরীয়ার হাসি' আর দিদির উদ্‌বিগ্নতা অভিজ্ঞতার দান। রেলগাড়ির অনুষঙ্গে বৃহৎ প্রেক্ষিতের দিকে দৌড়বার উল্লাস একটি রূপের নিটোল চলৎপ্রবাহ। সত্যজিৎ রায় একাধিক স্কেচ থেকে ক্যামেরার ভাষায় এই দৃশ্যের অনুবাদ করেছেন : 'হঠাৎ দুর্গা অপুর মুখে হাত দিয়ে তাকে থামিয়ে দেয়। কান পেতে শোনে, তারপর ফিসফিস করে বলে : 'রেলগাড়ি!' দুজনেই দাঁড়িয়ে ওঠে। এপাস ওপাস তাকায়। হঠাৎ দূরে ইঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা যায়।

তারা সেদিকে দৌড়ে যায়। দুর্গা হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়।

অপু দৌড়ে লাইনের কাছে পৌছয়।

সামনে দিয়ে সশব্দে ট্রেন চলে যায়।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপু দূরে ট্রেনের দিকে তাকিয়ে থাকে। ইঞ্জিনের ধোঁয়া কাশের উপর দিয়ে গড়িয়ে যায়।'[১৬]

প্রত্যেকটি বিভাজন এক-একটি 'shot'। ক্যামেরা বিভিন্ন প্রেক্ষণ থেকে দৃশ্যটি গ্রহণ করেছে। কেবল অপুর দৌড় আর তার সামনে দিয়ে রেলের ধাবমানতা নয়, সচল ক্যামেরাই এখানে গতির প্রধান উৎস। উপন্যাসে এ বর্ণনার পর অপু-দুর্গা রেলগাড়ি দেখেনি। চলচ্চিত্রে দুর্গা পড়ে যায়। তার ইন্টারপ্রিটেশন্ নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে। দুর্গাকে ফেলে দেবার উদ্দেশ্যে কাজ করছিল এক গভীর মন। কিন্তু চোখ দিয়ে দেখছে যে, উধাও রেলগাড়ির দিকে অপুর 'অনেকক্ষণ' তাকিয়ে থাকা : তাকেও দেখছে ক্যামেরা : 'অনেকক্ষণ'। ক্যামেরার মুহূর্তের নিশ্চলতা এখনে বাঙ্ময়। কাশের উপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া ধোঁয়ার ছবি dissolve করবে বাঁশঝাড়ের দৃশ্যে। উল্লাসের ধোঁয়া মিলিয়ে যাবে ইন্দিরের মৃত্যুঘটনার দৃশ্যায়নে। বৈপরীত্যের বৃত্তটিকে পূর্ণতা দেবার অভিপ্রায়েই কাশের উপর ধোঁয়ার ছবির কল্পনা। এই হলো চলচ্চিত্রের সংযোজন।

মাধ্যম থেকে মাধ্যমে নির্বাচনের গ্রহণ-বর্জনের সঙ্গে তাহলে যুক্ত হবে আরেকটি মাত্রা, সংযোজন। প্রকৃতপক্ষে এই সংযোজনের প্রকৃতির উপরই চলচ্চিত্রের 'সংগতি-অসসংগতি' নির্ভর করছে। সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রধান কাঠামো তার চিত্রনাট্য। দৃশ্যবিন্যাসের সাফল্য এক সমবায়ের ভিত্তিতে বাঁধা। শিল্পনির্দেশ, ক্যামেরা সংস্থান, সংগীতের ব্যবহার, সর্বোপরি অভিনয়-ক্রিয়া : সকল পর্বেই ঘটছে সংযোজন। সত্যজিৎ বলবেন : 'কাহিনীর ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে যা সাহায্য করবে, বক্তব্যকে যা পরিস্ফুট করবে তাই ঠিক, তাই শিল্পসম্মত। কাহিনীর প্রয়োজনের বাইরে যা কিছু

ক্যামেরার কারসাজি, ছবির সামগ্রিক বিচারে তার কোন মূল্য নেই।'[১১] মনে রাখতে হবে, এখানে 'কাহিনী' বলতে সাহিত্যবাহিত চলচ্চিত্রের নতুন কাহিনিবিন্যাসের কথাই বলা হচ্ছে। এই নতুন হলো গ্রহণ বর্জন-সংযোজনের মধ্যে দিয়ে এক নির্বাচন।

তাঁর সাহিত্যধারণার কথা বলতে গিয়ে বিভূতিভূষণ একবার বলেছিলেন, 'শিল্পীর সংযম ও দৃষ্টি নিয়ে'ই কেবল 'নির্বাচনের স্বাধীনতা'কে অনুভব করার কথা।[১৮] সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রে 'পথের পাঁচালী'র বিন্যাসের আদলেই 'সংযমে'র বহিঃপ্রকাশ। যদি পূর্বাপর কোন অন্তর্লীন ঐক্য অনুভবকেই 'দৃষ্টি' বলি তবে সৃষ্ট চলচ্চিত্রের রূপের প্রবাহেই তাকে খুঁজে পাবো। বন্ধু চিত্রশিল্পী দিনকর কৌশিক সত্যজিতের মন আর তাঁর চলচ্চিত্র-প্রকাশে লক্ষ করেন : 'প্রগাঢ় আবেগের নিয়ন্ত্রণহীন উচ্ছ্বাসের চেয়ে ওকে অনেক বেশী টানত সংযম ও স্থিরতা।'[১৯] উপন্যাসের আবেগপ্রবাহকে সংহত বিন্যাস দেবার পার্থক্যেই 'পথের পাঁচালী' ছবি চলচ্চিত্রভাষার দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

উল্লেখ সূত্র

১. শ্রীমুরারি ভাদুড়ীকে লেখা পত্র : ২৬ নভেম্বর, ১৯২৯। দেশ, ১৭ জুন, ১৯৯৫।
২. Satyajit Ray, *Our Films their Films*।
৩. সাক্ষাৎকার দেন, ১৮ এপ্রিল ১৯৮৭।
৪. সাক্ষাৎকার ঐ (৩)।
৫. সত্যজিৎ রায়, '*অপুর সংসার*' প্রসঙ্গে, *বিষয় চলচ্চিত্র*।
৬. শ্রীমাধব ঘোষালকে লেখা পত্র : ২ অগাষ্ট, ১৯৫২। এক্ষণ, শারদীয়, ১৩৮২।
৭. ঐ (৬)।
৮. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'স্মৃতির রেখা', *দিনের পরে দিন*।
৯. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্যের কথা', *দিনের পরে দিন*।
১০. সত্যজিৎ রায়, 'ডিটেল সম্পর্কে দু'চার কথা', *বিষয় চলচ্চিত্র*।
১১. ঐ (২)
১২. সত্যজিৎ রায়, 'পথের পাঁচালী চিত্রনাট্য প্রসঙ্গে'। এক্ষণ, শারদীয়, ১৩৯০।
১৩. K.G. Subramanyan 'The Graphic Talent of Satyajit Ray', Edited by Santi Das, *Satyajit Ray : An Intimate Master*।
১৪. 'সম্পাদকের কথা'। ঐ (১২)
১৫. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পথের পাঁচালী* (ষোড়শ পরিচ্ছেদ)।
১৬. সত্যজিৎ রায়, পথের পাঁচালী সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য। ঐ (১২)
১৭. সত্যজিৎ রায়, 'বাংলা চলচ্চিত্রে আর্টের দিক', *বিষয় চলচ্চিত্র*।
১৮. ঐ (৯)।
১৯. দিনকর কৌশিক, 'মানিক আর আমি একসঙ্গে...'। আনন্দলোক, ১মে ১৯২৯।

প্রসঙ্গ : 'পথের পাঁচালী'র ৫০ বছর

নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায়

দেখতে দেখতে 'পথের পাঁচালী'র পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল। অথচ আমার কাছে মনে হচ্ছে এই তো সেদিনের ঘটনা। সেটাও হবে ১৯৫৪ সালে। শ্রী ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সে স্থায়ী কর্ম্মী হিসাবে চাকুরী করতাম। ঢুকেছিলাম ১৯৪৬ সালে। সময়টা দুঃসময়। কলকাতা তখন রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় বিধস্ত। ওপার বাংলা থেকে এপারে হিন্দুরা চলে আসছে, এখান থেকে মুসলমানরাও চলে যাচ্ছে। স্টুডিওতে লোকের অভাব এই রকম শূন্যস্থান পূরণে আমাকে শ্রী ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স চাকুরী দিল। কাজে লেগে গেলাম। ১৯৫৪ সালে চাকুরি ছেড়ে দেবো ভাবছি। আমার ভাবার আগেই স্টুডিও কর্তৃপক্ষই আমাকে ছাড়িয়ে দিল। ছিলাম বেতনভুক ল্যাবরেটারি এ্যাসিস্টেন্ট হয়ে গেলাম চুক্তিবদ্ধ এ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর। সেটাও ঐ ১৯৫৪ সালেই। 'পথের পাঁচালী' সুরু হয়েছিল ১৯৫২ সালে। শুরুরও শুরু আছে।

যুদ্ধোত্তর যুগে তিনটে আড্ডা খুবই বিখ্যাত ছিল। প্রথমটি ছিল প্যারাডাইস্ কাফে নামে একটি ছোট গ্যারেজের মধ্যে একটি চা-এর দোকানে। এখানে আড্ডা দিত মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, হৃষিকেশ মুখার্জী, তাপস সেন, সলিল চৌধুরী, বংশী চন্দ্রগুপ্ত, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সজল রায়চৌধুরী, পানু পাল, নিরঞ্জন মুখার্জী, মমতাজ আহমেদ, সুরপতি নন্দী, ভূপতি নন্দী ছাড়াও এল, টি, জি গ্রুপের সদস্যরা। এরা ছাড়াও আরও অনেকে আসতেন যেমন সুধী প্রধান, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, খালেদ চৌধুরী, বুলবুল চৌধুরী, রবীন্দ্র মজুমদার, রাজেন তরফদার প্রমুখরা। এই প্রবন্ধের লেখকও ঐ দলে আড্ডা মারতো। আর সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কফি হাউসে আড্ডা মারতেন, প্রয়াত সত্যজিৎ রায়, রাধাপ্রসাদ গুপ্তরা। বোধকরি মৃণাল সেন (মৃণালদা) ও বংশী চন্দ্রগুপ্ত এই আড্ডায় যোগ দিতেন। কমলালয় স্টোর্সে চা-এর দোকানে তৃতীয় আড্ডার জায়গায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, গোপাল হালদার, হীরেন মুখার্জী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন দত্তরা আড্ডা দিতেন। প্রথম ও দ্বিতীয় আড্ডা নাটক ও চলচ্চিত্র বিষয়ে বহু আলোচনা, সমালোচনায় মুখর। প্রায় সকলেই চলচ্চিত্র বিষয়ক পুস্তক, ম্যাগাজিন, বিশেষ করে বিদেশী পরিচালকদের কর্মধারা, শৈলী বিষয়ক পুস্তক অধ্যয়নে নিজেদের ব্যস্ত রাখতেন। এঁরা সিনেমার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। চলচ্চিত্রকে কিভাবে উন্নত করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতেন।

আর-একটি জিনিসের উদ্ভব হয়েছিল ঐ সময়েই—ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন। ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির দান অনস্বীকার্য। ওঁরা বিভিন্ন সময়ে নানান চিত্রগৃহ ভাড়া করে নাম-করা সমস্ত ছবি দেখাতেন। এই লেখকও ঐ সব দেখেছেন। তবে বেশীর ভাগ সিনেমাই ছিল হলিউডের তৈরী। ঐ সময় মৃণাল সেন এককভাবেই চিনু ভট্টাচার্যর সঙ্গে এক হয়ে সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপে নির্ম্মিত ছবির প্রদর্শন বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরি বা অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহে শুরু করে। এই লেখকের মৃণাল সেনের সঙ্গে আলাপ ঐ সিনেমা শোর সময়। একটা জিনিস লক্ষ্য করার বিষয় হল সেই সময় বহু বিদেশী ম্যাগাজিন দেশে আসতো। সেগুলি এই সিনেমাপ্রেমীরা অধ্যয়নও করত।

এই সময় এই চলচ্চিত্রপ্রেমীদের কারুর আমাদের দেশে নির্ম্মিত ছবির প্রতি খুব একটা শ্রদ্ধাভক্তি ছিল না। কেউ কেউ আবার দেখতেনও না। ওদের মতে এদেশী ছবিমাত্র ছিল বোকা বোকা মার্কা ছবি। সেলুলয়েডে নাট্যাভিনয়। কাহিনীও এদের কাছে স্থূল বলে মনে হতো। অহেতুক গানের ব্যবহার এদের কাছে দৃষ্টিকটু মনে হতো। তাই এই চলচ্চিত্রপ্রেমীরা হলিউডে নির্ম্মিত বাণিজ্যিক ছবির প্রতি আকৃষ্ট হত। হলিউডে নির্ম্মিত ছবির কাহিনীর বিন্যাস, চিত্রনাট্য এবং কাহিনী অভিনবত্ব ওদের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠত। বিশেষ করে অরসন্ ওয়েলসের 'সিটিজেন কেন' হওয়ার পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সিনেমায় বিপ্লব ঘটে যায়। শর্ট ফোকাল লেন্সের সৃষ্টিধর্মী ব্যবহার এর আগে আর কোন ছবিতে দেখা যায় নি। রাতারাতি সিনেমার শিল্পক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব ঘটে গেল। ডেপথ অব ফিল্ডকে কাজে লাগাতে লাগলো সব পরিচালকরা এবং ক্যামেরাম্যানরা। আমাদের দেশের বহু ক্যামেরাম্যানরাও প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হল। সিনেমার প্রকরণও এক ধাপ অগ্রসর হল।

এই সময় আর একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হল—জাঁ রেঁনোয়ার এখানে ছবি করতে আসা। সমগ্র ইস্টার্ন স্টুডিওটা ওঁরা ভাড়া নিয়েছিলেন। এখানকার কলাকুশলীরাও অনেকে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ পেয়েছিল। যেমন বংশী চন্দ্রগুপ্ত। তিনি পিটার লরিয়ের সঙ্গে ফিল্ম নির্দ্দেশনা বিভাগে কাজ করেছিলেন। কল্যাণ গুপ্ত, যিনি প্রযোজনা বিভাগে করতেন, বংশী আশ ও হরিসাধন দাশগুপ্ত ছিলেন সহকারী পরিচালক এবং রামানন্দ সেনগুপ্ত ছিলেন ক্লদ রেনোয়ার সহকারী, বোধকরি অপারেটিভ ক্যামেরাম্যান। প্রসিদ্ধ শব্দযন্ত্রী ফুলটন ছিলেন শব্দগ্রাহক। ছবিটির নাম 'দি রিভার'। জাঁ রেনোয়ার নাম তখন বিদগ্ধ চলচ্চিত্রপ্রেমিকদের মুখে মুখে ঘুরত। ওঁর পরিচালিত Rules of the Game সেদিন অনেকে না দেখলেও ঐ ছবিটির সম্পর্কে পত্র পত্রিকায় যে সব আলোচনা বেরিয়েছিল, সেগুলিও ওঁরা পড়েছিলেন। তাই ওঁর কলকাতায় ছবি করতে আসাটা এদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। প্রয়াত সত্যজিৎ রায় ওঁর সঙ্গে আলাপও করেছিলেন এবং ওঁর ওপর খুব সম্ভবত লণ্ডন থেকে প্রকাশিত Cine Technique নামক পত্রিকায় একটি

নিবন্ধও লিখেছিলেন। এছাড়াও ওঁর শুটিং দেখতে গিয়েওছিলেন। 'পথের পাঁচালী'-র ক্যামেরাম্যান সুব্রত মিত্রও নিয়মিত The River-এর শুটিং-এ যেতেন। একটা কথা এখানে বলা দরকার প্রয়াত সুব্রত মিত্র এবং প্রয়াত সত্যজিৎ রায় উভয়েই খুবই উচ্চমানের স্থিরচিত্র গ্রাহক ছিলেন। 'পথের পাঁচালী' প্রয়াত সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ছবি হলেও ওঁর ছবি দেখার অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের। বিলেতে যখন ছিলেন সেই সময় সমসাময়িক পরিচালকদের ছবি উনি দেখেছিলেন। বিশেষ করে নিও রিয়েলিজ্‌মের পরিচালকদের ছবিও উনি প্রত্যক্ষ করেন শুধু নয় ওঁর ওপর নিও রিয়েলিস্ট পরিচালকদের কাজ বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তার উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'পথের পাঁচালী'র নির্ম্মাণ ও 'Notes on New Realist Film' নিবন্ধটি। এছাড়াও তিনি কয়েকটি সমালোচনাও লেখেন। এগুলি থেকে এটাই প্রমাণিত হয় প্রয়াত রায় চলচ্চিত্রর ভাষা তাঁর আয়ত্ত্বাধীনে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। একথা উল্লেখ করা হচ্ছে এই জন্য যে প্রয়াত রায় ভুঁইফোড় পরিচালক ছিলেন না। একথা অনস্বীকার্য যে সে যুগে কিংবা বর্তমানেও তাঁর সমকক্ষ পরিচালক ভারতবর্ষের সিনেমা জগতে সেদিনও ছিল না আজও নেই। একথা বারেবারেই শোনা যায় প্রয়াত রায়ের সহকর্মীরা সবাই নতুন। 'পথের পাঁচালী'র চিত্রগ্রাহক সুব্রত মিত্র একেবারে আনকোরা। মোটেই নয়। সুব্রত মিত্র ছিলেন আন্তর্জাতিক মানের স্থিরচিত্র গ্রাহক। আলো প্রক্ষেপণ ও ব্যবহারে তাঁর জ্ঞান ওঁর সমসাময়িক চিত্রগ্রাহকদের থেকে কম ছিল না। উনি এবং প্রয়াত রায় 'পথের পাঁচালী' নির্মাণের পূর্বে বিবিধ ধরনের লেন্স ও ফিল্টার নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন। শিল্প নির্দ্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ কলাকুশলী। উনি শুধু রেনোয়ার ছবিতে কাজ করেন নি। তারও আগে 'অভিযাত্রিক' ছবির শিল্প নির্দ্দেশনা বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন এবং 'পথের পাঁচালী' নির্ম্মাণ কালে উনি প্রয়াত পরিচালক সত্যেন বসুর 'ভোর হয়ে এলো' ছবির শিল্প নির্দ্দেশক। ওঁর শূন্যস্থান আজও পূরণ হয়নি। উনিই প্রথম সৃষ্টিধর্মী শিল্প নির্দ্দেশক আর উনিই ভারতীয় সিনেমার শেষ সৃজনীশীল শিল্প নির্দ্দেশক। সম্পাদক দুলাল দত্ত, 'পথের পাঁচালী' নির্মাণ কালে সত্যেন বসুর সম্পাদক ছিলেন। উনিও ছিলেন অভিজ্ঞ ও দক্ষ সম্পাদক। যে সমস্ত শিল্পীরাও এই 'পথের পাঁচালী'তে অভিনয় করেছিলেন, (পার্শ্বচরিত্রাভিনেতা এবং অভিনেত্রীরা ছাড়া) সকলেরই দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব নিয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না। সর্বজয়ার ভূমিকায় করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সু-অভিনেত্রী। কানু বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি হরিহরের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, তিনি এবং প্রসন্ন পণ্ডিতের ভূমিকায় তুলসী চক্রবর্তী, চুনীবালা ইন্দির ঠাকরুণের ভূমিকায় এঁরা সবাই মঞ্চ এবং চলচ্চিত্র. জগতের স্বনামখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রী। তবেই বোঝা যাচ্ছে 'পথের পাঁচালী' নির্ম্মাণকারী দলের পেশাদারিত্ব এবং দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলাই উচিত নয়। এছাড়া প্রথম প্রথম বলে সহানুভূতির বন্যা ছড়িয়ে এই দলকে ছোট করার কোন অবকাশ আছে বলে মনে করার প্রয়োজন নেই।

প্রয়াত সত্যজিৎ রায় প্রথমে যে উপন্যাসের চিত্রনাট্য রচনা করেন সেই উপন্যাসের নাম 'ঘরে বাইরে'। কিন্তু বাস্তবে যখন ছবি করলেন তখন বেছে নিলেন বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'কে। কারণ বোধহয় নয়া বাস্তববাদী দর্শন, যার দ্বারা তিনি প্রভাবিত ও উদ্দীপ্ত। 'পথের পাঁচালী' বিভূতিবাবুর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বিভূতিভূষণের খ্যাতি অনেকটাই 'পথের পাঁচালী'র উপরই প্রতিষ্ঠিত। উনি অনেক উপন্যাসই লিখেছেন। কিন্তু অধ্যাপক সুকুমার সেনের মতে, "সেগুলির রচনা অনাড়ম্বর ও সুপাঠ্য, তবে বাংলা উপন্যাসের কোন বিশেষ পরিণতির অথবা রূপান্তরের পরিচয় তাহাতে নাই।" শুধু কি তাই, যেহেতু 'পথের পাঁচালী' বিভূতিভূষণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস অতএব এই উপন্যাসকে ভিত্তি করে ছবি করলে বাণিজ্য সফল ছবিরূপে চিহ্নিত হতে পারে, তাতে পরিচালক রূপে প্রয়াত রায় প্রতিষ্ঠিত হবেন এই স্বপ্নকে সার্থক করার জন্য উনি 'পথের পাঁচালী'র উপর নির্ভর করাই শ্রেয় বলে এই জন্যই উক্ত উপন্যাসকে বেছে নিয়েছেন। উনি দেখাতে চেয়েছেন সত্যিকার ভারতবর্ষের ছবি, বাস্তবতার ছবি, মননের ছবি, ভারত তথা বাংলার গ্রামীণ সমাজের ছবি, গ্রামের ছবি, দারিদ্র্যলাঞ্ছিত গ্রামের ছবি, মানবিক ছবি। তাই 'পথের পাঁচালী'কে উনি বেছে নিয়েছেন। 'পথের পাঁচালী' সর্ব অর্থে মানুষের ছবি। উনি দেখেছেন, অপু এ উপন্যাসের প্রাণ আর দুর্গা উপন্যাসের সৌন্দর্য্য। নিশ্চিন্দপুরের জল মাটি দিয়ে তৈরি এই মেয়েটি পুষ্পিত লতার মত উপন্যাসকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। "পৃথিবীর স্বাদ বৈচিত্র সম্বন্ধে দুর্গার আকুল আগ্রহ তাকে রসনাচঞ্চল করেছে", সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কথাটি 'পথের পাঁচালী' ছবির সংগে অদ্ভুত ভাবে মিলে গেছে। তাই প্রয়াত রায়ের ছবিতে রয়েছে অপু, দুর্গা, সর্বজয়া, হরিহর ও ইন্দির ঠাকুরণ মুখ্য চরিত্র হিসাবে এবং দুর্গার মৃত্যুর পর অপুর নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগকে করেছেন বিয়োগ বিধুর পরিণতি। পরতে পরতে সিনেমা।

১৯৫২ সালে 'পথের পাঁচালী'র স্যুটিং শুরু হয় বর্দ্ধমানে কাশবনের শট্ দিয়ে। তোলা হয়েছিল ওয়াল ক্যামেরায়। ছবিটি তারপর বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছবিটির স্বত্ব কিনে নেয়। পুরোদমে আবার শুরু হয়। এবার স্যুটিং এর স্থান বোড়াল। বহির্দৃশ্য সবই বোড়ালে তোলা হয় এবং অন্তর্দৃশ্য তোলা হয় টেক্‌নিসিয়ান্স স্টুডিওতে। বোড়ালের ক্যামেরা ছিল মিচেল এবং শব্দযন্ত্র ছিল কিনেভকস বলে ম্যাগনেটিক্ রেকর্ডার। আর অন্তর্দৃশ্য মিচেল ক্যামেরা আর R.C.A optical recorder-এ। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৫৫ সনে। ছবিটি মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত চলচ্চিত্র শিল্পে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করে। প্রকৃত অর্থে সিনেমার জন্ম সূচিত হয়। 'পথের পাঁচালী'র সার্থকতা এই খানেই।

দুর্গার প্রত্নপ্রতিমা

প্রবীর বসু

"১৯৫২ সালের শরৎকালের এক বিকেলবেলায় দীর্ঘ কাশফুলে ছাওয়া এক মাঠের মধ্যে আমি শুরু করেছিলাম 'পথের পাঁচালি'র শুটিং।"

শরৎকাল বোধনের সময়, শরৎকাল সৃষ্টির সময়। এই শরৎকালেই সৃষ্টির শুভারম্ভ হয়েছিল বাংলা, ভারত তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র-কর্ম 'পথের পাঁচালী'র। এ এক অদ্ভুত সুসময়। বর্ষাধৌত নীলাকাশে সাদা মেঘেরা খেলা করে। মর্ত্যে ছড়িয়ে পড়ে সোনাঝরা রোদ। দিন ও রাত হয়ে ওঠে অদ্ভুত মায়াময়। রাতে জ্যোৎস্না ওঠে। নোনা গাঙের জল চকচক করে। হু হু হাওয়ায় চরের কাশফুলের রাশি, আকাশ জ্যোৎস্না ও মোহানায় জল একাকার করে উড়তে থাকে। এমন সময়ে সৃষ্টি মেতে উঠবেই। সত্যজিতের পক্ষে তো তাই স্বাভাবিক ছিল। বাঁশবন, আগাছা, গাবগাছ, বনচালতা, আশশ্যাওড়া, গুলঞ্চলতা, আম-কাঁঠালের প্রাচীন বনরাশি ও মজাপুকুরের মধ্যে সৃষ্টির রসদ খুঁজে নিয়েছিলেন সত্যজিৎ। তা এসব তো অনেকদিনের কথা। ১৯৫২ সালে শুটিং আরম্ভ হয়েছিল। আর এখন ২০০৪ সাল। মাঝে বাহান্ন বছরের সময়ান্তরাল। ইতিমধ্যে 'পথের পাঁচালি' সিনেমা শিল্প হিসাবে এবং সাহিত্য হিসাবেও 'ক্লাসিক' রূপে স্বীকৃত। কোনও শিল্প কর্ম যখন 'ক্লাসিক' হিসাবে অভিধা পায়, তখন তার আবেদন হয়ে ওঠে সর্বজনীন ও চিরকালীন। যুগে যুগে তার অর্থ পালটে যায়। কিংবা যুগই তার থেকে যুগোপযোগী অর্থ খুঁজে নেয়। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালি' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৯ সালে। ইতিমধ্যে অনেক বনজঙ্গল গড়ে উঠেছে। অনেক বনজঙ্গল সাফ হয়ে গেছে। এই সাহিত্যকর্মের ওপর নির্ভর করে সত্যজিতের ছবি প্রকাশ পাওয়ার পরে, এ বছর তারই পঞ্চাশ বছর পূর্তি। তাই শুধুমাত্র এই উপলক্ষেই শিল্পকর্মটির দিকে একবার ফিরে তাকানো যেতে পারে। যদিও ফিরে তাকানোর অভ্যাস আমাদের দ্রুত বিলীয়মান।

শরৎকালে বাঙালি মেতে ওঠে দুর্গোৎসবে। উৎসবের আড়ম্বরপ্রিয়তায় সে প্রলুব্ধ ও মুগ্ধ হলেও দুর্গার সঙ্গে সম্পর্ক তার আন্তরিক। দেবীমাহাত্ম্য যাই হোক না কেন,

দুর্গা তার ঘরের মেয়ে। এবং সেই কারণেই বাঙালির ঘরে ঘরে মেয়েদের নাম 'দুর্গা'। কেউ 'দুর্গারাণি' কেউ 'দুর্গাবালা' কেউ শুধুই 'দুর্গা'। দুর্গা নামের ছড়াছড়ি। এই দুর্গারা আমাদের খুব চেনা। তবুও আমরা সচরাচর এদের কথা ভুলেই থাকি। বড় বেশি চেনা বলেই কি তারা উপেক্ষা ও অবহেলার পাত্র? অথচ এমন তো হওয়ার কথা নয়। তা হলে কি আমরা তাদের সঠিকভাবে না চিনে দুর্গার চিন্ময়ীরূপ ছেড়ে মৃন্ময়ীরূপের দিকে ধাবমান? বিভূতিভূষণ কিন্তু আমাদের দুর্গাকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন সঠিক ভাবেই। সত্যজিৎ তাকে দিয়েছিলেন ভিন্ন এক মাধ্যমে নান্দনিক তাৎপর্য।

বিভূতিভূষণ যখন প্রথম 'পথের পাঁচালী' লেখেন তখন তাতে শুধু অপুই ছিল, দুর্গা ছিল না। পরে তাঁর মনে হয়েছিল দুর্গা-বিহীন প্রকৃতিগাথা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। আকাশ থাকবে, মাটি থাকবে, জল থাকবে, গাছ-গাছড়া থাকবে, মানুষ, কাশফুল থাকবে, অথচ দুর্গা থাকবে না; একি হয়? তাই তিনি আবার প্রথম থেকে ঢেলে সাজালেন সবকিছু। অসম্পূর্ণতায় আনলেন পরিপূর্ণতা। আজকে আমাদের পক্ষেও অবশ্য দুর্গাহীন অপুকে, দুর্গাহীন পথচলাকে, দুর্গাহীন 'পথের পাঁচালী'কে মেনে নেওয়া একেবারেই অসম্ভব। আসলে দুর্গার মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমাদের নেই। অপুরও ছিল না। আমরা বিস্মিত হই; দুর্গা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। আমরা কবিদৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকি; দুর্গা নিজেই কবিতা হয়ে ওঠে। আমরা রোমান্টিকতা অনুভব করি; দুর্গা রোমান্টিকতাকে ঝেড়ে ফেলে দেয়। আমরা সুস্থির হয়ে স্থিতিশীল হতে চাই; দুর্গা প্রাণশক্তির চাঞ্চল্যে ভরপুর। শান্ত স্বপ্নমুগ্ধ, বিস্ময়বিহ্বলের সম্পূর্ণ বিপরীত—চঞ্চল, অবাধ্য, উদ্দাম হল দুর্গা। তাই তো দুর্গাকে আমরা ভালোবেসে ফেলি। দুর্গা বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে। সে-ই অপুকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত করে দেয়। পরিচিত হই আমরাও। তার হাত ধরেই অপু প্রকৃতির নিসর্গসৌন্দর্যে প্রবেশ করে। এ সৌন্দর্য টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, আচার-আড়ম্বরের মেকি সৌন্দর্য নয়। এ সৌন্দর্য উলুখড়, কলমিলতা, সোঁদাল, বনচালতা ও নেবুপাতার সৌন্দর্য। এ সৌন্দর্য মজাপুকুর, মেঠো রাস্তা ও ছেঁড়া কাঁথার সৌন্দর্য। নীলকণ্ঠ পাখি, নীল অপরাজিতা ফুল, গোরুর হাম্বারবের মাঝে নানান অনটনের মধ্যেও মানুষের পথচলা এখানে অব্যাহত। তাই এই সৌন্দর্য প্রাকৃতিক। তাই এই সৌন্দর্য খাঁটি মানবিকতাও।

আসলে দুর্গা অপুকে যে জগৎ সৌন্দর্য দেখায় এবং একই সঙ্গে আমরাও যা প্রত্যক্ষ করি, সেই সৌন্দর্য সম্পর্কে দুর্গা কিন্তু একেবারেই নিশ্চুপ ও নিরাসক্ত। কারণ দুর্গা তো নিজেই প্রকৃতির অংশ। সিনেমা যত বেশি এগোয় সে তত বেশি করে প্রকৃতির অংশ হয়ে ওঠে। সে প্রকৃতিকে বোঝে, প্রকৃতির মতিগতি সম্পর্কে সচেতন। কখন বৃষ্টি হবে, কখন রোদ উঠবে, কোন গাছে কোন ফল কখন পাকবে সবই তার নখদর্পণে। সে সেই প্রকৃতিকে উপভোগ করে; সে সেই প্রকৃতির মধ্যে মিশে যেতে

থাকে। দুর্গার আর এক নাম তো প্রকৃতি। তাই পল্লীগ্রাম ছেড়ে গাছ-গাছড়া ছেড়ে তার আর অপুর মতন শহরে যাওয়া হয়ে ওঠে না।

কিন্তু এই দুর্গাকে কেমন দেখতে? চালচিত্রের সামনে পেন্ট করা, বার্নিশ করা দুর্গা নয়। কোনওফিল্ম স্টারের মুখের আদলের সঙ্গে এর মিল নেই। তাকে দেখে কোনও ভয়ভক্তি হয় না। অথচ পাশ কাটিয়ে যাওয়াও যায় না। আমাদের মনের গভীরে কোথাও কোনওখানে দুর্গা তার স্থান করে নেয়। কোনও মাহাত্ম্য বা অলৌকিকতার জোরে নয়। তার নিষ্পাপ সরলতা ও বেপরোয়া বুনো স্বভাবের জোরে। দুর্গা এখানেই আমাদের ঘরের মেয়ে হয়ে ওঠে। দুর্গা তো বাঙালির ঘরের মেয়েই। দুর্গা সম্বন্ধে বিভূতিভূষণ জানিয়েছেন,

> 'দুর্গার বয়স দশ এগারো বৎসর হইল, গড়ন পাতলা পাতলা, রং অপুর মত অতটা ফর্সা নয়, একটু চাপা হাতে কাচের চুড়ি, পরনে ময়লা কাপড়, মাথার চুল রুক্ষ বাতাসে উড়িতেছে, মুখের গড়ন মন্দ নয়...চোখগুলি বেশ ডাগর ডাগর।'

দুর্গার রূপবর্ণনায় বিভূতিভূষণ কোনও কৃপণতা করেননি। উপন্যাসের প্রথম দিকের নানান জায়গায় যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই দুর্গাকে আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন,

> 'বোশেখ মাসের দিন সকলের মেয়ে দ্যাখো গে যাও সেঁজুতি করচে, শিবপুজো করচে—আর অত বড় ধাড়ী মেয়ে—দিনরাত কেবল টো-টো। সেই সকাল হতে না হতে বেরিয়েচে, আর এখন এই বেলা দুপুর ঘুরে গিয়েছে, এখন এল বাড়ী—মাথাটার ছিরি দ্যাখো না! না একটু তেল দেওয়া, না একটু চিরুনি ছোঁয়ানো—কে বলবে বামুনের মেয়ে, ঠিক যেন দুলে বাগদীদের কেউ—বিয়েও হবে ঐ দুলে বাগদীদের বাড়ীতেই।'

অর্থাৎ সমাজের একেবারে নিম্নস্তরের অস্পৃশ্যদের একজন হয়ে উঠতে পারে দুর্গা। ব্রাহ্মণত্যের কৌলিন্য তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তা বলে সে যে প্রসাধন করে না এমন নয়।

> 'দরজা দিয়া দুর্গা বাড়ী ঢুকিতেছে। মুখ রৌদ্রে রাঙা, মাথার চুল উস্‌কোখুসকো, অথচ ধুলোমাখা পায়ে আলতা পরা।'

সাধ আহ্লাদ প্রসাধন বলতে শুধুই আলতা। হয়তো একটা টিপও। আর কিছু আয়ত্তের মধ্যে নেই যে; তাই প্রয়োজনও নেই। বাঙালির চিরকালীন নিজস্ব প্রসাধনী ঐতিহ্য তো আলতাই। যুগযুগ ধরে বাঙালি তার আরাধ্য দেবী দুর্গাকে লালপেড়ে শাড়ি আর আলতাই উৎসর্গ করে আসছে। আসলে এই উৎসর্গ তো এক লোকায়ত উৎসর্গ যা নানান পরম্পরা ও অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আজও টিকে আছে।

এইভাবে বিভূতিভূষণ যে দুর্গাকে কাগজে কলমে গড়ে তোলেন, সত্যজিৎ তাকেই প্রতিষ্ঠিত করেন ভিন্ন এক মাধ্যমে। মাধ্যম দুটি ভিন্ন হলেও দুর্গার চরিত্র ও প্রকৃতি একই। এবং এর নিট ফল হল, আমাদের চিন্তায় মননে ও দৃশ্যকল্পে দুর্গা তার নিজস্ব স্থান করে নেয়। এই স্থান আর কেউ অধিকার করতে পারে না; কারণ দুর্গা যে আমাদের কন্যারূপে স্বীকৃতি পেয়ে গেছে।

আমরা সিনেমার পরদায় দেখেছি দুর্গা এক বেপরোয়া স্বভাবের মেয়ে। মায়ের নিষ্ঠুর ভর্ৎসনা ও নির্মম প্রহার, প্রতিবেশীদের গালমন্দ কিছুই সে গ্রাহ্য করে না। আপাতদৃষ্টিতে তাকে মনে হতে পারে অত্যন্ত লোভী। পরের বাগানের ফলপাকুড় থেকে পরের ঘরের পুঁতির মালা পর্যন্ত কিছুই তার চুরি করতে বাধে না। আসলে দুর্গার এ এক অদ্ভুত খেলা। তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বস্তুর প্রতিই তার লোভ। বিশ্বের অনন্ত সম্পদ ও আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন যাদের আয়ত্বের মধ্যে নেই, দুর্গা যেন তাদেরই এক প্রতিনিধি।

অন্যদিকে এই দুর্গাকেই স্নেহ ও মমতার প্রতিমূর্তি হিসেবে দেখা যায় বিদ্যুৎচমকের মতন মাঝে মাঝে। সিনেমায় যা দেখতে দেখতে আমরা আর্দ্র হয়ে উঠি। অপুর প্রতি তার স্নেহের অন্ত নেই। অপুর প্রতি স্নেহশীল হলেও অপুকে সে শক্ত সমর্থ করে তুলতে চায়। অপুকে সে তার প্রায় সমস্ত অভিযানে সঙ্গী করে। বাবা-মাকেও না ভালোবেসে দুর্গা থাকতে পারে না। যদিও মায়ের তুলনায় বাবার ঘনিষ্ঠতা সে পায় খুব কম সময়ের জন্য। আর মায়ের হাতের মার না খেয়ে তার একটা দিনও কাটে না। অন্যদিকে ইন্দির ঠাকরুণ যাকে সকলে সংসারের পরগাছা মনে করে, অনাদরের, অবাঞ্ছিত বালাই এই ইন্দির ঠাকরুণের প্রতি দুর্গার ভালোবাসা কানায় কানায় পরিপূর্ণ। দুর্গা তাকে এত ভালোবাসে যে লোকের মনে হয় পূর্বজন্মে সে বোধহয় বুড়ির মেয়ে ছিল। বিভূতিভূষণ তাঁর কথাসাহিত্যে এই কথাই তো জানিয়েছেন,

> 'বুড়ী চমকিয়া চাহিয়া দেখিল দুর্গা হাঁপাইতেছে, যেন অত্যন্ত বেগে ছুটিয়া আসিয়াছে। বুড়ী ব্যগ্রভাবে দুর্গাকে হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা ঝাঁপাইয়া বুড়ীর কোলে পড়িল—তাহার মুখে হাসি অথচ চোখে জল। উঠানে ঝি বউ যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, অনেকের চোখে জল আসিল। প্রবীণ হরি পালিতের স্ত্রী বলিলেন—নেও ঠাকুরঝি, ও তোমার আর জন্মে মেয়ে ছিল, সেই মেয়েই তোমার আবার ফিরে এসেছে।'

দুর্গা তার ভাইকেও ভালোবাসে। চান করে এসে বাড়ির ভেতরে পেঁপেতলায় পুন্যিপুকুরের ব্রত করে। উঠানে ছোট চৌকোনা গর্ত কেটে তার চারধারে ছোলা-মটর ছড়িয়ে দেয়—ভিজে মাটিতে সেগুলির অঙ্কুর বের হয়। চারদিকে কলার ছোট বোগ পুঁতে ধারে ধারে পিটুলিগোলার আলপনা দেয়। সেই আলপনায় পদ্মলতা, পাখি, ধানের শিষ, নতুন ওঠা সূর্য ইত্যাদি ফুটে ওঠে। সমগ্র বিশ্বের এক কল্যাণকারী

করুনাময়ী মনোভাবই যেন ব্যক্ত হয় এইভাবে। দুর্গা এক নিশ্বাসে আবৃত্তি করতে থাকে।

'পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা কে পূজে রে, দুপুর বেলা?
আমি সতী লীলাবতী ভায়ের বোন্ ভাগ্যবতী।'

এইভাবে দুর্গা তার ভাইকে ভালোবেসে, তার মঙ্গলকামনা করে ভাগ্যবতী হতে চায়।

অন্যদিকে ভাই অপুও এই ভালোবাসায় মর্ম বোঝে।

'সে দুর্গার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল খুব লেগেছে রে দিদি? কোথায় মেরেচে মা?

দুর্গা বলিল—আমার কানের পাশে মা একটা বাড়ি যা মেরেছে—রক্ত বেরিয়েছিল, এখনও কন্‌কন্ কচ্ছে, এইখানে এই দ্যাখ হাত দিয়ে! এই—

—এইখানে? তাই তো রে? কেটে গিয়েছে যে? একটু পিদিমের তেল লাগিয়ে দেব দিদি?'

বিভূতিভূষণ বর্ণিত এই দৃশ্যগুলি সত্যজিৎ অসামান্য সিনেমার ভাষায় কাব্যের মতন করে একসূত্রে বেঁধেছিলেন। দুর্গা যে ব্রত পালন করে এবং সেই ব্রতে যে ছড়া বলে তা তো বৈদিক যুগের অনেক আগে মাতৃতান্ত্রিক কৃষিযুগের সময়ের এক পরম্পরা। দুর্গার ভাঙা আয়নায় মুখ দেখা, চোখে কাজল ও কপালে টিপ দেওয়া, ব্রতপালন করা ইত্যাদি চিত্রকল্পগুলি আসলে এক মাতৃতান্ত্রিক যুগের ছবিই তুলে ধরে। সত্যজিৎও দুর্গাকে প্রকৃতিরই মেয়ে হিসাবেই দেখান। আমরা দেখেছি যে কীভাবে বৃষ্টির মধ্যে মাথার চুল ঝুলিয়ে ছড়া বলার মতো কী যেন বলে চলেছে। তার এই ভঙ্গিটি কিন্তু একটি বিশেষ পরম্পরার কথাই মনে করিয়ে দেয়। এক আদিম মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতার কালে দীর্ঘ অনাবৃষ্টির পর প্রথম বৃষ্টির সময়ে এমনিভাবেই চুল দুলিয়ে পরম্পরা পালন করত সেই সময়ের কুমারী মেয়েরা। সত্যজিতের এই ছবিটি যেন হাজার বছর আগের এক পৃথিবীর ছবিকে আমাদের সামনে হাজির করে দিয়েছিল।

প্রকৃতি যখন ভীমা-ভয়ংকরী হয়ে ওঠে, আকাশ আঁধার করে বৃষ্টি ঘন হয়ে নেমে আসে, দুর্গা বুঝতে পারে সে ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। কিন্তু নিজের বিপন্নতাকে রক্ষা করার চেয়ে ভাইকে রক্ষা করার তাগিদে সে বিশাল গাছটির তলায় নিজের জীর্ণ শাড়ির আঁচল দিয়ে ভাইকে জড়িয়ে ধরে। বজ্রপাত শুরু হয়। ভয়ংকর ঝড় ও বৃষ্টি দুজনের ওপর আছড়ে পড়ে। বৃষ্টির ছাঁট থেকে ভাইকে বাঁচাবার জন্য দুর্গা আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে। দুর্গা প্রকৃতিকে বশ করতে চায় আদিম নারীর মতন ছড়া কেটে। দুর্গা এই ছড়া মন্ত্রের মতন উচ্চারণ করতে থাকে। এই মন্ত্র কিন্তু বৈদিক বা

হিন্দুত্ববাদী কৌলিন্যে পরিপুষ্ট সংস্কৃতের মতন দেবভাষায় রচিত কোনও মন্ত্র নয়। সম্পূর্ণ লোকায়ত বিশ্বাসেই লোকায়ত আঙ্গিকেই দুর্গা বলে চলে,

'নেবুর পাতা করমচা
আয় বৃষ্টি থেমে যা'

এই লোকায়ত মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়েই দুর্গার যেন এক লোক-কল্যাণকারী রক্ষাকর্ত্রী রূপ ফুটে ওঠে। দুর্গাকে অপু একটু একটু করে বুঝতে পারে। বুঝতে পারি আমরাও। অপুর বয়ানেই বিভূতিভূষণ জানিয়ে দেন,

'যখন তাহার দিদির মাথার সামনে রুক্ষ চুলের এক গোছা খাড়া হইয়া বাতাসে উড়ে তখনই কি জানি কেন, দিদির উপর অত্যন্ত মমতা হয় কেমন যেন মনে হয় দিদির কেহ কোথাও নাই সে যেন একা কোথা হইতে আসিয়াছে উহার সাথী কেহ এখানে নাই। কেবলই মনে হয়, কেমন করিয়া সে দিদির সকল দুঃখ ঘুচাইয়া দিবে সকল অভাব পূরণ করিয়া তুলিবে! তাহার দিদিকে যে এতটুকু কষ্টে পড়িতে দিবে না।'

সত্যজিৎ বিভূতিভূষণের উপন্যাস থেকে এই সিনেমা সৃষ্টির পঞ্চাশ বছর পরেও কি আমাদের একবারও মনে হবে না—'প্রেম পূজা আজি সাঙ্গ করেছি, প্রতিমা ফেলেছি ভাঙিয়া।' পথে-ঘাটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শত শত দুর্গাদের কথা কি আমাদের একবারও মনে পড়বে না?

এক অসাধারণ দৃশ্যপাঠ তৈরি করেছেন চলচ্চিত্র-মাধ্যমের দাবি মেনে। উপন্যাসের তথাকথিত ঘাত-প্রতিঘাত সম্বলিত প্লটের অভাব ছবিতে মিটিয়েছেন নির্বাচিত ছোটছোট ঘটনার ওঠাপড়ার সাহায্যে, সচেতনভাবে একটা ছন্দ আরোপ করে। ইন্দির ঠাকরুণের চরিত্রের ব্যাপারে বড়োরকম স্বাধীনতা নিয়ে সেটিকে দিয়েছেন দীর্ঘায়িত আয়ু। নিসর্গের নানা খুঁটিনাটি ক্যামেরায় ধরেছেন, ছবিতে ব্যবহার করেছেন অসামান্য দক্ষতায়। কিন্তু এই সবকিছুকে প্রাণবন্ত করতে ছবির প্রতিটি চরিত্রের বাচনে ধরা আছে বিভূতিভূষণের উজ্জ্বল উপস্থিতি।

সাহিত্যিক আর চলচ্চিত্রকারের এক অসামান্য যুগলবন্দী 'পথের পাঁচালী' সিনেমা। কিন্তু সত্যজিতের এই স্বীকৃতির কী পরিণতি আমরা দেখছি চোখের সামনে? ১৯৫৫ সালে মুক্তি-পাওয়া সত্যজিৎ রায়ের *প্রথম* ছবি 'পথের পাঁচালী'-র পঞ্চাশ বছরে পদার্পণকে ঘিরে আমরা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠান শুরু করে দিয়েছি ২০০৪ সালেই। কোথাও একবারের জন্যেও উচ্চারিত হয়নি যে ২০০৪ সালেই (২রা অক্টোবর) পূর্ণ হয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও *প্রথম* উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' প্রকাশের পঁচাত্তর বছর। দশম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের একটি সরকারি প্রকাশনার নাম দেওয়া হয়েছে 'পথের পাঁচালীর পঞ্চাশ বছর'! মনে হবে না কি, সরকারই প্রচার করতে চান যে 'পথের পাঁচালী'-র চলচ্চিত্র পরিচয়টিই এখন মুখ্য, গৌণ হয়ে গেছে উপন্যাস হিসেবে এর পরিচয়? অবশ্য আমার মনে হয়, আসল খেলাটা অন্য জায়গায়। সত্যজিৎ রায় একজন আন্তর্জাতিক সেলিব্রিটি, তাঁকে ভাঙিয়ে করে খাওয়া যায় এমনকি আন্তর্জাতিক স্তরেও। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজারদর সামান্যই; অন্তত এখনো যতদিন না জীবনানন্দের মতো তাঁকেও উদ্ধার করতে, আন্তর্জাতিকতায় উত্তীর্ণ করতে, উদয় হন কোনো ক্লিন্টন শীলি।

ক্রো ড় প ত্র : ২

অমল, আমার সময়?

ব্যক্তিগত : পাঁচের দশক

সমীর সেনগুপ্ত

এক সময়, কে বুড়ো হয়েছে সেটা বোঝবার জন্যে একটা সাধারণ নিয়ম ভেবে বার করেছিলাম। 'আমাদের সময়'—এই কথাটা যে উচ্চারণ করে, সেই বুড়ো। যে বলে, আমাদের সময়ে ইলিশ কত সুস্বাদু ছিল, আকাশ কত নীল ছিল, মেয়েরা কত সুন্দরী ছিল, সে একটা বিশেষ সময়কে নিজের সময় বলে স্থির করে নিয়েছে, চলতি কালটাকে সে তার নিজের কাল বলে আর মেনে নিতে পারছে না। তার কাল অতীত হয়ে গিয়েছে, একালের সময়ের স্রোত তাকে একপাশে ফেলে রেখে বয়ে গিয়েছে, তাই সে বুড়ো। মনে মনে স্থির করে রেখেছিলাম, আমি কখনো আমাদের সময় কথাটা উচ্চারণ করব না।

যতদিন যৌবন ছিল, ততদিন এই যুক্তিটা বেশ মোক্ষম বলে মনে হত—প্রায় অকাট্য। কিন্তু বেশি বয়সের দিকে নিজে যত এগোচ্ছি, তত যেন ফাঁকা বলে মনে হচ্ছে যুক্তিটাকে। এখন বেশ বুঝতে পারি, সত্যি তো একটা সময় আমার নিজের সময় ছিল। এখনকার সময়টা যেন আমার নয়, অন্যের জুতো পায়ে দেবার মতো এই সময়টাকে নিয়ে অস্বস্তি আমার। এই সময়টাকে ভলো করে বুঝি না, যেটুকু বুঝি সেটুকুকেও মেনে নিতে পারি না ঠিক। এক সময় তো ভাবতুম, যেখানে হিন্দি ফিল্মের গান চলে সেখানে থাকব না। সেকালে সেটাকে কাজেও পরিণত করবার চেষ্টা করতুম, আজ সেকথা ভাবাই হাস্যকর। এমন প্রতিজ্ঞা রাখতে গেলে বাস ট্রেন অটোয় চড়া বাদ দিতে হবে, এমনকী নিজের বাড়িতেও থাকা যাবে না, কারণ বাড়ির তরুণ প্রজন্ম আমাকে রেয়াত করবে না। তাদের কোনোমতেই বুঝিয়ে উঠতে পারব না যে তাদের যেমন তাদের পছন্দের গান শোনার অধিকার আছে, আমারও তেমনি আমার অপছন্দের গান না-শোনার অধিকার আছে।

কুড়ি বছর বয়সে বন্ধুকে বলতে পারতুম, 'একটা টাকা দে না মাইরি—'। এখনকার একটি কুড়ি বছরের ছেলে অম্লানবদনে বন্ধুকে বলে, 'দশটা টাকা দে না বাঁ—'। মেনে নিতে পারি না, কোথায় একটা আটকে যায়। এটাই আধুনিকতা থেকে উত্তরআধুনিকতার দিকে ক্রমউত্তরণ কিনা বুঝে উঠতে পারি না। এই ছেলেটি যে সে সময়কার আমার চেয়ে বেশি নির্বোধ বা বেশি অশিক্ষিত বা বেশি গ্রাম্য তা নয়,

একেবারেই নয়। আমরা আমাদের সময়কার খিস্তি ব্যবহার করতুম, সে তার সময়কার খিস্তি ব্যবহার করছে, এইমাত্র। আমাদের সময়কার খিস্তিটা কম খারাপ ছিল, এই সময়কার খিস্তিটা বেশি খারাপ, এই যুক্তি তো আর দেয়া যায় না। খিস্তি ব্যাপারটাই হল আমার প্রতি প্রতিকারহীন অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমার অক্ষম প্রতিবাদ—আমি যা করতুম, এও ঠিক তাই করছে। আমার কুড়ি বছর বয়সে বর্ষার দিনে একটা মোটরগাড়ি আমার গায়ে কাদাজল ছিটিয়ে চলে গেলে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসত, 'শ্‌শা—'। সেই ঘটনা ঘটলে এখনকার ছেলেটি বলে, 'বোকাচ্চো'। কোন যুক্তিতে আমারটা কম খারাপ, এরটা বেশি খারাপ? অগম্যাগমনের ইঙ্গিত আমারটাতেও ছিল, ওরটাতেও আছে। আমারটাতে সামান্য আড়াল করা ওরটাতে আরেকটু স্পষ্ট, এই মাত্র তফাত। পুরোনো দিনের সৌন্দর্যবাদীরা বলবেন, ওই আড়ালটাই সভ্যতা, স্পষ্টতাই অসভ্যতা। যত তির্যক করে, ইঙ্গিতময় করে বলা যায় ততই বক্তব্য মর্মস্পর্শী হয় বেশি, তির্যক করে বলতে পারেন বলেই না কবিদের এত আদর। যে যত বড়ো স্পষ্টবক্তা সে তত বেশি অসভ্য। এখনকার উক্তিটা যে পরিমাণে স্পষ্ট, সেই পরিমাণেই অসভ্য। কিন্তু আমিও তো অনপরাধ নই, ছিলাম না কখনো, আমাদের বাপজ্যাঠারা তো আমাদের অসভ্যই ভাবতেন, শিবনাথ শাস্ত্রী বা হেরম্ব মৈত্ররা তো নিশ্চয়ই ভাবতেন। তবে কেন মেনে নিতে আটকায় আমার?

সবই বুঝি, কিন্তু মেনে নিতে আটকায়। কোথায় আটকায়, কেন আটকায়? সেই তো, সেই 'আমাদের সময়'তে গিয়ে আটকে যায়। ওই সময়ে যা কিছু ঘটছে তার অনেক কিছুকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। মনে হয় সেই সময়টা আমার নিজের ছিল, এই সময়টা আমার নিজের নয়। একেই কি বুড়ো হওয়া বলে?

তো, এই আমার নিজের সময় বলে কোন সময়টাকে চিহ্নিত করব? যে সময়টা আমাকে গড়ে তুলেছে, আমার ভালোমন্দ পাপপুণ্য ন্যায়-অন্যায় ধর্মাধর্ম উচ্চাশা-নিরাশা-কে চেহারা দিয়েছে—অর্থাৎ এই 'আমি' মানুষটাকে গড়ে তুলতে যে সময়টার অবদান সবচেয়ে নিকট, সেটাই তো আমার সময়!

অথবা, এভাবেও হয়তো বলা যায় যে যখন থেকে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলাম তখন থেকেই আমার সময় আরম্ভ হল। ছোটবেলায় বড়োরা বলতেন, ঠাকুরকে নম করতে হয়—করেছি; বলেছেন, বড়োদের প্রণাম করতে হয়—করেছি; বলেছেন, ভোরবেলা শয্যাত্যাগ করা ভালো, মিথ্যেকথা না বলা ভালো, চুরি না করা ভালো, পরস্ত্রীতে লোভ না করা ভালো; যতদিন পর্যন্ত তাঁদের কথাগুলো প্রশ্নহীনভাবে মেনে নিয়েছি ততদিন পর্যন্ত বাস করেছি তাঁদের জগতে, তাঁদের সময়ে। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে, কোনটা করা ঠিক আর কোনটা করা ঠিক নয় সে সম্পর্কে তাঁদের স্পষ্ট অনুশাসন ছিল। আমার সময় আরম্ভ হয়ে গেল তখনই, যখন তাঁদের কাছে শেখা এই প্রায় স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বগুলো সম্বন্ধে প্রশ্ন জেগে উঠল মনের মধ্যে, যখন সেই স্বতঃসিদ্ধগুলোকে আর স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হল না।

নিজের কথা স্মরণ করে আসলেই বুঝতে চাচ্ছি নিজের বলে যাকে মনে করি সেই সময়টার কথা। আমি মানুষটা এখানে উদাহরণ মাত্র, কারণ যে উদাহরণটা খানিকটা বুঝি সেটাই দিচ্ছি। আসলে যেকথাটা বলতে চাচ্ছি তা হল সেই সময়টা, তার মানুষজন, পারিপার্শ্বিক, আর সবচেয়ে বেশি করে তার ভাবনাচিন্তাগুলিকে ধরবার চেষ্টা করা। সব মিলিয়ে তার ধর্মটাকে বুঝতে চাচ্ছি। আমি মানুষটাও সেখানে দর্শকমাত্র—হয়তো পরেকার যুগের মানুষের তুলনায় একটু সামনের সারির দর্শক, কিন্তু কখনোই কুশীলব নয়, কখনো বড়ো জোর জনতার দৃশ্যের এক্সট্রা।

জন্মেছিলাম ১৯৩৯ সালে। যদি বলা যায়, পনেরো থেকে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত সময়টা আমার সময়, তাহলে কি সত্যের কাছাকাছি পৌঁছনো হবে? প্রথম প্রেমে পড়েছিলাম আঠারো বছর বয়সে; তার আগে অনাত্মীয় কিশোরী বা তরুণী মেয়েদের কাছাকাছি এলে দশবারো বছর বয়স থেকেই শরীরে শিহরন জাগত, সেগুলোর কথা ধরছি না। কিন্তু আঠারো বছর বয়সে সেই প্রথম একটি বিশেষ মেয়েকে দেখে একটা বিশেষ ধরনের শিহরন জাগল। সেই থেকে, পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত নিজেকে তরুণ বলে ভাবা যায়—তারপর আমার চারপাশে পৃথিবীর খোসা ক্রমে শক্ত হয়ে এঁটে বসতে আরম্ভ করল। চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমরা জোর করে নিজেদের যুবক প্রমাণ করবার চেষ্টা করে যাই, নিজেকে বারবার মিথ্যে করে বোঝাবার চেষ্টা করি, যে আমি এখনো চেষ্টা করলে পৃথিবীটাকে বদলে দেবার ক্ষমতা রাখি। অন্যের কাছে তখনো নিজেকে যুবক বলে প্রমাণ হয়তো করা যায়, এমনকী স্ত্রীর কাছেও হয়তো প্রমাণ করা যায়, কিন্তু নিজের কাছে যায় না। চল্লিশের বেশ আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে গানে কবিতায় বয়স হয়ে যাওয়ার দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়, খুব একটা কান পাততেও হয় না তার জন্য—"তবু মনে রেখো" লিখেছিলেন তখন তাঁর বয়স মাত্রই সাতাশ। সাতাশেই তাঁর মনে হয়েছিল যা হবার তা একরকম হয়েছে, এখন থেকে প্রায় এই রকমই বরাবর চলবে, জীবনে হঠাৎ আশ্চর্য হবার আর কোনো কারণ রইল না। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেনও সেই কথা, নিজের জীবনস্মৃতিও শেষ করে দিয়েছিলেন চব্বিশ বছর বয়সে পৌঁছে। কিন্তু তিনি তো বনস্পতির মতোই বারে বারে নতুন হয়ে উঠতে পারতেন, আশি বছর বয়সে লিখেছিলেন আমার অঙ্গে সুরতরঙ্গে ডেকেছে বান, রসের প্লাবনে ডুবিয়া যাই, এসো গো, জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি, বিজন ঘরের কোণে। তখনো তিনি ভাবতে পেরেছিলেন তাঁর নিভৃত প্রতীক্ষায় কেউ বিস্ময় নিয়ে আসতে পারে, যূথীমালিকার মৃদুগন্ধের মতো হালকা পদপাতে। তাঁর সঙ্গে কার কথা। কিন্তু "ভালোমন্দ দুঃখসুখ যৌবন আমার, রঙবর্ণ কেড়ে নেবে উজ্জ্বল জামার, সহ্য হয়ে আসে রক্তে তুচ্ছ ওঠাপড়া—ভালোমন্দ দুঃখসুখ যৌবন আমার—" লিখেছিল আমার প্রজন্মের কবি শক্তি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, নিজের চল্লিশ বছরের জন্মদিনে।

তাহলে, পনেরো থেকে পঁচিশ—এই বয়সের সময়টাকে যদি আমার নিজের সময়

বলে মার্কা দিই, তাহলে দাঁড়ায় ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৫। ওভাবে তো সনতারিখ মিলিয়ে চিহ্নিত করা যায় না জীবনকে, তবু ধরা যাক, মধ্যপঞ্চাশ থেকে মধ্যষাট— এই সময়টা হল গিয়ে আমার সময়। এই সময়ে জীবন ছিল সবচেয়ে ঘন, সবচেয়ে দ্রুত, সবচেয়ে রহস্যময়, সবচেয়ে তরঙ্গময়, সবচেয়ে প্রশ্নময়, সবচেয়ে বেশি দুঃখের, সবচেয়ে বেশি সুখের। যদি কোনো সময়কে আমি খানিকটা বুঝে থাকি তাহলে সেটা এই একটি দশক। অথবা হয়তো কিছুই বুঝিনি, সময়ের ঢেউ বয়ে গিয়েছে আমার উপর দিয়ে, কখনো ভেসেছি কখনো ডুবেছি, ভাসতে ভাসতে ডুবতে-ডুবতে জল খেতে খেতে পেরিয়ে এসেছি সময়টা। আমি যা হয়েছি, আমি যা হইনি, আমি যা হতে পারতাম, সবই এই দশটা বছরের সাফল্য ও ব্যর্থতা, স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গ। সকলেরই বোধহয় এই রকম হয়, আমার মতো সাধারণ বোধ, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মরমানুষ যারা।

এই এক দশকব্যাপী কালখণ্ডকেই ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করা যাক তাহলে। বড়ো হওয়ার আরম্ভ কবে? যেদিন ইশকুল ফাইনাল পাশ করলুম? যেদিন প্রথম সিগারেট খেলুম? যেদিন প্রথম বাবা-মাকে ছাড়া একা একা রেলগাড়িতে চাপলুম? যেদিন প্রথমবার পথের পাঁচালী দেখে বেরোলুম? এই সবগুলো ঘটনাই পরস্পরের খুব কাছাকাছি সময়ে ঘটেছিল। তখন কলকাতা শহরের চেহারাটা অন্য রকম ছিল। পার্থদের বাড়ি গিয়েছিলুম নেতাজিনগকর, টালিগঞ্জ ট্রামডিপো থেকে হেঁটে যেতে হয়েছিল দিকচিহ্নহীন বাদাড়ের ভেতর দিয়ে দিয়ে। একটিমাত্র সবুজ রঙের প্রাইভেট বাস সেদিকে যেত কখনো সখনো, ঘনসবুজ আগাছার জঙ্গলের মধ্যেকার সরু রাস্তাটা ধরে, তাতে এত ভিড় যে ওঠার কথা সেই পনেরো বছর বয়সেও কল্পনা করতে পারতুম না। এর কিছুদিন আগে ওদিকে রেফিউজিদের বসানো হয়েছে ষোলো টাকায় পাঁচ কাঠা করে জমি দিয়ে দিয়ে। দেখিনি, পড়েছি। প্রতিভা বসুর স্মৃতিকথায় জীবন্ত ও সবিস্তার বর্ণনা আছে সেই ঘটনার।

তখন পয়সা বলতে বুঝতাম এক টাকার চৌষট্টি ভাগের এক ভাগ, বাংলা খবরের কাগজ সব তখন 'সাধু'ভাষায় লেখা হত, তখনো কলকাতায় বাঘমার্কা স্টেট ট্রান্সপোর্ট চালু হয়নি। সবুজ রঙের দোতলা প্রাইভেট বাসও ছিল—তখনও ছিল।

এখন পেছন ফিরে চেয়ে দেখতে গিয়ে ক্রমে আবিষ্কার করছি, অন্যমনস্কতার একটা অভেদ্য আস্তরণ দিয়ে আমার অস্তিত্বটা মোড়া ছিল। দেশকাঁপানো যেসব ঘটনা আমার সময়ের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে সেগুলোর প্রায় কোনোটাই আমাকে তেমন করে স্পর্শ করেনি, সারা জীবনের কোনো সময়েই না। ইশকুলে পড়ার সময় চুঁচড়ো শহরে, বা আই.এ পড়ার সময় বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে, সমসাময়িক ঘটনাবলি কোনো ছাপই ফ্যালেনি আমার জীবনে। বলতে পারব না, বেশির ভাগ বালকের ক্ষেত্রেই এমনটা হয়, নাকি শুধু আমার ক্ষেত্রেই হয়েছিল। বাড়িতে যেটুকু দেখেছি, বোনদের ক্ষেত্রে তো দূরস্থান, খুড়তুতো জেঠতুতো ভাইরাও বারো থেকে

পনেরো বছর বয়সে সমসাময়িক সামাজিক বা রাজনৈতিক ঘটনাবলি নিয়ে অত্যন্ত বেশি চিন্তিত ছিল বলে মনে হয় না। এখনকার দিনে অবশ্যি অন্য কথা, বেশির ভাগ ছেলের মাথায় ওগুলো একরকম জোর করেই ঢুকিয়ে দেয়া হয়। পাড়ায় পাড়ায় পার্টি অফিস রয়েছে এই মহৎ কর্মটি সম্পাদন করবার জন্য, পাড়ার ক্লাবে ক্লাবে তো বটেই, এমনকী ইশকুলে ইশকুলে তাদের অবাধ ও পবিত্র গতি। যে সময়টাকে আমি 'আমার সময়' বলে চিহ্নিত করতে চাচ্ছি, সেই সময়ে এইটে ছিল না। রাজনীতি সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও, রাজনীতির কথা একেবারে না ভেবেও একটা মানুষ স্বচ্ছন্দে বেঁচেবর্তে থাকতে পারত, এবং থাকতও। ছিল বটে কলকাতার কোনো কোনো পাড়ায় কমিউনিস্ট পার্টির লোকাল অফিস, সেখানে তাত্ত্বিক সাম্যবাদের ক্লাশও হত, ঘুরে ঘুরে ক্লাশ নিতেন জলি কাউল মণিকুন্তলা কাউল বিদ্যা মুনশি কল্যাণ দত্তরা, কিন্তু ওই পর্যন্তই, ওর চেয়ে খুব বেশি কিছু কখনোই নয়। যার ইচ্ছে সে যেত, যার ইচ্ছে সে যেত না। বেশির ভাগ ছেলেমেয়েই যেত না, তাদের কাছে ওটার অস্তিত্বই ছিল বলে মনে হয় না।

প্রথম যে রাজনৈতিক ঘটনার স্মৃতি আমার কাছে স্পষ্ট তা হল তথাকথিত 'স্বাধীনতা'র আগমন। তখন মায়ের সঙ্গে থাকি বড়ো জ্যাঠামশায়ের আশ্রয়ে, বাবা জাহাজে জাহাজে সপ্তসাগরে ভেসে বেড়ান। জ্যাঠামশায়—আমার বাবার নিজের দাদা নন, তাঁর বাবা আর আমার পিতামহ সহোদর ভাই ছিলেন—তখন বেঙ্গল গভর্মেন্ট প্রেসের ম্যানেজার, তাঁর কোয়ার্টার ছিল হেস্টিংস স্ট্রিটে বি-জি প্রেসের ওপরতলায়, রাস্তার ওপারেই রাজভবন। বাড়ির অন্য সকলের সঙ্গে মধ্যরাত্রে ছাদে দাঁড়িয়ে রাজভবনের মাথাকাটা গম্বুজের উপর পতাকাবদল দেখেছিলাম। ঘুমচোখে ঠিক কী দেখেছিল সাত বছরের বালক তা তার মনে নেই, কিন্তু একটা বিশেষ কিছু যে ঘটছে, বিশেষ একটা শুভঘটনা, এই রকম একটা অস্পষ্ট ধারণা তার মাথার মধ্যে তৈরি হয়েছিল, অনেক বছর পর্যন্ত বজায়ও ছিল ধারণাটা। দেশপ্রেমের ব্যাপারটা নিয়ে অবশ্য কিশোরবয়স থেকেই আমার একটা বুদ্ধিগত সমস্যা তৈরি হয়েছিল। দেশ তো একটা রাজনৈতিক ধারণামাত্র, তার সঙ্গে মানুষের সেন্টিমেন্টের যোগটা ঠিক কোথায় তা আমি কোনোদিনই খুব পরিষ্কার করে বুঝে উঠতে পারতাম না, আজ তো একেবারেই পারি না। এই সমস্যাটা নিয়ে বড়োদের সঙ্গে, ইশকুলের মাস্টারমশাইদের সঙ্গে, পরে এমনকী বড়ো হয়ে কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে, আলোচনা করতে গিয়ে অনেকবারই আমাকে মাথায় দেয়ালের ঠোক্কর খেতে হয়েছে। মাই কান্ট্রি রাইট অর রং, মাই মাদার ড্রাঙ্ক অর সোবার।

বইয়ে পড়া ইতিহাসে তো কতশতবার, তা ছাড়া আমার জীবৎকালেই আমি ভারতের মানচিত্র বদলাতে দেখেছি অন্তত ছ'বার। দেশভাগ, বর্মার পৃথক হয়ে যাওয়া, করদ রাজ্যগুলির ভারতভুক্তি, পরে আলাদা করে সৈন্য পাঠিয়ে হায়দরাবাদের ভারতভুক্তি—আমি যেখানে জন্মেছিলাম, সেই পূর্ববাংলার প্রথমে পূর্বপাকিস্তান এবং পরে বাংলাদেশ-এ রূপান্তরিত হবার ব্যাপারটা, সরকারিভাবে 'আমার' দেশের ব্যাপার

নয় বলে, ধরছিই না এর মধ্যে। যদি নাও ধরি তাহলেও, ভারতবর্ষ কোনদিকে—এই প্রশ্নটির সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে মাথা চুলকোতেই হয়, দ্বিধাহীন উত্তর মুখে আসে না। এবং যে-'দেশ' এর কোনো ভৌগোলিক চিরন্তনতা নেই, আছে শুধু রাজনৈতিক সাময়িকতা, যে ভূখণ্ড আজ আমার দেশ আছে কালকে না-ও থাকতে পারে, তার সঙ্গে আমার সেন্টিমেন্টের কেন যোগ থাকবে, তার পতাকা রক্ষার জন্য মৃত্যুবরণে ঠিক কোথায় আমার গৌরব, তা আমি পরিষ্কার বুঝে উঠতে পারি না। এই প্রশ্ন আমাকে কোনোদিন তেমন করে টানেনি। কারণ রাজনীতি ব্যাপারটার অর্থ আমি যেটুকু বুঝি তা হল, দেশ নামক এই সোনালি ধারণার গাজরটি সামনে ঝুলিয়ে রেখে, আমার দেশ সকল দেশের সেরা, যদি তা না হয় তো তাকে তা-ই করে তুলবে হবে, তার জন্য এই-এই কর্মসূচি নেয়া নিতান্তই প্রয়োজন, এই টোপটি দিয়ে যাঁরা দেশের পরিচালনায় আছেন তাঁরা দেশকে সেই দিকে চালান, যেদিকে গেলে তাঁদের দল বা সম্প্রদায় বা ভাষা বা জাতের সুবিধে। একেই বলে রাজনীতি—হিটলারও তাই করেছিলেন, আজকের নির্বাচননির্ভর রাজনৈতিক নেতারাও তাই করছেন, কোনো তফাৎ নেই। এমন একটা ভাব করা হয় যে আমার দেশ যদি কোনো কারণে বিপন্ন হয় তাহলে আমার অস্তিত্বই বিপন্ন হবে যেন। কিন্তু ব্যাপারটা তো আদৌ তা নয়। আমার ভাষা যদি বিপন্ন হয় একমাত্র তাহলেই আমার অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে, কিন্তু দেশের সঙ্গে তো আমার তেমন কোনো অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই। প্রত্যেক প্রজন্মেই তো লক্ষ লক্ষ মানুষ পৃথিবীর এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে বসতি করে। এই তো, যে ভূখণ্ডকে আমার পিতৃপিতামহরা দেশ বলে ভাবতেন চার বছর বয়স থেকে সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিলাম—কই অস্তিত্ব বিপন্ন হয়নি তো। শুধু ছুটিতে যারা দেশের বাড়িতে যেত তাদের একটু একটু হিংসে করতাম, আমার কোনো দেশের বাড়ি নেই বলে। দেশ ব্যাপারটাকে কখনোই আমার বেঁচে থাকার পক্ষে একটা জরুরি বিষয় বলে মানতে পারিনি।

দ্বিতীয় বড়ো রাজনৈতিক ঘটনা—গান্ধীহত্যা। ভবানীপুরে আমাদের এজমালি বাসাবাড়িতে থাকি তখন, হঠাৎ খবর এল, দিল্লিতে গান্ধী নিহত হয়েছেন। মনে আছে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল গান্ধী কে, তারপর বড়োদের স্তব্ধ ও বিষণ্ণ হয়ে যাওয়া, কারো এমনকী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না, পরদিন বাড়িতে উনুন জ্বলল না, এই সব মিলিয়ে ঘটনাটা খানিকটা অভিভূত করেছিল, মস্ত বড়ো একটা নিষ্ঠুর ও প্রতিকারহীন অন্যায় ঘটে গেল এই বোধটা সঞ্চারিত হয়েছিল মনে—কিন্তু ভুলে যেতেও দেরি হয়নি। তখনো ইশকুলে ভর্তি হইনি, ফলে বাড়ির বাইরেকার কোনো প্রতিক্রিয়ার কথা মনে নেই। এর মাসখানেক পরেই কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হল, কিন্তু আমাদের অসহযোগে জেলখাটা গান্ধীবাদী পরিবারে ঘটনাটা আলোচনার যোগ্য বলেই সম্ভবত মনে করা হয়নি। তার পরে বছর চীনে মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বে জনগণের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল, আমি ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিট্যুশনে ভর্তি হলাম ক্লাশ ফোরে—জীবনের প্রথম ইশকুল।

পুরোনো খবরের পাতা উলটে দেখতে পাচ্ছি পরের বছর বন্দেমাতরম্ ও জনগণমন গানদুটি ভারতের জাতীয় সংগীত হিশেবে গৃহীত হয়েছে, তার দুদিন পর প্রকাশিত হল ভারতের সংবিধান। সতীনাথ ভাদুড়ী প্রথম রবীন্দ্র-পুরস্কার পেলেন, আমার বাবা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করে জাহাজের মোটা মাইনের চাকরি ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে এলেন, তাঁর জীবনের দুঃখের দিনগুলি আরম্ভ হয়ে গেল। কিছুদিন চুপচাপ তাঁর ঘরে বসে থাকা, তারপর আমরা সবাই মিলে চলে গেলাম বেথুয়াডহরি। ছোটোমামা পূর্বপাকিস্তানে সরকারি চাকরি করতেন, পশ্চিমবাংলা অপ্ট্ করে এপারে চলে এসেছেন, সঙ্গে পাঁচটি অবিবাহিত বোন ও বৃদ্ধ বাবা-মা। তিনি ওখানে সার্কল ইন্সপেক্টর, আজকালকার পরিভাষায় যাকে বোধহয় বলে বি.ডি.ও। সেখানেই চলে গেলেন বাবা আমাদের নিয়ে, স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়ে সাহেবের চাকরি তিনি আর করবেন না, তা ছাড়া বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। সেখানে কিছুদিন ধরে তিনি ব্যবসায়ের উপায় সন্ধান করে বেড়ালেন। ক্রমে জানা গেল, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যাবসা হচ্ছে খেজুর গুড়ের ব্যাবসা। সদ্য জাহাজের চাকরি ছেড়ে এসে বাবার হাতে তখন অনেক টাকা—একসঙ্গে দশ হাজার খেজুরগাছ ইজারা নেয়া হল। সংক্ষেপে বলি, এক সের গুড়ও আমরা চোখে দেখিনি। আমি ও আমার দলবলই যে কতশত হাঁড়ি পেরেক বাঁধা লাঠি দিয়ে ফুটো করে তলায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে রস খেয়েছি তার কোনো হিসেব নেই। বেথুয়াডহরির ইশকুলে বোধহয় মাসছয়েক পড়েছিলাম। এমনিতেই আমি একটু কম বয়সে পড়তাম, তার ওপরে মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে ডবল প্রোমোশন পেয়ে এসেছিলাম—ক্লাশের ছেলেরা সবাই আমার চেয়ে বয়সে বেশ বড়ো। সে ইশকুলের একটাই স্মৃতি আছে—দুজন বয়স্ক সহপাঠী, তাদের মধ্যে একজন আবার বিবাহিত, আমাকে ইশকুলের পাশে একটা পোড়ো ঘরে নিয়ে গিয়ে হস্তমৈথুন করতে শিখিয়েছিল।

পরের বছর ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন হল, মামা বেথুয়াডহরি থেকে বদলি হয়ে চুঁচড়োয় চলে এলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও। প্রথমে মোগলটুলি অঞ্চলে একই বাড়িতে, তার পর হুগলি মহসিন কলেজের পাশের গলিতে আলাদা বাসা ভাড়া করে আমরা উঠে এলাম, রাস্তাটার নাম ছিল কলেজ রোড। কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হলাম ক্লাস সেভেন-এ। নির্বাচনের কোনো স্মৃতি নেই, সে সময় ওসব নিয়ে খুব একটা হৈ চৈ হতও না, পরে বড়ো হয়ে ওই সময় নিয়ে লেখা গল্প উপন্যাস অনেক পড়েছি কিন্তু কোথাওই নির্বাচনের কোনো উল্লেখ পাইনি। বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিট দূরে গঙ্গা, সেখানে বাবা-মা'র সঙ্গে স্নান করতে গিয়ে দিনকয়েকেই সাঁতার শিখে গেলাম, জলের পোকা হয়ে উঠলাম খুব তাড়াতাড়ি। ছোটবেলা বাবা বা মায়ের কাছে খুব একটা মারধোর খাইনি, যা খেয়েছি তার বেশির ভাগ গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে দেরি করে ফেরার জন্যে। নিজের সন্তান হবার পর বুঝতে পেরেছি, একটা দশ-বারো বছরের ছেলে যদি ভোর পাঁচটায় গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে বেলা বারোটায় বাড়ি ফেরে, তার কয়েকটা চড়চাপড় খাবার হক জন্মায়। স্নান মানে তো শুধু স্নান নয়,

রোদে জলে কাদায় আকাশের নীচে সমবয়সীদের সঙ্গে হৈ হৈ করে স্বাধীন সক্ষম ও চিন্তাহীনভাবে বেঁচে থাকা। নদীর ধার ধরে স্রোতের বিপরীত দিকে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাওয়া দু'তিন মাইল, তারপর জলে নেমে ভাসতে ভাসতে ফিরে আসা নিজেদের ঘাটে। ডিভিশনাল কমিশনারের বাংলোর বাগানে ঢুকে ফুল চুরি—কী আশ্চর্য লেগেছিল জীবনে প্রথমবার ওখানে কলাবতী ফুল দেখে, ফুল মানে জানতাম সুসংগত একটা জ্যামিতিক ব্যাপার, সবগুলো পাপড়ি একরকমভাবে সাজানো—ফুল যে অমন জ্যামিতিছুট হতে পারে কখনো ভাবিনি। বর্ষাকালে গঙ্গা বেয়ে কলকাতার দিকে যেত বজরা বোঝাই করে করে বিহার ইউ.পি-র ভুট্টা, হাল বেয়ে বজরায় উঠে সেই ভুট্টা চুরি করে এনে নদীর পাড়ে পাতাপুতা জ্বেলে পুড়িয়ে খাওয়া। বর্ষার ভরা গঙ্গায় বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে সাঁতরে চুঁচড়ো থেকে নৈহাটী গিয়ে নৈহাটীর মাটিতে পা না ছুঁইয়ে ফের এপারে ফিরে আসা, অশথ গাছের ডাল থেকে কোটালের বানের ঠিক মুখটায় লাফিয়ে পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে কিছুদূর গিয়ে ভেসে ওঠা, প্রিয় কুকুর লালুর গলা জড়িয়ে ধরে সাঁতার কাটা। গঙ্গার বুকে সাঁতরে বেড়ানো আর মাঠে ঘাটে রাস্তায় হেঁটে বেড়ানো আমাদের দলটার কাছে একই রকম সহজ ও স্বাভাবিক ছিল।

১৯৫২ সালে, পূর্ব পাকিস্তানে যখন ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনাটা ঘটল, তখন আমি ক্লাশ এইটে পড়ি, এদিককার খবরের কাগজে তেমনভাবে গুরুত্ব পায়নি খবরটা। মনে তো পড়ে না বড়োদেরও তা নিয়ে কথা বলতে শুনেছি বলে। বরং পরের বছর তেনজিং ও হিলারির এভারেস্ট বিজয় নিয়ে এ বঙ্গের বাঙালি অনেক বেশি উত্তেজিত হয়েছিল, তেনজিংকে বাঙালি প্রমাণ করার চেষ্টায়। আমরা ইশকুলের ছেলেরা উৎসবে মেতে উঠেছিলুম এটুকু মনে আছে। কিন্তু তার কয়েক দিন বাদেই এক পয়সা ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে সেই বিখ্যাত আন্দোলন হল কালকাতায়, পরে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হবে দীপক মজুমদার, সে এই আন্দোলনে যোগ দিতে গিয়ে গ্রেপ্তার পর্যন্ত হয়েছিল—কিন্তু আমাদের নিস্তরঙ্গ চুঁচড়ো শহরে তার কোনো ঢেউ গিয়ে পৌঁছয়নি। তা নিয়ে কাউকে কথা বলতে শুনেছি বলে মনে তো পড়ে না। চুঁচড়োয় তো আর ট্রাম চলে না, তার ভাড়া বাড়ছে তো আমাদের কী, ভাবখানা ছিল অনেকটা এই রকম। পরের বর্ষাতে প্রকাশিত হল কৃত্তিবাস পত্রিকা, আমি তখন ক্লাশ নাইনে পড়ি, পড়া কবিতার স্টক বলতে আদ্যোপান্ত সঞ্চয়িতা, আর পাঠ্যপুস্তকে ছাপানো যে-কটি কবিতা বাঙালিমাত্রই পড়ে সেই কটি। আধুনিক কবিতা বলে কবিতার যে আলাদা একটা জাত আছে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না, আধুনিক কবিতা শব্দবন্ধটাই শুনিনি বাস্তবিক। জীবনানন্দর নাম শুনতে তখনো আমার বছরদুয়েক বাকি, তবে সেই বাহান্ন তিপান্ন সালে ক'জনই বা তাঁর নাম জানত আর।

কবিতা পড়তে শিখেছিলাম বাবার কাছ থেকে। সাহিত্যচর্চা যাকে বলে বাবা তা করতেন না ঠিকই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় ছিল, বিয়ের পর মাকে প্রথম উপহার দিয়েছিলেন একটি তৃতীয় সংস্করণ সঞ্চয়িতা, নীল সিল্কে বাঁধানো ভারি মলাটটির

ডানদিকের নীচের কোনায় সোনার জলে মায়ের নাম লেখা, ঈষৎ ব্রাউন হয়ে যাওয়া অ্যান্টিক কাগজে ছাপা বইটি এখনো আছে আমার কাছে। সেখান থেকে গল্পের টানে পড়তাম গান্ধারীর আবেদন, কর্ণকুন্তীসংবাদ, কথা ও কাহিনীর কবিতাগুলো। ক্রমে অন্য কবিতাও। বাবা গঙ্গাস্নান করে ফিরতেন ভিজে কাপড়ে কবিতা আওড়াতে আওড়াতে—"দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল, বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল"। শুনতে শুনতে অনেকদিন আগেই মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। ভালো লাগত কণিকা-র চকচকে সিকির মতো প্রগল্ভ কবিতাগুলো, খেয়া পড়তে পড়তে অকারণে মন ভারি হয়ে আসত, সন্ধেবেলা বাড়িতে একা থাকলে যেমন লাগে। সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, কড়ি ও কোমল তেমন ভালো লাগত না—একমাত্র নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ছাড়া। কড়ি ও কোমল-এর সংরাগলিপ্ত কবিতাগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিরামিষগুলোকেই শুধু সঞ্চয়িতায় স্থান দেয়া হয়েছিল কিন্তু তার মধ্যেও 'চুম্বন' কবিতাটা পড়তে পারতুম না—নামটার দিকে চোখ পড়লেই কেন জানি না চোখমুখ ঝাঁঝাঁ করে উঠত, যদিও বাস্তবিক তখনো শব্দটার মানে খানিকটা জানলেও ব্যাপারটা আদৌ বুঝতুম না। তবে একটু বড়ো হতে না হতেই মানসী সোনার তরী চিত্রা চৈতালি, কল্পনা কথা ক্ষণিকা কণিকা আমাকে একেবারে লুঠ করে নিল। ক্লাস নাইনে যখন উঠলাম তখন সঞ্চয়িতাটি আমার প্রায় আদ্যন্ত মুখস্থ, এমনকী পুনশ্চ থেকে শেষ লেখা পর্যন্ত গদ্যকবিতাগুলোও।

ইশকুলের পড়াশোনায় ভালো ছিলাম না, তবে বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তার কারণও খুব একটা ঘটাইনি, পড়াশোনায় অবহেলা করেও পরীক্ষাগুলো পাশ করে যেতাম। শুধু অঙ্কটা পারতাম না—মা ম্যাট্রিকে ম্যাথম্যাটিকস আর অ্যাডিশনাল ম্যাথম্যাটিকস দুটোতেই লেটার পেয়েছিলেন, ছুটির দিনের দুপুরবেলায় আমার অঙ্কের সঙ্গে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বলতেন, তুই আমার ছেলে নস। সেই যে লীলা মজুমদার লিখেছেন না, বাঁশ আর বাঁদরের অঙ্কে উত্তর হবে সতেরো মিনিট, আর তাঁর গল্পের নায়কের উত্তর হয়েছিল সাড়ে পাঁচটা বাঁদর, আমার অঙ্কের মাথা ছিল অনেকটা ওই ধরনের। তাও কোনোমতে পাশ করে যেতুম জ্যামিতি মুখস্থ করে।

কিন্তু গল্পের বই পড়বার নেশা ছিল অসম্ভব। পাঁচ বছর বয়সেই চশমা হয়েছিল, ফলে দৌড়োদৌড়ির খেলায় বিশেষ আমল পেতাম না। তবে সেকালের কলেজিয়েট ইশকুলে বিশাল ওপেন লাইব্রেরি ছিল, ক্লাশ নাইন পর্যন্ত বছর তিনেকে সেই সংগ্রহ আদ্যোপান্ত পড়া হয়ে গিয়েছিল, কোনো কোনো বই অনেকবার করেও, যেমন পথের পাঁচালী আরণ্যক ঢোঁড়াই হাঁসুলি বাঁক গণদেবতা পুতুলনাচের ইতিকথা। এগুলো যে ভালো বই তা কেউ আমাকে বলে দেয়নি। গল্প হিশেবেই পড়তুম, সাহিত্য কাকে বলে জানতুম না। শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব ছাড়া শরৎচন্দ্রের কোনো বইই অবশ্য দু'বার পড়িনি—আজ পর্যন্ত নয়। অনেক দিন পর আনন্দ থেকে যখন একখণ্ডে সমগ্র শরৎচন্দ্র বেরোল, মায়ের জন্যে কিনে এনেছিলুম এককপি, মা খুব ভালোবাসতেন। সেই তখন

শেষবার চেষ্টা করেছিলাম শরৎচন্দ্র পড়তে—কিন্তু বৃথা চেষ্টা, একটা উপন্যাসও শেষ করতে পারিনি। তবে একটা কথা খুব পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পেরেছিলাম সেবার। কথাটা এই, বাংলাভাষায় লিখে কী করে সর্বজনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হতে হয় তার অভ্রান্ত নিদানগুলি সবই শরৎচন্দ্র উদ্ভাবন করে গেছেন। যাঁরাই বাংলায় জনপ্রিয় উপন্যাস লিখেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁর উদ্ভাবিত ফরমুলা ব্যবহার করেছেন, তার বাইরে কেউ একটা আঙুলও নাড়াবার চেষ্টা করেননি। আর চাঁদের পাহাড়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শিবরাম, নীহাররঞ্জনের কিরীটি রায় আর দেব সাহিত্য কুটিরের পূজাবার্ষিকীগুলো যে কতবার করে পড়েছি তার কোনো ইয়ত্তা নেই। 'বড়োদের বই' পড়তে কখনো বাধা পাইনি—তবে মায়ের একটা কাঠের বাক্সের একেবারে নীচে ফেলে রাখা 'যৌবনপথে' বলে বইটা খুলেই বুঝেছিলাম এটা লুকিয়েই পড়তে হবে। বাক্সটা রাখা থাকত ছাদের ঘরে—কাঠের একটা মই বেয়ে সে ঘরে উঠতে হত, মা উঠতে পারতেন না। আমার পড়ার জায়গা ছিল দেড়তলার ঘরে, মা দোতলায় রান্না করতে করতে মাঝে মাঝে হেঁকে বলতেন 'বাবলু চেঁচিয়ে পড়ো, আমি যেন শুনতে পাই।' অল্পদিনেই বুঝে গেলাম মা রান্নাঘর থেকে আমার চ্যাঁচানিটা শোনেন কিন্তু কী পড়ছি তা বুঝতে পারেন না, ফলে বন্ধুদের কাছ থেকে আনা দস্যু মোহন স্বপনকুমার বা কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের বইগুলি চেঁচিয়ে পড়ে একদিনের মধ্যে শেষ করে ফেরত দিতে পারতাম।

ভূগোলের মাস্টারমশাই শশধর চৌধুরী ছিলেন লাইব্রেরিয়ান। বই কেনার সরকারি গ্রান্ট এলে তিনি কলকাতায় আসতেন, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন ইশকুলের খরচে। কলেজ স্ট্রিটে বইয়ের দোকানের (সেকালে তো দে'জ ছিল না, তাহলে কোন দোকানে যেতেন? দাশগুপ্ত? চক্রবর্তী-চ্যাটার্জি? মনে করতে পারি না, কলকাতা তো তেমন চিনতাম না) কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আমি বলে দিতে পারতাম কোন বইটা লাইব্রেরিতে আছে কোনটা নেই, কোন বইটা আছে কিন্তু এত ছিঁড়ে গেছে যে আর ব্যবহার করা যায় না। একবার লাইব্রেরিতে আমাকে ইন্সপেক্টরের সামনে একজিবিটও করা হয়েছিল। পরে কলকাতায় এসে দেখেছিলাম, আমার চেয়ে বেশি বাংলা গল্পের বই পড়েছে এমন বন্ধুদের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়—মানব, মীনাক্ষী (বুদ্ধদেবের বড়ো মেয়ে), সুনীল, সুবীর, এই রকম মাত্রই কয়েকজন।

এখান থেকে পিছন দিকে তাকিয়ে পঞ্চাশ বছর আগেকার একটি বালককে ঝাপসা দেখতে পাই। খালি গা, খালি পা, কোমরে একটা দড়িবাঁধা ইজের, চোখে নিকেলের চশমা। জ্যৈষ্ঠের মার্তণ্ডতাপকে গ্রাহ্য না করে সে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে হুগলি মহসিন কলেজের বিশাল কম্পাউন্ডে, পিছনে গঙ্গার ধারে কলেজের ল্যাবরেটরির ফেলে দেয়া আবর্জনার স্তূপের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে যদি একটা আস্ত স্লাইড বা টেস্টটিউব খুঁজে পাওয়া যায়, গামছার একটা প্রান্ত কোমরে বেঁধে অন্য প্রান্ত দুই হাতে ধরে গঙ্গার ধারে হাঁটুজলে মাছ ধরবার চেষ্টা করছে, কখনো বা বারান্দায় বসে পাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসা রেডিয়োর গান শুনছে এক মনে। বাবা একটার পর একটা

ব্যাবসা ধরছেন আর বারে বারেই ব্যর্থ হচ্ছেন, জাহাজের চাকরির সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হতে হতে বছরতিনেকে প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছে, তাঁর ব্যবসায়িক প্রচেষ্টাগুলি ক্রমেই শস্তা থেকে শস্তাতর হয়ে আসছে। খেজুরগুড়ের পর কোঅপারেটিভ ট্রেডিং, তারপর ফিল্মের সাব-ডিস্ট্রিবিউটরশিপ, তারপর কিছুদিন এমনকী আটাচাক্কি—রেশনে গম দেয়া আরম্ভ হয়েছে তখন। বাড়িভাড়া সাড়ে সতেরো টাকা, ইলেকট্রিক নেই, দিনে আট আনা বাজার খরচ, তাই কোত্থেকে জুটত বলা কঠিন।

পাশের যুগলকিশোর সেনের বাগানওয়ালা দোতলা বাড়িতে রেডিয়ো বাজত, তাইতে শোনা যেত অনুরোধের আসরের গান। বেলা আড়াইটেয় যখন দ্বিতীয় অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হত, কেমন শুনশান হয়ে যেত পাড়াটা। বহু দূর থেকে ভেসে আসত ফেরিওয়ালার ডাক : 'ক্কু উ উ উ উ উ উ উ উ ল্‌পিমালাইবরোফ!'

আমাদের নিজেদের বাড়িতে গান সম্বন্ধে কোনো মোহ ছিল না। মামাবাড়ি ছিল যত ছোটই হোক তবু উনিশ-শতকী ফিউডাল সংস্কৃতির জমিদারবাড়ি, বরিশাল শহরে মস্ত বড়ো দোতলা দালান, বৈঠকখানা ঘরে দুয়েকখানা ঝাড়লণ্ঠন অয়েল পেন্টিং-ও ছিল বলে মনে পড়ে, দাদু-দিদিমার শোবার ঘরে বাঘের থাবার পায়াওলা আবলুশ কাঠের পালঙ্ক ছিল, গান ইত্যাদি শিল্পচর্চা সে বাড়িতে খুব স্বাভাবিক ছিল। মাছের আঁশের সূচিশিল্প ছিল দেয়ালে টাঙানো, তুলোর বেড়াল ছিল ফ্রেমে আঁটা। আর আমাদের নিজেদের পরিবারের সামান্য কিছু ভূসম্পত্তি হয়তো ছিল ঢাকা জেলার মহেশ্বরদি পরগনার আমদিয়া গ্রামে, পারিবারিক একটা শিবমন্দিরও ছিল বলে শুনেছি, কিন্তু সেই সম্পত্তি থেকে যৌথ সংসারের সম্বৎসরের খরচ উঠত বলে মনে হয় না। দুটো পরিবারের সাংস্কৃতিক পার্থক্য সেই ছোটবেলাতেই চোখে লাগত আমার। সেই গ্রাম নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা কোনোদিনই হয়নি, কারণ আমার সঙ্গে তার কোনো প্রত্যক্ষ যোগ তৈরি হয়নি কখনো। পূর্বপুরুষের ভিটে ছিল বলেই যে আমারও শেকড় সেখানে প্রোথিত তা তো আর নয়। শুনেছি আমার দেড় বছর বয়সের সময় আমাকে একবার সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কথা বলতে পারার আগেকার কোনো স্মৃতি থাকে না মানুষের। ছোটবেলার স্মৃতি যেটুকু আছে তা বরিশালের, একটু হয়তো নারানগঞ্জের, আর বেশির ভাগটা কলকাতার। সেই যে ছোটবেলায় মা একটা গান গাইতেন, "কিশোরগঞ্জে মাসির বাড়ি, মামার বাড়ি তেঁতুলপার, বাপের বাড়ি ব্রাহ্মণবাইড়া নিজের বাড়ি নাই আমার।"

তার জন্যে একটা চাপা অভিমানও আছে কি কোথাও, অন্তরের খুব ভিতরের দিকে? বুঝতে পারি না ঠিক। আজকাল মাঝে মাঝেই ঢাকায় যাই, বছরে অন্তত একবার যাওয়াই হয়, মিলনরা বলে 'চলের সমীরদা একবার আইম্‌দার থিকা ঘুরাইয়া আনি আপন্যারে—' বেশি দূরও নয়, ঢাকা থেকে মাত্রই আটত্রিশ কিলোমিটার উত্তরে, ওদের সঙ্গে গাড়িতে হয়তো ঘণ্টা দেড়েক, রাস্তাও ভালো শুনেছি—কিন্তু প্রত্যেকবারই এড়িয়ে যাই। কী হবে?

আমাদের পরিবার আমার জন্মের অনেক দিন আগে থেকেই নগরমুখী। আমার নিজের দাদু ছিলেন টেলিগ্রাম মাস্টার, আরেক দাদুও পোস্টাপিশে চাকরি করতেন। সংসারে প্রতিষ্ঠা পাবার উপায় হিসেবে তাঁরা আঁকড়ে ধরেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে। আমার ছোটদাদু বোধহয় স্বদেশী-টদেশী করতেন; বিয়ে করেননি, বৌবাজারে রূপম সিনেমাহলের পাশে 'দি লজ' নামে একটা বহু পুরোনো মেসে বহু বছর ধরে বাস করতেন, আর চিঠি লিখতেন স্টেটসম্যানে। এত চিঠি লিখেছিলেন যে সেগুলো একত্র করে একটা দেড়শো পৃষ্ঠার বইও ছাপাতে পেরেছিলেন। পিসিরা সেকালের ডায়োসেশনে পড়া; বড়ো পিসি প্রথম যুগের বি-টি, সম্ভবত প্রথম ব্যাচেরই, উত্তরবঙ্গে ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্ট্রেস অব স্কুলস ছিলেন, বিবাহ করেননি। পরে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে কাশী চলে যান, সেখানে একটি প্রাইমারি মেয়ে ইশকুলের দায়িত্ব নিয়ে সেটিকে ধীরে ধীরে বড়ো ইশকুলে, পরে এমনকী কলেজে পরিণত করেছিলেন। বড়োপিসির মৃত্যুর পর একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটেছিল কাশী শহরে—হিন্দু-মুসলমান একত্র হয়ে তাঁর শেষযাত্রায় কাঁধ দিয়েছিল।

কিন্তু গান তাঁরা কেউই শেখেননি, তাঁদের ভাইরা অর্থাৎ আমার বাপ-জ্যাঠাদের তো কথাই ওঠে না। কোনোরূপ সৃষ্টিশীল শিল্পকর্মকে আমাদের পরিবারে প্রশ্রয় বা এমনকী মনোযোগের যোগ্য বলে মনে করা হত না—সাংসারিক সাফল্যের পরিপন্থী বলেই ধরে নেয়া হত খানিকটা। সাংসারিক সাফল্যের ওপরে আর কোনো কথা ছিল না। আমি মামাবাড়ির সুরবোধটা পেয়েছিলাম, মামাবাড়ির গানের গলাটা পাইনি। এরকমটা যাদের হয় তারা খুব দুর্ভাগা—তারা গান শোনার আর্তিটা পায়, গান গাইবার তৃপ্তিটা পায় না। এদেরই কেউ কেউ বোধহয় পরে বাজিয়ে হয়, বা অন্তত ভালো শ্রোতা হয়। আমি কোনোটাই হয়ে উঠতে পারিনি, তবে সেই সময়ে গান শুনতে অসম্ভব ভালো লাগত। মা ছিলেন যাকে বলে স্বর্ণকণ্ঠী; বাবা সেটা বুঝতেন। এত যে দুঃসময় যাচ্ছে, তার মধ্যেও মাকে গান শেখাবার জন্যে সপ্তাহে একদিন নৈহাটি থেকে গঙ্গা পেরিয়ে আসতেন এক মোহান্ত, মা তাঁর কাছে কীর্তন শিখতেন। শুনতে শুনতে মনোহরসাইয়ের সুর আর আখর বুকের ভিতরে বসে গিয়েছিল, বহু বছর পরে এখনো মাঝে মাঝে বেজে ওঠে—"আমি কাজলের প্রায়, রেখেছি হিয়ায়..."।

ইশকুলে ক্লাশ টেন-এ একটি নতুন ছেলে ভর্তি হল, নীলকমল সেনগুপ্ত, সে নাকি গান গাইতে পারে। প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের দিন গাইলও একটা গান—গানটা আজও মনে আছে, "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী"। শুনে মনে হয়েছিল এটা সাধারণ গান নয়, এর ভিতরে অনেক গোপন কথা অনেক ঢেউ আছে যা আমার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি দুহাত বাড়িয়ে ধরতে পারছি না, অলক্ষিতে আমার মনের মধ্যে কোনো একটা কাঁচা জায়গায় গিয়ে ঘা দিচ্ছে যেন। কিন্তু তার পরে অনেক দিন আর রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে যোগাযোগ নেই।

পরের বছরের গোড়ায় সেনেট হল্-এর দুদিনব্যাপী কবিতাপাঠের আসর, সে

আসরে অতিতরুণ কবি যারা অংশ নেয় তাদের কেউ কেউ পরে আমার বন্ধু হবে, কিন্তু তখন আমার কাছে সে আসরের কোনো খবর গিয়ে পৌঁছয়নি। বলেছি তো, আধুনিক কবিতার অবস্থান আমার পৃথিবীর কক্ষপথের বাইরে ছিল, তাছাড়া আমি তখন অতিতরুণের চেয়েও অনেকটা ছোট, বালক। একটা চোদ্দ বছরের ছেলে আর একটি আঠারো বছরের নবযুবকের মধ্যে আস্ত একটা গ্রহের তফাৎ। আধুনিকতার ধারণার খানিকটা কাছাকাছি আসে, এমন কবি একমাত্র একজনের সঙ্গেই তখন খানিকটা পরিচয় হয়েছে ইশকুল লাইব্রেরির দৌলতে—তার নাম সুকান্ত ভট্টাচার্য। তখন হেমন্তর গলায় দারুণ জনপ্রিয় হয়েছে রানার আর গাঁয়ের বধূ, সেই টানে পড়ে ফেলা গিয়েছিল ছাড়পত্র আর ঘুম নেই। সুকান্তর চেহারাটা ভিতর ছাপানো থাকত, প্রিয়দর্শন কিশোর, গায়ে কোট, ঠোঁটে একটা আবছা হাসি, সেই চেহারাটা মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। যখনই সুকান্তর উল্লেখ হত ওই চেহারাটা মনে আসত। তারপর পড়লাম সুকান্তকে নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিচারণ, তার সঙ্গেও ছবিটার অমিল হল না। বোধহয় এক বছর কি দু'বছর, সুকান্ত মন জুড়ে ছিলেন। তারপর কবে এক সময় তাঁর কবিতার জাদু মন থেকে মুছে গেল, কথা উঠলেও মনে আর সাড়া জাগে না।

সেদিন আমার এক কাকা মারা গেলেন, হাসপাতালে গিয়ে তাঁর শবদেহ দেখলাম। শুকিয়ে কুঁকড়ে যাওয়া বৃদ্ধ এক, মুখে দিনপাঁচেকের দাড়ি, গালদুটো গর্ত হয়ে ভিতরে ঢুকে গেছে। কত বছর বয়সে গেলেন, ভাইদের মধ্যে সেই আলোচনায় উঠে এল তাঁর জন্মসাল—১৯২৬। হঠাৎ একটা ধাক্কা লাগল বুকের মধ্যে, সুকান্তর জন্মসাল না? সুকান্ত যদি আজ মারা যেতেন, এই রকমই কি দেখতে হত তাঁর শব, এই রকম পরাজিত ও বিষণ্ণ? সুকান্তকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে এসেছি আজ, কবিতার সীরিয়াস আলোচনার মধ্যে কেউ সুকান্তর উল্লেখ করলে তার দিকে বাঁকা চোখে তাকাই। কিন্তু, যদিও জানি বাঁচা না-বাঁচার চেয়ে চিরদিন বেশি, কিন্তু কী ভালো হয়েছিল একুশ বছর বয়সে সুকান্তর মৃত্যু, চিরকাল তিনি শেষ কৈশোরের প্রতীক হয়ে রয়ে গেলেন বাঙালি কবিতাপাঠকের স্বপ্নে, "আঠারো বছর বয়স জানে না ফাঁকি" যে লিখবে সে পঁচাশি বছরের বুড়ো হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে মারা গেলে কেমন বেমানান হত না?

সাইকেল চালাতে শিখেছি, ধনীপুত্র এক সহপাঠীর সাইকেল ধার করে চষে বেড়াচ্ছি চুঁচড়ো থেকে চন্দননগর। মার্চমাসে ইশকুল ফাইনাল দিলাম—যতদূর মনে পড়ে জুলাইতে রেজাল্ট বেরোল, কয়েক দিনের মধ্যে বাবার সঙ্গে গিয়ে ভর্তি হলাম বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশান বিদ্যামন্দিরে। আমার যা রেজাল্ট তাতে বিদ্যামন্দিরে চান্স পাবার কথা নয়, আর্টসে জনা পঁচিশ ছাত্র ভর্তি হয়েছিল তার মধ্যে জনা পাঁচেকই ছিল ম্যাট্রিকে স্ট্যান্ড করা, জলপাইগুড়ি থেকে প্রথম হওয়া রামগোপাল আগরওয়ালাও তাদের মধ্যে ছিল। কিন্তু সামনে বসে কাঁপা হাতে লেখা আমার ইংরেজি রচনাটি তেজসানন্দ মহারাজের কেমন করে যেন ভালো লেগে যায়। তা ছাড়া কোন শব্দের

বানানে পাঁচটা ভাওয়েলই আছে, এই ধাঁধাটির জবাবও আমি ভাগ্যক্রমে সঠিক বলতে পেরেছিলাম।

জীবনানন্দ ট্রামে চাপা পড়লেন, ভর্তি হলেন শম্ভুনাথ পণ্ডিতে, ভূমেন গুহদের প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ করে সপ্তাহখানেক পরে মারা গেলেন। আমি কোনো খবর রাখি না, রাখার কথাও নয়, কারণ কাবরটা কোথাও গুরুত্ব পায়নি—স্টেটসম্যান পত্রিকা খবরটা ছাপেনি বলে বুদ্ধদেব বসু তার সম্পাদককে চিঠি লিখে কুড়ি বছর ধরে পড়ে আসা স্টেটসম্যান পড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যামন্দিরে ঢুকেই কীভাবে যেন তার কিছু দিন পরেই জীবনানন্দকে আবিষ্কার করি। সম্ভবত প্রথম মরণোত্তর আকাদেমি পুরস্কার পাবার খবরটা কাগজে খানিকটা আলোড়ন তুলেছিল, এসে পৌঁচেছিল অন্যমনস্ক আমার কানেও। কার কাছে যেন শুনলামও জীবনানন্দের কবিতার কথা, কার কাছে শুনেছিলাম? রবিন সেনগুপ্ত? বিদ্যামন্দিরে যাদের সঙ্গে প্রথম বন্ধুত্ব হল তাদের মধ্যে রবিনই কবিতার ভক্ত ছিল খুব। আবু ইসহাক-এর 'সূর্যদীঘল বাড়ি' উপন্যাসের নামটির মুগ্ধ প্রশংসা শুনেছিলাম ওর কাছে, এখনো মনে আছে। এর কয়েক মাসের মধ্যেই সংগ্রহ করেছিলাম নাভানা প্রকাশিত 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা', প্রথম সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছিল জীবনানন্দের মৃত্যুর মাত্রই কয়েক মাস আগে। সবুজ ঝাউপাতা আঁকা সেই সংস্করণটি বহু বাসাবদল বহু অবহেলা পেরিয়েও এখনো কেমন করে যেন টিকে আছে আমার অনির্ভরযোগ্য সংগ্রহে, কিছুদিন আগে বাঁধিয়ে নিয়েছি নিজেহাতে।

আমি ইশকুল ফাইনাল পাশ করবার বছরখানেক আগে বাবা ব্যাবসার ধান্দা চুকিয়ে ফের ডাক্তারিতে ফিরে গেছেন। চাকরি নিয়ে চলে গেছেন বর্মা রেলে। সেখানে আবার কয়েক বছর তিনি সচ্ছলতার মুখ দেখবেন, যতদিন না বর্মার জাতীয়করণ হবে, চব্বিশ ঘন্টার নোটিশে দ্বিতীয়বার রিফিউজি হয়ে প্রায় একবস্ত্রে কলকাতায় ফিরে আসতে হবে তাঁদের। মা ছিলেন দু'বছর বয়সী আমার ছোট বোন আর আমাকে নিয়ে চুঁচড়োর বাড়িতে, আমি বিদ্যামন্দিরে ভর্তি হলে তিনিও বাবার কাছে চলে গেলেন।

আমি আমার বাবা-মায়ের প্রতি অন্তহীনভাবে কৃতজ্ঞ আছি এই কারণে যে এক ছেলে, এবং বারো বছর বয়স পর্যন্ত একমাত্র সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা আমাকে অতিলালিত করে মানুষ করেননি—আগলে রাখবার চেষ্টা করেননি, বিপুলা পৃথিবীর সঙ্গে আমার পরিচয়কে অতিমসৃণ করে দেবার প্রয়াসে নিজেরা ঘর্মাক্ত হননি, হাতড়ে হাতড়ে আমাকে নিজেনিজেই বুঝে নেবার সুযোগ দিয়েছিলেন। কী বই পড়ব তা কখনো বলে দেননি, দিনের পর দিন পাঠ্যবই না পড়লেও চেয়ে দ্যাখেননি, আবার সারাদিনরাত বই মুখে করে বসে থাকলেও আপত্তি করেননি, সিনেমা দেখব কি দেখব না, কার সঙ্গে মিশব কার সঙ্গে মিশব না, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলব কি বলব না, এসব নিয়ে মাথা ঘামাননি কখনো। একটিমাত্র বিষয়ে মায়ের নির্দেশ ছিল কঠোর—সন্ধেবেলা লণ্ঠন জ্বলবার আগে বাড়ি ফিরতে হবে।

বাবার ছিল অফুরন্ত প্রাণশক্তি। সারাদিন অনভ্যস্ত ব্যাবসাজগতে ঘুরে-ঘুরেও, বাড়িতে থাকলে নানা রকম রান্না করা, হাতের কাজ করা তাঁর শখ ছিল। তাঁর সুখের দিনে তাঁর তৈরি করা জ্যাম জেলি কেক পুডিং সস্ আমাদের বাড়ি ও মামাবাড়িতে বিরল সুখাদ্য বলে পরিগণিত ছিল। চুঁচড়োর বাড়িতেও রান্নাঘরে নিজের হাতে ইট আর মাটি দিয়ে এমন একটা উনুন বানিয়েছিলেন যাতে মা দাঁড়িয়ে রান্না করতে পারেন—সেকালে মেয়েদের দাঁড়িয়ে রান্না করবার ধারণাটা বাঙালি মধ্যবিত্ত বাড়িতে অভাবনীয় ছিল, তা ছাড়া সেই উনুনটির ভিতরে একটা খাঁজ ছিল যাতে বেক করা যায়। একটা কাঠের বাক্সে তাঁর যন্ত্রপাতি থাকত। আমার হাতের কাজের শখটা বোধহয় সেখান থেকেই পেয়েছিলাম। বাবার কাছে শিখতাম কেমন করে র‍্যাঁদা ধরতে হয়, করাত দিয়ে কাঠ সোজা করে কাটবার রহস্যটা কী, মাটির জিনিশ পোড়াবার সময় কী কী সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। মাসে একদিন মাংস আসত বাড়িতে, বাবাই আনতেন, এনে রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে ছুরি দিয়ে পাঁঠার কলজেটা কেটে কেটে দেখাতেন কাকে বলে অরিক্‌ল কাকে বলে ভেন্ট্রিক্‌ল। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ব্রিজ দেখলে বোঝাতেন কাকে বলে ক্যান্টিলিভার কাকে বলে সাসপেনশন, বহু উঁচুতে ভেসে থাকা পাখি দেখিয়ে বোঝাতেন কেমন করে চেনা যায় কোনটা চিল আর কোনটা শকুন। নানা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল, সেই আগ্রহ তিনি সঞ্চার করে দেবার চেষ্টা করতেন তাঁর বালকপুত্রের মধ্যে। ছোটবেলার সেই যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্যে একটা প্লায়ার্স এই সেদিন পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে ছিল, রান্নাঘরের সাঁড়াশির কাজে ব্যবহার হত সেটা।

আরেকটি অভ্যেস বাবা ইশকুলজীবনে করিয়ে দিয়েছিলেন সেটি সারা জীবন কাজে লেগেছে এখনো লাগছে—যে কোনো শব্দে সন্দেহ হলেই অভিধান দেখে নেয়া। দারিদ্র্য সত্ত্বেও আমাদের চুঁচড়োর বাড়িতে দুটি পকেট অক্সফোর্ড অভিধান ছিল, যে কোনো শব্দ আমি আর বাবা একসঙ্গে দেখতে শুরু করতাম, খেলাটা ছিল কে আগে শব্দটা খুঁজে বের করতে পারে। আমার অভিধানটাতে দেখা শব্দগুলোর পাশে কালি দিয়ে একটা ফুটকি দিয়ে রাখতুম, কোনো শব্দ ভুলে গেছি কিনা দেখবার জন্যে। কোনো কোনো রবিবার বাবা আমার কপিটা নিয়ে সেই শব্দগুলো বেছে বেছে মানে আর বানান জিগেস করতেন আমাকে। কিন্তু তাঁরও ছিল সেকালের প্রাচীনপন্থী ইংরেজিনবিশদের মতো গ্রামারের ওপর অন্ধ বিশ্বাস, ফলে আমার ইংরেজি পড়াটা কগনেট অবজেক্ট আর জিরান্ডিয়াল ইনফিনিটিভের গন্ডি ভেঙে খুব একটা বাইরে বেরোতে পারেনি ইশকুলজীবনে—যতদিন না বাংলা গল্পের বই মোটামুটি শেষ হয়ে গেলে, খিদের জ্বালায় নিজে নিজেই ঢুকতে হল ইংরেজি গল্পের বইয়ের জগতে—সেটা কলেজে ওঠার পরেকার কথা। এখনো মনে হয়, বাবা যদি গ্রামারের আবর্জনায় আমার মনটাকে ভারাক্রান্ত না করে আমাকে সেই বয়সে ইংরেজি গল্পের বইটা ধরিয়ে দিতেন তাহলে অনেক বেশি উপকার হত আমার। কিন্তু সেকালের থিয়রিই ছিল আগে

ব্যাকরণ পরে ভাষা—বাবা শিক্ষাবিদ ছিলেন না, চল্‌তি ধারণার বাইরে যে আর কিছু থাকতেও পারে সেটা তাঁর মনে হয়নি কখনো।

আমাকে ভর্তি করাবার জন্যে বাবা ছুটি নিয়ে এসেছিলেন। আমি বিদ্যামন্দিরে ভর্তি হলে তিনি মা আর ছোটবোনকে নিয়ে ফিরে গেলেন বর্মায়, আমি একটি ট্রাঙ্ক আর শতরঞ্চিতে জড়ানো বিছানা নিয়ে গিয়ে উঠলাম বিদ্যামন্দিরে।

পুরো নাম রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, ছাত্র ও অধ্যাপকদের ভাষায় সংক্ষেপে বিদ্যামন্দির। জি টি রোড থেকে যে রাস্তাটি সোজা গিয়ে বেলুড় মঠের প্রধান ফটকে মিশেছে, তার বাঁদিকে বিদ্যামন্দিরের গেট। গেট পেরিয়ে বিশাল মাঠ, রাস্তার দুপাশে দুটি ফুটবল ম্যাচ একসঙ্গে খেলা যায় এত বড়ো, আপাতত তার একপাশে বাস্কেটবল খেলার ব্যবস্থা, অন্য পাশে প্যারালেল বার রিং ইত্যাদি শরীরচর্চার আয়োজন, তার পর কলেজের দোতলা বাড়ি। বড়ো বড়ো চৌকো থাম, থামের মাথায় কারুকার্য করা। রামকৃষ্ণ মিশনের বাড়িগুলোর একটা বিশেষ ধরনের স্থাপত্য আছে, দেখলে চেনা যায়। কলেজবাড়ি পার হলে আবার একটা অত বড়োই মাঠ, মাঠ পেরিয়ে হস্টেল। একই বাড়িতে পাশাপাশি দুটি হস্টেল, ইস্ট আর ওয়েস্ট। আরো একটি ছোট হস্টেল আছে, সাউথ হস্টেল, সেটি কলেজ এলাকার বাইরে একটু দূরে, গলির মধ্যে। আমার জায়গা হল ইস্ট হস্টেলে, মাঝখানের হলঘরটিতে, সেখানে ছ'টি সিট।

জীবনে প্রথম বাড়ির বাইরে থাকা। নিজের সব কাজ নিজেকেই করতে হবে। সব কাজ বলতে আটপৌরে জামাকাপড় কাচা, খেয়ে উঠে বাসন ধুয়ে রাখা, নিজের জিনিশপত্র গুছিয়ে রাখা। আমাদের এক ধনী সহপাঠীর মা নাকি কাজগুলো করে দেবার জন্যে একটি ভৃত্যও দিতে চেয়েছিলেন ছেলের সঙ্গে।

কলেজের সামাজিক জীবনে মধ্যযুগীয় মঠবাসের আবহাওয়া। কোনো অহিন্দু ছাত্র বা শিক্ষক নেই, অহিন্দু ভৃত্য পর্যন্ত নেই। মিশনের আইনে অন্যধর্মসম্প্রদায়ের প্রবেশ নিষিদ্ধ না হলেও, তারাই এড়িয়ে চলে—কে আর সাধ করে অন্য সম্প্রদায়ের ইশকুল কলেজে পড়তে যায়। ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেরা সেকেন্ড ইয়ারের ছেলেদের দস্তুরমতো পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে, সন্ন্যাসীদের তো কথাই নেই। তাঁদের ডাকা হয় মহারাজ বলে। তাঁদের প্রত্যেকেরই একটা পোশাকি নাম আছে, তবে সাধারণভাবে ডাকতে গেলে তাঁর সংসারাশ্রমের নামের সঙ্গে 'মহারাজ' শব্দটি যোগ করে ডাকতে হয়—যেমন গোপাল মহারাজ, গোবিন্দ মহারাজ, তারাপদ মহারাজ। পরিধেয় দিয়ে বোঝা যায় তাঁদের মধ্যে তিনটি শ্রেণীভেদ আছে—মঠে সদ্য আগত কনিষ্ঠ মহারাজগণ পরেন শাদা ধুতি ও ফতুয়া, খানিকটা সিনিয়রিটি অর্জন করলে তাঁরা ওই ধুতিটাই কাছা বাদ দিয়ে লুঙ্গির মতো করে পরেন। শাদা কাপড় পরার কালে তাঁদের সন্ন্যাসী বলা হয় না, বলা হয় ব্রহ্মচারী। পুরোপুরি সন্ন্যাস অর্জন করলে (তার জন্যে পরীক্ষা-টরীক্ষাও হয়তো দিতে হয়, সেদিকটা আমার অজানা) তিনি গেরুয়া লুঙ্গি ও গেরুয়া

ফতুয়ায় প্রমোশন পান। তখন তাঁর নাম হয় আধ্যাত্মিক অনুষঙ্গজড়িত কোনো একটা শব্দের সঙ্গে 'আনন্দ' এবং নামের আগে 'স্বামী' শব্দটি যোগ করে—যেমন কলেজের অধ্যক্ষ হলেন স্বামী তেজসানন্দ, সচিব স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ। বাকি সমস্ত ভারতে স্বামী শব্দটি সন্ন্যাসী-নামের পরে বসে, রামকৃষ্ণ মিশন ব্যতিক্রম। স্বামী বিবেকানন্দকে বিবেকানন্দ স্বামী বললে তাঁর ভক্তরা সূক্ষ্মভাবে অপমানিত বোধ করেন।

সংস্থাটি সম্পূর্ণরূপে নারীবর্জিত—রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠানে কোনো সন্ন্যাসিনী নেই, অন্তত আমি দেখিনি, যদিও বিবেকানন্দের এক ধনী আমেরিকান মহিলাভক্তের দানেই মিশনের জমি কেনা ও মন্দির তৈরি হয়েছিল। তাঁর প্রতি ভক্তিমতী আইরিশ মহিলাটিকে তো তাঁরা মিশন থেকে বহিষ্কৃতই করে দিলেন বিবেকানন্দের মৃত্যুর পনেরো দিন পরেই। শুধু তাই নয়, সংস্থাটিকে বলা যায় প্রায় মহিলাবিদ্বেষী—তাঁদের পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান নেই যা নারীসেবায় নিয়োজিত, মেয়েদের জন্যে কোনো বিদ্যালয়ও তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেননি। মন্দির দর্শনার্থীদের মধ্যে অবশ্যি মহিলাদের অভাব নেই—বাস্তবিকপক্ষে তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কোনো মহিলা কোনো সন্ন্যাসীর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে চাইলে করতে পারেন, কিন্তু প্রণাম করতে হলে পাদস্পর্শ করা অবিধেয়—দূর থেকে প্রণাম করতে হয়। সমস্ত আবহাওয়াটি নারীভীতিতে শিঁটিয়ে আছে। রামকৃষ্ণদেব, যে কারণেই হোক মেয়েদের ভয় পেতেন, তাঁর ধর্মমত শুধুমাত্র পুরুষদেরই পালন করবার জন্যে; সমগ্র কথামৃতে কতবার যে 'কামিনীকাঞ্চন' ত্যাগ করবার কথা বলা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ভাবখানা এমন, মেয়েরা সংসার করবে, পতিদেবতার নৈশ খাঁই মেটাবে, ছেলেপিলে মানুষ করবে—তাদের আর ধর্মেটর্মে কী বা প্রয়োজন, তাদের জন্মই তো ওই জন্যে। তারা মানুষ নয়, তারা মেয়েমানুষ। ধর্মকর্ম হচ্ছে পুরুষের কাজ, সেজন্যে তাদের পক্ষে মেয়েদের যতটা পারা যায় এড়িয়ে চলাই ভালো। লক্ষণীয়, রামকৃষ্ণদেব কিন্তু মেয়েদের কখনো পুরুষমানুষকে এড়িয়ে চলতে বলেননি। এই একটা দ্বন্দ্বসমাসের সাহায্যে মেয়েদের সঙ্গে একটা জড় কিন্তু চকচকে ধাতুপদার্থের তুলনা বারংবার দিয়ে গেছেন রামকৃষ্ণদেব, তবু তাঁর ভক্তবৃন্দের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা চোখে পড়বার মতো বেশি, এটা খুবই আশ্চর্য। দুটো জিনিসের কারণ আমি কোনোদিন বুঝতে পারিনি, মেয়েদের মধ্যে—বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত, বুদ্ধিমতী বঙ্গললনাদের, মধ্যে—দুজন মানুষের প্রভাব এত বেশি কী করে হল, একজন রামকৃষ্ণদেব, আরেকজন পণ্ডিচেরির 'মাদার'। মীরা রিশার ও তাঁর সমাজতাত্ত্বিক স্বামী পল রিশার অরবিন্দের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে পণ্ডিচেরিতে গিয়েছিলেন 'যোগসাধনা' করবার অভিপ্রায় নিয়ে; কিছুদিন পর পল চলে আসেন, মীরা সেখানে থেকে যান অরবিন্দের 'সাধনসঙ্গিনী' হয়ে। পল তারপর কিছুদিন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে থেকে 'নির্জনবাস' করেন। শ্রীমতী রিশারের নিজস্ব যোগ্যতা বলতে, যতদূর বোঝা যায়, তিনি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে লিভ টুগেদার করতেন, এই পর্যন্ত—কেন তিনি বাঙালি মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে অবতারের মতো পুজো পান তা আমি বহু ভেবেও বুঝে উঠতে

পারিনি। আমার জানতে ইচ্ছে করে সেই কথোপকথনগুলি যা কখনোই জানা যাবে না—মীরা যখন স্থির করলেন তিনি পন্ডিচেরিতেই থেকে যাবেন, তখন শেষ কথাগুলি কী হয়েছিল পল ও তাঁর মধ্যে, পল ও অরবিন্দের মধ্যে।

ঘন্টাধ্বনির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছাত্রদের জীবন। ভোরবেলা ঘন্টা পড়ে, ঘুম ভেঙে উঠে হাতমুখ ধুয়ে তেতলায় প্রেয়ারহল্-এ যেতে হয়। মস্ত বড়ো প্রেয়ারহল, তার মাঝখানে কৃষ্ণনগরের পুতুলশৈলীতে রচিত শ্বেতপাথরের রামকৃষ্ণমূর্তি, মন্দিরের নকলে বানানো একটি চূড়াওয়ালা কাঠের বাক্সের মধ্যে স্থাপিত। তাঁর নিয়মিত ভোগ শয়ন ইত্যাদি পুতুলখেলাগুলিও আছে, সেগুলি অবশ্য ছাত্রদের করতে হয় না, হস্টেলবাসী এমন একজন ব্রহ্মচারীর উপরে সেই ভারটি ন্যস্ত যিনি সংসারজীবনে ব্রাহ্মণপরিবারের জাতক ছিলেন, তাঁর কাঁধে মোটা ও ধরধবে পৈতের গোছা মনে পড়ে। গান হয় বিবেকানন্দ-রচিত রামকৃষ্ণ বন্দনা—"খণ্ডন ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়"। সঙ্গে হার্মোনিয়াম তবলা ও খঞ্জনী বাজে। তারপর ঘন্টাদুই স্টাডি আওয়ার, তারপর স্নানখাওয়া সেরে কলেজ। স্নানঘর আছে কয়েকটি, তবে নেহাৎ অসুস্থ না হলে কেউ সেখানে যায় না, হস্টেল ও রান্নাবাড়ির মাঝখানে বিশাল পুকুরটাই ছাত্রদের স্নান করবার জায়গা। স্নান করে রান্নাবাড়িতে গিয়ে মাটিতে পাতা পাটির আসনে লাইন করে বসে খেতে হয়, খাবার পর থালাগেলাশ ধুয়ে রাখতে হয়। যে কোনো বয়সের বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষমানুষকে খাবার পর বাসন ধুয়ে রাখার কথা বললে তার গা ঘিনঘিন করে ওঠে বটে কিন্তু বাস্তবিক ধোবার হাঙ্গামা তেমন নেই, বারান্দায় গোটাদশেক কল লাগানো আছে সরুমুখের, তাতে জলের এমন তোড় যে তার নীচে ধরলেই থালা পরিষ্কার হয়ে যায়, আলাদা করে মাজবার দরকার হয় না।

খাবার পর জামাকাপড় পরে কলেজ। ইশকুলে শুধু প্রথম ঘন্টায় নাম ডাকা হত, এখানে প্রত্যেক ঘন্টায় নাম ডাকা হয়, এইটুকুই পার্থক্য। কলকাতার কলেজের ছাত্রদের যেমন ক্লাশ না করবার স্বাধীনতা থাকে, কলেজে ওঠবার মূল মজাটাই প্রথমদিকে তাই—এখানে সেরকম কোনো সুযোগ নেই, একটা ক্লাশে না গেলেই অধ্যক্ষের ঘরে ডাক পড়ে, ক্লাশে না যাওয়ার কারণ দর্শাতে হয়। তেজসানন্দ প্রত্যেকটি ছাত্রকে শুধু আলাদা করে চেনেন তাই নয়, বেশির ভাগ ছাত্রের বাবার নাম জানেন, ঠিকানা বলতে না পারলেও সে কোথা থেকে এসেছে, বাঁকুড়া না চুঁচুড়া তা মনে থাকে তাঁর। কলেজের পর বিকেলে টিফিন, তারপর খানিকক্ষণ খেলাধুলো বা যার যা খুশি করা, কেউ কেউ বেড়াতে যায় মঠে বা অন্য কোথাও, তারপর সন্ধেবেলা পুনশ্চ প্রেয়ার ও রোলকল, তারপর স্টাডি আওয়ার। আটটা নাগাদ খেতে যেতে হয়, খেয়ে এসে আবার খানিকক্ষণ পড়াশুনো, দশটায় বাতি নিবে যায়। সংসারের যাবতীয় মালিন্য ও বাস্তবের থেকে সযত্নে আড়াল করে রাখা এক মেধাবী ও সুকুমার উপবংশ, যারা কলেজ থেকে ভালো ফল করে বেরিয়ে ভালো চাকরি পাবে, বিবাহকালে প্রচুর পণ পাবে, সারা জীবনে কোনো নতুন চিন্তা করবে না, রামকৃষ্ণে ও গোব্রাহ্মণে ভক্তি

রেখে, কোমরের ঘের ও ব্যাঙ্কের ব্যালেন্স ক্রমাগত বাড়িয়ে গিয়ে, একদিন পৃথিবী থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে মসৃণভাবে রামকৃষ্ণলোকে লীন হয়ে যাবে, কোথাও কোনো দাগ রেখে যাবে না। কয়েক দিনেই অসহ্য হয়ে উঠল।

প্রতিবাদ মনের মধ্যে জমা হত, কিন্তু প্রকাশিত হবার ভাষা ও যুক্তি তখনো তৈরি হয়নি। ফলে প্রতিশোধটা নিতুম নিজের উপরেই : পড়াশোনা না করে, স্টাডি আওয়ারে সায়েন্সের ছেলেদের ল্যাবরেটরি নোটবইয়ের ছবি এঁকে দিয়ে, আপনমনে পাঠ্য পুস্তকের বাইরের গল্প ও কবিতার বই পড়ে পড়ে। গোবিন্দ মহারাজ পরের ছাত্রদের কাছে বহুদিন গল্প করেছেন, সমীর নামে সেই একটি ছেলে ছিল, কাশফুল হাতে নিয়ে ক্লাশে যেত, ফাইনাল পরীক্ষার সময় লজিকের দিন পরীক্ষার হলে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কখনো আমি ভালোবাসতে পারিনি ওই নিয়মে বাঁধা জীবন, বাইরের দিকে যেমন ঘন্টাধ্বনি দিয়ে বাঁধা, ভিতরের দিকে তেমনি প্রথার প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য দিয়ে বাঁধা। আমার ভালো লাগত ছুটির দিনে চুয়ান্ন নম্বর বাসে করে কলকাতায় চলে যাওয়া, গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো। বছরে দুবার বর্মা যেতুম, গরমের আর পুজোর ছুটিতে। পনেরো বছর বয়সে একা একা এসপ্ল্যানেডে ঘুরে ঘুরে ইউনিয়ন অব বর্মা এয়ারওয়েজ-এর আপিশ, বর্মী কনসুলেট, কোথায় ভিসা কোথায় পি-ফর্ম কোথায় ইমিগ্রেশন সব জোগাড় করতুম নিজে নিজেই। বাবা-মাও ব্যাপারটা অস্বাভাবিক বলে ভাবতেন না, কখনো বলেননি কারো সাহায্য নিতে, সেই কিশোর বয়সেই আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন বৃহৎ ও নিষ্করুণ পৃথিবীতে, পূর্ণবয়স্ক মানুষের সম্মান দিয়েছিলেন, শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়স্বজনের উদ্বিগ্ন নালিশেও গুরুত্ব দিতেন না। অলিতে গলিতে এত ট্রাভেল এজেন্সিও ছিল না তখন। ডাকোটা প্লেন জনা পনেরো কুড়ি যাত্রী নিত, বারোশো কিলোমিটার রেঙ্গুন যেতে সময় লাগত পুরো চার ঘন্টা। মাত্র হাজার পাঁচেক ফুট ওপর দিয়ে যেত, সমুদ্রের ঢেউগুলো দেখা যেত স্পষ্ট, জাহাজ দেখা যেত। একবার প্রচণ্ড কালবৈশাখীতে ওলটপালট খেতে খেতে আকিয়াবে নেমে পড়েছিল।

বিদ্যামন্দিরে থাকার সময় আমার মনোজগতে দুটি বড়ো বড়ো পরিবর্তন হয়, যা পরবর্তীকালে আমার 'আমি' হয়ে ওঠবার বড়ো বড়ো দুটি উপাদান হিশেবে কাজ করেছে। একটি হল, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে আমার আস্থা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল—ঢুকেছিলুম চিন্তাহীনভাবে ঐতিহ্যবাহী হিন্দু হিশেবে, বেরিয়ে এলুম মানবতাবাদী কট্টর নাস্তিক হয়ে। সেখানকার অতিরিক্ত ধর্মভাব ও প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রতি ভক্তিই বোধহয় আমার মনে এই বদলটা আরম্ভ করতে সাহায্য করেছিল।

দ্বিতীয় পরিবর্তনটা সম্ভবত আরো একটু বড়ো ধরনের। এই সময় থেকে এই বোধটা ক্রমে আমার মাথার মধ্যে তৈরি হয়ে উঠতে আরম্ভ করল, কেবলমাত্র কবিতা পড়ে গান শুনে ছবি দেখে এক ধরনের পদ্মভুক কিন্তু সার্থক জীবন কাটিয়ে দেয়া যায়—যাকে মানুষী ভাষায় 'সফলতা' বলে, তা যদি জীবনে নাও আসে, তাহলেও

জীবন ব্যর্থ হয় না, জীবনের আনন্দের ভাণ্ডার শূন্য হয়ে যায় না। পরীক্ষায় যারা ভালো ফল করে, প্রায়ই দেখি তারা সিলেবাসের বাইরে গেলেই অথই জল, প্রায় কেউ কোনো গল্পের বই পড়েনি, কবিতা পড়ার কথা তো ভাবতেই পারে না, পাঠ্যবইয়ের বাইরেকার পৃথিবীটা সম্পর্কে কোনো কৌতূহল নেই। বিদ্যামন্দিরে আমার চারপাশেই তথাকথিত 'ভালো' ছেলেরা ছিল বলে তাদের সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট কিন্তু সর্বজনীন ধারণা তৈরি হচ্ছিল মনে মনে। পরে বয়স বাড়লে দেখেছি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম থাকলেও ধারণাটা সাধারণভাবে সত্যি।

আরো মনে হল, এটা বোধহয় কবিতা পড়তে পড়তেই মনে এসেছিল যে, এমনকী সৃষ্টিশীল শিল্পসাহিত্যের চর্চা নিজে করতে না পারলেও এসে যায় না কিছু, কারণ জগতের সব কবিতা তো আমার জন্যেই লেখা হয়, সব গান আমার জন্যেই গাওয়া হয়, সব ছবি আমার জন্যেই আঁকা হয়। এই বোধ আমার মধ্যে সঞ্চারিত হতে আরম্ভ করে সম্ভবত 'পথের পাঁচালী' ছবিটি দেখার পর থেকে। বইটা বারবার পড়েও যে কথাটা এতদিন বুঝতে পারিনি ছবি দেখে সেটা স্পষ্টভাবে ধরতে পারলাম। ছবিটা কোনোভাবেই মূল বইটার সঙ্গে তুলনীয় নয়, কিন্তু তার সার্থকতা এইখানে যে বইটাকে বোঝবার পক্ষে চমৎকার একটি টীকার কাজ করে ছবিটা—অন্তত আমার ক্ষেত্রে করেছিল। সত্যজিৎ রায়ের চোখ দিয়ে দেখে আমি খানিকটা বুঝতে পেরেছিলাম অপু চরিত্রটিকে—যার জীবনে বাইরের দিক থেকে সুখী হবার কোনো উপলক্ষ কখনো ঘটে না, অথচ যার জীবনে আনন্দের পরিমাণও কখনো কমে না—যাদের সে ভালোবাসে, যাদের উপর নির্ভর করে তারা সবাই একে একে মরে যায় বা তার কাছ থেকে দূরে চলে যায়, তার নিজের জীবন শুধুই দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে যায়—তবু সব সময়েই আমাদের মনে হয়, অপুর বেঁচে থাকাটা অসম্ভব রকমের সার্থক। অর্থাৎ তার বেঁচে থাকার সার্থকতার চেতনাটা আসছে বাইরের পৃথিবীর কোনো ঘটনা থেকে নয়, তার নিজের অন্তর্জগতের গঠন থেকেই।

মনে আছে ছবিটা প্রথমবার দেখতে গিয়েছিলাম 'নিশাত' নামে শালকিয়ার একটা ছবিঘরে, সঙ্গে ছিল পার্থ চৌধুরী আর হিল্লোল সেন (আসল নাম নয়)। তিনটের শো, হস্টেলে ফিরতে হবে ছটার মধ্যে। ছটার সময় প্রেয়ার হয়, প্রেয়ারের পর রোলকল। সেই রোলকলে হাজির না থাকার শাস্তি এমন সাংঘাতিক যে শাস্তিটা কী তা পর্যন্ত সাহস করে জিগেস করে না কেউ। পাঁচটা থেকে হিল্লোল উশখুশ আরম্ভ করল। প্রথমে অল্পস্বল্প, 'মাইরি, ঠিকসময়ে ফিরতে পারব তো?' একটু পর, 'দেরি হয়ে যাচ্ছে মাইরি, তারাপদ মহারাজ—' আবার একটু পরে, 'এই, চল্ উঠে পড়ি—রোলকলে থাকতে না পারলে—' হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে, 'এই আমি মাইরি চললাম, তারাপদ মহারাজ—' তার পরে আবার বসে পড়ে, 'এই তোরাও চল্ না মাইরি, তারাপদ মহারাজ—' এদিকে আমি নিশ্বাস বন্ধ করে বসে আছি, চোখের পাতা কাঁপলে বিরক্ত হচ্ছি নিজের ওপর, কীসের যেন একটা ঢেউ বয়ে যাচ্ছে আমার ওপর দিয়ে, টের পাচ্ছি একটা

শিরশিরানি আমার মাথা থেকে তলপেট পর্যন্ত নামছে আবার উঠে যাচ্ছে, অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি এই ছবিটা দেখা শেষ হলে আমি আর আগেকার আমি থাকব না। একেই কি বড়ো হওয়া বলে? কত কী যে শিখেছি এই একটা সিনেমা থেকে! ছবি দেখতে শিখেছি, গান শুনতে শিখেছি, যে কোনো কাজ ভালোভাবে করতে গেলে তার ছোট ছোট ডিটেলগুলির দিকে নজর দিতে হয় এই কথাটা শিখেছি—আর শিখেছি কোনো একটা কাজ করে ওঠা, আর ভালোভাবে করে ওঠা—এই দুটোর মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য আছে, এই কথাটা। একবারেই, সেই প্রথম বার নিশাত থেকে বেরিয়েই যে সবকিছু শিখে ফেলেছিলাম তা নয়, তবে এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম এই ছবিটা অফুরন্ত আনন্দের উৎস হয়ে থাকবে জীবনে, ক্রমে ক্রমে শিখেছি বছরের পর বছর ধরে বার বার করে দেখতে দেখতে। শেষ দিককার সত্যজিৎকে যে প্রত্যাখ্যান করতে শিখেছিলাম তারও যুক্তিগুলি পেয়েছিলাম পথের পাঁচালী থেকেই। যখন আমি ছবিটা দেখছি, হয়তো তখনই সত্যজিৎকে সংবর্ধনা দেয়া হচ্ছে সেনেট হল-এ ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ সারিখে—সেই যেখানে পূর্ণেন্দু পত্রী রাত জেগে আলপনা দিয়েছিল, শুধু সেনেট হল-এর বারান্দায় নয়, বিশাল সেই সিঁড়িগুলো ভরে, এমনকী কলেজ স্ট্রিটের অ্যাসফল্টে—সেই আলপনার ভিতর দিয়ে উপচে পড়েছিল সত্যজিতের প্রতি শিল্পপ্রেমিক বাঙালির উচ্ছ্বসিত ভালোবাসা। বিদ্যামন্দিরে পড়ে আমরা সেসব খবর রাখতুম না তখন।

ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারটা এর থেকে অনেক সোজা। আমার বাবা মা গোঁড়া হিন্দু ছিলেন না বটে, তবে ধর্মবিশ্বাস নিয়ে তাঁদের মনে কোনো দ্বন্দ্বও ছিল না—অথবা, আমার মানবতাবাদী বাবার মনে দ্বন্দ্ব থাকলেও আমি তখন তা টের পাইনি। একটু আভাস পেয়েছিলুম, অনেক বছর পরে, যখন তাঁর মৃত্যুর বছরদুই আগে তাঁকে জিগেস করেছিলুম; আমি তো পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মে বিশ্বাস করি না—তৎসত্ত্বেও তিনি কি চান আমি তাঁর শ্রাদ্ধ করি? তিনি একটু ভেবে ইংরেজিতে জবাব দিয়েছিলেন, দ্যাখো, আমার শ্রাদ্ধ কীভাবে হবে তাতে আমার এমন কিছু উৎকট আগ্রহ নেই; তবে সুন্দরভাবে হচ্ছে এটা ভাবতে ভালো লাগে (I don't have any over-whelming interest in my funeral, but I'd like it to be in decent taste.)। বাবার শ্রাদ্ধে আমি পুরোহিত ডাকিনি, মন্ত্র পড়িনি, দিনক্ষণ মানিনি, লোকজন খাওয়াইনি; পরের রবিবার ঘরে একটা শাদা চাদর পেতে সবাইকে বসতে দিয়ে, বাবার একটি ফটো সামনে রেখে তাঁর প্রিয় কিছু গান গাওয়া ও কবিতা পড়া হয়েছিল। শক্তি বাবাকে ভালোবাসত, সেই শ্রাদ্ধবাসরে গেয়েছিল "জয় তব বিচিত্র আনন্দ"—মাথা ন্যাড়া করা বা কাচা গলায় দেবার তো প্রশ্নই ওঠে না, পরের সোমবার আপিশে যাবার সময় আরেকটা কাজ করেছিলুম—মাকে বললুম, তুমি আজ আমার সঙ্গে খাবে। খেতে বসে মায়ের পাতে একটুকরো মাছ তুলে দিয়ে বললুম, খাও। মা একবার আমার দিকে তাকালেন, তারপর লক্ষ্মী মেয়ের মতো নির্দেশ পালন করলেন। পরে অবশ্য তাঁর

কাছে শুনেছিলুম, বাবাও তাঁকে বলে গিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পরে মা যেন তাঁর খাওয়াপরার অভ্যাসগুলি বর্জন না করেন।

বদভ্যেস তো সহজে মরে না; ইশকুলে থাকতে নিয়মিত সরস্বতী পুজোর অঞ্জলি দিতুম; বিদ্যামন্দিরে এসে প্রথম বছরটা দিয়েছিলুম কিনা মনে নেই, দ্বিতীয় বছর তো অবশ্যই দিইনি। তবে অঞ্জলি দেব না একথা জোর দিয়ে মহারাজদের বা সতীর্থদের সামনে ঘোষণা করার সাহস তখনো হয়নি। হল কী, সরস্বতী পুজোর অঞ্জলি তো কয়েকবার করে দেয়া হয়? প্রথম দিকটায় কাজের অছিলা করে পালিয়ে বেড়ালুম, পরের দিকে ভান করলুম যেন আগের ব্যাচেই দেয়া হয়ে গেছে। 'আমি অঞ্জলি দেব না' বলবার মতো অবিশ্বাসের স্বভূমিতে স্থিত হতে হতে কয়েক বছর লেগে গিয়েছিল। প্রথমবার মনে হয়েছিল একটা বিরাট কাজ করলাম—কেন করছি সেটা অবশ্যি তখনো মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়নি, একটা আপত্তি সঞ্চারিত হয়েছিল এই মাত্র। তারপর কলকাতায় এসে, যখন আমি একজন সত্যিকারের কেউ-না, কেউ আমাকে লক্ষ করছে না, কেউ অমার খবর রাখছে না, অর্থাৎ যাকে বলে খাঁটি নন-এন্টিটি, তখনই ভাবতে ভাবতে যুক্তিগুলো খাড়া করতে পেরেছিলাম মনে মনে। ক্লাস থেকে আলগা হয়ে না গেলে ক্লাসের বাইরেকার মূল্যবোধগুলো ঠিকমতো হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজো হত কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন না প্রতিমাপুজোয়, অথচ পিতা সেখানে উপস্থিত থাকতেন, তাঁর আদেশ অমান্য করবারও সাহস ছিল না। সকলের সঙ্গে মণ্ডপে যেতেন, কিন্তু সবাই যখন প্রণাম করত তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন—ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করবার সময় কেউ তো আর দেখতে পাচ্ছে না তিনি প্রণাম করলেন কি করলেন না। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, তিনি একবার নাকি সকলের অলক্ষ্যে প্রতিমার মুখে কী একটা ছুঁড়েও মেরেছিলেন, আমি অবশ্যি অতদূর কখনো যাইনি।

কিন্তু অবিশ্বাসের ব্যাপারটা দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছিল সরস্বতীকে ঘিরেই—কারণ দেবদেবীদের মধ্যে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটাই তখন সবচেয়ে নিকট ও প্রত্যক্ষ। সংস্কৃতটা সামান্য শিখেছিলাম, বিদ্যামন্দিরে একবার একখানা বাঁধানো পুরোহিতদর্পণ হাতে পড়ল। সেখানে সরস্বতীবন্দনাগুলি পড়তে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, স্তবের মধ্যে সরস্বতীকে কোথাও মাতা বলে সম্বোধন করা হয়নি, লক্ষ্মী দুর্গা ইত্যাদিদের ক্ষেত্রে যা করা হয়েছে। তারপর, স্তবের বাণীর মধ্যেও মাতৃভাব নেই—'কুচযুগশোভিত মুক্তাহারে' বা 'কুচভরণমিতাঙ্গী' বলে কেউ মায়ের বর্ণনা করে না। নানা জায়গায় সরস্বতীর বর্ণনা পড়ে আমার ধারণা হল, ইনি সকল বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী এবং স্বৈরিণী, যাকে ইচ্ছা তাকে—আশ্রয় করেন না, ক্লিওপেট্রার মতো তাকে গ্রহণ করেন, তার উপর ভর করেন। যাকে দয়া করেন সে কবি হয়, ভাবুক হয়, দার্শনিক হয়—অর্থাৎ সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা হয়ে যায়, খানিকটা পরিতে বা নিশিতে পাওয়ার মতন—সে এমন জিনিশ দ্যাখে যা আর কেউ দ্যাখে না, এমন জিনিশ শুনতে পায় যা আর কেউ

শোনে না, এমন জিনিশ সৃষ্টি করতে পারে যা অন্য সকলের কল্পনারও পরপারে। অর্থাৎ তার মধ্যে একটি জাদুক্ষমতার আবির্ভাব হয়। এই রহস্যময়ী দেবীকে যদি ভজনা করতেই হয় তবে মাতৃভাবে না করে প্রেমিকাভাবে করাই সংগত, এই দেবীর কল্পনা যাঁরা করেছিলেন প্রথম, তাঁরাও সম্ভবত তাই করেছিলেন। যতই সরস্বতীর সম্পর্কে নানা পৌরাণিক কাহিনী জানতে লাগলাম ততই আমার ধারণা হতে লাগল সরস্বতী নামত বিষ্ণুর ঘরনী হলেও আসলে তিনি ফ্রি এবং ইন্টেলেকচুয়াল নারী—অনেকটা সিমোন দ বভোয়ার-এর ধরনে। অত্যন্ত সংবেদনশীল কিন্তু ভয়ংকর নিষ্ঠুর স্বামিনী, যার উপর ভর করেন তাকে এমন কিছু সুখ দেন যা অন্য লোকে কল্পনাও করতে পারে না—কিন্তু তার সামাজিক সাংসারিক এবং ব্যক্তিগত জীবন একেবারে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। শুধু তার অকিঞ্চিৎকর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে তার নাম ইতিহাসের পাতায় জ্বলজ্বল করে, আপনাতে আপাতসার্থক, মরত্বের শেষ পরিণাম। কিন্তু তাতে সেই মানুষটার কি এসে যায় কিছু? এবং তা যদি হয় তবে তাঁকে পাবার জন্য জীবনপাত করা গেলেও, তাঁর পুজো করার কোনো তো যৌক্তিকতা নেই। এত কথা যে সেই পনেরো ষোলো বছর বয়সে বিদ্যামন্দিরে বসে ভাবতে পেরেছিলাম তা অবশ্যই নয়, সিমোন দ বভোয়ারের নামও শুনিনি তখন—কিন্তু সরস্বতীকে মাতৃজ্ঞানে পুজো করার যে কোনো মানে হয় না, এই পর্যন্ত মনে হয়েছিল, এবং সেই মনে হওয়াটাকে কাজেও পরিণত করেছিলাম।

এবং যা হয়, পতনের পথে একবার গড়াতে আরম্ভ করলে আর থামা যায় না। সরস্বতীর পুজোটা বাদ দিতে পারার ফলে ধর্মাচার সংক্রান্ত অন্যান্য জন্মসূত্রে পাওয়া বন্ধনগুলোও কেমন আপনা থেকে আলগা হয়ে যেতে আরম্ভ করল। ক্রমে বুঝতে আরম্ভ করলাম যে ধর্মানুষ্ঠান মাত্রেই, শুধু যে অর্থহীন তাই নয়, তা তার ঘোষিত উদ্দেশ্যেরই পরিপন্থী। যেহেতু পৃথিবীর সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ই পরস্পরের বিরোধী—এমন কোনো ধর্মসম্প্রদায় সম্ভবই নয় যার সঙ্গে অপর কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের কোনো বিরোধ নেই—তাই যে কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার অর্থই হল পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষকে বৈরী ভাবা, বেশির ভাগ মানুষের সঙ্গে দূরত্বের বোধকে, শত্রুতার বোধকে মনের মধ্যে লালন করা। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই আছে দল বাঁধার প্রবণতা। আদিম মানুষ দলবদ্ধ হয়ে থাকত, কারণ তার একলার শক্তি বিরোধী শক্তির কাছে তুচ্ছ ছিল, ম্যামথ কিম্বা ম্যাস্টডনের সঙ্গে একা একা লড়াই করা অসম্ভব ছিল। সেই দল বাঁধার প্রবণতাই ক্রমশ ধর্মসম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে, যার মূল স্বভাবই হল প্রতিরক্ষা—অর্থাৎ অপর ধর্মের মানুষের প্রতি সর্বদা অবিশ্বাসের সতর্ক চক্ষু মেলে রাখা। এক ধর্মের মানুষ সর্বদাই অন্য ধর্মের মানুষের প্রচ্ছন্ন শত্রু—যতই তারা কাছাকাছি বাস করুক, যত দিন ধরেই বাস করুক, যতই তারা মুখে সম্প্রীতির বাণী কপচাক। সব মানুষকে ভালোবাসার প্রথম শর্ত হল কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মে বিশ্বাস না করা—এটা বুঝতে খুব বেশি সময় লাগেনি আমার।

বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন ছাত্রদের একটি সংগঠন আছে, আমি তার আজীবন সদস্য, ফলে তাদের মুখপত্রটি নিয়মিত পেয়ে থাকি। প্রতিটি সংখ্যায় কোনো না কোনো রচনায় থাকে শ্রীরামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ বা সারদামণির স্তুতিমূলক রচনা, অন্য রচনাবলির মধ্যেও তাঁদের বিষয়ে শ্রদ্ধাভক্তির প্রকাশ একটি প্রধান স্থান অধিকার করে থাকে। এটা কি নিতান্তই আবশ্যক? ধরে নিলাম শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার ছিলেন, লাল জবার গাছে শাদা জবা ফোটাতে পারতেন, বা বিবেকানন্দ স্বামী মহাপুরুষ ছিলেন, সারদামণি চিরন্তন ভারতীয় নারীর আদর্শ ছিলেন—কিন্তু, এই পত্রিকাটির প্রতিটি সংখ্যায় সে বিষয়ে আলোচনা বা উল্লেখ করবার কী দরকার আছে বুঝে উঠতে পারি না। কোনো একটা বিষয়কে বিচারের ঊর্ধ্বে রেখে দিলে কখনো সত্যিকারের সাবালক হয়ে ওঠা যায় না। আর, আরেকটা বিষয়ে পত্রিকাটি অত্যন্ত সোচ্চার—বিদ্যামন্দির থেকে যাঁরা পাশ করে বেরিয়েছেন তাঁদের মধ্যে পরে যাঁরা বড়ো বড়ো চাকরি করেছেন তাঁদের সাক্ষাৎকার, তাঁদের নিয়ে আলোচনা, তাঁরা জীবনে কীভাবে 'সফলতা অর্জন' করেছেন তার বর্ণনা। আমার মনে প্রশ্ন তৈরি হয়, একটা বিদ্যালয় থেকে ক'জন আই.এ.এস বা আই.পি.এস নির্গলিত হয়েছে, তাই দিয়ে কি বিদ্যালয়টির মান স্থির হয়? বিশেষ করে এমন একটি বিদ্যালয়ে যেখানে যাঁর পুজো করা হয় তিনি চিরকাল বিষয়বুদ্ধি বর্জন করবার কথা বলে গেছেন? স্ববিরোধটা এইখানে।

বিদ্যামন্দিরে এত অজস্র মানুষকে এতবার এত অকারণে প্রণাম করতে হয়েছে যে প্রণাম ব্যাপারটার প্রতিই আমার অভক্তি জন্মে গেল, মনে হতে লাগল আমি যে কাউকে শ্রদ্ধা করি না, সেইটে গোপন করবার জন্যেই তাকে প্রণাম করি। ফলে এই দাঁড়িয়েছে যে আজ তেত্রিশ বছরে আমি কখনো আমার একমাত্র সন্তানের প্রণাম নিইনি। ভালোবাসা ছাড়া একজন মানুষ আরেকজন মানুষের কাছে কী আর চাইতে পারে? বাবা জানতেন আমি প্রণাম করা পছন্দ করি না, কখনো প্রণাম দাবি করেননি। শুধু মা মাঝে মাঝে, যেমন বিজয়ার পরে, চুলের মুঠি ধরে মাথাটা নামিয়ে ধরতেন নিজের পায়ের উপরে। বলতেন, বিজয়ার পর মাকে প্রণাম করবি না মানে? কর্, প্রণাম কর্ শিগগির—জোর করে প্রণাম আদায় করে নিতেন দুর্বিনীত পুত্রের কাছ থেকে।

তবে এসব কথা বলে আমি যে কোনো কৃতিত্ব নিতে চাচ্ছি বা নিজের পিঠ চাপড়াবার চেষ্টা করছি তা একেবারেই নয়, কারণ আমি জানি এর কোনোটাই কিছু নতুন কথা নয়। আমি যখন মায়ের কোলে শিশু তখন আমার মাস্টারমশাই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পিতৃশ্রাদ্ধ বর্জন করেছিলেন; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা শুনেছি, ছাত্ররা কেউ তাঁকে প্রণাম করলে তিনি তাকে ফিরে প্রণাম করতেন। নিজের অন্তর্জীবনের প্রতীতিকে বাইরে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অনেকেই সাংঘাতিক সব সাহসিকতার কাজ করেছেন, অনেকেই প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে কোনোভাবেই নিজেকে

তুলনা করবার স্পর্ধা আমি করছি না। আমি শুধু বোঝবার চেষ্টা করছি আমি মানুষটা কীভাবে গড়ে উঠেছি সেই সময়টায়, কী কী প্রভাবের সমাপতনের ফলে। বিদ্যামন্দিরে পড়তে না গেলে আমি হয়তো আমার সমকালীন বেশির ভাগ মানুষের মতোই শিথিলবিশ্বাসী হতুম—অর্থাৎ, মনে মনে কোনোটাই খুব জোরালোভাবে বিশ্বাস করি না, কিন্তু সামাজিকতার দাবিতে সবকিছুই করে উঠি—পুরুতও ডাকি, ম্যারাপও বাঁধি, শ্রাদ্ধের বা পৈতের নিমন্ত্রণেও যাই। তা না হয়ে, আমি যে বুঝতে শিখেছি এই তথাকথিত ধর্মাচরণগুলোর মধ্যে কোথাও একটা ঘোরতর অন্যায় আছে, সেই বুঝতে শেখাটা আরম্ভ হয়েছিল মনে মনে বিদ্যামন্দিরের অর্থহীন প্রথাপালনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে। প্রকাশ্যে প্রতিবাদের তো সাহস ছিল না। প্রতিবাদ করার মতো বিদ্যেও ছিল না।

আমার সমবয়স্ক যিনি এই তুচ্ছ লেখাটার ওপর চোখ বোলাবেন তিনি হয়তো আবিষ্কার করতে পারবেন কোনো প্যাটার্ন—এর সমান্তরাল কোনো ঘটনা, চিন্তাপদ্ধতির কোনো বিবর্তন, যা তাঁর নিজের জীবনেও ঘটেছিল। তা যদি হয় তাহলেই এই কথাগুলো বলবার একটা মানে তৈরি হবে। আমি খুব ভালো করেই জানি আমার জীবনের ইতিহাসে কারো আগ্রহ নেই, থাকার কথাও নয়। কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে কোনো সমকালীন সত্য বেরিয়ে আসে কিনা সেটাই হল যে কোনো স্মৃতিকথা পড়ার, বা লেখার, মূল কারণ। সেই রকম কিছু যদি পাঠক এই লেখাটার মধ্যে খুঁজে পান, যে দশকটিকে বর্ণনা করবার চেষ্টা করছি নিজের স্মৃতিকে অবলম্বন করে, তার কোনো প্রাসঙ্গিকতা যদি তিনি নিজের জীবনে আবিষ্কার করতে পারেন, তাহলেই বোঝা যাবে আমার দেখাগুলো, ভাবনাগুলোর মধ্যে কোথাও কোনো সত্য ছিল কিনা।

এক শীতের দিনে রেডিয়োতে প্রথম সর্বভারতীয় কবিসম্মেলন বসল, বাংলা ভাষায় কবিতা পড়লেন বুদ্ধদেব বসু। আমার প্রিয় লেখকদের তালিকায় এখনো তাঁর নাম নেই, উপন্যাসগুলোয় দাঁত ফোটাতে পারি না, শুধু 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' পড়ে অবাক হয়ে গেছি। আর বছরতিনেক বাদে যে বুদ্ধদেব বসু আমার জীবনের প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠবেন তাঁর লেখাপত্র থেকে তখনো বেশ দূরেই সরে থাকি।

পুজোর ছুটিতে সিউড়ি গেলাম, ছোটমামা কিছুদিন হল সেখানে বদলি হয়েছেন মশানজোড় বাঁধের কাজে, ইরিগেশন কলোনিতে থাকেন। মামার বাড়িটা সব সময়ই আমার কাছে আনন্দের জায়গা। অবিবাহিত, ফুর্তিবাজ, স্নেহপ্রবণ, গানপাগল মামা চিরকাল আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। না বলে তাঁর সাইকেলটা নিয়ে দূরে দূরান্তে চলে গিয়েছি একা একা—রাজনগর, বক্রেশ্বর, শান্তিনিকেতন, একবার এমনকী তারাপীঠ। আর সিউড়ি গেলে একাধবার যাওয়া হবেই তাঁর সঙ্গে জিপে করে মশানজোড় গ্রামে, সেখানে ময়ূরাক্ষী নদীর ওপর বাঁধ বাঁধার তোড়জোড় চলছে আটানব্বইটি গ্রাম ডুবিয়ে দিয়ে, মামা আছেন সরকারের তরফ থেকে তার জন্য জমি সংগ্রহ করার দায়িত্বে। জায়গাটি বিহারে কিন্তু প্রকল্পটি বিহার ও পশ্চিমবাংলা দুই সরকারের যৌথ

দায়িত্ব বলে সেখানে পশ্চিমবাংলা সরকারের একটি বিলাসবহুল ডাকবাংলো আছে, সেখানেই গিয়ে উঠি। আজকের দিনে যাঁরা মশানজোড় বাংলোয় রাত কাটান তাঁরা এর জীর্ণ দশা দেখে সেদিনের বৈভব কল্পনা করতে পারবেন না। জানলার পর্দা, বিছানার চাদর, বেসিনের চাকচিক্য, সবই অনিন্দ্য। আর বাংলোর সবচেয়ে বড়ো অ্যাসেট ছিল তার পাচক রহমান। কখনো তাকে ধোপদুরস্ত শাদা উর্দি পরা ছাড়া দেখা যেত না। নিজের জীবিকা নিয়ে এমন গর্বিত মানুষ কম দেখা যায়। সন্ধের পর রহমান একটু রঙিন হত। আমরা যখন বারান্দায় বসে জলের শোভা দেখছি, মোটাসোটা মানুষটি হেলতে দুলতে এসে সেলাম করে জানতে চাইত, সাহেবরা কী চালের ভাত খেতে ইচ্ছে করেন? ভেতো বাঙালি সায়েব এমত প্রশ্নে চমকে গিয়ে ব্যাখ্যা চাইলে রহমান সবিনয়ে নিবেদন করত, তার ভাঁড়ারে সতেরো রকম চাল আছে, সায়েবগণ যেটা হুকুম করবেন সেটা দিয়েই সে চাওল পাক করে দেবে। রাস্তার ওপারের পাহাড়চুড়োটায় বিহারের বাংলো তখনো তৈরি হয়নি, ঘন জঙ্গলে আকীর্ণ পাহাড়ের উপর থেকে গভীর রাত্রে মাঝে মাঝে বাঘের গম্ভীর ডাক ভেসে আসত।

তো সেই মামাবাড়িতে সেবার পুজোয় আবিষ্কার করলাম 'তিথিডোর', তিন মাসি কলেজে পড়ে, তাদেরই কেউ লাইব্রেরি থেকে নিয়ে এসেছিল। এতদিন কী করে বইটা আমার হাতে পড়েনি জানি না। সেই বই আমার দিনরাত্রির চেহারা বদলে দিল।

অজস্র বাংলা বই তো আগে পড়েছিলাম, এই প্রথম একটা উপন্যাস পড়লাম যাতে কলকাতা শহরটা ফুটে উঠেছে তার সমস্ত ঋদ্ধি সমস্ত আত্মা নিয়ে। এই কলকাতা নিশ্চিতভাবে শিক্ষিত, সাহিত্যপ্রিয়, সূক্ষ্মরুচি মধ্যবিত্ত বাঙালির কলকাতা, যে কলকাতার চেহারা আজ ক্রমেই অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে আসছে। কলকাতাকে নিয়ে উপন্যাস লেখার রেওয়াজটা তখনো ভালো করে তৈরি হয়নি, বাস্তবিক কখনোই ভালো করে তৈরি হল না। তখন পর্যন্ত ঔপন্যাসিকরা তাঁদের উপন্যাসের পটভূমি হিশেবে প্রধানত গ্রামবাংলাকেই ব্যবহার করতেন, তার পরেও যাঁরা কলকাতা শহরকে ব্যবহার করেছেন তাঁদের রচনাতেও শহরটা পটভূমি হয়েই আছে, নিজস্ব একটা চরিত্র পায়নি। বুদ্ধদেব বসুই বোধহয় একমাত্র যিনি কখনো গ্রামবাংলার পটভূমিকায় উপন্যাস লেখেননি—ছোটগল্পও নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেকগুলি উপন্যাসের ঘটনাস্থল হিশেবে কলকাতাকে নির্বাচন করেছেন ঠিকই, কিন্তু শহরটাকে তিনি ভালোবাসতে পারেননি বলে শহরটা কখনো গুরুত্ব পায়নি তাঁর লেখায়। শেষের কবিতায় বোঝাই যায় না কোথায় শিলং শেষ হচ্ছে কোথায় কলকাতা আরম্ভ হচ্ছে আর যে চায়ের দোকানটির কথা দিয়ে চার অধ্যায় আরম্ভ হচ্ছে তার মতো অবাস্তব চায়ের দোকান তো কলকাতায় অন্তত ভাবা যায় না। কলকাতার কোন দরিদ্র চায়ের দোকানে য়ুরোপীয় আধুনিক গল্প-নাটকের ইংরেজি তর্জমা বিক্রি হয়? যে দোকানে টুলচৌকির অভাব প্যাকিং বাক্স দিয়ে পূরণ করতে হয়, সে দোকানের টেবিলে ফুলের তোড়া থাকে কলকাতার কোন পাড়ায়? দরিদ্র চায়ের দোকান রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন চোখে দ্যাখেননি।

কিন্তু তিথিডোর-এ কলকাতাকে অনুভব করা যায় একটা জ্যান্ত সত্তা বলে, অন্যমনস্ক পাঠকের গায়ে তার উষ্ণ নিশ্বাস এসে পড়ে। স্বাতী সত্যেনের প্রেমকে ফুটিয়ে তোলে কলকাতা শহর, উপন্যাসের কাহিনী-অংশ কলকাতার সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় যেভাবে বাঁকানো ছুরি ঢুকে যায় বাঁকানো খাপের মধ্যে—মনে হয়, কলকাতায় না ঘটলে কাহিনীটিকে আমরা তেমনভাবে অনুভবই করতে পারতুম না। আর রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দৃশ্যে যে উতরোল কলকাতার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন আদ্যন্ত বাংলা সাহিত্যে সেই ক'টি পৃষ্ঠার কোনো তুলনা নেই, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকে তিনি তাঁর উপন্যাসের প্রয়োজনে যেমনভাবে ব্যবহার করেছেন তারও কোনো তুলনা নেই। কলকাতায় ভালো করে প্রবেশ করতে পারার আগেই তিথিডোর পড়ে শহরটাকে আমি ভালোবেসে ফেললুম।

এতদিন কেন বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস হাতে পড়েনি, এখন যেন বুঝতে পারি। আমার বইয়ের মূল উৎস ছিল চুঁচড়োর কলেজিয়েট স্কুলের ওপেন লাইব্রেরি, হাজার দশেক অন্তত বই ছিল সেখানে, বিশাল একটা হলঘরের চারিপাশে সাজানো কাচের পাল্লাওয়ালা চাবিহীন আলমারিতে। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম থেকেই কুখ্যাত ছিলেন 'অশ্লীল' লেখক বলে। ইশকুলের লাইব্রেরিতে, যে লাইব্রেরি শুধু মাস্টারমশাইরা নন ছাত্রেরাও যদৃচ্ছা ব্যবহার করবে সেখানে তাঁর বই রাখা নিশ্চয়ই অনৈতিক বলে বিবেচিত হত। আর সেই পঞ্চাশের দশকের চুঁচড়ো শহরে অভিভাবকেরা ছেলের হাতে শশধর দত্ত বা স্বপনকুমার দেখলে আপত্তি করতেন না তত, কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর বই পড়া ছিল প্রায় ফৌজদারি অপরাধের শামিল। একটু বড়ো হয়ে যতদিনে কলকাতায় এলাম, তার আগে পর্যন্ত তাই তাঁর লেখার সঙ্গে প্রায় পরিচয়ই ছিল না।

এই প্রসঙ্গে, অশ্লীলতা বলতে বাঙালি মধ্যবিত্ত ঠিক কী বোঝে তা একবার ভেবে দেখা যেতে পারে। আমাদের সাহস মনে হতে পারে যে যৌনতার উল্লেখই অশ্লীল—কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে ব্যাপারটা আদৌ অত সরল নয়। সমগ্র নিধুবাবুতে কোথাও কোনো যৌন উল্লেখ নেই—অথচ তিনি ভয়ংকর রকম অশ্লীল বলে বিবেচিত ছিলেন, এমনকী আজও তাঁর কলঙ্ক সম্পূর্ণ অপনোদিত হয়েছে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া উপযুক্ত সময় ও সুযোগ উপস্থিত হলে বাঙালি মধ্যবিত্ত (বলে দিতে হবে কি, যে 'মধ্যবিত্ত' বলতে একটা মানসিক গঠন বোঝাতে চাচ্ছি, আর্থিক অবস্থার কথা বলছি না) যথেষ্ট যৌনবিষয়ের উল্লেখ করে থাকে, সহর্ষে সগর্বে ও সোচ্চারে, সেগুলো সমাজে অনুমোদনযোগ্য বলেই মনে করা হয়—অন্তত উপেক্ষণীয়। যৌনতা নয়, বাঙালির কাছে যথার্থ অশ্লীল হল সঙ্গীনির্বাচনে সমাজের শাসনকে অস্বীকার করে ব্যক্তিগত রুচিকে প্রাধান্য দেয়া। নিধুবাবুকে যে অশ্লীল বলে বিবেচনা করা হত তার কারণ হল তিনি সামান্য পৌরাণিক আড়ালও না দিয়ে নায়কনায়িকার পরস্পরের প্রতি আসক্তিকে অলজ্জভাবে বিবৃত করেছিলেন, তাদের ভালোবাসার বর্ণনা করেছিলেন⋯

সেটাই অশ্লীলতার চূড়ান্ত বলে মনে হয়েছিল সমাজপতিদের কাছে। "কেন যামিনী না যেতে জাগালে না, বেলা হল মরি লাজে"-কে এক সময় বাংলা সাহিত্যের স্বনিযুক্ত অভিভাবকগণ যে ভয়ংকর অশ্লীল বলে মনে করেছিলেন—এর মধ্যেও যৌনতা নেই, আছে নায়িকার ব্যক্তিত্বের অলজ্জ প্রতিফলন, সেই জন্যেই অশ্লীল। একথা বিদ্যাপতি বললে অশ্লীল হত না, কারণ তাঁর রচনার ওপর পৌরাণিকতার আবরণ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের বই, শরৎচন্দ্রের বই যে কারণে অশ্লীল বলে বিবেচিত হত, সেই একই কারণের কোপে পড়তে হয়েছিল বুদ্ধদেবকেও—তিনি তাঁর নায়কনায়িকার প্রণয়েচ্ছার অনবদমিত প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে যৌনতা অশ্লীল নয়, অশ্লীল হল প্রণয়—বিবাহবহির্ভূত প্রণয়।

গান শেখারও খানিকটা চেষ্টা করেছিলাম বিদ্যামন্দিরে পড়তে গিয়ে। সেখানে ছাত্রদের গান শেখানোর ব্যবস্থা ছিল, রেডিয়োর গায়ক একজন খেয়ালিয়া (তাঁর নামটা দেখছি ভুলে গেছি) উৎসাহী ছাত্রদের গান শেখাতে আসতেন। তখন আমায় টান দিয়েছে হার্মোনিয়াম যন্ত্রটা। হস্টেলের তেতলায় প্রেয়ার হল, সেখানে প্রতিদিন ভোরে আর সন্ধ্যায় গান হয় 'খণ্ডন ভববন্ধন', আর 'নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত', সারাদিন হল্‌টা ফাঁকা পড়ে থাকে। যে প্রভু বাক্যমনের অতীত তাঁকে নমস্কার জানাবার সার্থকতাটা ঠিক কোনখানে এই প্রশ্ন তখন মনের মধ্যে অঙ্কুর হয়ে গজিয়ে উঠলেও ঠিক ভাষা পায়নি। গানের ভাষা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও, রোজ রোজ শুনতে শুনতে মনে হয় সুরটা সহজ, আমি কি ওটা হার্মোনিয়মে বাজাতে পারব না? কোনো কোনোদিন বিকেলে আমি তেতলার নির্জন প্রেয়ারহল্‌-এ উঠে গিয়ে হার্মোনিয়ামটা টেপাটিপি করি, সুরটা তোলবার চেষ্টা করি। একজন ব্রহ্মচারী মহারাজ প্রার্থনার সময় হার্মোনিয়ামটা বাজাতেন, তিনি একদিন সেই সময় এসে উপস্থিত। আমি একা একা যন্ত্রটার সঙ্গে কুস্তি করছি দেখে তিনি আমাকে সুরটা বাজাতে শিখিয়ে দিলেন। সেই সুরটা বাজাতে শিখে একটা মস্ত বড়ো দিগন্ত খুলে গেল আমার ভিতরে—একটা বিশাল রাজপ্রাসাদের পাঁচিল ডিঙিয়ে যেন ঢুকে পড়েছি, যেন একটা সিদ্ধাই আয়ত্ত হয়েছে। ওইটুকু একটা বিশ্রী দেখতে কাঠের বাক্সের মধ্যে এত ক্ষমতা, যে কোনো গানের সুর আমাকে দিয়েও নির্ভুল বাজিয়ে নিতে পারে, এই বিস্ময়বোধ আমার কাটতে চাইত না। সময় পেলেই তেতলায় চলে যাই, নির্জন প্রেয়ার হল-এ বসে বসে চেনা গানের সুর তোলবার চেষ্টা করি। এদিকে গানের ক্লাশে শিখছি (শিখছি না বলে শুনছি বলাটাই সত্যের কাছাকাছি) ছোটো ছোটো খেয়াল, একটু আধটু সর্গম, 'তুম জাগো মোহন প্যারে' বাজাতে শিখে গেলাম, ভৈঁরোর বন্দিশ একটা অন্য জগতের দরজা খুলে দিয়ে গেল। কমনরুমে একটা রেডিয়ো ছিল, অন্য ছেলেদের বিরক্ত করে তাতে শুধু খেয়ালের প্রোগ্রাম শুনতে লাগলাম। সব সময় যে খুব ভালো লাগত তা নয়, কিন্তু খেয়াল গান শোনাটা কেমন একটা নেশার মতো হয়ে গিয়েছিল সেই সময়। আমার নেশা দেখে মহারাজেরাও উৎসাহ দিতেন। হস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট গুণমণি মহারাজের

ঘরে একটা ছোট রেডিয়ো ছিল, ভালো অনুষ্ঠান থাকলে তিনি স্টাডি আওয়ারেও আমাকে ডেকে নিতেন গান শোনার জন্যে। এমনি করে ধীরে ধীরে আমার কান খানিকটা তৈরি হয়ে উঠতে লাগল।

সতেরো আঠারো বছর বয়স তখন। যে মেয়েটির প্রেমে পড়েছি, দুই বেনী ঝোলানো তাকে শুধু চোখে দেখলেই বুকের মধ্যে ছলছল করে ওঠে, নির্জন আমহার্স্ট স্ট্রিট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিচু গলায় তাকে 'পঁচিশ বছর পরে' আবৃত্তি করে শোনাই, কিন্তু তার শরীরের সঙ্গে সাবধানী দূরত্ব বজায় রাখি; তাকে যে ছোঁয়া যায় এই প্রত্যয় তখনো তৈরি হয়নি। প্রায় একটা পুরো বছর লেগেছিল, সে আঙুলে চোট পেয়েছে এই অছিলাটুকুর উপর নির্ভর করে দু'আঙুলে তার একটি অনামিকা ধরে দেখবার। সেটা যে তারও অছিলা সেটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধিও তখনো হয়নি।

আধুনিকতার ধারণাও তেমনি, মনের মধ্যে প্রশ্ন হয়ে খোঁচা দিতে আরম্ভ করেছিল অনেকটা এই বয়স থেকেই। সেসব প্রশ্নের উত্তর যে আদৌ পাওয়া যায় এই বোধ তখনো তৈরি হয়নি। আমি যেমন আধুনিকতাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তেমনি আধুনিকতাও যে আমাকে খুঁজে বেড়াতে পারে এই ধারণা তখনো গড়ে ওঠেনি, অনেক কিছুই তখন জানতে বাকি।

বিদ্যামন্দির থেকে আই. এ পাশ করে কলকাতায় পড়তে এলাম ১৯৫৭ সালে, এসেই কফিহাউসের সন্ধান পেয়ে গেলাম। *কৃত্তিবাস*-এর টেবিলে নিয়ে গিয়েছিল দীপক, দীপক মজুমদার। কবিতার চর্চা করলেও আমি কবিতা লিখি না, খেলাচ্ছলে ছাড়া কখনো লিখিনি। ফলে আমি ঠিক যাকে বলে কৃত্তিবাসের দলভুক্ত তা কখনো ছিলাম না। পরিচয় হয়েছিল সকলের সঙ্গেই—শক্তি, উৎপল, সুনীল, শরৎ, সন্দীপন, শংকর—অনেকের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয়েছে সেই দল ভেঙে যাবার পর। সে সময়ে তাদের চিনতাম এই পর্যন্ত, তাদের টেবিলে বসলে তারা আমাকে সহ্য করত এই পর্যন্ত। দুয়েকবার লিখেওছি কৃত্তিবাসে, কবিতা নয়, গদ্য। একবার লিখেছিলাম কমলকুমার মজুমদারের বিরুদ্ধে—তার ফলটা কী হয়েছিল সেটা এইখানে নথিবদ্ধ করে রাখি।

পুরো একটা সংখ্যা *কৃত্তিবাস* জুড়ে প্রকাশিত হয়েছিল *সুহাসিনীর পমেটম*। পরের সংখ্যাটি ছিল তার সমালোচনা সংখ্যা। কয়েকটি আলোচনা এক সঙ্গে বেরিয়েছিল, তার মধ্যে একটি লিখেছিলাম আমি। তখন আমি তুলনামূলক সাহিত্য পড়া অতীব স্মার্ট তরুণ, নানান চালিয়াতি দিয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলাম যে লেখাটা কিছু হয়নি—কমলকুমার কোনো লেখকই নন বাস্তবিক। সুনীল তার চমৎকার কাণ্ডজ্ঞানের সাহায্যে লেখাটাকে কেটেছেঁটে অনেক মোলায়েম করে প্রকাশ করেছিল, তৎসত্ত্বেও ছাপার অক্ষরে জিনিশটা দেখবামাত্রই বুঝতে পারলাম, ভয়াবহ ওপরচালাকি করে বসে আছি। কিছুমাত্র না বুঝে, তলিয়ে না দেখে, কাজ করেছি ঈডিয়টের মতো।

আমি জানতুম, কমলদার সামনে পড়লে রক্ষা নেই। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

তখন শেষ বিকেল থেকে আড্ডা জমত খালাসিটোলায়। খালাসিটোলা হল মধ্য কলকাতার একটি বিখ্যাত দেশি মদের পানশালা, সংক্ষেপে কেটি (K.T=Khalashitolla), *কৃত্তিবাস* থেকে আরম্ভ করে তার পরেকার যুগের লেখকদের অনেকের রচনাতেই এই *ঠেকটির* উল্লেখ পাওয়া যাবে। ওয়েলিংটনের মোড় থেকে ডানদিকের ফুটপাত ধরে দক্ষিণদিকে কয়েক পা হাঁটলেই, এস এন ব্যানার্জি রোডে পড়বার একটা বাড়ি আগে, মোটরবাইকের পার্টসের সারি সারি দোকানের মধ্যে মস্ত একটা লোহার ফটক, ঢেউটিন দিয়ে ঢাকা, চেনতালা দিয়ে আটকানো। তার গায়ে খোলা একটা ছোট গেট, সেটাই হল প্রবেশপথ। তার সামনে ডিমভাজা তেলেভাজা আর চানাচুরের দোকান দেখে চেনা যায়। ভেতরে ঢুকলে মস্ত একটা চাতাল, সেটাও ঢেউটিন দিয়ে ঢাকা, তার নিচে বেঞ্চি আর মর্চে-পড়া-পেরেক-বের-করা কেঠো টেবিলের সারি, ভিড়ের সময়ে সেখানে একসঙ্গে প্রায় হাজার লোক বসে মদ্যপান করে থাকে। একটা পুরোনো আমলের ঢাউস মোটরগাড়ির তোবড়ানো বডি পড়ে আছে একদিকে, সেটার ভেতরে বসেও লোকে খায়। ডানদিক ঘেঁষে কাউন্টার, সেখানে মালিক কালীবাবু (পুরোনো খদ্দেরদের কাছে কালীদা) বসে খদ্দেরদের পানীয় মেপে দেন। তাঁর মুখখানা অস্বাভাবিক রকম কালো এবং ঝামার মতো ফুটো-ফুটো, আমাদের ধারণা বোতলের শোলার ছিপি খুললেই প্রথম ভশ করে যে একটা ঝাঁজ বেরোয়, সেই ঝাঁজ বছরের পর বছর মুখে লাগতে লাগতে ওঁর মুখখানা অমন হয়ে গিয়েছে। সত্যিমিথ্যে জানি না, তবে দিশি মদের বোতল নিজে খোলবার সময়ে কখনো ওরকম ঝাঁজ পাইনি। এখন মনে হয়, কালীদার মুখখানা স্বাভাবিকভাবেই অমন অস্বাভাবিক ছিল।

তিন রকমের মদ পাওয়া যেত, এক নম্বর দু'নম্বর তিন নম্বর। তাদের তফাৎ ছিল শুধু কোহলের শতাংশের হিশেবে, স্বাদে গন্ধে একই রকম কটু ও ঝাঁঝালো। একই রকম শস্তা কারখানায় তৈরি কাচের বোতল, প্রতারণারোধক শৌখিন ছিপির বদলে এক টুকরো শোলা দিয়ে মুখটা বন্ধ করা, তার ওপর আলকাতরার মতো কালো গালার সীল, সীলের উপরে নির্মাতার চাপচিহ্ন। পাতলা একটুকরো চোঁতা কাগজ সেঁটে লেবেল। এক নম্বরটা, যতদর মনে পড়ে, ৭৫% প্রুফ ছিল। প্রুফের হিশেবটা গোলমেলে, তার ওপর ওভারপ্রুফ আন্ডারপ্রুফ বলে সেটাকে আরো গোলমেলে করে তোলা হত। এখনকার বোতলের গায়ে যেমন পরিমাণে কতটা কোহল আছে তা শতাংশের হিশেবে লিখে দেয়া হয় (যেমন 42.8%v/v) তখন তেমনটি লেখা হত না। কমলদা দু'নম্বরটা খেতেন, সম্ভবত তাঁর দেখাদেখি *কৃত্তিবাস*-এর দলও দু'নম্বরটাই পছন্দ করত।

মদের সঙ্গে ফ্রি দেয়া হত কয়েক কুচি আদা আর একটু নুন। অন্যান্য চাট কিনতে পাওয়া যেত, যথা কাটা শশা টমাটো পেঁয়াজ ও নানা রকম ভাজাভুজি। সাধারণত সবাই জল মিশিয়েই খেত, বিলাসিতা করবার জন্যে পাওয়া যেত জিঞ্জারেল নামে বোতলে ভর্তি পানীয়, মিষ্টি মিষ্টি সোডাওয়াটারের মতো খেতে। সেটা মিশিয়ে

যে ককটেল তৈরি হত তাকে বলা হত কান্ত্রি হাইবল। মাঝে মাঝে আসত নিম্নবিত্ত সমাজের চীনে বা ফিরিঙ্গি মেয়ে দুয়েকটি। পানশালায় তারা ঢুকত না কারণ মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল কাউন্টার থেকে বোতল কিনে চটের ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়ে চলে যেত। উৎপল বলত মদ দু'রকম, কান্ত্রি আর আপকান্ত্রি। এখন নাকি সব বদলে গেছে, বহু বছর ওখানে ঢুকি না।

খালাসিটোলাটাই যে কেন *কৃত্তিবাস* দলের পছন্দ ছিল তা জানি না। সম্ভবত কমলদা এবং তাঁর *কৃত্তিবাস*-এর আগের যুগের বন্ধুদের ওটাই ঠেক ছিল, সেখান থেকেই ওর জনপ্রিয়তা *কৃত্তিবাস* গোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তা ছাড়া কলেজ স্ট্রিট থেকে কাছেও হত, সেটাও একটা কারণ হতে পারে। খুব দূরে নয় এমন আরো দুয়েকটি তুলনীয় জায়গার সঙ্গে পরে পরিচিত হয়েছিলাম যেমন বারদুয়ারী, বন্দুকগলির বি.আর সেন—কিন্তু খালাসিটোলা, সম্ভবত কলেজ স্ট্রিটের থেকে তার নৈকট্যের কারণেই, কখনো লিটল ম্যাগাজিন ও কবিতার বইয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক হারায়নি। কয়েক বছর পরে হাংরিরা তো খালাসিটোলা থেকে নতুন কবিতার বইয়ের উদ্বোধন পর্যন্ত করেছিল।

কমলদার সঙ্গে যাতে দেখা না হয় সেইজন্যে কেটিতে যাচ্ছি না আর। অথচ জায়গাটা তখন রক্তে বসে গেছে, সন্ধেগুলো বিস্বাদ কাটে। এর মধ্যে একদিন শক্তি বলল, 'সমীর' কমলদা তোমাকে খুঁজছেন, কী যেন দরকারি কথা আছে তোমার সঙ্গে, বোধহয় তোমার সেই লেখাটা নিয়েই তোমাকে কিছু বলতে চান। কেটিতে যাচ্ছ না কেন আর?' 'হ্যাঁ হ্যাঁ যাব নিশ্চয়ই, এই ঠিক সময় করে উঠতে পারছি না আর কী।' যা হোক, এক দিন পায়ে পায়ে গেলাম। একটু দেরি করে, অর্থাৎ যখন কমলদা সাধারণত চলে যান, কিন্তু অন্যেরা থাকে; অর্থাৎ কমলদার সঙ্গে দেখাটাও হবে না অথচ বলে আসা যাবে যে কমলদা ডেকেছেন খবর পেয়েই দেখা করতে এসেছিলাম। ঢুকেই কমলদার সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি। তিনি বেরোচ্ছেন, সঙ্গে বেলাল শক্তি ইন্দ্রনাথ আরো কে কে যেন।

'এই যে—সমীরবাবু—'কমলদা তাঁর সহৃদয় হাসিটি হেসে, বুকের ওপর দুহাত জড়ো করে অভ্যর্থনা করলেন। 'বাবু'র ওপর সামান্য বেশি ঝোঁক পড়ল কিনা ঠিক ধরা গেল না—'আপনাকে আমি যে কবে থেকে খুঁজছি (বাক্যগুলো অবিকল মনে নেই তবে কমলদা প্রায় সবাইকেই 'আপনি' বলতেন) শক্তিকে দিয়ে খবরও পাঠিয়েছিলাম আপনাকে, বলেনি?' আমি মিনমিন করে কিছু একটা বলবার চেষ্টা করি, কমলদা হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর মতো একটা ভঙ্গি করে বলে চললেন, 'আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম *কৃত্তিবাস*-এ আপনার লেখাটা নিয়ে—ওটা যে কী ভালো হয়েছে—আপনি যে আমার কত ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন—বাস্তবিক, আপনার লেখা পড়ে আমি যে কী উপকৃত হয়েছি—ঠাকুর আপনাকে মঙ্গলে রাখুন (কমলদা রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত ছিলেন, চিঠিও পেয়েছি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ' পাঠ দিয়ে, অনেকেই পেয়েছেন) আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছি, তলপেটের কাছে দুই হাত জড়ো করা,

আর কমলদা আরতি করার মতো আমার সামনে দুই হাত শূন্যে ভাসিয়ে বলে চলেছেন, কেউ কেউ বুঝতে না পেরে একটু বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে, প্রাণ খুলে হোহো করে হাসছে বেলাল আর শক্তি। এততেও হল না, কমলদা পুনরায় কাউন্টারের দিকে ফিরলেন, অনেক চেষ্টায় আমাকে ধরতে পেরেছেন এই সুবাদে সবাইকে কান্ট্রি হাইবল খাওয়ালেন একপাত্র করে, তারপর ছুটি পেলাম। জীবনে কারো কাছে এমন তিরস্কৃত আর কখনো হইনি।

আমাকে বিদ্যামন্দিরে ভর্তি করে দিয়ে আমার মা চলে গিয়েছিলেন বর্মায় বাবার কাছে, আমার ছোট বোনকে নিয়ে। বাবা সেখানে রেলের ডাক্তার ছিলেন সাত আট বছর, প্রথম দিকে বছরদুই হিংস্র কারেন উপজাতি অধ্যুষিত দক্ষিণ বর্মায়, মফলিনে, বেশির ভাগটাই মধ্যব্রহ্মের ইয়ামেদিন শহরে। মফলিন জায়গাটা ছিল নিচু নিচু পাহাড় দিয়ে ঘেরা। মানচিত্রে যে দেখা যায়, পুবে পশ্চিমে ছড়ানো হিমালয় পর্বতমালা অরুণাচলের কাছে হঠাৎ সমকোণে বেঁকে গিয়ে দক্ষিণে নেমে এসেছে ব্রহ্মদেশের শিরদাঁড়ার মতো, বড়ো মানচিত্র হলে তার একেবারে শেষ অংশে মফলিন শহরটার দেখা পাওয়া যায়।

গরমের ছুটিতে গিয়ে আমি পাহাড়ে পাহাড়ে একলা ঘুরে বেড়াতুম; পাহাড়ে চন্দ্রবোড়া সাপ ছিল খুব, আর পাহাড়ি কাঁকড়াবিছে। বাবা সবই জানতেন, মাঝে মাঝেই সাপে কিম্বা কাঁকড়াবিছেয় কামড়ানো রুগি আসত হাসপাতালে কিন্তু আমাকে কখনো যেতে মানা করেননি, শুধু সাবধান করে দিয়েছিলেন। পাহাড়ের ওপর কাজুর জঙ্গল ছিল, কাজু পেড়ে পকেট ভর্তি করে বাড়িতে নিয়ে আসতুম, পুড়িয়ে খোসা ভেঙে ভেতর থেকে শাঁস বার করে খাওয়া হত। ওখানেই দেখেছিলাম বহু দূরে বিদ্রোহী উপজাতিদের জনপদের ওপর এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলছে বর্মী সরকারি বিমান। এরোপ্লেনটা নাক নিচু করে নেমে এসে ফের উঠে যায়—তার পেট থেকে বিড়বিড় করে বোমা পড়তে থাকে, দূর থেকে ছাগলনাদির মতন দেখায়। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিহত হয়ে ক্ষীণ শব্দ কানে আসে। শহরটা ছোট ছোট টিলা দিয়ে ভরা, টিলার মাথায় মাথায় স্থানীয় গণ্যমান্যদের বাড়ি। বাবার কোয়ার্টারও ছিল এমনি একটা টিলার মাথায়, শালকাঠের খুঁটির ওপরে তৈরি ছবির মতো বাড়ি, চ্যাচারির বেড়ার দেয়াল, নিচে ট্রেঞ্চ কাটা। কারেনরা মাঝে মাঝে শহরে ঢুকে এসে গুলিগোলা চালায়, উদ্দেশ্য সন্ত্রাস সৃষ্টি করা, তখন বাড়ি থেকে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ট্রেঞ্চে নেমে গিয়ে বসে থাকতে হয়। একটা টিলার মাথায় ছিল সেনানিবাস। সেখানা কার বর্মী সৈন্যদের দেখেছি গুলি করে আকাশ থেকে শকুন নামাতে—প্রিয় খাদ্য ছিল ওদের। সময়টা ১৯৫৪-৫৫ সাল।

ইয়ামেদিনের বাড়িটা ছিল অনেক বড়ো, সেকেলে সাহেবি বাংলো, সামনে পিছনে মস্ত বড়ো কম্পাউন্ড। তখনকার দিনে কারেনদের অন্তর্ঘাতের ভয়ে সারা বর্মায় রাত্রে ট্রেন চলত না। বর্মার যেটা প্রধান রেলপথ, সেই রেঙ্গুন-মান্দালয় (বর্মী উচ্চারণে

'ম্যান্ডলে') রেলপথের ঠিক মাঝামাঝি অবস্থান ছিল ইয়ামেদিন শহরটার। দুদিক থেকে দুটো মেলট্রেন এসে সেখানে সন্ধেবেলা দাঁড়িয়ে পড়ত। সারারাত যাত্রীদের ট্রেনেই থাকতে হত, পরদিন সকালে ফের যাত্রা। সুন্দরী বর্মী তরুণী বাঁকে করে চা বিক্রি করত, তার সুরটা মনে আছে, 'লাফেইয়ে লাফেএএঃ—' তার লালচে গালদুটি তানাখার প্রলেপে শাদা। লাফে মানে চা-পাতা, ইয়ে মানে জল, শব্দটার সঙ্গে ফরাশি Eau-র আশ্চর্য মিল কানে না লেগে পারে না। লাফেইয়ে মানে তৈরি চা।

বিকেলবেলা আমার মা চা-টি খেয়ে, চুলটি বেঁধে, পরিপাটি করে সেজেগুজে হাতে একটি বর্মী ছাতা নিয়ে স্টেশনে গিয়ে হাজির হতেন। দুটো মেলট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, মিটারগেজ হলেও দুটো ট্রেন মিলে দু-আড়াই হাজার যাত্রী—অনেক দিনই পরিচিত লোকজনের দেখা পাওয়া যেত। যেদিন চেনা লোক বেরোত না, সেদিনও—'বাঙালি বলে মনে হচ্ছে না? কোথায় যাবেন, পিয়োবোয়ে? নেমে আসুন।' তাদের বাড়িতে এনে খাইয়ে দাইয়ে, রাত্তিরে গেস্টরুমে রেখে, পরদিন কাকভোরে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসা নিত্যকর্ম ছিল মায়ের। রাত্রে খাবার টেবিলে কোনোদিন অতিথি না থাকলে মন খারাপ হয়ে যেত বাবার—'এ কী? নো গেস্ট্স ফর ডিনার টুনাইট?' সে আমলের শিক্ষিত ঢাকাইয়া বাঙালের প্রোটোটাইপ ছিলেন বাবা। কোনো প্রিটেনশন ছিল না। ভালো খাওয়া, ভালো খাওয়ানো, ভালো বই পড়া, নিজের কাজকে ভালোবাসা, উদার মুক্ত সংস্কারহীন মানসতার চর্চা করা—এমনিতে শান্ত নিরীহ পত্নীশাসিত কিন্তু দরকার পড়লে প্রচণ্ড ডাকাবুকো—বাবা মানুষটি ছিলেন এমনি। তাঁর কথা বলতে আরম্ভ করলে শেষ হবে না, আজ পর্যন্ত আমি জীবনে তাঁর চেয়ে পূর্ণতর মানুষ দেখিনি। একটা গল্প বললে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা স্পষ্ট হবে।

বাবা চুরুট খেতেন খুব, আমি সিগারেট ধরেই বাবার কাছে অনুমতি পেয়ে যাই তাঁর সমক্ষে ধূমপান করবার। আমাকে জীবনে প্রথম মদও খাইয়েছিলেন আমার বাবা, ওই ইয়ামেদিনে। সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি, তখনো বয়স ষোলো হয়নি। গরমের ছুটিতে বর্মায় গেছি, সন্ধেবেলা গেছি বাবাদের ক্লাবে। একদিকে ছোট ছোট দুতিনটি টেবিল, সবুজ বনাতে মোড়া, তার চারপাশে চারজন বসে তাশ খেলছেন, প্রায় প্রত্যেকের পাশেই একটি গেলাশে রঙিন পানীয়। মদ ব্যাপারটা যে কী তা আমি তথ্য হিশেবে জানি কিন্তু তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা কখনো করিনি। একপাশে একটা বিলিয়ার্ড টেবিল ছিল, আমি সেখানে গিয়ে মার্কারের সঙ্গে ঠুকঠাক করছি, বাবা ডাকলেন। 'বাবলু, এদিকে এসো।'

কাছে গিয়ে দাঁড়াতে নিজের গেলাশটার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'একে বলে রাম। খেয়েছ কখনো?'

আমি ঘাড় নাড়লাম। খাইনি।

'খাবে?'

এবারও ঘাড় নাড়লাম। খেতে পারি।

'খাও।' বাবা নিজের আধখাওয়া গেলাশটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

তখনকার দিনে ভিমটো বলে একরকম বোতলে ভরা পানীয় পাওয়া যেত, কোকাকোলার পূর্বপুরুষ, রংটা ছিল অল্প জলমেশানো রামের মতো। সেটা আমার প্রিয় পানীয় ছিল, সাড়ে চার আনা পয়সা পকেটে থাকলে মাঝে মাঝে খেয়েছি। আমি সেই আন্দাজে ঘপ্ করে একবারে অনেকটা গলায় ঢেলে দিলাম।

এখন বুঝতে পারি সেই গেলাশের জিনিশটা ছিল বেশ কড়া—এক পেগ রামে মাত্রই দু'আউন্স মতো জল মেশানো। ফলটা আমার ওপর যা হওয়া উচিত ছিল তাই হল। গলায় বেধে গিয়ে, কাশি এসে, মুখ থেকে চারদিকে ছিটকে ছড়িয়ে, একটা বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। বাবা বেশ তারিয়ে তারিয়ে আমার দুর্দশাটা উপভোগ করলেন। তাঁর বন্ধুরাও পুত্রের উপরে তাঁর এই প্র্যাকটিকল জোক-এ বেশ মজা পাচ্ছিলেন। আমি কথঞ্চিৎ সামলে উঠতে বাবা জিগেস করলেন, 'কেমন লাগল?'

কাশি সামলাতে সামলতে জবাব দিলাম, 'অতি বদ—'

'আর খাবে?'

'না'

'ঠিক আছে, যাও'

ফিরে গেলাম বিলিয়ার্ড টেবিলে। কিন্তু যেটুকু রাম পেটে গিয়েছিল সে তার নিজের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে ততক্ষণে। কিউয়ের ডগায় বল তো দেখি আর কথা শুনছে না। মার্কার ব্যাটাও দেখি হাসছে মুচকে মুচকে। খানিক পরে সেই বলল, 'আজ অওর নহী হোগা ছোটাসাব।'

বাড়ি ফিরে এলাম। দরজা খুলে দিয়েই মা নাক কোঁচকালেন। ভয়ংকর ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় গিয়েছিলি?'

'বাবাদের ক্লাবে'

'হুঁ। টেবিলে খাবার আছে, আপেয়াম্মাকে খেতে দিতে বলো। খেয়ে শুয়ে পড়ো গিয়ে।' সব সময় মা-ই খেতে দেন, আপেয়াম্মা নয়। সব সময়েই মা আমাকে 'তুই' করে বলেন, কখনোই 'তুমি' বলেন না। রোজই মা খাবার পর গল্প করতে ভালোবাসেন, কোনোদিন গিয়ে শুয়ে পড়তে বলেন না।

নিঃশব্দে খেয়ে গিয়ে শুয়ে পড়লাম, কিন্তু ঘুম আসছে না। কানদুটো কেন জানি না গরম হয়ে আছে। খানিক পর বাবা ফিরলেন। ফিরে রোজকার অভ্যেসমতো খবরটা শুনবেন বলে রেডিয়ো খুলতে যাচ্ছিলেন, মা ডাকলেন, 'এদিকে শোনো তো একটু—' বলে শোবার ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। স্কাইলাইটের ভিতর দিয়ে দেখতে পেলাম ঘরের বড়ো কড়া আলোটা জ্বলে উঠল।

এ গল্পটা বলতে হল এইটেই বোঝাতে, যে তু.সা'র প্রভাব যখন আমার ওপর পড়তে আরম্ভ করল, তখন আমি তৎক্ষণাৎ চিনতে পেরেছিলাম আধুনিকতা নামক ধারণাটিকে, একটুও দেরি হয়নি। বুঝতে আমার সময় লাগেনি যে, সমাজ আমাদের

যেসব বিধিনিষেধ পালন করতে বলে সেগুলো সবই ধ্রুবসত্য নয়, যে কোনো অনুশাসনই নিজে বুঝে তবে গ্রহণ বা বর্জন করা উচিত, সমাজ বলছে বলে নয়—এই কথাটা আমি যে শোনামাত্র বুঝতে পেরেছিলাম তার কারণ শিশিরচন্দ্র সেন আমার বাবা ছিলেন। এই কথাটা তু.সা'র পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত না থাকলেও বিভাগের বাতাসে এই কথাটা ভেসে বেড়াত। এই জ্ঞানটা অন্তরে না থাকলে সাহিত্য পড়া যায় না। অন্তত, পড়বার কোনো মানে হয় না।

বর্মা থেকে দেরি করে আসার জন্যে হস্টেলে সীটও পাইনি তখনো, লোকাল গার্জেন এক কাকার বাড়িতে লেক অ্যাভেনিউতে থাকি। কলেজ টলেজের ছায়াও মাড়াই না। প্রাণ ভরে শুনছি রবীন্দ্রনাথের গান, সন্ধান পেয়ে গেছি চাঁদের পাহাড়ের হীরের খনির। কফিহাউসে যে দুজনের সঙ্গে প্রথম বন্ধুত্ব হল তারা দুজনেই রবীন্দ্রনাথের গান অসামান্য গায়—দীপক মজুমদার আর শক্তি চট্টোপাধ্যায়। এদিকে আলাপ হয়েছে স্যান্ডো নামে একটি বাউন্ডুলে তরুণের সঙ্গে, তাদের বাড়িতে তার বোন কিটি আর দাদা অশোক দুজনেই রবীন্দ্রনাথের গান শেখে দক্ষিণীতে। বিকেলবেলা যাই ওদের বাড়িতে, কিটির তখন রেওয়াজ করার সময়। সে আবার হার্মোনিয়াম বাজাতে পারে না। হার্মোনিয়ামটা টেনে বের করে সা-পা টিপে ধরে বসে থাকি, অন্য পর্দাগুলোতেও একটু একটু আঙুলের চাপ দিই। অল্পস্বল্প ভুলভাল হলে কিটি কিছু মনে করে না, গান গাইতে গাইতে মুচকি মুচকি হাসে। ওর সঙ্গে বাজাতে বাজাতে হার্মোনিয়মটা বেশ অভ্যেস হয়ে গেল, ক্রমে এমন হল যে রবীন্দ্রনাথের অচেনা গানের সঙ্গেও বাজিয়ে দিতে পারি। বৃটিশ কাউন্সিল থেকে দুটো একটা পিয়ানো ফিঙ্গারিং-এর বই পড়ে আঙুল ফেলাটাও শিখে নিয়েছি নিজে নিজেই।

ওই আরেকটা অন্তহীন খনি তখন আবিষ্কার করেছিলাম—বৃটিশ কাউন্সিল। পাঠ্যপুস্তকের তো কথাই নেই, যে কোনো অচলিত বিদ্যার চর্চা করবার বই পাওয়া যেত ওখানে। পিয়ানোর বই, বেহালার বই, ছুতোর মিস্ত্রির কাজ করার বই, বাগান করার বই—কত বিভিন্ন বিষয়ের বই যে ওখান থেকে এনে এনে পড়েছি সারা জীবনে তার কোনো হিশেব নেই। আমাদের দেশীয় উদ্যমে ওরকম একটা লাইব্রেরি কি কখনো তৈরি হবে না? কিন্তু কী করেই বা হবে, অত বই কোথায় বাংলায়?

মনে আছে একদিন ওদের দেব লেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি স্যান্ডো আর কিটি হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে বসেছি পার্ক সার্কাস ময়দানে, তিনজনে মিলে গলা ছেড়ে গান ধরেছি। এমন সময় বৃষ্টি এল ঝমঝম করে, ময়দান ফাঁকা হয়ে গেল কিন্তু আমরা উঠলাম না, সেইখানে বসে বসে একের পর এক বর্ষার গান গেয়ে চলেছি সমস্বরে। স্যান্ডোরও গলাটা চমৎকার, ওদের দুজনের সঙ্গে মিশে আমার গলাও বেসুরো লাগছে না খুব একটা। শেষে যখন ঠান্ডার সর্বশরীরে কাঁপুনি ধরেছে, দাঁতে দাঁতে লেগে যাচ্ছে তখন উঠে পড়ে গান গাইতে গাইতেই ওদের বাড়িতে ফিরে এলাম।

স্যান্ডোদের বাড়ি আমার জীবনে একটা স্নিগ্ধ স্মৃতি হয়ে আছে। অতি সামান্য

একটা চাকরি করত অশোকদা—রেলের ফিটারের সহকারী না কী যেন, ওদের বাবা যখন মারা গেছেন অশোকদা তখন বালক। সেই চাকরি চালিয়ে, ওভারটাইম করে, যেটুকু সময় পায় খরচ করে রবীন্দ্রনাথের গান শেখার পেছনে। স্যান্ডো বছরের পর বছর বি. এ পরীক্ষা দেয় আর ফেল করে, মৃদুস্বভাবের অশোকদা বিনা বাক্যব্যয়ে খরচ চালিয়ে যায়। আমি যেবার বি. এ পরীক্ষা দিলাম, সেবারও স্যান্ডো দিল আবার, সঙ্গে এবার কিটিও দিল। পরীক্ষা দিয়ে ওদের বাড়িতেই ফিরতাম। মাসিমা একটা থালাতেই আমাদের তিনজনকে খেতে দিতেন—একগোছা আটার রুটি, একটু আলুভাজা আর আচার, সঙ্গে শুকনো লংকা পোড়া। ওদের বাড়িতে সময় কাটিয়ে কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানে আমার কান ক্রমশ শিক্ষিত হয়ে উঠতে লাগল, এখন গান শুনে ধরে ফেলতে পারি কে শান্তিনিকেতনে গান শিখে এসেছে আর কে দক্ষিণীতে, এমনকী কার প্রিয় দেবব্রত কার প্রিয় হেমন্ত সেটাও গান শুনে বলে দেয়া সম্ভব হচ্ছে আমার পক্ষে, যে আমি ক্লাস টেনে ওঠার আগে রবীন্দ্রনাথের কোনো গান শুনিনি—অন্তত, সচেতনভাবে শুনিনি।

সে বছর—১৯৫৭ সাল ছিল সেটা—সরস্বতী পুজোর দিন সারাটা সন্ধে দেবব্রত বিশ্বাসের পিছন পিছন ঘুরেছিলাম। যেখানে তিনি গাইছেন সেখানেই চলে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে শুনছি। গানের পর মুজরোর হিশেব বুঝে নিতে তাঁর খানিকটা সময় লাগছে, তার মধ্যে আমি তাঁর তবলচির কাছ থেকে জেনে নিচ্ছি তিনি এর পর কোথায় যাবেন, তারপর দৌড়োতে দৌড়োতে সেখানে গিয়ে হাজির হচ্ছি। সন্ধে ছটা থকে রাত্তির এগারোটা পর্যন্ত এইভাবে কেটেছিল সেদিন। দেবব্রতকে ভগবানের মতো মনে হত। মুখ ভর্তি পান নিয়ে, হার্মোনিয়ামটা কোলের উপর টেনে নিয়ে তিনি যখন গভীর খাদের ভিতর থেকে গান ধরতেন, "আমি চঞ্চল হে—" তখন তাঁর গলার জোয়ারি আমার চৈতন্যকে অবশ করে দিত, নিজের হাতের দিকে চেয়ে দেখতাম সমস্ত লোমগুলো দাঁড়িয়ে উঠেছে। কালো থসথসে গায়ের রং, পানের রসে লাল লাল দাঁত, চৌকো চোয়ালের তলায় দু'থাক আলগা চর্বি, ঘামে ভেজা গেরুয়া পাঞ্জাবি পরা আধবুড়ো মানুষটিকে অসম্ভব রূপবান বলে মনে হত। এই গানটা সেদিন চার পাঁচবার শুনেছিলাম তাঁর গলায়।

রবীন্দ্রনাথের গান শোনার আর একটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়েছে এই বছরেরই গোড়ার দিকে, যখন সুচিত্রা মিত্রকে প্রথমবার দেখলাম। নাম্বুদিরিপাদের নেতৃত্বে ভারতের প্রথম বামপন্থী মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে কেরালায়, সেই উপলক্ষে মনুমেন্টের নীচে জয়োৎসব। কোনোকালেই আমি সভাসমিতিতে যাই না, কিন্তু স্যান্ডো-কিটি পার্টির ভয়ানক উৎসাহী সদস্য, জাল ভোট দিতে ওদের জুড়ি নেই, ওদের সঙ্গে দলে পড়ে গেছি, ভাগ্যক্রমে জায়গাও পেয়ে গেছি সামনের দিকে। ভাগ্যিস গিয়েছিলাম।

দোতলা সমান উঁচু মঞ্চ, তার উপরে কয়েকজন কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবক ব্যস্ত ভাবে ঘোরাফেরা করছেন, কারণ উদ্বোধনী সংগীত গাইবেন সুচিত্রা মিত্র, তিনি এসে

পৌঁচচ্ছেন না। জনসমুদ্র অশান্ত হয়ে উঠতে চাচ্ছে, এমন সময়ে তিনি এলেন। সেই ১৯৫৭ সালের সুচিত্রা মিত্র, ধারালো তলোয়ারের মতো চেহারা, পুরু পাওয়ারের চশমা চোখে, বব্ করা কালো চুল বাতাসে উড়ছে, পরনে শাদা খোলের মোটা খদ্দরের শাড়ি, গেরুয়া পাড়। প্রায় দৌড়োতে দৌড়োতে এসে বাঁশের মই দিয়ে অবলীলায় উঠে গেলেন। পেছন পেছন দুটি ছেলে একটা হার্মোনিয়াম নিয়ে উঠছিল, হাত নেড়ে বারণ করে দিলেন তাদের। মঞ্চে উঠে গিয়ে মাইকের দণ্ডটি এক হাতে ধরে অন্য নিরাভরণ হাতটি শূন্যে ভাসিয়ে বিনা ভূমিকায় আরম্ভ করে দিলেন, "এখন আর দেরি নয়, ধর্ গো তোরা, হাতে হাতে ধর্ গো—"

লক্ষ মানুষের জনসভায় আলপিন পড়লে শোনা যায়। চক্ষুকর্ণের বিপুল অভিজ্ঞতার অভিঘাত বয়ে যাচ্ছে আনপড় কিশোর আমার উপর দিয়ে, ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের পরে ঢেউ, আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। গান এমন হয়? সুরের মায়ায় সেই মানবী যেন দেবী হয়ে উঠলেন সহসা, এই লক্ষ মানুষের বুকের ভিতুরকার আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের প্রতীক। পরে কতবার সুচিত্রা মিত্রের গান সামনে বসে শুনেছি, একবার তো আমারই অনুরোধে টুরিস্ট ব্যুরোর দোতলায় এয়ারকন্ডিশন্ড কনফারেন্স রুমে বসে দশ বারোটা গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন, কিন্তু এমন অভিজ্ঞতা আর কখনো হয়নি।

সরস্বতী পুজোর পরপরই এসে গেল সদারং সংগীত সম্মেলন। মিডলটন রোড আর চৌরঙ্গির মোড়ে এখন যেখানে এল-আই-সি'র আকাশ ঝাঁটানো বাড়ি, সেখানে তখন ছিল ফাঁকা মাঠ—সেই মাঠেই সেবার সদারং বসেছিল। চেয়েচিন্তে কয়েকজনে মিলে সীজ্ন টিকিট জোগাড় করলাম একখানা, ভয়ানক চাহিদা। কিন্তু কাকিমা বললেন, 'মাঝরাতে বাড়ি ফিরবি—অত রাতে তোকে দরজা খুলে দেবে কে? তোর কাকা শুনলে রাগ করবেন।' আমি বললাম, 'ঠিক আছে, বাড়ি ফিরব না তাহলে—ওখান থেকে বন্ধুর বাড়িতে চলে যাব।' সেবারই সদারঙে দেখেছিলাম ফুটপাতে ইট পেতে বসে গান শুনছেন সত্যজিৎ রায়, আর দুটো প্রোগ্রামের মাঝখানে মাঠে বসে চা খাচ্ছেন, সঙ্গে বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী, সুচিত্রা মিত্র।

সন্ধ্যে থেকে আরম্ভ হয়ে আসর ভাঙতে ভাঙতে রাত প্রায় দেড়টা। মাথার মধ্যে ঝমঝম করে সুর বাজছে, টলতে টলতে রাস্তা দিয়ে চলেছি একা একা, বাড়ি ফেরা নেই, পৃথিবীতে কোথাও কোনো তাড়া নেই। রাস্তার বাতিতে চকচক করছে নির্জন চৌরঙ্গি। বির্জিতলাওয়ের কাছে এসে বাঁয়ে সার্কুলার রোডে মোড় ফিরলাম, রাস্তার ওপারে একটা ঝাঁকড়া কদম গাছ ছিল তখন, তার নীচে কয়েকটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। অবাক লাগল একটু—এত রাত্রে তিন চারটি মেয়ে রাস্তায় কী করছে? তারপর তাদের মধ্যে একজন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

এরাই কি তবে সেই? বাংলা উপন্যাস প্রায় সবই পড়া হয়ে গেছে তত দিনে, অনুবাদে এমিল জোলার 'পঙ্কিল' ও পড়ে ফেলেছি। এরা তারাই। আমার শরীর ঠান্ডা

হয়ে গেল, কানের মধ্যে পিঁ পিঁ করে শব্দ হতে লাগল, হাতপাগুলো আর নিজের বশে নেই। কোনো মতে চোখ বুজে, প্রায় দৌড়ে জায়গাটা পার হয়ে গেলাম। নির্জন রাস্তা বেয়ে বহুদূর থেকে তাদের ব্যঙ্গমেশানো খিলখিল হাসি কানে এসে বাজতে লাগল।

হাঁটতে হাঁটতে পার্ক সার্কাস ময়দান। টিপটিপ করে বৃষ্টিও পড়তে আরম্ভ করেছে। ময়দানের মাঝখানে চারদিক খোলা গোল একটা ছাউনি ছিল (এখনো আছে বোধহয়।) সেখানে ঢুকে পড়লাম। ভিখিরিরা শুয়ে আছে গায়ে গা লাগিয়ে, চারদিক খোলা থাকা সত্ত্বেও একটা জান্তব ঘেমো গন্ধ উঠছে। তারই মধ্যে ঢুকে শুয়ে পড়লাম আমিও। তলপেট থেকে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি ওপরদিকে উঠছে, সেটা সুখের না কষ্টের ঠিক বুঝতে পারছি না। সন্ধে থেকে অসম্ভব গান, ঝমঝমে বাজনা, সুচিত্রা মিত্রর তলোয়ারের মতো ধারালো মুখ, সত্যজিৎ রায়ের মস্ত বড়ো চৌকো বয়ামের মতো মুখ, বড়ে গোলাম আলির গোঁফ—আর লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড়ে কদম গাছের নীচে, রাস্তার ওপার থেকে দেখা অস্পষ্ট কয়েকটি নারীমূর্তি, তাদের একজন হাত তুলে আমাকে ডাকল—অনেক দূর থেকে তাদের খিলখিল ব্যঙ্গের হাসি—ভিখিরিদের গায়ের গন্ধ—বৃষ্টি। সকালে জেগে দেখি ভিখিরিরা সব উঠে চলে গেছে, রোদে ঝলমল করছে আকাশ। গুটি গুটি উঠে নূপুরদের বাড়ি গেলাম, নেবুতলা পার্কের ধারে ক্রাউচ লেনে। আজও সন্ধেবেলা গানের আসর বসবে।

আরো বছরচারেক পরে শতবার্ষিকীর সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের গানের বিস্ফোরণ ঘটে গেল, কিছু দিন তো এমন হল যে বাংলা গান মানেই 'রবীন্দ্রসংগীত'। এই শব্দটা আমার কোনোকালে ভালো লাগে না—শব্দটার মধ্যে কোথায় যেন খানিকটা অনাকাঙ্ক্ষিত কাব্যিকতা আছে, যাতে এই গানের মূল ধারণাটাকেই বিকৃত করে অতিললিত করে দেয়—যেন যতদূর সম্ভব নরম করে, মিড়ের পর মিড় দিয়ে, যেখানে সেখানে টপ্পার দানা বসিয়ে, 'স'-কে 'শ্‌শ' উচ্চারণ করে, চাপা গলায় গাওয়াকেই রবীন্দ্রনাথের ঘরানা বলে। এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের গানের অধঃপতন আরম্ভ হল, সুচিত্রা দেবব্রতর শত চেষ্টাতেও তা আর পুরোনো মহিমায় ফিরে আসেনি। এখন তো বেশির ভাগ গানই কারো গলায় শুনতে ভালো লাগে না, একটা কলি শুনলেই ক্লান্তি আসে, পুরো গানটা কীভাবে গাওয়া হবে এক লহমায় বুঝে যাই। কোনো চমক নেই, অবাক হওয়া নেই। এখন ভালো লাগে শুধু মনে মনে গানটাকে ভাবতে।

এম. এ পড়বার জন্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হলাম ১৯৫৮ সালে, তৃতীয় দলে। প্রথম দলে ছিল নবনীতা মানব অমিয় প্রণবেন্দুরা, দ্বিতীয় দলে দীপক মজুমদার দীপক চক্রবর্তীরা। তখন একেকটা ক্লাশে পাঁচ-সাতজনের বেশি ছাত্র হত না। যেবার আমরা পাশ করলাম তার পরের বছর, অর্থাৎ আমরা ভর্তি হবার তিন বছর বাদে, ষোলজন ভর্তি হয়েছিল এম.এ-তে। শুনে চমকে উঠেছিলাম মনে আছে, মৃদু শক খাবার মতো। কোথায় যেন বিশুদ্ধতা নষ্ট হচ্ছে এমন মনে হয়েছিল।

যাদবপুরে এত বাড়িঘর ছিল না তখন। ইউনিভার্সিটির ভিতরে বিশাল ফাঁকা মাঠ, আর্টস বিল্ডিং থেকে অরবিন্দ বিল্ডিং পর্যন্ত। ঝিলের উপরকার কাঠের সাঁকো পেরিয়ে দক্ষিণে যেতে বাঁদিকে ছিল শুধু লাইব্রেরির বাড়িটা, ডানদিকে মেকানিকল এঞ্জিনিয়ারিং-এর কারখানার শেড, ঢেউতোলা অ্যাজবেস্টসের ঢালু ছাদওয়ালা ক্যান্টিন, সেটাই আবার অডিটরিয়াম—যেখানে একবার কী একটা অনুষ্ঠানে, মাস্টারমশাইরাও উপস্থিত ছিলেন, মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে সিগারেট ধরিয়েছিলাম বলে প্রবল হাততালি পড়েছিল। এতেই তখন যাদবপুরে হৈহৈ হত, কিন্তু আমাদের বিভাগে নয়। সুধীন্দ্রনাথ তো আমাদের সিগারেট অফার করতেনই, আর নরেশদার মেপোল আমরা প্রায় কেড়ে নিয়ে খেতাম।

মদ আর সিগারেট—বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের এই দুটো ট্যাবুকে তু.সা বিভাগে যেন প্রতীক হিশেবে বেছে নেয়া হয়েছিল, ভাঙবার জন্যে। খুব একটা সুচিন্তিতভাবে যে করা হয়েছিল তা নয়—বুদ্ধদেবের সামনে প্রথম দিকে সিগারেট খেতুম না আমরা কেউই, পরে অবশ্য প্রথাটা ভেঙে যায়। ফিফ্থ ইয়ার থেকে সিক্সথ ইয়ারে ওঠবার পরীক্ষা হচ্ছিল বিভাগেই, অলোকরঞ্জন ছিলেন ইনভিজিলেটর। কমলেশ তাঁকে বলল, 'অলোকদা, সিগারেট ছাড়া তো পরীক্ষা দিতে পারব না!' অলোকরঞ্জন বললেন, 'ডীন আসতে পারেন একবার—আচ্ছা, আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখছি।' উনি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন, আমরা সিগারেট ধরালাম। খানিক পরে উনি ত্রস্ত হয়ে এসে বললেন, 'এই ডীন আসছেন ডীন আসছেন—' আমরা সিগারেট নিবিয়ে ফেললাম। অসীমকৃষ্ণ দত্ত ঘরে ঢুকলেন, ঘরের বাতাস চারমিনারের কটু গন্ধে ভারি হয়ে আছে। তিনি নাকমুখ কুঁচকে অলোকরঞ্জনের দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করলেন, অলোকরঞ্জন তাঁর চোখে চোখ রেখে তাঁর মধুরতম হাসিটি হাসলেন। কী আর করবেন ডীন, বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

অডিটরিয়ামের সেই ঢালু ছাদের ওপর উঠে শীতকালে রোদ পোয়াতাম আমি আর আমার তিন সহপাঠিনী—রানু, ইন্দিরা, ঝর্না। সেই জন্যে পয়লা এপ্রিলে আমাদের নাম দেয়া হয়েছিল ক্যাট্স অন হট্ ক্যান্টিন রুফ। পয়লা এপ্রিলে নানা রকম নামকরণ করবার প্রথা ছিল তখন, পোস্টারে নামগুলো লিখে নানা জায়গায় সেঁটে দেয়া হত, মাস্টারমশাইরাও রেহাই পেতেন না। রানু ইন্দিরার সঙ্গে আর দেখা হয়নি যাদবপুর ছাড়ার পর। ঝর্না থাকে প্যারিসে—মাঝেমধ্যে কলকাতায় এলে টেলিফোন করে। ওর স্বামী দেবেনদা, দেবেন ভট্টাচার্যের বেশ একটু খ্যাতি ছিল মিউজিকোলজিস্ট হিশেবে, সম্প্রতি মারা গেছেন। অতি চমৎকার ভদ্রলোক, কলকাতার বাড়িতে যখন হেঁটো ধুতি আর ফতুয়া পরে বসে আড্ডা দিতেন মনে হত না সারা জীবন ইয়োরোপের বুদ্ধিজীবী মহলে কাটিয়েছেন। বিলেতে না গিয়ে অনেকেই ওর চেয়ে অনেক বেশি কড়া সায়েব হয়। যৌবনে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন চমৎকার, বু.ব বলেছিলেন তিনি নিজে করলে ওর চেয়ে ভালো হত না।

আমাদের সঙ্গে পড়ত কমলেশ চক্রবর্তী আর কৃষ্ণা সেন। কমলেশ আমারই মতো *কৃত্তিবাস*-এর বহির্বৃত্তের মানুষ ছিল, হয়তো আমার চেয়ে কেন্দ্রের আরেকটু কাছাকাছি—কারণ *কৃত্তিবাস*-এ ওর কবিতা মাঝে মাঝে ছাপা হত, এমনকী *কবিতা*-তেও দুয়েকবার বেরিয়েছিল। প্রচুর বিদেশী বই কিনত। কমলেশ আর কৃষ্ণা পরে দম্পতি হয়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে কমলেশ আমারই মতন চাকরিসূত্রে বাণিজ্যিক জগতের মানুষ হয়ে যায়, কিন্তু লেখাপড়া চর্চাটা ছাড়েনি কখনোই। অবসর নেবার পর থেকেই (কিম্বা হয়তো তার একটু আগে থেকেই) বিশ্বসাহিত্যের দিকপালদের নিয়ে ওর বইগুলি প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। ২০০২ সালে হঠাৎ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ওর বইয়ের সংখ্যা হবে অন্তত আটটি। ওর অকালমৃত্যুর পর কৃষ্ণার সঙ্গে আমাদের নতুন করে ঘনিষ্ঠতা হল, সে এখন আমার স্ত্রীর প্রিয় বান্ধবী। জীবনের বৃত্ত যে কার কীভাবে গোল হয়ে ফিরে আসে!

বর্ধমান থেকে এসেছিল কমলেশ চট্টোপাধ্যায়—তার মুখস্থ করবার অমানুষিক ক্ষমতা ছিল। শুনেছিলাম বুদ্ধদেব ও সুধীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতা শুধু নয়, সমস্ত প্রবন্ধও নাকি তার কণ্ঠস্থ ছিল—*তিথিডোর*-ও মুখস্থ ছিল কিনা জিজ্ঞেস করিনি।

ঢাকুরিয়া ওভারব্রিজ তখনো তৈরি হয়নি। লেভেল ক্রসিঙে থেমে থেমে দোতলা এইট-বি আর পাঁচ নম্বর স্টেটবাস যাতায়াত করত। প্রাইভেট বাস ছিল না, মিনিবাস ছিল না। অটো কেউ কল্পনা করেনি। অফিসটাইম ছাড়া অন্য সময় বাসে উঠে সাধারণত বসবার জায়গা পাওয়া যেত, দুপুরবেলা তো অবশ্যই। আর্টস বিল্ডিঙের তেতলায় দাঁড়ালে পুবদিকে রেললাইনের ওপারে ধানক্ষেত চোখে পড়ত, এখন সেখানে দম আটকানো সন্তোষপুর।

কত রাত অবধি বাস চলত তখন। বলতে গেলে সারা রাতই বাস পাওয়া যেত, অন্তত প্রধান প্রধান রুটগুলোতে। শহরের পরিবহন ব্যবস্থার মেরুদণ্ড দু'নম্বর দোতলা বাস (হায়, দোতলা বাস!) পাইকপাড়া থেকে ছাড়ত রাত সাড়ে বারোটায়, গড়িয়াহাটে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় রাত দেড়টা, প্রায় ওই সময় পর্যন্তই চলত এইট-বি'ও। আবার ওদিকে সকালের প্রথম ট্রাম—যাকে বলা হত গঙ্গাযাত্রীদের ট্রাম—বেরিয়ে পড়ত ভোর হবার আগেই, সাড়ে তিনটে নাগাদ। অর্থাৎ রাত দেড়টা থেকে সাড়ে তিনটে, এই দুঘন্টাই মাত্র বন্ধ থাকত ট্রামবাস। সারা রাত খোলা থাকত নিজাম আর মেট্রোগলির পাঞ্জাবি ধাবা। কত দিন দেখা হয়েছে মানবের সঙ্গে, শেষ দু'নম্বরে পাইকপাড়া থেকে ফিরছে, আমি ফিরছি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট থেকে। গড়িয়াহাট পর্যন্ত পৌঁছে গেলে সেখান থেকে যাদবপুর—এইটবি পাওয়া গেলে তো কথাই নেই, নাও যদি পাওয়া যায় তো দুজনে গল্প করতে করতে চলে গেলে কতটুকুই বা রাস্তা আর।

সে সময় আমাদের আড্ডা জমত মানবের ঘরে, এইট-বি বাসস্ট্যান্ডের ঠিক পেছনটায় ওদের বাড়ি ছিল। মানবের ছোট্ট ঘরখানায় একদিকে একটা তক্তপোশ, তার উপরে, মেঝেয়, যেখানে জায়গা আছে সেখানেই, বই বই আর বই। ইংরেজি

বাংলা দুটোই আশ্চর্য দ্রুত পড়তে পারত মানব। যখনকার কথা বলছি তখন ও ডক্টর জিভাগো অনুবাদ করছে। এক কোণে বসে আমি আর মানবের বাল্যবন্ধু গৌরীশংকর দাবা খেলছি, অন্যদিকে ব্রিজ চলছে, মানব অন্যতম খেলোয়াড়। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে জিভাগো অনুবাদ করতে করতেই খেলছে। ওর ছোটভাই সতু (পরে বিখ্যাত নকশাল তাত্ত্বিক, বহু শুভানুধ্যায়ীর আন্তরিক চেষ্টাকে ব্যর্থ করে গত বছর ক্যান্সারে মারা গেছে), তার একটা পায়ে কী একটা খুঁত ছিল সেজন্য খুঁড়িয়ে হাঁটত, তার ডিউটি ছিল মানবের তাশটা খুলে মানবের দিকে ফিরিয়ে ধরে রাখা। লিখতে লিখতে খাতা থেকে এক ঝলক মুখ তুলে তাশ দেখে ফের খাতায় ফিরে যেতে যেতে মানব নির্দেশ দিত, 'গোলামডা ফালাইয়া দে।' বলে আবার ডক্টর জিভাগো-য় ডুবে যেত। মানবদের বাড়িতে বাঙাল ভাষাই চলত, মা-ভাই-বোনদের মধ্যে। অথচ বাইরে চমৎকার অ্যাকসেন্টহীন তু.সা-র উপযুক্ত বাংলা বলতে আটকাত না কোথাও। পরে অবশ্য এরকম অনেক দেখেছি। শঙ্খ ঘোষদের পরিবারেও এই ব্যাপারটা চালু ছিল এটা তাঁর নিজের মুখেই শুনেছি—ওঁরাও বাবা-মায়ের সঙ্গে, এমনকী ভাইদের মধ্যেও বরিশালের ভাষাতেই কথা বলতেন, বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলতে হলেই বেরিয়ে আসত কলকাতার ভাষা। আমি নিজে কখনো বাঙাল ভাষায় কথা বলিনি, তাই তখন অবাক লাগত ব্যাপারটায়। এ অভিজ্ঞতা বাঙাল-ঘটি নির্বিশেষে অনেকেরই হয়েছে, যে হস্টেল বা মেসের রুমমেট যে সিলেট বা চাটগাঁয়ের বাঙাল, সেটা তথ্য হিশেবে জানলেও মনে থাকত না। মনে পড়ত তার বাড়ি থেকে কাকা কিম্বা দাদা দেখা করতে এলে—তখন সে যে ভাষায় কাকা বা দাদার সঙ্গে আলাপ করত সেটাকে বাংলা বলে মেনে নিতে ঢাকার বাঙালেরও বেশ অসুবিধে হয়।

বাড়িতে মা-বাবা আমার সঙ্গে কলকাতার ভাষাই বলতেন, আমাদের পরিবার চল্লিশের দশকের গোড়া থেকেই কলকাতামুখী বলেই বোধহয় আমার কাকা-জ্যাঠাদের বিভিন্ন পরিবারেও কোথাওই আমাদের প্রজন্মে বাঙালভাষার চল গড়িয়ে আসেনি, আমার খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইবোনরা সকলেই জন্ম থেকেই কলকাতার (খাস কলকাতার নয়, দক্ষিণ কলকাতার) কথ্যভাষায় অভ্যস্ত হয়েছে, একমাত্র আমার বড়োমাসির ছেলেদের গলায় বাঙালভাষা শুনে ছোটবেলায় মজা পেতুম : "ওমা, দ্যাহ আহাশখান কালি কইরা আইসে—" আমাদের বাপকাকারা নিজেদের মধ্যে বাঙাল কথা বললেও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁরা প্রায় কেউই সে উচ্চারণ ব্যবহার করতেন না, তবে তাঁদের উচ্চারণে ও বাগ্‌ধারার প্রয়োগে তাঁদের বাঙাল প্রাগিতিহাস ধরা পড়ে যেত। সেটা গোপন করবার জন্যে তাঁরা যে খুব বেশি ব্যগ্র ছিলেন, তাও অবশ্যি নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বাঙালরা কলকাতায় এলে তাদের বাঙাল পরিচয় গোপন করবার চেষ্টা করত, তারপর আর করেনি। আর দেশভাগের পর তো তারা এ-বঙ্গে নিজের আইডেন্টিটি স্থাপন করার চেষ্টায় মরিয়া; আগের কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতায় তারা বুঝেছিল, কলকাতায় নিজের পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে বাঙালত্ব গোপন

করে সেটা করা যাবে না, গোপন করা সম্ভবও হবে না—সেটা করতে হবে বাঙাল হিশেবে নিজেদের জোর প্রতিপন্ন করে তবেই। সংখ্যার জোর তো একটা বড়ো ফ্যাক্টর বটেই, তা ছাড়া প্রতিজ্ঞার জোর, লড়াই করবার মনোবৃত্তির জোর—দীর্ঘ সময় ধরে শারীরিক ও মানসিক চাপ সহ্য করে দাঁতে দাঁতে চেপে টিকে থাকার জোর, ইংরেজিতে যাকে বলে স্ট্যামিনা। সেই যে একজন বরিশালের লোককে একজন জিগেস করেছিলেন, 'কেমন আছেন?' উত্তর পেয়েছিলেন, 'লইড়া দ্যাখেন।'

তবে, এই জোরটা যে বিশেষভাবে বাঙালদেরই মানসিক বৈশিষ্ট্য তা নিশ্চয়ই নয়। এটা সেকালে তাঁদের মধ্যে উপ্ত হয়েছিল সমসাময়িক ইতিহাসের চলন থেকে। যে অবস্থার মধ্যে তাঁরা পড়েছিলেন সেখানে এই মানসিক জোর নিজের ভিতর থেকে বের করে আনতে না পারলে তাঁরা শারীরিকভাবেই লুপ্ত হয়ে যেতেন। তাঁদের মনোভাবটা ছিল মরিয়ার। তেমন অবস্থায় পড়লে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিও সেই একই মনোভাব দেখাতে পারতেন বলে আমার বিশ্বাস, কিন্তু ইতিহাস তাঁদের অন্যরকম করে ভাবতে প্ররোচিত করেছিল। তাঁরা সর্বহারা হননি, কিন্তু সম্পন্নও ছিলেন না। এই ধরনের মানুষরা সাধারণত আত্মরক্ষাপ্রবণ হয়, সবাই মিলে পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে কোনো মতে মাথা নীচু করে থাকার চেষ্টা, নিজের যেটুকু আছে সেটুকুও যেন না হারায়।

পশ্চিমবঙ্গে সাম্যবাদের প্রসার ও স্থায়িত্বের একটা আদি কারণ অবশ্যই দেশভাগ, সত্যিকারের সর্বহারা শরণার্থীদের আগমন। তাঁরা বোধহয় মার্ক্সবাদের একেবারে গোড়াকার তত্ত্বটি প্রমাণ করেছিলেন, যে সর্বহারা না হলে কেউ মনেপ্রাণে কমিউনিস্ট হয় না। লক্ষণীয়, সাম্যবাদীদের দলে যাঁরা সিদ্ধান্ত নেবার মতো শীর্ষস্থানীয়, তাঁদের মধ্যে প্রায় কোনো ঘটি নেই—কোনোদিনই ছিলেন না। পশ্চিমবাংলার লোক মানবেন্দ্রনাথ রায় বা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তো এখনকার দিনে সাম্যবাদী বলে স্বীকারই করা হয় না।

সেই চেষ্টা থেকেই বোধহয় সে সময়ে বাঙাল-ঘটি তর্ক শোনা যেত সর্বত্র। তার মনস্তত্ত্বের ছকটাও একই রকম ছিল সর্বত্রই—একটা দল মরিয়া হয়ে আক্রমণ করছে, আরেকটা দল মরিয়া হয়ে আত্মরক্ষা করছে। এক দলের মূল যুক্তি ছিল আমরা কী কী পারি, আরেক দলের মূল যুক্তি ছিল আমাদের পূর্বপুরুষেরা কী কী পারতেন। আজকাল এই তর্কটা শোনা যায় না আর। বাঙাল-ঘটি আলাদা পরিচয়—এই ব্যাপারটাই পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয় থেকে প্রায় মুছে গেছে। ঘটিবাঙাল ঝগড়ার এখন শেষ ঠাঁই হয়েছে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের লড়াইতে—সেখানেও বোধহয় তার তীব্রতা তেমন প্রকট নয়।

আমার ঠাকুর্দা ঠাকুরমায়েরা অবশ্যি কেউই কলকাতার ভাষা আয়ত্ত করবার কোনো রকম চেষ্টা করেননি। তবে আমার মাতামহ—বরিশাল জেলার ক্ষুদ্র জমিদার পরিবারের দক্ষিণাচরণ রায়—পার্টিশনের আগে পর্যন্ত বরিশালের বাইরে যাননি, তিনি যে কোথা থেকে কলকাতার সান্ধ্যভাষা আয়ত্ত করেছিলেন জানি না, আমার সঙ্গে তিনি আমার শিশুকাল থেকেই ওই ভাষায় কথা বলতেন।

বুদ্ধদেব বসুর বাড়ি ঢাকায়, জন্ম কুমিল্লায়, স্মৃতির উন্মেষ নোয়াখালিতে, কৈশোর ও প্রথম যৌবন কেটেছে ঢাকায়। তাঁর পক্ষে বাঙালভাষার টান বা অ্যাকসেন্ট কাটিয়ে ওঠা যথেষ্টই কঠিন ছিল, কঠিনতর ছিল কলকাতার বিশেষ বাক্‌রীতিকে আয়ত্ত করা। উপরন্তু তিনি ছিলেন তোতলা, কথা বলতে গেলে আটকে যেত, ক ইত্যাদি বিশেষ কয়েকটা ব্যঞ্জনবর্ণকে তিনি যমের মতো ভয় করতেন। কৈশোরে তিনি যে মুখচোরা ছিলেন তার একটা মস্ত বড়ো কারণ তাঁর এই তোতলামি, এই তোতলামির জন্যেই তিনি জীবনে প্রথমবার বড়ো মঞ্চে নিজের কবিতা পড়তে উঠেও পড়া শেষ করতে পারেননি। তাঁর হাত থেকে পাণ্ডুলিপি টেনে নিয়ে কবিতাটা পড়ে শেষ করে দিয়েছিলেন ময়মনসিংহের কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

কিন্তু সেই তোতলামির জন্যেই তিনি ক্রমে নিজের কাছেই শিখে নিলেন কেমন করে মূল শব্দটি ব্যবহার না করেও তার আশেপাশের শব্দ দিয়ে তির্যকভঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, এমনকী সরল পদ্ধতির তুলনায় শ্রোতার কানের উপরে যার প্রভাব অনেক বেশি তীক্ষ্ণ ও দূরগামী—আয়ত্ত করলেন মৌখিক বাংলার উচ্চারণ ও বাক্যগঠনের একটি বিশেষ ভঙ্গি, পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে তার নকল করতে আরম্ভ করলেন তাঁর ছাত্ররা, তাঁর ভক্ত তরুণ কবিগণ, তাঁর পুত্রকন্যাজামাতাগণ ও তাঁদের বন্ধুবর্গ। তখন যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্যের পাঠক্রম চালু হয়ে গেছে বুদ্ধদেবের নেতৃত্বে, তাই ক্রমে সেটি সাধারণ্যে চলিত হয়ে গেল যাদবপুরী বাংলা বলে। কিন্তু যাদবপুরী নয়, ওটার যথার্থ নাম হওয়া উচিত ছিল কবিতাভবনী বাংলা। বাংলা উচ্চারণ—শুধু উচ্চারণ নয়, কথাবার্তা বলার, মৌখিক গদ্যরীতির একটি বিশেষ ধরন, যাকে স্টাইল বললে খুব ভুল বলা হয় না—এইভাবে আরম্ভ হয়েছিল বুদ্ধদেব বসু থেকে। এখন অবশ্যি রীতিটি অনেকাংশে মুদ্রাদোষে কন্টকিত হয়ে পড়েছে, কিন্তু কারো কারো বাগ্‌ভঙ্গিতে এখনো স্টাইলটি খানিক খানিক উলসে ওঠে।

আর্টস বিল্ডিং-এর পশ্চিমে প্রধান প্রবেশপথ দিয়ে বারান্দা পেরিয়ে ঢুকেই বাঁদিকে প্রথম খুপরিটা ছিল বুদ্ধদেব বসুর ঘর, ওখানেই তাঁকে প্রথম দেখি। ইকনমিক্স নিয়ে বি. এ পাশ করে তু.সা পড়তে এসেছি শুনে অবাক হয়েছিলেন। তু.সা'তে প্রথম থেকেই এই ব্যাপারটা ঘটছে, প্রথম ব্যাচের অমিয় দেবের অনার্স ছিল অঙ্কে। ইংরেজি বিভাগেও আবেদন করেছি শুনে জিগেস করেছিলেন দুটোতেই সুযোগ পেলে কোনটা পড়ব। বলতে চেয়েছিলাম 'অবশ্যই কম্প্যারেটিভ লিট্রেচার—' নার্ভাস থাকার ফলে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল 'ওব্‌ভিয়াসলি কম্প্যারেটিভ লিট্রেচার।' শুনে বড়ো বড়ো চোখ তুলে প্রশ্ন করেছিলেন 'কেন, ওব্‌ভিয়াসলি কেন?' ভুল শব্দটি মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় আরো নার্ভাস হয়ে গিয়ে জবাব দিতে পারিনি, উনিও দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করেননি।

শব্দটা অবশ্য পুরোপুরি ভুল ছিল না। তখনো কেউ কেউ কেরিয়ারের কথা না ভেবে, পরে কী চাকরি পাওয়া যাবে সে কথা চিন্তা না করে, শুধু পড়বার আনন্দেই

একটা বিষয় বেছে নিতে পারত, এবং নিত। ছোটবেলা থেকে কবিতা পড়তাম, গল্পের বইয়ের পোকা ছিলাম। তাকেই যে সাহিত্য বলে সেটা যদিও তখন জানতাম না। শিশুকাল থেকে চশমা থাকার ফলে ক্রিকেট ফুটবল খেলতে পারতাম না, বই ছিল প্রায় একমাত্র আশ্রয়। বি.এ পড়তে যখন এসেছিলাম ততদিনে বাংলা বই মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে, খিদের জ্বালায় বাধ্য হয়ে ইংরেজি বই পড়তে আরম্ভ করেছিলাম, আস্তে আস্তে রস পেতে আরম্ভ করেছি। ইকনমিক্স পড়তে হয়েছিল পারিবারিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার চাপে। পারিবারিক অর্থে নিজের বাবা-মা নন, তাঁরা পারতপক্ষে আমার কোনো ইচ্ছায় বাধা দিতেন না—কিন্তু আমার এক সম্পর্কিত কাকা ছিলেন লোকাল গার্জেন, তিনি আমার বাপজ্যাঠাদের মধ্যে সকলের চেয়ে সফল—কলকাতা হাইকোর্টের মস্ত উকিল ছিলেন, শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন, সব্বার আগে যোধপুর পার্কে বাড়ি করেছিলেন, তিনি বাবাকে বোঝালেন, আর্টস নিয়ে যদি পড়তেই হয় নেহাৎ, তাহলে ইকনমিক্সই একমাত্র বিষয়। সেই চাপে পড়ে অর্থনীতি পড়া—কিন্তু মন পড়ে থাকত গল্পের বইতে। কফিহাউসের পড়ুয়া বন্ধুদের কাছে শুনে শুনে অনিংরেজ লেখকদের বই পড়তে আরম্ভ করেছিলাম। *কৃত্তিবাস* দলের মধ্যে সকলের চেয়ে আগে আলাপ হয় দীপক মজুমদারের সঙ্গে, আমার তু.সা পড়তে আসার পিছনে ওর উৎসাহ কম ছিল না, পড়তে এসে ওকে উপরের ক্লাশে পাই। ওর কাছ থেকে নিয়ে প্রথমবার 'দ ট্রায়াল' পড়েছিলাম—ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের সাহিত্য তখন পেপারব্যাকে এখনকার মতো সহজপ্রাপ্য ছিল না। মহারানী হেমন্তকুমারী স্ট্রিটে দীপকের বাড়িতেও গিয়েছি তখন, মেঝে থেকে সীলিং পর্যন্ত টাল দেয়া বই দেখে হতভম্ব হয়েছি। একজন ছাত্রের যে অত বই থাকতে পারে এটা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। তার বেশির ভাগই ছিল ইয়োরোপীয় সাহিত্যের বই, তখনো পর্যন্ত কেউ কেউ যাকে বলতেন কন্টিনেন্টল লিট্রেচার। আমরা বাঙালিরা যেমন ভারতবর্ষকে দুভাগে ভাগ করি, বাঙালি আর অবাঙালি, তেমনি বাঙালি সাহিত্যপড়ুয়ারাও, তু.সা আরম্ভ হবার আগে পর্যন্ত, ইয়োরোপীয় সাহিত্যকে দুটো ভাগে ভাগ করতেন, ইংলিশ আর কন্টিনেন্টল। আজকাল যেমন বিশুদ্ধ বাংলা সাহিত্য পড়তে গেলেও তুলনামূলকতা চর্চার জন্যে একটা পেপার থাকে—সাহিত্যপাঠের ওটাই যে সঠিক পদ্ধতি তা এখন বাঙালি পাঠকের কাছে মোটামুটি স্বীকৃত হয়ে এসেছে—তখন কিন্তু এমন ছিল না, আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকার সাহিত্য তো দূরস্থান, বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় রিলকে কিম্বা র‍্যাঁবোর উল্লেখও পাকামি বলে মনে করা হত। দীপকের পুস্তকসংগ্রহ ছিল এই কূপমণ্ডুক ধারণার বিরুদ্ধে চীৎকৃত প্রতিবাদ, অত বাউন্ডুলে জীবন যাপন করেও অত বই কী করে সংগ্রহ করত সে এক রহস্য।

আরো অবাক হয়েছিলাম তার পড়ার টেবিলের সামনে বাঁধানো একটি লম্বাটে ধরনের যিশুখ্রিস্টের মুখের ছবি দেখে, ওপরদিকে তোলা চোখ—মাথায় কাঁটার মুকুট দেখে যিশু বলে চিনতে পেরেছিলাম। ধর্মপ্রাণ দেশী খ্রিস্টানের ঘরে ছাড়া যিশুর ছবি

আগে আর কোনো বাঙালির ঘরে দেখিনি বলে মানে বুঝিনি। ওটা যে এল্ গ্রেকোর প্রিন্ট তা বুঝতে বেশ সময় লেগেছিল। পরে শুনেছিলাম, দীপককে নিয়েই নাকি বুদ্ধদেব *বিপন্ন বিস্ময়* উপন্যাসটি লেখেন।

শক্তির সঙ্গেও তখন আলাপ হয়েছে। তু.সা'র বিএ ক্লাশে নাম ছিল, রুমিদের সঙ্গে পড়ত, আমার এক ক্লাশ নিচে। প্রায়ই আসত না, যেদিন আসত সেদিন হইচই পড়ে যেত বিভাগে। সকলের সঙ্গেই ইয়ার্কি করে কথা বলে, মাস্টারমশাইরাও রেহাই পান না। একদিন কফিহাউসে অন্য টেবিলে একটি ঘোরবর্ণা যুবতীকে দেখে উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করে ওঠে, "ডাকিনী আবলুশগাত্রী, তুমি মধ্যরাত্রির সন্তান!" আমার কবিতাপাঠের সীমা তখনো জীবনানন্দ ছাড়ায়নি, ভয়ানক চমকে উঠে জিগেস করি, 'কার লেখা এটা?' শক্তি বলে, 'বোদলেয়ার।' *কবিতা পত্রিকায়* তখন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে বুদ্ধদেবের অনেকগুলো করে ফ্ল্যব্ দু'মাল থেকে কবিতার অনুবাদ, কবিতাপ্রিয় তরুণদের মুখে মুখে ফিরছে তার বাছা বাছা পঙ্‌ক্তিগুলি, তার অনেক কবিতাই তখন শক্তির মুখস্থ। এদিকে কিন্তু সে তখন রিলকে-তে মজে আছে, ক্লাশে বুঝতে পারিনি শুনে কলেজ স্কোয়ারে বসে একটা পুরো দুপুর ধরে আমাকে ডুইনো এলেজি বুঝিয়েছিল। ডুইনো এলজি কতটা বুঝেছিলাম মনে নেই, কিন্তু এটা বুঝেছিলাম যে শক্তি কত মন দিয়ে রিলকে পড়েছে। নাকি এটা তু.সা'তে ভর্তি হবার আগে? মনে পড়ছে না ঠিক, কিন্তু তখন ওর 'গোলাপস্থাপিত কবিতাগুচ্ছ' বেরিয়ে গেছে, রিলকে নিয়ে কথা বলতে বলতে লাইশমান-এর ইংরেজি অনুবাদ আর নিজের কবিতা পাশাপাশি মুখস্থ বলেছিল এটা মনে আছে। বুদ্ধদেবকে 'ওব্‌ভিয়াসলি' বলে ফেলবার পেছনে হয়তো এই সব স্মৃতি ক্রিয়াশীল ছিল—কিন্তু তাঁকে এত সব কথা গুছিয়ে বলব কী করে। এর আগে আমি কোনো প্রতিষ্ঠিত লেখককে চোখে দেখিনি।

ক্লাশ করতে আরম্ভ করে অগাধ জলে পড়েছিলাম কিছুদিন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যপাঠের ট্র্যাডিশন যেটুকু চিনেছিলাম তাতে ধারণা হয়েছিল, শেক্সপিয়ার মানেই এ. সি ব্র্যাডলে বা অন্তত এ.এল. গাঙ্গুলি, রবীন্দ্রনাথ মানেই 'রবীন্দ্রসাহিত্যে মৃত্যুচেতনা' বা অন্তত *রবিরশ্মি।* এখানে সে রকম কোনো হাতল নেই, নিজের জোরে দরজা টেনে খুলতে হবে। কাফকা মানে কাফকাই শুধু, বোদলেয়ার বলতে বোদলেয়ারই কেবল। পরে অবশ্যি আস্তে আস্তে সব সহজ হয়ে এসেছিল। আধুনিক ধরনে সাহিত্য বুঝতে মন্ত্রের মতো সাহায্য করত বুদ্ধদেবের ক্লাশগুলি। তাঁর নির্দেশ ছিল, ক্লাশে আসার আগে একবার বইটি পড়ে আসতে হবে, পড়ানো শেষ হয়ে গেলে আরেকবার পড়ে নিতে হবে। সাহিত্যের ইতিহাস ছাড়া অন্য কোনো রেফারেন্স বই পড়তে বলতেন না। কিন্তু ক্লাশে (সাধারণত দুটো পিরিয়ড এক সঙ্গে নিতেন) এমনভাবে বুঝিয়ে দিতেন, সেই লেখকের সমস্ত গুপ্ত কৌশল ও পরিপ্রেক্ষিত সুদ্ধু, যে নিজের অজ্ঞাতসারেই বিষয়গুলো থিতিয়ে বসতে শুরু করে দিত মনের তলায়। সাহিত্য জিনিসটা যে ভাষায় ভাষায় খোপ কাটা কাটা কোনো পদার্থ নয়, বাংলা সাহিত্য ইংরেজি সাহিত্য

জর্মান সাহিত্য ফরাশি সাহিত্য বলে যে আলাদা আলাদা কিছু নেই, সারা পৃথিবী ভরে সাহিত্যের স্রোত যে এক ও অবিভাজ্য, সাহিত্যের এই মূল তত্ত্বটি আজকের দিনে খুব সহজবোধ্য ও সংশয়াতীত বলে মনে হয়—কিন্তু আজ থেকে অর্ধেক শতাব্দী আগে ব্যাপারটা অত সহজ ছিল না, অন্তত বাংলাদেশ; বেশ কষ্ট করে বুঝতে হত। আর শুধু সাহিত্য কেন, মানুষের মনের কল্পনাপ্রবণ অংশের যে কোনো সৃষ্টিই আসলে একই মাত্রা দিয়ে বিচার করতে হবে, বাঙালির শিল্পচিন্তার ইতিহাসে এই ধারণারও প্রতিষ্ঠাতা হলেন বুদ্ধদেব বসু। সাহিত্যে রোমান্টিকতা বোঝাতে গিয়ে প্রথম দিন টার্নারের ছবি দেখিয়ে আরম্ভ করেছিলেন মনে আছে। এখনো রোমান্টিকতা শব্দটি শুনলেই টার্নারের বন্দরে ঝড়ের দৃশ্যের ছবিটি মনে আসে।

সুধীন্দ্রনাথের স্টাইল ছিল একেবারে আলাদা। সিম্বলিজ্‌ম্ পড়াতেন। নিজে হাতে ক্লাশনোট তৈরি করে নিয়ে আসতেন, সেটা আমরা পালা করে বাড়ি নিয়ে গিয়ে নিজের খাতায় টুকে নিতাম, জেরক্স কোথায় তখন? রুলটানা ফুলস্ক্যাপ কাগজ লম্বালম্বি সমান দু'ভাঁজ করা, আদালতের নথির মতন—তার বাঁদিকটা ফাঁকা, ডানদিকে সুধীন্দ্রনাথের কুটি কুটি কিন্তু পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে সরু কলমে লেখা। বছর তিনেক আগে পুরোনো খাতাপত্রের মধ্যে তাঁর হস্তাক্ষরে র‍্যাঁবো বিষয়ে ক্লাশনোটটি আবিষ্কার করি। সেটি বিভাগকে উপহার দিয়েছিলাম। আশা করেছিলাম সেটি বিভাগীয় পত্রিকায় ছাপা হবে, হয়নি। বিভাগ যেন কেমন হয়ে গেছে আজকাল।

গ্যালিস দেয়া চমৎকার ছাঁটের ট্রাউজার পরতেন সুধীন্দ্রনাথ। তখন তাঁর বয়স হবে আটান্ন, করিডর দিয়ে যখন হেঁটে আসতেন আমাদের সহপাঠিনীরা হাঁ করে সেই রূপবান পুরুষের দিকে তাকিয়ে থাকত, আমরাও। হাতে মুরাদের টিন থাকত। ইজিপশিয়ান (নাকি টার্কিশ? এ বিষয়ে ছাত্রদের মধ্যে মতভেদ ছিল) সিগারেট, গাঢ় বাদামি রঙের, প্রস্থচ্ছেদ গোল নয়, ডিম্বাকৃতি। ছাত্রদের মধ্যে অকাতরে বিলাতেন, ক্লাশ ছেড়ে যাবার সময় একেকদিন আধভরা টিনটা যেন ভুল করেই টেবিলে ফেলে রেখে চলে যেতেন। করিডরে দাঁড়িয়ে গল্প করতেন ছাত্রদের সঙ্গে। একদিন মদ খাওয়া শেখাচ্ছিলেন—'রাত্তিরবেলা আনারস স্লাইস করে কেটে জিনে ভিজিয়ে রেখে দেবে। সকালে উঠে জিনটা ফেলে দেবে, আনারসটা খাবে।' শক্তি উপস্থিত ছিল সেদিন, শুনে হাঁহাঁ করে উঠেছিল, 'অতটা জিন ফেলে দেবেন সার? ওটা বরং আমাকে—'

জিনটা বোধহয় সুধীন্দ্রনাথের প্রিয় পানীয় ছিল। দোলপূর্ণিমার দিন প্রতিভা বসুর জন্মদিন, সন্ধের একটু পরে সুধীন্দ্রনাথ রাজেশ্বরীকে নিয়ে কবিতাভবনে এলেন, হাতে একটি এক লিটারের বীফ ঈটারের বোতল—লিটার প্যাক সেই প্রথম দেখলাম। আমরা ছাত্ররা চারপাঁচজন যারা উপস্থিত ছিলাম সবাইকে সিকি পেগ আন্দাজ করে বিতরণ করা হল। প্রতিভা বসুকে প্রায় জোর করে দু'ফোঁটা খাওয়ানো হল চায়ের চামচে করে। সুধীন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি বেশি খাব না, সঙ্গে ভদ্রমহিলা রয়েছেন, গাড়ি চালিয়ে ফিরতে হবে—' বলে খোশমেজাজে ঘন্টা তিনেকে বোতলটি শেষ করে গাড়ি চালিয়ে

ফিরে গেলেন। সত্যের অনুরোধে বলতে হয়, আমরা আরো এক রাউন্ড করে পেয়েছিলাম, তবে ওই সিকি পেগ।

মাতাল বলে অযৌবন কুখ্যাতি ছিল বুদ্ধদেব বসুর, আজও অনেক বাঙালি সাহিত্যপাঠকের সেই রকম ধারণা, সুতরাং তাঁর মদ্যপানের গল্পটাও এখানে বলে রাখা যেতে পারে। প্রতিভা সোমকে তিনি যখন বিবাহ করবার প্রস্তাব দিলেন, ১৯৩৪ সালের গোড়ার দিকের কথা সেটা, প্রতিভা বসু লিখেছেন তাঁর মামা তখন আপত্তি করে তাঁর বাবা-মাকে বলেছিলেন, 'আপনারা কি জানেন, ওর মদের খরচ কত?' পরের লাইনেই লিখেছেন, 'যদিও তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে আমি মদ্যপ বলে জানতে পারিনি।' মদ্যপ ছিলেন না বটে, তবে মদ্যপান করতেন না এমন নয়। ওঁকে মদ খেতে শিখিয়েছিল ওঁর জামাই জ্যোতি। প্রতিভা বসু তাই বলেছিলেন, 'জামাই শ্বশুরকে বখায় এই প্রথম দেখলাম।' সন্ধ্যে একটু গাঢ় হয়ে এলে কোনো কোনো দিন বুদ্ধদেব হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলতেন, 'আঃ, একটু স্কচপানি খাবার এই তো সময়!' ওঁর একটি রুপোর গেলাশ ছিল, বহুদিনের পুরোনো, লেখার সময় তাইতে করে ওঁর টেবিলে খাবার জল রাখা থাকত। তাতে আধ পেগ আন্দাজ স্কচ ঢেলে বাকিটা বরফজলে ভর্তি করে নিয়ে বসতেন। আড্ডা চলছে, বুদ্ধদেব ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছেন গেলাশে। আধ গেলাশ মতো শেষ হলে পুনরায় গেলাশটি বরফজলে, শুধুই বরফজলে, আর স্কচ নয়—ভর্তি করা হল—সেটা আদ্ধেক হলে পুনশ্চ বরফজলে ভর্তি করা হল। এই চলত, ধরুন, সাতটা সাড়ে সাতটা থেকে দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত। এই রকমই ছিল বিখ্যাত মদ্যপ বুদ্ধদেব বসুর পানাভ্যাস—তবে একেবারে শেষ দুয়েক বছর বোধহয় আরেকটু বেড়েছিল, সেটা জ্যোতি বলতে পারবে। ওইটুকু খেয়েই লিখতে পেরেছিলেন "শুধু তাই পবিত্র, যা ব্যক্তিগত"—যা পড়ে নকশালরা বুদ্ধদেব বসুর মুক্তি চাই বলে পোস্টার সাঁটিয়েছিল।

সুধীন্দ্রনাথের বাড়িতেও কখনো কখনো ক্লাশ করতে গিয়েছি আমরা। তাঁর কাছে আমরা মাইকেল পড়তে চেয়েছিলাম, বললেন, 'বুদ্ধদেব তো এখানে আমাকে মাইকেল পড়াতে দেবেন না, তোমরা যদি আমার বাড়িতে আসতে পারো তো পড়াতে পারি।' তাঁর বাড়িতেই প্রথম যামিনী রায়ের তেলরঙে করা ভ্যান গগের কপি দেখি, ওরিজিনালের মতো অবিকল—দেখে, এবং আমাদের প্রশ্নের উত্তরে যামিনী রায়ের সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা শুনে, যামিনী রায় এবং আধুনিক ছবির সম্পর্ক ভালো করে বুঝতে আরম্ভ করি। হাজার হাজার বইতে প্রায়ান্ধকার তাঁর বিশাল বসবার ঘর। আমরা সকালবেলা যখন যাই তখন একেকদিন সেখানে রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আসেন রাজেশ্বরীকে গান শেখাতে। একদিন সুধীন্দ্রনাথ পড়াচ্ছেন, শোবার ঘর থেকে গানের আওয়াজ আসছে। আমি যতটা সম্ভব সেদিকে ঘেঁষে বসেছি, চেষ্টা করছি দুদিকেই কান রাখবার, এমন সময় পড়াতে পড়াতে আমার দিকে একবারও না তাকিয়ে একই গলায় সুধীন্দ্রনাথ বললেন, 'সমীর, আ'ম এফ্রেড ইয়ু'ল হ্যাভ টু ডিসাইড—' বলে আবার পাঠ্যপ্রসঙ্গে

ফিরে গেলেন। পরীক্ষার খাতায় নম্বর দিতেন অনেক। বুদ্ধদেবের হাতে নম্বর উঠতে চাইত না, টিউটরিয়েল খাতা রক্তাক্ত দাগে দাগে ছিন্নভিন্ন করে ফেরত দিতেন।

ফাদার ফার্লঁ গ্রীক সাহিত্য পড়াতেন, আর ডিভাইন কমেডি। দীর্ঘ কৃশ শরীর, শাদা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, তখন গ্রে স্ট্রিটে থাকতেন, সেখান থেকে যাদবপুর সাইকেলে যাওয়া আসা করতেন (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অধ্যাপক আজ সাইকেলে করে আসছেন, তাও গ্রে স্ট্রিট থেকে—ভাবা যায়?)। পড়াতে পড়াতে মাঝে মাঝে ওপর দিকে চোখ তুলতেন, তখন কপালে ত্রিনয়নের মতো অদ্ভুত বাঁকা বলিরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠত, দেখে মনে হত সত্যি সত্যি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। প্রথম যেদিন বললেন গ্রীক ট্র্যাজেডির মূল কথা পিটি আর ফিয়ার, না বুঝে বোকার মতো তর্ক করেছিলাম তাঁর সঙ্গে, ধৈর্য হারাননি। কোমল গম্ভীর মানুষটির কাছে তিরস্কারও পেয়েছিলাম একবার। পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেছে তখন, কী কারণে যেন চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, ঠিকানায় লিখেছিলেন সমীর সেনগুপ্ত এম. এ। গিয়ে বললাম, 'এম. এ-টা আবার কেন লিখেছেন ফাদার?' নীলচে-ব্রাউন চোখে হঠাৎ একটু সোনালি ঝিলিক দেখা দিল, বললেন, 'হোয়াই নট? আর ইউ অ্যাশেম্‌ড অভ ইয়র ডিগ্রি?'

সে তুলনায় ফাদার আঁতোয়ান অনেক বেশি কাছের মানুষ ছিলেন। ঝকঝকে হাসিভরা চোখ, চটপটে চালচলন, পরিষ্কার কামানো মুখ, পরনের সারপ্লিসটি ছাড়া তাঁকে পাদ্রি বলে বোঝবার উপায় ছিল না। পরের দিকে সেটাও বাদ দিয়েছিলেন, পাজামা আর গেরুয়া পাঞ্জাবি পরতেন। মধ্যযুগ পড়াতেন, কথায় কথায় সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে সমান্তরতা টানতেন। রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেন চমৎকার, যদিও বাংলা উচ্চারণে ঈষৎ টান ছিল। একবার বিভাগে কার যেন বিদায়সভা হচ্ছে, সম্ভবত প্রফেসর বিনেপালের—আমাদের গাইয়ে সহপাঠী প্রশান্তকে গান করতে বলা হল। প্রশান্ত গলাটলা ঝেড়ে নিয়ে আরম্ভ করতে যাবে, পাশ থেকে ফাদার আঁতোয়ান ফিশফিশ করে বললেন, '"ভরা থাক স্মৃতিসুধায়" গেয়ো না কিন্তু'—প্রশান্ত পরে বেরিয়ে এসে কানটান লাল করে বলল, 'দেখেছ কাণ্ড? আমি তো ওই গানটাই ধরতে যাচ্ছিলাম!' সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দিন কেওড়াতলায় ফাদারের খোলা গলায় গান গেয়ে ওঠা মনে পড়ে, "তবু প্রেম নিত্যধারা, হাসে সূর্য চন্দ্র তারা—"

সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দিনের আরেকটি ঘটনা মনে পড়ে। শ্মশান থেকে ফিরে আমরা ছাত্ররা কেউ কেউ গিয়েছিলাম কবিতাভবনে। তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। কবিতাভবনের চেহারা বিশৃঙ্খল; সিঁড়িতে বসে ফোঁপাচ্ছে কেউ, বুদ্ধদেব উদ্‌ভ্রান্তের মতো এঘর ওঘর করছেন। একবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন, পরক্ষণেই ফিরে এসে সোফায় বসছেন, একটু পরই উঠে গিয়ে বসছেন লেখার টেবিলে। পরদিন ছিল বি এ পরীক্ষার শেষ দিন, যাদবপুরে। কনিষ্ঠা কন্যা রুমির পরীক্ষার বছর সেটা। কিন্তু রুমি বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে আছে, মাঝে মাঝে কেঁদে উঠছে হুহু করে। একবার এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরল। বুদ্ধদেব মেয়ের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে হঠাৎ অনাবশ্যক

উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, 'রুমি, আয় তোকে পড়াই। কাল তোর পরীক্ষা—নিয়ে আয়, কী পড়তে চাস নিয়ে আয়—'

তারপর কী হল মনে নেই। কিন্তু এখনো কানে লেগে আছে, সেই বিশৃঙ্খলা, উত্তাল শোক ও চারদিকে বিভ্রান্তির মধ্যে, বুদ্ধদেবের আত্মস্থ হবার চেষ্টা, অনাবশ্যক উচ্চকণ্ঠে সেই বলে ওঠা, 'রুমি, আয় তোকে পড়াই—'

নরেশদাকে বেশিদিন পাইনি, কয়েক মাস পড়িয়েই বিদেশে চলে গেলেন ফুলব্রাইট নিয়ে। বাৎসল্যে ভরা মানুষ, ছাত্রদের যে কোনো সমস্যাকে ব্যক্তিগত স্তরে নিয়ে গিয়ে সমাধানের চেষ্টা করতেন। লাজুক স্বভাবের ছিলেন তখন, সেই সুযোগ নিয়ে তাঁর উপর অনেক অত্যাচার করেছি। তাঁর মধ্যে একজন স্নেহময় বয়স্ক বন্ধুকে পেয়েছিলাম, সেই বন্ধুত্ব এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। আমার ছোট বোন যখন তু.সা পড়ে তখন তিনি বিভাগীয় প্রধান। ডক্টর গুহর কথা উঠলে এখনো তার চোখেমুখে আলো জ্বলে ওঠে।

অলোকরঞ্জন পড়াতেন বাংলা সাহিত্য, আমাদের চেয়ে সামান্যই বড়ো ছিলেন। তাঁর ক্লাশে নোট নেব বলে খাতা পেনসিল বাগিয়ে তৈরি হয়ে থাকতাম, কিন্তু তিনি কথা বলতে আরম্ভ করলে লিখে নেবার কথা ভুলে গিয়ে শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হত। একজন মানুষ কী করে অমন শিল্পিত বাংলা বলে যেতে পারে ঘন্টার পর ঘন্টা? মুখের কথায় অমন তাৎক্ষণিক রূপসৃষ্টি করতে আর কাউকে কখনো দেখিনি। পরে দেখেছি শুধু পড়ানো নয়, ওটাই ছিল তাঁর স্বাভাবিক বাগ্‌ভঙ্গি। একটা শব্দকে মুচড়ে তার ভিতর থেকে অপ্রত্যাশিত ব্যঞ্জনা বের করে আনায় অলোকরঞ্জনের জুড়ি ছিল না। ফাঁকিবাজি করে লেখা আমার একটা টিউটরিয়েল খাতায় মন্তব্য লিখেছিলেন, 'শীর্ণ ও তথ্যবিবিক্ত রচনা।' একদিন ক্লাশের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একজনের সঙ্গে কথা বলছি, অলোকরঞ্জন পাশ দিয়ে ক্লাশে ঢুকে গেলেন। প্রায় পড়াতে পড়াতেই ঢুকতেন। আমি মিনিটদুই পরে ঢুকতে মিষ্টি করে জিগেস করলেন, 'জরুরি কথা ছিল বুঝি?' বললাম, 'না, খেজুরে আলাপ, কিন্তু ছাড়ছিল না—' অলোকরঞ্জন বললেন, 'ও, খর্জুরতর্জা?' 'অরণি' নামে পত্রিকা ছিল ছাত্রদের, সেবার আমার ওপর দায়িত্ব ছিল, কিন্তু কাগজ বেরোচ্ছিল না। অলোকরঞ্জন জিগেস করলেন দেরি হচ্ছে কেন। বললাম, 'কম্পোজ তো অনেক দিন হল হয়ে গেছে, কিন্তু—' 'কিন্তু কী? সেগুলো কি সব ডিকম্পোজ্‌ড হয়ে গেছে?' অলোকরঞ্জন বিদেশে চলে যাওয়ায় অনুভূতিপ্রবণ বাঙালি ছাত্রদের কত বড়ো ক্ষতি হয়ে গেছে ভাবা যায় না—মুখের কথাকে রসোজ্জ্বল শিল্পে রূপান্তরিত করার এই আশ্চর্য দৃষ্টান্তটি বছরের পর বছর ধরে চোখের সামনে বিদ্যমান থাকলে আজকের দিনের শিক্ষিত নাগরিক বাঙালির কথাবার্তায় গ্রাম্য স্থূলতার উপাদান আরেকটু কম হত সন্দেহ নেই—হয়তো বুদ্ধদেব বসুর মতো আর একটি বাগ্‌ভঙ্গিরই জন্ম দিতে পারতেন তিনি।

কিছুদিনের মধ্যেই নিয়মিত যাবার অধিকার পেয়ে গেলাম কবিতাভবনের আড্ডায়। গড়িয়াহাটের মোড় থেকে পশ্চিমদিকে (রাসবিহারী মোড়ের দিকে) একটুখানি হাঁটলেই

ডাইনে পড়বে রমণী চ্যাটার্জী স্ট্রিট, তার উলটো দিকে বাটার দোকান, ঠিক তার পরের বাড়িটার দোতলায় কবিতাভবন—তেতলায় থাকতেন অজিত দত্ত। ঠিকানা ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। সন্ধেবেলা সদর দরজা খোলাই থাকত, বড়ো জোর ভেজানো। রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকীর সময়ে যখন *যুগান্তর* ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁকে নিয়ে কেচ্ছা আরম্ভ হল তিনি প্যারিসের বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের মানহানি করেছেন বলে, অতর্কিতে গুন্ডামাস্তানের আগমন যখন আর সম্ভাব্যতার পরপারে নেই, তখন থেকেই দরজায় ছিটকিনি দেয়া আরম্ভ হল। সেই দরজা ঠেলে ঢুকলে একটা ছোট প্যাসেজ, বাঁদিকে দরজা দিয়ে ঢুকলে বুদ্ধদেব বসুর বসবার ঘর। মস্ত বড়ো ঘর, ১৬ বাই ১৮ হবে। চারপাশের দেয়াল বইয়ের আলমারিতে আচ্ছন্ন, সামনে শস্তা বেতের কয়েকখানা সোফা, কয়েকটি মোড়া। একখানা সিংল্ খাট, তাও প্রায় বইতেই ঢাকা, সেটি বুদ্ধদেবের শোবার জায়গা, ভিতরের অন্য ঘরটিতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রতিভা বসু থাকেন। উত্তরদিকে জানলার ধারে বুদ্ধদেবের কাগজেপত্রে স্তূপাকার হয়ে থাকা টেবিল।

প্রথম দুয়েকদিন গিয়েছিলাম ভয়ে ভয়ে, পুরোনো কোনো আড্ডাধারীর আড়ালে আড়ালে—হয়তো দীপক, হয়তো মানবের সঙ্গে, এখন আর মনে নেই। তারপর দেখলাম, গিয়ে দিব্যি চেয়ার দখল করে বসে পড়া যায়, বসলেই চা আসে, বুদ্ধদেবের হাসিতে প্রসন্ন প্রশ্রয় ফুটে থাকে। ভাবতে ইচ্ছে করত প্রশ্রয়টা বিশেষভাবে আমারই জন্যে—কিন্তু অচিরেই দেখলাম তা নয়, ছাত্র এবং ছাত্রোপম সকলের জন্যেই ওই হাসিটি তাঁর স্বভাব। এমনই তাঁর ধাতু যে প্রত্যেকেই ভাবত তার প্রতি ওঁর বিশেষ পক্ষপাত আছে। সাহিত্য এবং সম্পৃক্ত বিষয় ছাড়া আর কোনো বিষয়ে আলোচনা হত না। সমস্ত কথাবার্তা হাসি কৌতুক, এখন বুঝতে পারি, একটা অত্যন্ত উঁচু তারে টান করে বাঁধা থাকত; অথচ প্রবেশাধিকার অবারিত ছিল, বিশেষ করে সাহিত্যমনস্ক ও আধুনিকতায় দীক্ষিত তরুণদের। আধুনিকতা বলতে ঠিক কী বোঝায় তা ওই আঁসব্ল থেকেই অস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলাম, যা চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিজের জীবনযাপনে কাজে লেগেছে, এখনো লাগছে। জন্মসূত্রে পাওয়া ধারণাগুলিকে নিজের অর্জিত যুক্তি শিক্ষা বোধ ও অভিজ্ঞতা দিয়ে নিরন্তর যাচাই করে চলা—নিজের সংবেদনগুলিকে নতুনের প্রতি নিয়ত তীক্ষ্ণ ও উন্মুখ করে রাখা। কোনো বিশ্বাস, তা যতকালেরই যত্নলালিত হোক, ভুল বলে বুঝতে পারলে তাকে অকাতরে বিসর্জন দিতে পারার মানসিক ক্ষমতা অর্জন করা। সাহিত্য তো অবশ্যই বিষয়, কিন্তু আমি আমার ব্যক্তিগত বুদ্ধদেবের কাছে অন্তহীনভাবে কৃতজ্ঞ আছি আমার ভিতরে এই বোধ তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন বলে। স্পষ্ট করে যে এই ধরনের কথা কখনো তিনি বলেছিলেন তা নয়, কিন্তু তাঁর আচারে ব্যবহারে আধুনিকতার ধারণাটি এত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠত যে শিখে না নেয়া অসম্ভব ছিল। এতটাই বলা যায় যে নিজের পরিবারে জন্মেছিলাম, আর তাঁর কাছে পড়তে এসে দ্বিতীয় জন্ম হয়েছিল।

আচারে ব্যবহারে আধুনিকতার ধারণা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠা—একথা বলার পিছনে

আমার যে অভিপ্রায়, তাকে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। ধরা যাক, বুদ্ধদেবের খাদ্যাভ্যাস। তাঁর ছাত্ররা, বিশেষ করে যারা দূরে থাকত বা হস্টেলে থাকত, অনেক সময়েই আড্ডা দিতে এসে রাতের আহারটাও সেরে যেত তাঁর বাড়িতে। তারা সবাই জানত মাংস ছাড়া বুদ্ধদেবের নৈশাহার সুসম্পন্ন হয় না—এতটাই তিনি মাংসাশী ছিলেন যে মাছকে বলতেন নিরামিষ। সে সময় দেখেছি তাঁদের বাড়িতে প্রায় রোজই রাত্তিরে গোমাংস রান্না হত। তাঁর পুত্র পাপ্পার নিয়মিত কাজ ছিল (ফাজিল পাপ্পা বলত 'অ্যাসাইনমেন্ট') নিউমার্কেটের বিখ্যাত তালেবের দোকান থেকে আন্ডারকাট কিনে আনা। বাঙালি হিঁদুর ছেলে শখ করে নিজামে গিয়ে একাধদিন কাঠিকাবাব খায় হয়তো, কিন্তু মধ্যবিত্তের রক্ষণশীলতার দুর্ভেদ্যতম প্রতিরোধ তার হেঁশেলে গোমাংস ক'জন ঢোকাতে পারে জানি না—এখনো। একবার আমাদের এক সহপাঠী কুণ্ঠিতভাবে বলেছিল, 'মাংসটা নাহয় না খেলাম—'

সেই একবার যথার্থভাবে রাগতে দেখেছিলাম বুদ্ধদেবকে। 'কী? লেখাপড়া শিখে—বীফ খাবে না?' আমি চেয়ে দেখছিলাম তাঁর ফর্শা মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে, বৈপরীত্যে ঝকঝক করছে দক্ষিণ কপালের কালো জন্মদাগটা, অসংলগ্ন আঙুলে কপাল থেকে চুল সরাচ্ছেন। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে আমি মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিলাম, কী বলতে চেয়েছিলেন সেই দ্রষ্টা কবি যিনি উচ্চারণ করেছিলেন, 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'—তাই বিদ্যা, যা মুক্তি দেয়—মুক্তি দেয় চিন্তার জাড্য থেকে, জন্মসূত্রে পাওয়া সংস্কারসমূহের অন্ধ দাসত্ব থেকে।

আমার মা-বাবা তখনো বর্মায় থাকেন। সেখান থেকে আমার মাসোহারা আসে, তার থেকে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন এবং হস্টেলের প্রাপ্য চুকিয়ে দেবার কথা। হস্টেলের টাকা বাকি রাখা যায় না বলে সেটা নিয়মিত মিটিয়ে দিতাম, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনের কোনো তাগাদা ছিল না বলে ওটা আর দেয়া হয়ে উঠত না। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আমার পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড আটকে গেল। অরবিন্দ বিল্ডিং থেকে আমাকে চিঠি দিয়ে জানানো হল, অমুক তারিখের মধ্যে জরিমানা সমেত গত দশ মাসের বেতন মিটিয়ে না দিলে আমাকে পরীক্ষায় বসতে দেয়া হবে না—চিঠির কপি এল বুদ্ধদেবের কাছে, কপি গেল বর্মায় বাবার কাছে। জরিমানা সমেত বোধহয় দুশো তিরিশ টাকার মতন, কুড়ি টাকা করে মাইনে ছিল।

চিঠি পেয়ে বুদ্ধদেব আমাকে ডাকিয়ে এনে খুব খানিকটা চ্যাঁচামেচি করলেন। বললেন, 'তোমার বাবা চিঠিটা পেলে নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে টাকা পাঠিয়ে দেবেন, কিন্তু সে টাকা আসতে আসতে তো শেষ তারিখ পেরিয়ে যাবে—আমিই বা অত টাকা একসঙ্গে কোথায় পাই এখন? কী যে ছেলেমানুষি করো সব—এম.এ পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ—'

শেষ পর্যন্ত তিনিই জোগাড় করে দিয়েছিলেন টাকাটা, বাবার টাকা এসে পৌঁচেছিল অনেক পরে। তখন তিনি ওটা না দিয়ে দিলে আমার আর কখনো এম. এ পরীক্ষা

দেয়া হত কিনা সন্দেহ। কারণ পরের বছরই বর্মা জাতীয়করণ হল, রেঙ্গুন ব্যাঙ্কে বাবার অ্যাকাউন্ট আটকে দেয়া হল, দ্বিতীয়বার উদ্বাস্তু হয়ে বাবা-মা প্রায় একবস্ত্রে এসে কলকাতায় পৌছলেন, আমাকে অর্ধপ্রস্তুত অবস্থায় বেরোতে হল জীবিকার সন্ধানে।

কবিতাভবনের আড্ডার যেটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা হল, আলোচনার বিষয়বস্তু যতই গগনমার্গী হোক, আড্ডার মেজাজটা কিন্তু নষ্ট হত না কখনো, আলোচনাসভা হয়ে উঠত না। এখানকার আড্ডাধারীরাই অনেকে হয়তো এখান থেকে বেরিয়ে উলটো ফুটপাতের পানীয়ন রেস্টুরেন্টে বসে পরচর্চা ও রাজনীতির ফোয়ারা ছোটাতেন—সেটা দেখেছি, কিন্তু কবিতাভবনের আড্ডায় কারো পতন হতে দেখতাম না।

আমরা যখন গিয়েছি তখন কবিতাভবনের আড্ডার শেষ পর্যায় চলছে। বিখ্যাত আড্ডাধারীরা প্রায় সকলেই অদৃশ্য। সমর সেন, কামাক্ষীপ্রসাদ, ধূর্জটিপ্রসাদ, বিষ্ণু দে, অজিত দত্ত, অশোক মিত্র, এঁদের কখনো দেখিনি ওখানে। সুধীন্দ্রনাথ আসতেন, কলকাতায় থাকলে একটু বেশি রাত করে কখনো কখনো আসতেন অমিয় চক্রবর্তী। মাস্টারমশাইরা অনেকে আসতেন, আসতেন অরুণকুমার সরকার, 'আরো কবিতা পড়ুন' আন্দোলন যিনি আরম্ভ করেছিলেন, ধর্মতলা বা ডালহৌসির (বিবাদী বাগ নয়) ফুটপাতে বিকেল পাঁচটার ভিড়ে দাঁড়িয়ে যিনি উচ্চস্বরে জীবনানন্দের কবিতা পড়ে শোনাতেন। ঝকঝকে নাগরিক কবি অরুণকুমার সরকারকে আজকের তরুণ পাঠক চেনেন না, চিনলে লাভবান হতেন। প্রতিভা বসুকে নিবেদিত তাঁর "সিন্দুক নেই, স্বর্ণ আনিনি/এনেছি ভিক্ষালব্ধ ধান্য/ও-দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের/পাবো কি পরশ যৎসামান্য?" কিম্বা "লিখলুম বিচিত্রা দাশকে/বহুদিন দেখিনি আকাশকে", অথবা "মালবিকা হালদারের ইস্পাতের মতো দুটি কান", বা "বৃষ্টিভেজা বাড়ির মতো রহস্যময়/তোমার হাতে আছে আমার একটু সময়" আমাদের মুখে মুখে ফিরত তখন—লিখতে গিয়ে তাঁর অনেকগুলি পঙ্‌ক্তি আজও দেখছি পরপর মনে এসে গেল।

নিয়মিত আসতেন ছাত্ররা, ও তখনকার আরো কোনো কোনো তরুণ ও নাতিতরুণ কবি। বুদ্ধদেব সন্ধেবেলা কোথাও বেরোতেন না। তাঁর বাড়িতেই আড্ডা বসেছে চিরকাল—সে তিনি যখন নাইন-টেনে পড়েন, ৪৭নং পুরানা পল্টনের টিনের ঘরে থাকেন সেই সময় থেকেই—তিনি অন্য কোথাও গিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন এটা ভাবা যেত না। এমনকী সুধীন্দ্রনাথের বাড়িতেও খুব বেশি গেছেন বলে মনে হয় না। সুধীন্দ্রই আসতেন—কখনো একা, কখনো রাজেশ্বরীকে নিয়ে। অসামান্য ভদ্রতা ও সাদর সম্ভাষণের আড়ালে একটি প্রচ্ছন্ন অহংবোধ বুদ্ধদেবকে সকলের চেয়ে আলাদা করে রাখত। *পরিচয়*-এর আড্ডার গোষ্ঠীপতি হিশেবে সুধীন্দ্রনাথের যে মুগ্ধ বর্ণনা তিনি দিয়েছেন নিজের বাড়ির আড্ডায় সেই ভূমিকা তিনি কখনো গ্রহণ করেননি। তাঁর উচ্চহাসির কথা তো অনেকেই লিখেছেন—নাকি গড়িয়াহাটের মোড় থেকে তাঁর হাসি শোনা যেত—কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর স্বাতন্ত্র্য অনুভব না করে পারা যেত না।

এমন কখনো দেখিনি যে সন্ধে হয়ে গেছে, কিন্তু কবিতাভবন আড্ডাপায়ীদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত নয়। ভিড়ের মধ্যে থেকেও নিজস্ব মতে জীবনযাপনের কৌশলগুলি ওখান থেকে একটু একটু শিখে নিয়েছিলাম।

তুলনামূলক সাহিত্যের অনেক ছাত্রের কাছেই তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা ও কবিতাভবনের আড্ডা, একটা অন্যটার পরিপূরক ছিল। তুলনামূলক সাহিত্যচর্চার একটা বিশেষ চরিত্র তখন গড়ে উঠেছিল, যেটাকে প্রায় একটা আন্দোলন বলা যায়—বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে বুদ্ধদেবকে অকালে বিভাগ থেকে বিদায় নিতে না হলে সেটা হয়তো পুরোপুরিই আন্দোলনের আকার নিতে পারত। তবু, তার সেই অপরিণত চরিত্রের প্রভাবই গত চল্লিশ বছরের বাংলা সাহিত্যে, এবং সাহিত্যের পঠনপাঠনের পদ্ধতিতে, বেশ স্পষ্টভাবেই পড়েছে—তার হোতা ছিলেন বুদ্ধদেব বসুই। যাদবপুরে এই অধ্যাপককুলকে তিনিই একত্র করেছিলেন, এম. এ পদবিহীন সুধীন্দ্রনাথকে তিনিই বিশ্ববিদ্যালয়িক অচলায়তনের সঙ্গে লড়াই করে বৃত করেছিলেন এম. এ ক্লাশের অধ্যাপক পদে—এ রকম ঘটনা সম্ভবত সেই একবারই ঘটেছিল বাঙালির বিশ্ববিদ্যালয়িক বিদ্যাচর্চার ইতিহাসে। তিনিই পাঠক্রম নির্বাচন করেছিলেন, পড়ানোর পদ্ধতি স্থির করেছিলেন। বুদ্ধদেবের ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই তখন বিভাগে অমন খোলা হাওয়া আসাযাওয়া করত, যে খোলা হাওয়ার বর্ণনা দেবার চেষ্টা করলাম খানিকটা। অধ্যাপকের বক্তৃতাকে অপৌরুষেয় বলে মেনে না নিয়ে নিজের নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী স্বাধীন চিন্তার চর্চা করতে তিনিই ছাত্রদের সাহস জুগিয়েছিলেন। আর এই হাওয়াটা বয়ে এসেছিল কবিতাভবনের ওই আড্ডা থেকেই—শুধু অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে নয়, বেঁচে থাকার প্রত্যেকটি পুরোভূমিতে। প্রথম দিকের বিখ্যাত ছাত্রেরা অনেকেই, কবিতাভবন থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই তু.সা পড়তে এসেছিলেন। কবিতাভবন বলতেই মনে পড়ে হাস্যোজ্জ্বল, হালকা কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত, প্রখরভাবে অনুভূতিশীল একটা চাল, একটা ঘরানা—যেটা বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হয়ে গেছে।

কমপ্যারেটিভ লিট্রেচারের ডিগ্রি আমার ব্যবহারিক জীবনে কোনো কাজে লাগেনি। এম. এ পদবিটা কাজে লেগেছে হয়তো, কিন্তু সেটা ইসলামিক হিস্ট্রি অথবা কমপ্যারেটিভ ফিললজি হলেও কিছু যেত আসত না। বাণিজ্যিক জগতে কর্মজীবন কাটালাম, সেখানকার মূল্যবোধ একেবারে আলাদা। কিন্তু তার ভিতরে নিমজ্জিত থেকেও জীবনে পৃথক একটা নিজস্বতার কুলুঙ্গি বজায় রাখতে পেরেছি, বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি কবিতার প্রতি ভালোবাসা, সাহিত্যের প্রতি সম্মানবোধ, মানুষের সঙ্গে মানুষের মতো আচরণের মূল্য। দেশপ্রেম ধর্মমত রাজনীতি এসব বাদ দিয়েও যে বেঁচে থাকা যায়; এমনকী, এগুলোকে বর্জন করতে পারলে তবেই যে বেঁচে থাকা ব্যাপারটাকে অর্থময় করে তোলা সম্ভব, কমপ্যারেটিভ লিট্রেচার পড়তে না এলে এই বোধ হয়তো চিরজীবন আমর অধরা থেকে যেত।

তবে, এখানে একটা কথা এই সঙ্গেই যোগ করে রাখা দরকার। প্রথম যৌবনে,

অর্থাৎ উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে বুদ্ধদেব বসুর দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হবার ফলে আমার নিজের জীবনে বেশ বড়ো ধরনের কিছু দৃষ্টিভঙ্গিগত সংকটেরও উদ্ভব হয়েছিল। বেঁচে থাকার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আমার আমার দৃষ্টিভঙ্গি যে এক হতে পারে না এটা বুঝতে আমার অনেককাল সময় লেগে যায়। বুদ্ধদেব ছিলেন, যাকে বলা যায় খাঁটি অর্থে গজদন্তমিনারের অধিবাসী মানুষ, সাহিত্য ছাড়া কিছুই বুঝতেন না, প্রতিভা বসু লিখেছেন সুটকেসে চাবি পর্যন্ত নিজে লাগাতে পারতেন না। ছেলেমেয়েরা কে কোন ক্লাশে পড়ে জানতেন না। এবং তিনি নিজেই এক জায়গায় লিখেছেন, একজন ভালো মানুষ, আর একজন বিদগ্ধ মানুষ, এই দুজনের মধ্যে তিনি বিদগ্ধ মানুষটিকেই পছন্দ করবেন সঙ্গী হিশেবে। মানতেই হবে, পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গেলে, সাধারণ মানুষ হয়েও সার্থকভাবে বেঁচে থাকতে গেলে এই জীবনদর্শন পদে পদে বিঘ্ন ঘটাবে। আমার জীবনদর্শনের মূল ধাঁচটা পেয়েছিলাম আমার বাবার কাছে, যিনি প্রায় যে কোনো বিষয়ের অন্তত অআকখটুকু জানতেন, বা জেনে নিতে চেষ্টা করতেন। তিনি রান্না করতে পারতেন, কাঠের কাজ জানতেন, চাষ করতে পারতেন, নিজে হাতে বাড়ি বানিয়ে বাস করেছেন নেফায়, ওই উচ্চতার ঠান্ডায় তাঁর ডিজাইন করা একটি বিশেষ ধরনের বাংলো এখনো অরুণাচলের উত্তর দিকটায় 'ডাঃ-সেন-টাইপ বাংলো' নামে পরিচিত। তাঁর সংগ্রহের করাত প্লায়ার্স র‍্যাঁদা আর শিরিষকাগজের সঞ্চয় নষ্ট করে করেই আমার যন্ত্রপাতির কাজে হাতেখড়ি হয়েছে। আবার রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল, বিয়ের পর মাকে প্রথম উপহার দিয়েছিলেন বিলেত থেকে বাঁধিয়ে আনা সঞ্চয়িতা। কিন্তু এই দুই বিপরীতধর্মী দর্শনের মধ্যে আমাকে হাবুডুবু খেতে হয়েছে অনেকদিন। আমি সাহিত্য ভালোবাসি, কিন্তু নিজে সৃষ্টিশীল সাহিত্যচর্চা করি না, বা করতে পারি না। আমি পছন্দ করি জ্যাকবৃত্তি। এ কথাটা বুদ্ধি দিয়ে ভালো করে বুঝতে আমার বহু বছর লেগেছে যে সাহিত্যপ্রেম জীবনের মূল ভিত্তি হলেও, রান্না করা বা বই বাঁধানো বা জুতো সারানো জাতীয় হাতের কাজগুলোকে কোনোমতেই অশ্রদ্ধেয় বা করবার অযোগ্য বলে বিবেচনা করা যায় না। বর্নার্ড শ'র একটা চমৎকার কথা আছে—তাকেই বলা যায় খাঁটি ইন্টেলেকচুয়াল যে কোনো হাতের কাজ জানে না।

যা কিছু আমার বেঁচে থাকার সঙ্গে সম্পৃক্ত তাই আমার সশ্রদ্ধ মনোযোগের যোগ্য। কিন্তু বু.ব'র প্রভাবে বহুদিন পর্যন্ত আমি ছিলুম বিশুদ্ধ স্নব। যত ভালো কথাই কেউ বলুক, সেটা ভালো উচ্চারণে বলা না হলে সেটা আমি মন দিয়ে শোনবার যোগ্য বলে ভাবতে পারতুম না, হাস্যকর বলে মনে হত। একটি বিদেশী শব্দ বাংলায় ঠিকমতো লিখতে গেলে—অর্থাৎ সেটা যে দেশের শব্দ সেই দেশে যেভাবে উচ্চারণ করে ঠিক সেইভাবে—কী বানানে লিখতে হবে তা নিয়ে বুদ্ধদেব বহু সময় ব্যয় করতেন, এমনকী বিদেশী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণের জন্যে তিনি নতুন দুটি অক্ষরও উদ্ভাবন করেছিলেন, অনেকের মনে থাকতে পারে—'জ' আর 'জ'। চলেনি অক্ষরদুটো, বু.ব ছাড়া আর কেউই ব্যবহার করেনি কখনো। এই ব্যায়ামটাকে আজ আমার অর্থহীন

বলে মনে হয়। বিদেশীরা কি বাংলা শব্দ যথাযথ উচ্চারণ করবার জন্যে যত্ন নেয়, বা যে কোনো বিদেশী ভাষার শব্দ? কোনো ভাষাতেই মানুষের গলার আওয়াজের সবগুলো স্বর বা ব্যঞ্জনবর্ণ ঠিকমতো উচ্চারিত হয় না, সবাই বিদেশী শব্দ নিজের ভাষায় ব্যবহার্য স্বরব্যঞ্জনের সাহায্যেই লিখে থাকে ও উচ্চারণ করে থাকে। সেটাই স্বাভাবিক, সেটাই হওয়া উচিত। 'শেক্ষপীর' বা 'মোক্ষমূলর' লিখতে আমার তো ভালোই লাগে, যুক্তিসংগত বলে মনে হয়। বিদেশী ভাষা আমরা যত ভালো করেই শিখি, ঠিকঠিক তাদের মতো উচ্চারণ করতে কখনোই আমরা পারব না—কেউই পারে না পৃথিবীতে, এবং তা নিয়ে উদ্বেজিত হবারও কোনো প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু দেখতেন। যৌবনকালে আয়ত্ত হওয়া এই ভূমি থেকে সরে আসতে আমার অনেক সময় লেগেছিল।

স্ববিরোধও ছিল তাঁর মধ্যে। আমেরিকা যে কত বড়ো মিক্সপট তা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, ইংরেজি সবাই বলে, কিন্তু সকলেরই উচ্চারণে তাদের নিজের নিজের ভাষার প্রভাব থেকে গেছে—উদাহরণ হিশেবে উল্লেখ করেছেন একজন জার্মান পণ্ডিতের কথা, তিনি তিরিশ বছর আমেরিকায় আছেন কিন্তু এখনো 'ফান্ডামেন্টল'কে 'ফুন্ডামেন্টল' বলেন—সেখনে কিন্তু তিনি কোনো দোষ দেখতে পাননি। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা রুমি যখন আমেরিকায় বিয়ে করল, তিনি সব শুনে মন্তব্য করেছিলেন, সবই ভালো কিন্তু ওই 'ঘোষ' পদবিটা বড্ডো খারাপ শুনতে। নিজে কিন্তু ইংরেজিতে নিজের নাম 'বসু' লিখতেন না, Bose লিখতেন।

বুদ্ধদেবকে রক্ষা করেছিল সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী হিশেবে তাঁর গগনচুম্বী অহংকার। কিন্তু আমার তো সে অহংকার নেই, কোনো রকম অহংকার করবারই যোগ্যতা নেই। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যে আমার দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে না, এটা প্রথম দিকে বুঝতে পারিনি। তাঁর ছিল নিজস্ব চাল, আমাকে রপ্ত করতে হবে জনতার চলন—একলষেঁড়ে হবার যোগ্যতা আমার নেই। তাঁর দ্বারা প্রভাবিত অনেক যুবকই এই কথাটা সারা জীবনে বুঝতে পারেননি, তাঁরাই 'বৌদ্ধ' নামে পরিচিত ও উপহসিত হয়েছেন পরে। নিজেরা কষ্ট পেয়েছেন সেজন্যে, আর উপহাসের মশলা জুগিয়েছেন ব্যঙ্গপ্রিয় বাঙালিকে। ভাগ্যকে ধন্যবাদ যে আমি খুব তাড়াতাড়ি সেই প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম—নিজেকে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলাম পথচলতি জনতার সঙ্গে।

এম. এ পাশ করলাম ১৯৬০ সালে, মস্ত বড়ো পার্চমেন্ট কাগজে ছাপা সার্টিফিকেটটি হাতে করে একদিন ফুটপাতে দাঁড়ালাম এসে। প্রথম পর্ব শেষ হয়ে গেল। এইবার সত্যিকার বেঁচে থাকার আরম্ভ, না কী? না আরেকটা অধ্যায়? যে মেয়েটিকে দেখলে বুকের রক্ত ছলছল করে উঠত সে পড়াশোনা বন্ধ করে ফিরে গেছে বহুদূর মফস্‌সলে। মাঝে মাঝে রেজেস্ট্রি করে চিঠি পাঠাই তাকে, 'অ্যাক্‌নলেজমেন্ট ডিউ' করে; উত্তর আসে না, তবে অ্যাক্‌নলেজমেন্ট স্লিপটা ফিরে আসে, তাতে তার চেনা হাতের সই থাকে। তার থেকে বুঝতে পারি সে বেঁচে আছে। আর, মুমূর্ষুর নাড়ির মতো ক্ষীণ

একটু আশাও ওই সঙ্গে আছে কি? যতই ভুল বোঝাবুঝি হোক, উত্তর না দিক, অন্তত চিঠিগুলো তো সে নেয় পিয়নের হাত থেকে, ফেরত তো পাঠায় না!

কৃত্তিবাস পত্রিকা বেরোবার পেছনে যেসব প্রেরণা কাজ করেছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল নতুন ধরনে কবিতা লেখবার প্রয়াস। সেই নতুন কবিতার আদর্শের অনেকটাই এসেছিল আধুনিক ইয়োরোপীয় কবিতার আদর্শ থেকে, সিম্বলিস্ট এবং ইমেজিস্ট কবিতার প্রেরণা থেকে—যার স্বাদ ইংরেজি ধরনের রোমান্টিকতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

বাংলায় অনিংরেজ ইয়োরোপীয় কবিতা অনুবাদের ঐতিহ্য বহুকালের পুরোনো। তরুণ বয়সে ফরাশি জর্মান কবিতার অনুবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—তা ছাড়াও অজস্র ইয়োরোপীয় কবিতার অনুবাদ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, তাঁর পরের প্রজন্মের সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এম.এ পড়বার সময় থেকেই ইয়োরোপীয় কবিতা অনুবাদ করতে আরম্ভ করেছেন, সেসব কবিতা দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশিত হয়েছে *পরিচয়*-এ *সাহিত্যপত্র*-তে *কবিতা*-য়, অনুবাদ করেছেন বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু। কিন্তু সদর্থে যাকে প্রভাব বলা যায়, তা শুধুমাত্র কতগুলো চিত্রকল্প অথবা বাগ্‌ধারার যান্ত্রিক ব্যবহার তো নয়; মূল্যবোধের রূপান্তরণ, ভাবনার সংক্রাম, যেভাবে ভাবতে অভ্যস্ত তার থেকে অন্যরকম করে ভাববার চেষ্টা করা, কবিতার শরীরনির্মাণে নিজস্ব পদ্ধতি প্রস্তুত করবার প্রবণতা এই আরম্ভ হল। এর পূর্বে একমাত্র জীবনানন্দ ছাড়া এভাবে কেউ ভাবেননি কবিতায়, এবং তাঁর বিরুদ্ধে পান-খাওয়া দাঁতের যে অট্টহাসি তাঁর জীবৎকাল ভরেই শোনা গেছে তার মূলে ছিল তাঁর কাব্যিক আদর্শের সঙ্গে বাংলা কবিতার আদর্শের অপরিচয়, শুধু অপরিচয় নয় সংঘাত। প্রথাগত ভাবে যা সুন্দর সেই নারী বা নিসর্গ বা মনোভাবের মুগ্ধ বর্ণনা ছাড়াও যে কবিতার অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে সে সম্পর্কে সচেতনতা সাধারণভাবে বাঙালি কবি ও কবিতাপাঠকদের মধ্যে এই সময় থেকেই আরম্ভ হল, যার একটা প্রমাণ এই হতে পারে যে জীবনানন্দের কবিতা জনপ্রিয় হতে আরম্ভ হল এই পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে। বুদ্ধদেব বসুর উৎসাহে ডি.কে গুপ্ত সিগনেট প্রেস থেকে *বনলতা সেন* প্রকাশ করেন ১৯৫২ সালে, এই বছর নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলনে এই বছরের শ্রেষ্ঠ কাব্য বলে পুরস্কৃত হয় বইটি। জীবনানন্দের জনপ্রিয়তার আরম্ভ এই সময় থেকে।

শিক্ষিত বাঙালির সাহিত্যিক মানসভুবনে ইংরেজ কবিদের যতখানি স্থান, অনিংরেজ কবিদের তার সহস্রাংশও ছিল না। শিক্ষাক্রম যা ছিল তাতে পরিচয়ের সুযোগও তেমন ছিল না। তা ছাড়া কবিতার অনুবাদের প্রতি তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিও ফরাশি জর্মান রুশ কবিতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল আমাদের। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে যেমন, অনুবাদ কবিতার ক্ষেত্রেও তেমনই প্রখরভাবে স্ববিরোধময়। নিজে অনুবাদে ফরাশি জর্মান কবিতা পড়েছেন অজস্র, নিজের কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করে ভুবনবিখ্যাত হয়েছেন, কিন্তু অনুবাদের উপযোগিতা সম্পর্কে কখনো কথা

বলতে গেলেই বক্রোক্তি করেছেন, অনুবাদ কবিতার ব্যবহারযোগ্যতা ও কার্যকারিতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। গোয়ালারা মরা বাছুরের চামড়া মোড়া মূর্তি গোরুর সামনে ধরে দিয়ে তাকে দোহন করে, তার সঙ্গে অনুবাদ কবিতার নিষ্ঠুর তুলনা করেছেন—বলেছেন, 'তার আহ্বান নেই ছলনা আছে।' কবিতার অনুবাদ বিষয়ে এই সপত্নীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে, এবং ইংরেজ আমাদের ইংরেজি কবিতা ছাড়া আর কোনো ইয়োরোপীয় কবিতার সন্ধান দেয়নি বলে, দীর্ঘকাল ধরে অনিংরেজ কবিতা বাঙালি পাঠকের সীরিয়াস মনোযোগের বাইরে ছিল। বুদ্ধদেব বসুই প্রথম জোর দিয়ে এই কথাটা বললেন যে একটি দুটির বেশি বিদেশী ভাষা আমরা সাধারণতই শিখতে পারি না, অথচ অন্য ভাষার কবিতা পড়ার তৃষ্ণাটাও আমাদের থেকেই যায়, সুতরাং অনুবাদ ছাড়া গতি নেই। তিনিই প্রথম আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে এটাও দেখালেন যে, বেশির ভাগ ভারতীয় পাঠক অনুবাদেরই রামায়ণ মহাভারত পড়ে, প্রায় সমস্ত খৃষ্টান অনুবাদেই বাইবেল পড়ে—এবং পড়ে নিজের আত্মিক ও নান্দনিক প্রয়োজনে তাকে কাজেও লাগাতে পারে—সুতরাং আধুনিক কবিতাও অনুবাদে পড়ে উপকৃত না হবার কোনো কারণ নেই—এবং সেখানেই থেমে থাকলেন না, তাঁর গুণমুগ্ধ বন্ধু তখনকার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবির এবং পশ্চিমবঙ্গের ডি.পি.আই ধীরেন্দ্রমোহন সেন মহাশয়ের প্রত্যয় উৎপাদন করে সাহিত্যপাঠের জন্যে এমন একটি বিভাগের সৃষ্টি করলেন যার মূল দর্শনটাই অনুবাদের যৌক্তিকতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। নিজে আশ্চর্য অনুবাদ করে বাঙালি পাঠকের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন বোদলেয়ার ও রিলকে-র কবিতা, কলকাতার বইয়ের বাজারে এসে পৌঁছতে আরম্ভ করল ইয়োরোপীয় সাহিত্যের রাশি রাশি পেপারব্যাক, ছাত্রছাত্রীদের হাতে হাতে ঘুরতে আরম্ভ করল র‍্যাঁবো ভালেরি ভের্লেন মালার্মে হ্যেল্ডারলিন পাস্তেরনাখের কবিতা, কাফকা কামু টোমাস মান-এর উপন্যাস। বাংলার বাউল ও ইটালির ত্রুবাদূরদের মতো দেশে ও কালে আলাদা, পরস্পরের অস্তিত্ব বিষয়েই অচেতন কবিরাও কী রকম একই ধরনে কাব্য রচনা করতে পারেন তা নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করলেন তুলনামূলক সাহিত্যের সদ্য পাশ করা তরুণগণ। ক্রমে বাংলায় এই মত প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করল যে সাহিত্য ব্যাপারটা ভাষা থেকে ভাষায় আলাদা আলাদা করা কোনো বিষয় নয়, বস্তুত বিশ্বসাহিত্য বৈচিত্র্যে বহুধাজটিল হয়েও সারত এক, ও অবিভাজ্য।

তুলনামূলক সাহিত্যের আন্দোলন অকালে থেমে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও কূটনীতিতে বিরক্ত ও হতাশ বুদ্ধদেব চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিদেশে পড়তে চলে গেছেন। তারপর রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর সময় বুদ্ধদেব প্যারিসে বক্তৃতা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের অপমান করেছেন, নানা অর্থে ভয়ংকর এই রটনা কলকাতার সাংস্কৃতিক গোষ্পদে বিশাল তুফান তুলে দিল। পত্রিকাগুলিতে খনখন করে বাজতে লাগল বুদ্ধিজিহ্ব বাঙালির কেচ্ছানিপুণ করতাল, বুদ্ধদেবের বাড়িতে ইটপাটকেল পড়তে আরম্ভ করল, তাঁর ছেলেমেয়েদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিরাপদে বাড়িতে ফিরে আসা নিয়ে সংশয়

দেখা দিতে আরম্ভ হল। বুদ্ধদেব এমনিতেই নিঃসঙ্গ ধরনের মানুষ ছিলেন, এই ঘটনার পরে আরো গুটিয়ে গেলেন, যেটুকু উৎসাহ তাঁর চাকরি ছাড়বার পরেও তু.সা সম্পর্কে অবশিষ্ট ছিল তা লুপ্ত হয়ে গেল। তু.সা বিভাগ ক্রমে ক্রমে সীমিত হয়ে পড়তে লাগল একটা ঘনসংবদ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে; ফলে যেখানে ছিল জীবন্ত স্টাইল, সেখানে জন্ম নিতে লাগল বদ্ধ ম্যানারিজ্ম্। এসব ঘটনার পশ্চাতের কলকাঠি যাঁরা নেড়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই এখনো কলকাতার ইন্টেলেকচুয়াল সমাজের তরঙ্গশীর্ষে বিচরণ করেন, নাম করলে সবাই চিনবেন।

যদি বুদ্ধদেবকে অকালে বিভাগ থেকে বিদায় নিতে না হত, তাহলে তুলনামূলক সাহিত্য হয়তো সত্যিসত্যিই একটা আন্দোলনে পরিণত হতে পারত। তা হয়নি। কিন্তু না হলেও, আজ বাংলায় তুলনামূলক আলোচনা সাহিত্যপাঠের অবশ্যপালনীয় পন্থা হিশেবে চিহ্নিত হয়েছে, বিশুদ্ধ বাংলা সাহিত্য পড়তে গেলেও অন্য দেশের সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করে পড়তে হয়—১৯৫৫ সালে এই ধারণাটা অকল্পনীয় ছিল। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়দের চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরের নিরলস চেষ্টার ফলে আজ অতিতরুণ কবিও সাহিত্যের বৈশ্বিকতা বিষয়ে সচেতন, তিনি কেবল বাঙালি কবি হতে চান না বিশ্বের কবিও হতে চান, হতে গিয়ে হয়তো বাড়াবাড়িও হয়ে যায় কোথাও কোথাও, তবু তাঁর এই হতে চাওয়াটা সত্যি। দুই প্রজন্ম আগে বাংলা কবিতায় এই ছাপটা ছিল না। আজকের দিনে যিনি বাংলায় কবিতা লেখেন তাঁর কবিতা ভালো অথবা খারাপ হতে পারে, কিন্তু তা নেহাৎই বাঙালির কবিতা নয়, তা সারা বিশ্বের মূল সাহিত্যস্রোতের অংশভাক্—এই চলমানতায় বাংলা কবিতাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু, তাঁর *কবিতা* পত্রিকায়—আর তার প্রথম স্বাধীন প্রকাশ দেখা গেল *কৃত্তিবাস*-এ—এবং সমসাময়িক *শতভিষা* ও অন্য দুয়েকটি পত্রিকায়। সম্পাদকীয় চরিত্রে পার্থক্য থাকলেও এরা একই আন্দোলনের সহযাত্রী।

গীন্সবার্গ কলকাতায় আসে ১৯৬১ সালের শেষ দিকে, কলকাতা ছেড়ে চলে যায় ১৯৬৩ সালের প্রথম দিকে। তার সঙ্গে আসে তার 'স্ত্রী' পিটার অর্লভস্কি, এবং তখনকার দিনের কুখ্যাত রাসায়নিক মাদক এল-এস-ডি (লাইসার্জিক অ্যাসিড ডাই-ইথালামাইড)।

এরা আসবার আগে পর্যন্ত *কৃত্তিবাস*-এর দলটা ছিল, যাকে বলা যায় শৌখিন বখাটে। একটু আধটু দিশি মদ খাওয়া, একটু আধটু এদিক ওদিক যাওয়া এই আর কী—কলকাতা শহরের পত্তনকাল থেকে বাবুদের ছেলেরা যৌবনে পৌঁছে যেসব মিহি বদমায়েশি করে আসছে তার সঙ্গে তার চরিত্রের খুব বেশি পার্থক্য ছিল না। কিন্তু সত্যিকারের নিচুতলায় পৌঁছতে হবে, 'ডিক্লাসড্' হতে হবে, হতে হবে 'মহারোগী, মহাদুর্জন, পরম নারকীয়', যদি সত্যি সত্যি কবিতা লিখতে হয়—একমাত্র তাহলেই পাওয়া যাবে নীরক্ত মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিরলম্বভাবে বেঁচে থাকার প্রেরণার সন্ধান—এই ধারণাটা গীন্সবার্গই প্রথম সঞ্চার করে *কৃত্তিবাস*-এর

কবিদের মধ্যে, তাদের মাথার মধ্যে ভরে দেয় উন্মার্গগামিতার দর্শনতত্ত্ব। ও-ই কলেজ স্ট্রিটের কবিছোকরাদের জন্যে আবিষ্কার করে দেয় টেরিটিবাজারের চীনেপাড়া—যা, ভৌগোলিকভাবে কফিহাউস থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হলেও এর আগে কৃত্তিবাসীদের কাছে সম্পূর্ণ অন্য গ্রহের জগৎ ছিল। ওখানকার পোহে-র ঠেকও ওরই আবিষ্কার—পোহে মানে ঘরে চোলাই করা চীনে দিশি মদ। দূর থেকে দেখে এই চীনেপাড়া নিয়ে প্রচুর অকারণ রোমান্টিকতা বাংলা কবিতায় *কৃত্তিবাস*-এর অনেক আগে থাকতেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, সেটা এসেছিল মূলত অপরিচয় থেকে। সমর সেন যে লিখেছিলেন, "রিকশায় ক্লান্ত চীনে গণিকা যখন চোখ বোজে", তা লিখেছিলেন না জেনে, সম্পূর্ণ আন্দাজে। কলকাতায় কখনোই চীনে গণিকা ছিল না, অন্তত অচৈনিকদের জন্যে ছিল না। তিনি সম্ভবত খাসিয়া মেয়ে দেখে চীনে বলে রোমান্টিক ভুল করেছিলেন, ওই বৃত্তিতে খাসিয়া মেয়ে কলকাতায় অনেক আছে।

তখন ওখানে পোদ্দার কোর্ট ছিল না, হসপিটাল স্ট্রিটের সঙ্গে চিৎপুর হয়ে বিবাদী বাগের যোগাযোগকারী চওড়া রাস্তাটা ছিল না, একটা সরু গলিমাত্র ছিল—তার উত্তরদিকে সমান্তরাল কলুটোলার ফলপট্টির রাস্তা আজও যেমন আছে। ছোট ছোট চীনে খাবারের দোকান ছিল অনেক—ছিল 'র‍্যাভিয়োলি', ছিল 'টু সিস্টার্স', যেখানে সত্যি সত্যি দুই চীনে বোন ব্যাবসাটা চালাত, খাবারের অর্ডার দিলে যতক্ষণ খাবার রান্না হচ্ছে তার মধ্যে জেসমিন টী আসত সবার জন্যে, ফ্রি, হালকা সবুজাভ চা, তার উপর ভাসছে দুটি টাটকা জুঁইফুল। ছিল তার সমস্ত রহস্যময় বৈভব নিয়ে নির্জন নানকিং রেস্তরাঁ, তার সামনে দাঁড়িয়ে রোজ সন্ধেবেলা এক অন্ধ অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বৃদ্ধ গিটার বাজাত, তার কোমরের সঙ্গে সরু শেকল দিয়ে বাঁধা থাকত মস্ত একটা গোল্ডেন রিট্রিভার। সমস্ত অঞ্চলটা ছিল দরিদ্র, আলোআঁধারি ও অলিগলিময়, পুলিশের খাতায় অপরাধপ্রবণ এলাকা বলে চিহ্নিত। ব্যোমকেশ বক্সীকে নিয়ে শরদিন্দুর প্রথম গল্প 'সত্যান্বেষী'র এটাই ছিল অকুস্থল, সেটা অবশ্যি তিরিশের দশকের কথা।

এখানকার একটা বাইলেনে রশিদ বলে একজন লোকের সঙ্গে কমলা বলে একটি উত্তরপ্রদেশীয় মহিলা বাস করত। কমলা দিনের বেলায় মেডিক্যাল কলেজের সামনে আপেলটাপেল বিক্রি করত, রাত্রে ব্যাবসা করত পোহে-র। ওদের খাপরার চালের বস্তিবাড়ির সামনে একটা দু'খুপরি ইউরিনাল ছিল, তার নিচে সিমেন্টে গর্ত করে তার মধ্যে অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচিতে মালটা রাখা থাকত—ঢাকা দেয়াই থাকত অবশ্যি। চিহ্ন ছিল, ইউরিনালের ওপরে বসা শেকলে বাঁধা ছোট্ট একটা রূপী বাঁদর। বাঁদরটা থাকলে সব ঠিক আছে, নির্ভয়ে যাওয়া যেত। বাঁদরটা না থাকার মানে ছিল বিপদ, খোঁচড়টোচড় আছে কাছাকাছি। জীবনানন্দের শেষ পর্বের কবিতায় এই পাড়ার বর্ণনা অনেক আছে। ব্ল্যাকবার্ন লেন আর নতুন রাস্তার সংযোগস্থলে, যেখানে এখন পাহাড়ের মতো টাল দেয়া খালি পিপের গাদা, সেখান থেকে রাস্তা পার হয়ে, ওপারে লরির আড্ডার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে, হরিণবাড়ি লেনের নুনমাখানো কাঁচা চামড়ার গুদানের

পাশ দিয়ে কমলার *ঠেকে* পৌঁছতে হত, শর্টকাট করতে হত একটা হতদরিদ্র গণিকাপল্লির মাঝখান দিয়ে—এমনই শস্তা যে মনে হয় ভিখিরিরাও সেখানে যেতে পারে। অন্যান্য পল্লি থেকে বাতিল হতে হতে নিজে ভিখিরি হয়ে যাবার আগে একটি হালভাঙা পালছেঁড়া মেয়ে যেখানে গিয়ে পৌঁছয়। আমি নিজের চোখে দেখেছি সেখানে চটের দরজার সামনে যেসব মেয়ে গলিতে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে একটি অন্ধ মেয়েকে—বসন্ত হয়ে চোখদুটো গলে গেছে তার, মুখখানা কদর্য হয়ে গেছে, কিন্তু তারও খদ্দের জোটে নিশ্চয়ই।

একদিন অনেক রাত—বারোটা সাড়ে বারোটা হবে। কমলার ওখান থেকে পোহে খেয়ে আমরা চার-পাঁচজন ফিরছিলাম। যেখান থেকে উত্তরমুখো ছাতাওয়ালা গলিটা ঢুকে গেছে, উল্টোদিকের ফুটপাত দিয়ে সেই মুখটা পর্যন্ত এসে একটা চীনে লন্ড্রির সামনে আমরা ফুটপাতে বসে পড়লাম, কারো আর চলবার ক্ষমতা নেই। শ্যামবাজার কিম্বা গড়িয়াহাটে সন্ধে সাতটায় যেমন, তেমনি ঝলমল করছে রাস্তাঘাট, দোকানপাট সব খোলা, লোকচলাচল করছে অজস্র, রাস্তার ওপারে দেখতে পাচ্ছি একটা দোকানে চৌকো লাল দাড়িওলা মাথাকামানো ঘাড়েগর্দানে একাকার একটা লোক বলিষ্ঠ ঘর্মাক্ত হাতে মোটা মোটা রুটি সেঁকে তুলছে। সামনে দিয়ে যে যাচ্ছে তাকেই আমরা ডেকে বলছি দোকানটা থেকে একটু রুটিমাংস এনে দিতে, দারুণ খিদে পেয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই, কিন্তু কেউই আমাদের আবেদনে কর্ণপাত করছে না, যদিও স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকেই দেখছে আমাদের। আমরা ওপাড়ার লোক নই সেটা স্পষ্ট। খানিক পর ও ফুটপাত থেকে রাস্তা পার হয়ে একটা টিংটিঙে ছেলে এল, তার পরনে ময়লা চৌখুপি লুঙ্গি আর কালো স্যান্ডো গেঞ্জি। এসে বলল, দিন পৈসা দিন, এনে দিচ্ছি। শংকর তাকে একটা পাঁচটাকার নোট দিল, পাঁচটাকায় তখন মুসলমান দোকানে কুড়ি জনের ভরপেট খাওয়া হত, এনামেলের পিরিচে দুটো করে তন্দুরি রুটির সঙ্গে বড়ো বড়ো চারটুকরো গোমাংস, তার সঙ্গে যত চাই তত লাল টকটকে ঝোল। নোটটা নিয়ে ছেলেটা খুব শান্ত পায়ে রাস্তা পার হয়ে ওপারের ছাতাওয়ালা গলির মধ্যে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, আমরা বসে বসে দেখলাম। পোহে-র বিশেষত্বই ছিল, হাতপা অসাড় হয়ে যেত, কিন্তু মাথাটা সেই তুলনায় সাফ থাকত। চীনেরা কোনোকালেই মাথার বিকারকে প্রশ্রয় দেয় না।

এই গপ্পোটা থেকে একটা তত্ত্বকথার আলোচনা উঠে পড়ে। সেটা এই, *কৃত্তিবাস*-এর কবিরা বোহেমিয়ান বলে তাদের একটা খ্যাতি বা অখ্যাতি আছে—তবে কথাটায় রোমান্টিক খ্যাতির, তাদের দিকে ছাঁপোষা মধ্যবিত্ত বাঙালির সবিস্ময় চেয়ে থাকার একটা ভঙ্গি ধরা পড়ে, ধরা পড়ে অসুস্থ শিল্পীর প্রতি গৃহস্থের ঈর্ষা। ব্যাপারটার মধ্যে সত্যি কতখানি?

বোহেমিয়ানিজ্‌ম বস্তুটা কোনো প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক বা দার্শনিক তত্ত্ব নয়, লোকমুখে প্রচলিত একটা অনচ্ছ ধারণামাত্র। সহস্রাধিক পৃষ্ঠার *পেঙ্গুয়িন ডিকশনারি অব লিটেরারি*

টার্মস-এ শব্দটা নেই, ইংলন্ডের ওয়র্ডসওয়র্থ রেফারেন্স লাইব্রেরির *ডিকশনারি অভ বিলীফস অ্যান্ড রিলিজিয়নস*, বা মস্কো থেকে প্রকাশিত *ডিকশনারি অভ ফিলসফি*-তেও শব্দটি নেই। তবে চেম্বার্স অভিধানে 'বোহেমিয়ান' শব্দের অর্থ দেয়া আছে : A person of loose or irregular habits; an artist or man of letters, or indeed anyone, who sets social conventionalities aside। শব্দটির মূল নির্ণয় করা আছে এইভাবে : Fr. *bohemien*, a gypsy, from the false belief that these wanderers came from *Bohemia.*

সকলেই জানেন, আধুনিক চেকোস্লোভাকিয়ারই পুরোনো নাম বোহেমিয়া। ভ্রাম্যমাণ জিপসি জাতি, যারা কৃষিভিত্তিক সভ্যতার স্থিতিশীলতাকে মেনে না নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, তারা বোহেমিয়া থেকে এসেছে এই ধারণা এককালে পণ্ডিতেরা পোষণ করতেন। ধারণাটা পরে ভুল বলে প্রমাণিত হলেও তার আলঙ্কারিক অনুষঙ্গগুলি থেকে গেছে। বোহেমিয়ান শব্দের ব্যঞ্জনা দাঁড়িয়ে গেছে, যে কোনো মানুষ যে সমাজের চলিত নিয়মগুলি অস্বীকার করে—সবচেয়ে বড়ো কথা, যে কোথাও ঘর বাঁধে না, অথবা ঘর যাকে বাঁধতে পারে না। স্থায়িত্ব যার কাছে স্থাণুত্বের নামান্তর।

এই ব্যঞ্জনা মেনে নিলে *কৃত্তিবাস*-এর দলে একজনই মাত্র খাঁটি বোহেমিয়ান ধরা পড়ে—সে *কৃত্তিবাস*-এর মূল পরিকল্পক ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, তার নাম দীপক মজুমদার। আর সবাই কালক্রমে ঘর বেঁধেছে, আশ্রয় নিয়েছে মধ্যবিত্ত স্থিতিশীলতার আরামদায়ক ও নিরাপদ অন্তরালে, এমনকী শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমাত্র, ব্যতিক্রম নয়। সেও শেষ পর্যন্ত নিজেকে ছুঁড়ে দিয়েছে একটা কালো গাড়ি থেকে অন্য একটা কালো গাড়ির মধ্যে। দীপকই একমাত্র যে চিরকাল জপ করে গেছে হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, নিজের জীবনটাকেই মশাল করে জ্বালিয়ে নিয়ে তার কম্পমান আলোয় রাস্তা খুঁজে বেড়িয়েছে—মধ্যবিত্ত অর্থে সফলতা সার্থকতার দাবি তার কারো চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। যাঁরা তাকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন তাঁরা জানেন, দীপক তার সমস্ত জীবন দিয়ে মধ্যবিত্ত স্থিতিশীলতাকে শুধু অস্বীকার নয়, তাচ্ছিল্য করে গেছে। রাজনীতি করে জেল খেটেছে ইশকুলে থাকতেই। তিনবার সে বিবাহ করেছিল, একবারও টেঁকেনি—তার ছন্নছাড়া উদাসীন ভালোবাসাকে ধারণ করতে পারে এমন নারীর দেখা সে পায়নি। ডি. কে. গুপ্তর মতো ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে সে *কৃত্তিবাস*-এর প্রকাশকে সম্ভব করেছিল। তুলনামূলক সাহিত্যে এম. এ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে সে ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে আমেরিকায় গিয়েছিল, সেখানকার ছাত্র-রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার ফলে তাকে আমেরিকা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়, সে গিয়ে আস্তানা বাঁধে গ্রীসে, সেখানে ইশকুলের ছাত্রদের ইংরেজি পড়িয়ে সে জীবিকানির্বাহ করত। প্রায়োগিক নাটকের চর্চা করেছে হাবিব তনভীরের সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে, গ্রোটভ্স্কির সঙ্গে পোল্যান্ডে; বারংবার ইরাক আফগানিস্থান পাকিস্থানের মধ্যে দিয়ে স্থলপথে যাতায়াত করেছে ইয়োরোপ থেকে ভারত। জোগাড়যন্ত্র করে বিদেশের নিমন্ত্রণ

সংগ্রহ করে, বিনেপয়সায় বিমানে ভ্রমণের সংস্কৃতিমন্থর পদ্ধতি ছিল না দীপকের, সে ঘুরে বেড়াত সম্পূর্ণ নিজের অন্তরের তাড়নায়; পয়সা বাঁচিয়ে, শস্তার বাসে, কখনো হিচহাইক করে, পয়সা ফুরিয়ে গেলে কোথাও দু'মাস থেকে গিয়ে একটা কাজ করে পুনরায় কিছু পয়সা জোগাড় করে দীপক বজায় রাখত তার যাযাবরবৃত্তি, তার চারিত্রিক বিশুদ্ধতা। যাত্রার শেষে তার জন্য অপেক্ষা করে থাকত না বিলাসী হোটেল ও বিদগ্ধ সেমিনার, দীপকের পথ সাময়িকভাবে ফুরোত এসে নোংরা সরাইখানায়, আরামহীন ইয়ুথ হস্টেলে, পাখতুন বন্ধুর কাঠের বাড়িতে। তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগের সম্মানিত অধ্যাপকের নিশ্চিন্ত জীবিকা তাকে বেঁধে রাখতে পারেনি, শেষ পর্যন্ত উঞ্ছবৃত্তি করতে করতে তুচ্ছ মৃত্যু ঘটেছে তার, তার মতো অস্থির মানুষের তাই বোধহয় নিয়তি। হাসপাতালে সে তার শেষ কথা বলেছিল হিরণ মিত্রকে : 'কাল রাত দেড়টার সময়ে বাড়ি আছেন তো, হিরণ? আমি যাব।' কোনো বাঙালি মধ্যবিত্ত অতিবড়ো দুঃস্বপ্নেও এই বাক্যটি রচনা করতে পারত না।

তরুণরা অনেকেই দীপক মজুমদারকে ভালো করে চেনেন না। চন্দননগরের *দাহপত্র* পত্রিকাগোষ্ঠী দীপকের ওপর সাড়ে সাতশো পৃষ্ঠার বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন, না হলে দীপকের কোনো চিহ্ন কোথাও থাকত না। এই সংখ্যাটি পাঠ করলে আমাদের প্রজন্মের আশ্চর্যতম এই ব্যক্তিত্বটি সম্পর্কে, তার জীবন, লেখা, মানসিক গঠন ও তার সেই অনুপম চেহারা সম্পর্কে (কারণ দীপকের বেশ কিছু ছবিও আছে এতে—তবে তার গান তো নেই, আর গান বাদ দিলে দীপকের একটা মস্ত বড়ো অংশ বাদ পড়ে যায়) অন্তত একটা আবছা ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব তাঁদের পক্ষে, যাঁরা মানুষটাকে দেখেননি। *কৃত্তিবাস*-এর দলে বোহেমিয়ান, বাউণ্ডুলে, উড়নচণ্ডী বলতে তাঁরা জানেন শক্তিকে—তার উদ্ধত ও তির্যক পরিহাসবোধ, নিজের স্বার্থের অপরিমেয় ক্ষতি করেও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তার রুখে দাঁড়ানোর ধারাবাহিক ইতিহাস, তার তৃপ্তিহীন পানাসক্তি, মোড়ের মাথা থেকে সিগারেট কিনে আনতে গিয়ে তিনমাস পর বাড়ি ফেরা—এসব বিষয়ে অপরিমিত গল্প শুনে শুনে সেই রকম ধারণাই মোটামুটি জনমানসে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। অথচ আমি একটু আগে বলেছি, শক্তি খাঁটি বোহেমিয়ান নয়, প্রতিবাদী চরিত্র মাত্র, খাঁটি বোহেমিয়ান বলতে একমাত্র দীপকই ছিল *কৃত্তিবাস*-এর দলে। সুতরাং এই মন্তব্যের ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

সে ব্যাখ্যা দিতে গেলে শক্তির 'সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়' নামক অতিবিখ্যাত কবিতাটির অন্দরমহলে একটু প্রবেশ করা দরকার।

কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল *কৃত্তিবাস* ২২-এ, তার প্রকাশের তারিখ দেয়া আছে ১৯৬৬, মাসের উল্লেখ নেই। পুজোর সময়ে বেরিয়েছিল, এই সম্ভাবনাই বেশি। আর মনে রাখতে হবে, শক্তির বিবাহের তারিখ—প্রথমে ওরা রেজেস্ট্রি করে গোপনে বিয়ে করে ১৯৬৭ সালের ১৫ অগস্ট, আর সেই বিয়ের প্রকাশ্য শাস্ত্রীয় চেহারা দেয়া হয়

সেই বছরেরই ৪ অক্টোবর, মহালয়ার দিন। শাস্ত্রীয় চেহারা বলতে সম্প্রদান হয়নি—তবে সপ্তপদীগমন ও চতুর্থী হোম হয়েছিল। বিয়ের সময় শক্তির বয়স ৩৪। 'সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়' *সোনার মাছি খুন করেছি*র কবিতা। একটি সাক্ষাৎকারে শক্তি বলেছে, ' "সোনার মাছি খুন করেছি" প্রকৃতপক্ষে মীনাক্ষীর সঙ্গে আলাপের সময়ে লেখা।'

কিন্তু এত কাণ্ড করে যে বিয়ে, তার মাত্র কয়েক মাস আগে এসব কী লিখেছে সে? কেউ অপেক্ষা করে আছে, হাতে তার মাকড়সার সোনালি ফাঁস—মালা, তোমাকে পরিয়ে দেবে, তোমার বিবাহ মধ্যরাতে, যখন ফুটপাত বদল হয়, আর পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিবাহের পরিচিত কল্যাণচিহ্নগুলি সব কেমন করে যেন মৃত্যুর প্রতীক হয়ে উঠছে। মালা হয়ে যাচ্ছে সোনালি ফাঁস, শিশুর কাঁধে মড়ার পালকি ছুটেছে নিমতলা—মড়া কি পালকি করে যায় নাকি, পালকি তো থাকে নববধূর! আর পালকি বয়ে নিয়ে চলেছে শিশুরা, বাসরঘরের নাচ নাচছে বুড়োরা—মৃত্যু আর বিবাহের অর্থবিপর্যাস ঘটে গেছে এই অদ্ভুত কবিতায়। সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়. তখনই পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়ালে, কার্নিশে কার্নিশ, ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে। এখানে পরিষ্কার দুজন শক্তিকে অনুভব করতে পারি আমরা—একজন শক্তি সম্মোহিতের মতো বিবাহমঞ্চের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে, আরেকজন শক্তি দূরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দ আর্তনাদে তাকে ফিরে আসতে বলছে। তার এক কান ধরে টানছে গেরস্তবাড়ির চিরাচরিত ক্ষুদ্র সুখের হাতছানি, অন্য কান ধরে টানছে তার বল্গাহীন চিন্তাহীন ভবিষ্যৎহীন নিরঙ্কুশ বর্তমান দিয়ে গড়া জীবন। জড় ও অজড় ডায়ালেকটিক আমাদের দুই কান ধরে টানে বলে বেঁচে থাকি, শক্তি চট্টোপাধ্যায় নামক এই কবিকে কোন ক্ষমতা বেশি জোরে টেনে নিজের কোটে ধরে রাখবে? এই দ্বিধা থেকে কবিতাটির জন্ম। আমরা জানি শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল তার, কোনদিকে যেতে কোনদিকে চলে গিয়েছিল সে। খাঁটি বাউন্ডুলে হবার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেনি শক্তি, আত্মসমর্পণ করেছিল ভবিতব্যের কাছে। এড়িয়ে গিয়েছিল যে, এড়িয়ে থাকতে পেরেছিল যে, তার নাম দীপক মজুমদার।

আশ্চর্য শুকনো অরোমান্টিক কিন্তু ব্যঞ্জনাঋদ্ধ কবিতা লিখত দীপক, সেসব কবিতা বই করে বের করতে সে কখনো উৎসাহিত হয়নি। বাংলায় অন্যতম খাঁটি অ্যাবসার্ড নাটক তার 'বেদানার কুকুর ও অমল' *কৃত্তিবাস*-এর পৃষ্ঠায় আবদ্ধ হয়ে আছে। তার একটিমাত্র বই, চটি বই, মধ্যপ্রাচ্যে তার ভ্রমণের বৃত্তান্ত, *দেশ* পত্রিকায় ধারাবাহিক বেরোত, ১৯৮৯ সালে ছেপে বেরিয়েছিল, কলকাতা থেকে কনস্তান্তিনোপ্‌ল, এখন আর পাওয়া যায় কিনা জানি না। সেখানে তার বিশ্বনাগরিক চরিত্রটি ধরা পড়ে—যে মানুষ দেশ মানে না, ধর্ম মানে না, রাজনীতি মানে না—এইমাত্র মানে যে এগুলো জীবন থেকে বর্জন করতে পারলে তবেই একটা অর্থময় জীবন গড়ে

তোলা সম্ভব। মানুষে মানুষে কোনোরকম ভেদাভেদ মানে না, কোনো সামাজিক সম্পর্ক মানে না, শুধু বন্ধুতা মানে, শুধুমাত্র প্রেম মানে। ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছাড়া কোনোরকম সামাজিক সম্পর্ককে স্বীকার করে না—আমি বাঙালি বলেই যে আরেকজন বাঙালির সঙ্গে আমার সাযুজ্য বেশি হবে বা আমি হিন্দু বলে আরেকজন হিন্দুর সঙ্গে , বা আমার চামড়ার রং বাদামি বলে আরেকজন বাদামি চামড়ার মানুষের সঙ্গে, এই ধরনের সরলীকরণ দীপকের কাছে শুধু অর্থহীন নয় বিরক্তিকর ছিল, ওর বইটি পড়লে সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। আর তার মতো রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে আমি আমার জীবনে কাউকে শুনিনি; বহুদিন আগে সায়েন্স কলেজে একটা অনুষ্ঠানে দীপকের গলায় 'ও চাঁদ চোখের জলে' শুনে অমিয়া ঠাকুর বলেছিলেন, 'তোমার গান শুনে কতদিন পরে দিনদার গলা মনে পড়ল।' শান্তিদেব-সাগরময়ের ভাগ্নে দীপক সা-রে-গা-মা জানত না।

প্রতিষ্ঠার বছরখানেকের মধ্যে *কৃত্তিবাস*-এর সঙ্গে দীপকের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। তারপরও লিখেছে *কৃত্তিবাস*-এ, কিন্তু সম্পাদনা বা অন্য কোনো দায়িত্বে জড়িয়ে থাকেনি আর। *কৃত্তিবাস*-গোষ্ঠীর বানিয়ে তোলা বোহেমীয়বৃত্তির সময়সীমা মোটামুটি ১৯৬০-৬১ থেকে, অর্থাৎ গীন্সবার্গ যখন কলকতায় এসে পৌঁছল তখন থেকে শুরু করে ১৯৬৭ পর্যন্ত এই পাঁচ বা ছ'বছর—তারপর তারা একে একে বিবাহ করে সংসারে থিতু হতে আরম্ভ করল। *কৃত্তিবাস*-এর কবিরা যখন খুঁজে বেড়াচ্ছে ইউনিভার্সিটির কাগজপত্র বাঁধা রেখে যে কোনো রকম একটা চাকরি, চাইছে কবিতাও থাক চাকরিটাও থাক, দীপক তখন কবিতার পালা শেষ করে চলে গেছে বাউলগানের জগতে, নাটকের জগতে, অক্ষরবর্জিত নান্দনিক যোগাযোগের জগতে। তার পরিচালনায় আমরা এক বছর ধরে মহলা দিয়েছিলাম *বিসর্জন* নাটকের—সেই মহলা বাংলা নাটকের ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে আছে, কখনো মঞ্চস্থ হয়েছিল কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর।

এমন কথা বলতে চাইছি না যে *কৃত্তিবাস*-এর কবিরা যা করতে চেয়েছিল তার মধ্যে কোনো ফাঁকি আছে, বা সেটা কিছুমাত্র অশ্রদ্ধেয়। আমরা সাধারণ মানুষেরা সব সময় সেটাই চেয়ে থাকি, তার মধ্যে দোষের কিছু নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে ব্যাপারটাকে তার নিজের আলোতে দেখাই যথার্থ দেখা, তার উপরে বোহেমিয়ানিজ্ম বা এই জাতীয় কোনো রঙিন আলো ফেলে দেখাটা কোনো কাজের কথা নয়। শেষ পর্যন্ত তো কবিতাই থাকে, কবির জীবন তো থাকে না। বোহেমীয়বৃত্তি যে মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বা অধিকতর সফল এমন কোনো ইঙ্গিতও আমি দেবার চেষ্টা করছি না, কারণ ব্যাপারটা আদপে তা নয় বলেই আমার বিশ্বাস। আমি কেবল তথ্য হিশেবেই এটা বলতে চাচ্ছি যে যাকে বোহেমিয়ান বলা হয় *কৃত্তিবাস*-এর কবিরা আদৌ তা ছিলেন না, আপাদমস্তক মধ্যবিত্তই ছিলেন। একমাত্র দীপক মজুমদার ছাড়া।

এই কথাটা স্পষ্ট করে বোঝবার দরকার আছে। আজকের দিনের তরুণ কবিদের মধ্যে *কৃত্তিবাস* গোষ্ঠী বিষয়ে একটি রোমান্টিক ধারণা আছে; তাঁরা মনে করেন

কৃত্তিবাস গোষ্ঠী ছিল কয়েকজন বাধাবন্ধহারা, কাব্যোন্মাদ, প্রতিবাদময় নবযুবকের একটি দল, পৃথিবীটাকে যারা ভেঙে নতুন করে গড়তে চেয়েছিল—তার জন্যে প্রয়োজন হলে নিজেকে আহুতি দিতেও তাদের কোনো আপত্তি ছিল না। তাদের কোনো পিছুটান ছিল না, বন্ধন ছিল না, সংস্কার ছিল না। নিজেদের রক্তমাংস আহার করে বিশুদ্ধ কবিতার জন্ম দিতে চেয়েছিল তারা। ধারণাটা একেবারেই ভুল। তারা ছিল অন্য সব নিরীহ বাঙালি যুবকের মতোই। সকলেই চাকরি খুঁজত, কেরিয়ার তৈরির চেষ্টা করত, সমর সেনের ভাষায় 'পুরুষাঙ্গ বাঁধা দিয়ে'ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করেছে কেউ কেউ। ক্রমে প্রায় সকলেই মাঝারি থেকে ভালোর দিকে চাকরি পেতেও লাগল, প্রেম করে বা সম্বন্ধ করেও বিয়ে করে সংসারের আরামে থিতু হয়ে বসার বাসনা ছিল গোপনে গোপনে প্রায় সকলেরই। সেই যে শরৎ লিখেছিল না *কৃত্তিবাস*-এ, মধ্যরাত্রে কলকাতা শাসন করত যে চারজন যুবক, শাসন করা শেষ হলে তারপর তারা কী করত?

একজনের কাঠি নিয়ে আরেকজন লক্ষবার নিবন্ত সিগ্রেট
ধরিয়েছি, তোমার *ঠোঁটের* কোণ থেকে বমি মুছিয়েছি
নিজের রুমালে লক্ষবার....

তারপর হাহাকার, বন্ধুপত্নীদের উদ্দেশে :

আমাদের আড্ডা বেশ জমে উঠেছিল
রেলিং কাঁপানো তর্ক, ফুটপাত-কাঁপানো অট্টহাসি
অনেক দিনের চেনা একগুচ্ছ মুখ।
তোমরা কে, কাদের ঝিউড়ি?
পাখির মতন টুপ করে এসে তারে বসলে অলক্ষ্যে কখন
তারপর
একজন বন্ধুর হাত ধরে উড়ে গেলে রাস্তা পার।

কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর মানসিকতা এই সব পঙ্‌ক্তিতে খুব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। গীন্সবার্গকে *কৃত্তিবাস*-গোষ্ঠীর অন্তর্গত বলে ধরা উচিত কিনা জানি না, যদিও *কৃত্তিবাস*-এর বহুপ্রসিদ্ধ ও ছদ্ম-রোমান্টিকতাময় অনিকেত দার্শনিকতা বৃহদংশে তারই নেতৃত্বে সাময়িকভাবে গড়ে উঠেছিল—'নেতৃত্বে' শব্দটাতে কারো কারো আপত্তি থাকলে তার বদলে 'অনুপ্রেরণায়' বলা যেতে পারে—তা ছাড়া ছিল দীপক ও শক্তি। শক্তির কথা তো সকলেই জানেন। এই রকম দু'তিনজন ছাড়া আর সকলেই ছিল যাকে ঘোড়ার পরিভাষায় বলা যায় 'অল্‌সো র‍্যান'। আর সকলেই যতটা *কৃত্তিবাস*-এ ছিলেন ততটাই সংসারেও ছিলেন, পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় ক্ষয় দীপক আর অংশত শক্তি ছাড়া আর কেউ করেনি। বেশিরভাগ কৃত্তিবাসীই মনে মনে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের কাদায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন, তাঁদের দ্রোহ স্ফূর্তি পেত কেবলমাত্র অপর্যাপ্ত

সীধুসেবনে ও অবিদ্যার চর্চায়। সোনাগাছি অঞ্চলে নন্দরানীর ফ্ল্যাট নামে একটি বাড়ি ছিল, সেখানে যাওয়া হত দল বেঁধে। সে বাড়িতে শক্তির নাম ছিল সিঁড়িবাবু—কারণ শক্তি কারো ঘরে যেত না, একটা পাঁইট নিয়ে সিঁড়িতে বসে বন্ধুদের জন্যে অপেক্ষা করত, নারীসঙ্গে অনাসক্তি ছাড়াও ওর বেশ একটু ফাইমোসিসের সমস্যাও ছিল বলে পরে ওর কাছেই জেনেছিলাম। একজন ওখানে নিজের নাম বলে আসত রমাপদ চৌধুরী। সেকালে মস্কো থেকে যেসব বই আসত তার মধ্যে ছিল চার ভলুমের *ডাস কাপিটাল*, অসাধারণ ছাপা বাঁধাই কিন্তু পুরো সেটটার দাম পড়ত আনা আষ্টেক মাত্র—তাই কিনে সঙ্গে নিয়ে দীপক একবার গিয়েছিল, আসার সময় মূল্য হিশেবে নাকি বইগুলো রেখে এসেছিল। তবে এটা গল্পও হতে পারে।

একটা সময়ে মাঝে মাঝে ক্যানিং যাওয়া হত দল বেঁধে—কয়েকবারই যাওয়া হয়েছে, একটা প্যাটার্নে পড়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা। কৃত্তিবাসীদের কবিতাতিরিক্ত ক্রিয়াকলাপের একটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই ক্যানিং ভ্রমণ। একদিনের কথা বলি, আমি ওই একবারই গিয়েছিলাম।

সন্ধেবেলা কফিহাউসে ঢুকেই একটা অন্যরকম কিছু অনুভব করলাম। চাপা একটা ষড়যন্ত্রের আবহাওয়া যেন। কৃত্তিবাসের টেবিলে গিয়ে বসে দেখি সবাই যেন একটু অতিরিক্ত গম্ভীর, চুপচাপ। একটু পরে টাইপরা শরৎ মুখ নামিয়ে নিচুগলায় প্রশ্ন করে, 'আজ একটু ক্যানিঙের দিকে যাবার মতলব—আছেন নাকি?'

—খরচা কেমন?

—দশটাকা করে ধরা হয়েছে

—আমার কাছে গুটিছয়েক আছে

—ওতেই হয়ে যাবে। দিয়ে দিন।

সবাই জানত, বাকিটা বড়ো চাকুরে শরৎ পুরিয়ে দেবে। সেই ফাঁক দিয়ে অবাঞ্ছিত লোক জুটে না পড়ে, তাই ফিশফাশে কাজ সারতে হয়।

কফিহাউস বন্ধ হবার পর বেরোনো গেল। দশবারোজন যুবক, তার মধ্যে শক্তি আর বেলাল। সুনীল বোধহয় তখন বিদেশে। সম্পাদক শরৎই দলনেতা, সে ততক্ষণে টাইটা খুলে পকেটে রেখেছে, তা ছাড়া ওর প্যান্টের ক্রিজ ও জুতোর পালিশ অনিন্দ্য।

প্রথমেই বৈঠকখানা বাজারে গিয়ে মাটির কলসি কেনা হল একটা। সেটার অর্ধেকমতো দিশি মদ দিয়ে ভর্তি করা হল, বাকিটা জল। মাটির ভাঁড় নিয়ে নেয়া হল এক ঠোঙা। তখনো পলিথিন আসেনি।

শেষ ক্যানিং লোকাল শেয়ালদা সাউথ থেকে ছাড়ত রাত সাড়ে দশটা নাগাদ। তখনো কয়লায় চলা ট্রেন। ছোট একটা কামরা দেখে সবাই মিলে উঠে পড়ে ভেতর থেকে দরজা লক করে দেয়া হল।

কলসিটা বেলালের কাছে—বেলালই বারটেন্ডার। ট্রেনের মেঝেয় আসনপিঁড়ি হয়ে বসে, কোলের কাছে কলসিটা নিয়ে সবাইকে পরিবেশন করতে আরম্ভ করল শেয়ালদা

ছাড়ার পর থেকে। একটু পরেই শক্তি সমস্ত কাপড়জামা খুলে ফেলল। সম্পূর্ণ নাঙ্গা হয়ে, বজ্রাসনে বসে অসম্ভব সুরেলা উদাত্ত ভারি গলায় গান ধরল—"নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও...' কালো কুচকুচে চাপদাড়িতে মুখের নিচের দিকটা ঢাকা, চোখে চশমা, তা ছাড়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ, একের পর এক ভারি ভারি ব্রহ্মসংগীত গেয়ে চলল শক্তি। "কার মিলন চাও বিরহী—"

অল্প একটু খেয়ে নিয়ে শক্তি যখন গান গাইত, রবীন্দ্রনাথের গান, তখন একটা অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটত ওর চোখে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। কফিহাউসের দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে ওর একটা ছবি তুলেছিলাম, সম্ভবত ১৯৬০ সালে, আমার তখনকার আইসোলেট থ্রি-তে। ছবিটাতে ওর ব্যক্তিত্ব আশ্চর্যরকম ফুটেছিল, পরে ওর শত শত ছবি উঠেছে, কিন্তু ওর অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব ওই ছবিটায় যেমন ফুটেছিল তেমন আর কোনো ছবিতে কখনো দেখিনি। নিজের তোলা ছবি বলে বলছি না, কারণ ওতে আমার কৃতিত্ব কিছুমাত্র ছিল না, হঠাৎই এসে গেছে। আমি তুলতে চেয়েছিলাম শক্তি নামক মানুষটির ছবি—যা এসে গেছে তা হল শক্তির ব্যক্তিত্বের ছবি। এককেটা ছবিতে কদাচিৎ যা ঘটে যায়, তাতে ফটোগ্রাফারের কোনো হাত থাকে না। একই সঙ্গে বদমাইশি ও উদাসীনতা মেশানো একটা দৃষ্টি—কৌতুক ও করুণার আশ্চর্য একটা সংমিশ্রণ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত শক্তির জীবনীগ্রন্থটিতে ছবিটি ব্যবহৃত হয়েছে, পাঠক ইচ্ছে করলে সেখানে দেখে নিতে পারেন।

বৈঠকখানা বাজারে কলসি ভরবার সময়ই সবাই বেশ খানিকটা করে চড়িয়ে নিয়েছিল। তারপর ট্রেনে ওঠবার পর থেকে দরাজভাবে চলছে বেলালের পরিবেশনায়। ঘন্টা দেড়েক পর থেকেই এক এক করে শুয়ে পড়তে লাগল অনেকে। রাত দেড়টা নাগাদ ট্রেন যখন ক্যানিং গিয়ে পৌঁছল, জনা পাঁচ-ছয়ের বেশি ট্রেন থেকে নামতেই পারল না। আমরা যারা তখনো সক্ষম ছিলাম নেমে পড়লাম। ওদের জন্যে চিন্তা নেই—ভোরবেলায় এই ট্রেনখানাই কলকাতায় ফিরে যাবে।

ক্যানিং শহরটা—অন্তত তখন পর্যন্ত ছিল—পুরোপুরি রাতের শহর। দিনের বেলা গেলে দেখা যাবে সব ঝিমন্ত, দোকানপাট বন্ধ, রাস্তায় লোকজন বেশি নেই। সন্ধে থেকে বাজারটাজার খুলতে আরম্ভ করত। মাঝরাত্তির থেকে ভোররাত্তির পর্যন্ত ক্যানিং থেকে দুটো তিনটে ট্রেন ভর্তি করে কলকাতায় এসে পৌঁছত দক্ষিণবঙ্গের মাছ, দুধ, তরিতরকারি, গ্রামাঞ্চল থেকে তার জোগান এসে ক্যানিঙে পৌঁছতে আরম্ভ করত বিকেল থেকে। নিজের চোখে দেখেছি, ডিঙি নৌকোর খোল দুধে ভর্তি, তার মধ্যেই হাজাসুদ্ধ পা ডুবিয়ে বসে বৈঠা বাইছে প্রৌঢ় মাঝি, উছলে যাতে না ওঠে সেজন্য দুধের ওপরে খেজুরপাতা বা গোলপাতা ফেলা। হাজাটা আমার আন্দাজ অবশ্যি, কিন্তু খুব ভুল আন্দাজ নয়, মাঝির পায়ে হাজা থাকবেই।

রাত দুটোর সময় আমরা গিয়ে যখন পৌঁছলুম তখন দুপুরবেলাকার ডালহৌসিপাড়ার মতো গমগম করছে ক্যানিং বাজার। নেমে, প্রথম কাজই হল মদ জোগাড় করা—

কলসিটা ট্রেনেই ফুরিয়ে গেছে, সেটা নিয়ে আর ভার বাড়ানো হয়নি। কোথায় কী পাওয়া যায়, কয়েকবার গিয়ে গিয়ে সকলেরই জানা হয়ে গিয়েছিল। ওখানে আর দিশি নয়, চুল্লু। দিশি আর চুল্লুর তফাত সকলেই জানেন আশা করি। দিশিটা যত খারাপই হোক লাইসেন্স প্রাপ্ত, আর চুল্লু হল লুকিয়েচুরিয়ে চোলাই করা। শস্তায় বানানো এবং তাড়াতাড়িতে সারবার জন্য নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ তাতে মেশানো হয়, নিশাদল ইত্যাদি তার কোনো কোনোটা বেশ বিষাক্ত দ্রব্য, বেশি পরিমাণে পেটে গেলে মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়, অন্ধটন্ধ তো অনেকেই হয়ে যায়। স্বাদের কোনো প্রশ্নই নেই, কত দ্রুত এবং কত শস্তায় কী পরিমাণ নেশা হতে পারে তাই একমাত্র বিবেচ্য, জ্বলতে জ্বলতে গলা দিয়ে নামে। এসব জায়গায় নির্ভর করতে হয় প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতার গুডউইলের ওপর। ক্যানিঙের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ঠেকটি খুঁজে বের করেছিল সম্ভবত বেলালই, এসব কাজে ওর একটা অস্বাভাবিক কুশলতা ছিল, প্রায় অলৌকিক। ঠিক ক্যানিং থানার সামনে, রাস্তার উল্টো দিকে। বাইরে একটা সাইকেল সারানোর দোকান, ভেতরে ঝাঁপ ফেলে মাদুরে শুয়ে থাকেন নধরকান্তি একটি প্রৌঢ়া মহিলা, শাড়ির ভেতর দিয়ে তাঁর সারা অঙ্গে সাইকেলের টিউব জড়ানো, টিউবের ভিতরে তীব্র ধান্যেশ্বরী। টিউবের মুখটি তাঁর বিশাল বক্ষোদেশের ঠিক মাঝখানে। ঝাঁপের বাইরে একটি তেরো চোদ্দ বছরের ছেলে ঘুমোয়, খদ্দের এসে তাকেই ডেকে তোলে। খদ্দেরের প্রয়োজন জেনে নিয়ে সে চটের পর্দা তুলে ঘুমজড়ানো গলায় ডাকে, 'মাসি, ও মাসি—তিন গেলাশ—'

মাসিও ঘুমচোখেই একটু কাত হয়ে, বাঁ হাতে গেলাশটি বুকের কাছে নিয়ে, ডান হাতে টিউবের মুখটি ধরে একটু টিপ দেন—চ্চির্‌রররর শব্দ করে গেলাশ ভরে ওঠে। দৃশ্যটি দেখলে স্তনদায়িনী মাতৃমূর্তি মনে না এসে পারে না। মাল ও দামের আদানপ্রসান হয় বালকটির হাত দিয়ে। ফুটপাতের চায়ের দোকানের গেলাশ যেমন হয় সেই সাইজের গেলাশ—এক গেলাশের দাম চার আনা। ক্যানিঙেরই অন্য সর্বত্র চোদ্দ পয়সা গেলাশ, কিন্তু মাসির দোকানের মালের খুব নাম, তাছাড়া 'পুলুশের হাংনামা মোটে লেইকো'—তাই দামটা সামান্য একটু বেশি।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাসির দোকানের কাজটা সেরে নিয়ে আমরা রাস্তায় নামি। বৃষ্টি হয়ে গেছে খানিক আগে—রাস্তায় থকথক করছে কাদা। ঘন্টাখানেক উদ্দেশ্যহীনভাবে বাজারের মধ্যে ঘুরে বেড়ালাম আমরা। অ্যাসিটিলিনের আলোয় কাঠের বিশাল দাঁড়িপাল্লায় তুলে মণ মণ বাটা আর চারাপোনা নিলাম হচ্ছে, ঝিঙে আর বর্ষার মুলো বিক্রি হচ্ছে ঝাঁকা ধরে ধরে, নৌকো থেকে দুধ উঠছে গোয়ালাদের সরু গলার টিনের ক্যানেস্তারায়। একদিকে টাল দেয়া ইলিশ—সেদিকে আর কিছু নেই।

হঠাৎ একটা গলির চৌমাথায় একটা রোগামতো লোক তীরবেগে ছুটে এসে আমার হাঁটু জড়িয়ে ধরে রাস্তায় বসে পড়ল।

—স্যার স্যার, আপনাকে তো চিনেছি স্যার—

দলের অন্যান্যদের মতো, আমিও তখন তূরীয় মেজাজে আছি, শয়তান নিজে ছুটে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরে করুণা ভিক্ষা করলেও ঘাবড়াতাম না—আর এ তো সামান্য একটি রোগা যুবক, দেখেই বোঝা যাচ্ছে দারিদ্র্যপীড়িত। আমি মুখে একটা স্বর্গীয় হাসি ফুটিয়ে বললাম, 'ও, চিনেছিস? বল্ দেখি কে আমি?'

—আপনি আমাদের ভবানীপুর থানার মেজবাবু স্যার, আমি চিনবুনি? সেবার আমাকে তুলে লিয়ে এস্‌চিলেন খালপাড় থিকে—কী প্যাঁদান পেঁদিইচিলেন স্যার, ওঃ-

আমি ওর চুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে স্নেহভরে নেড়ে দিয়ে বলি, 'তাই তো, চিনে ফেলেছিস দেখছি। কী যেন নাম তোর?'

—পচা স্যার, পচা—

—ওঃ। তা পচা এখন কী করছিস?

—সেই চুরিই করছি স্যার—আর কী করব, বলুন? অরা কোনো কাজ তো শিকি নি? একটা কথা বলি স্যার?

—আবার কী কথা?

—আপনারা যদি স্যার দয়া করে একবার পায়ের ধুলো দেন আমার ডেরায়, আপনাদের একটু সেবা করি—হুই যে স্যার, এখানে থেকে দু'পা—

আমি উদারভাবে দলের দিকে ফিরে বলি, 'এই পচা আমাদের একটু সেবা করে ধন্য হতে চায়। আমার মনে হয় ওকে একটা সুযোগ আমাদের দেয়া উচিত—'

রাত্রে বিশেষ কিছু খাওয়া হয়নি, বেশ খিদে পেয়েছিল সকলেরই। সকলেরই বিনাবাক্যে রাজি হয়ে যায়।

—আসুন স্যার, দয়া করে এইদিকে আসুন—পচা হেঁহেঁ করতে করতে, হাত কচলাতে কচলাতে আমাদের কয়েক পা দূরে একটি কাঠের ঘরে নিয়ে আসে। আমাদের মাদুরে বসিয়ে পাশের একটি দরজায় ধাক্কা দিয়ে চ্যাঁচায়, শেফালি, এই শেফালি—আরে হারামজাদি ওঠ্ মাগি—স্যারেরা এয়েচেন, কত ভাগ্যি জানিস তোর? কই, উঠলি? দরজাটা খুলে যায়, ভিতর থেকে ঘুমজড়িত অস্পষ্ট নারীকণ্ঠ কানে আসে। পচা ভেতরে ঢোকে। দু'মিনিট পরে বেরোয়, তার পিছনে একটি অবগুণ্ঠিত রোগাটে স্ত্রীমূর্তি, তার হাতে একটি নেবানো উনুন। পচা আমার দিকে তাকিয়ে বলে, একটু আরাম করুন স্যার, এখানে কোনো ঝামেলা নেই—আমি পাঁচ মিনিটে আসচি স্যার—তাড়াতাড়ি করে আর একটা ছেঁড়া পাটিও পেতে দেয়। নেশাতুর অবস্থায় অনেকক্ষণ হেঁটে হেঁটে আমরা ক্লান্ত হয়েছিলাম, বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টিও শুরু হয়েছে, একটা আশ্রয় পেয়ে সকলেই এলিয়ে পড়ে সিগারেট ধরায়। পচারা বেরিয়ে যায়—যাবার সময় দরজাটা টেনে দিয়ে যায়।

পাঁচ মিনিট গেল। দশ মিনিট গেল। পনেরো মিনিট গেল।

দুটো করে সিগারেট শেষ হবার পর আমরা একটু চিন্তিত হয়ে উঠলাম। গেল কোথায় হতভাগা, সম্মানিত অতিথিদের ফেলে? এর মধ্যে কার যেন একটু প্রাকৃতিক

প্রয়োজন হয়েছিল, বেরোতে গিয়ে দেখা গেল দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ। জানলার কাছে এসে দেখা গেল জানলার বাইরে দিকচিহ্নহীন অন্ধকার মাতলা নদী—ঘরটা নদীর ওপরেই বানানো।

ব্যাপারটা আবিষ্কার করে সকলেই একটু চুপ করে যায়। তারপর বেলাল বলে, 'ব্যাপারটা কিছু বুঝলে সমীর?'

—তুমি কী বুঝলে, বলো তো?

জজসাহেবের মতো ঠান্ডা গলায় বেলাল বলে, 'তোমাকে ও ভবানীপুর থানার মেজবাবু বলে শনাক্ত করেছে—তুমি সেটা মেনেও নিয়েছ। এবং ও যখন তোমার অতিথি হয়েছিল তখন তুমি ওকে যেভাবে আপ্যায়ন করেছিলে তাও আমরা শুনলাম। এখন আমার বিশ্বাস, ও ঠিক সেইভাবেই তোমাকে আপ্যায়ন করতে চায় বলে লোক ডাকতে গেছে। এবং তোমার সঙ্গে আমরা আছি বলে আমাদেরও তোমার মতো আপ্যায়ন ভোগ করতে হবে—তবে তোমার মতো অতটা মধুর আপ্যায়ন আমাদের ভাগ্যে নাও জুটতে পারে।'

বেলাল নাটকীয়ভাবে চুপ করে যায়। আর কেউ কোনো কথা বলে না। ঘরের মধ্যে শেষরাত্রির নৈঃশব্দ্য থমথম করতে থাকে। নদীর ওপর দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া এসে জানলা দিয়ে ঘরে ঢোকে, জানলার পাশে দড়িতে ঝোলানো একটা ময়লা চিটচিটে গামছাকে মৃদুমন্দ দোল দিতে থাকে।

হঠাৎ বাইরে তালায় চাবি ঘোরানোর শব্দ পাওয়া যায়। পচা ঘরে ঢোকে। তার এক হাতে দড়ি দিয়ে ঝোলানো দু-তিনটি চোলাইয়ের বোতল, অন্য হাতে কয়েকটি গেলাশ, সিগারেটের নতুন প্যাকেট। পিছন পিছন শেফালিও আসে, তার হাতে কানাতোলা মস্ত একটা চকচকে কাঁসার থালা। থালাটি মেঝেতে নামিয়ে সে গড় হয়ে আমাদের প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়। থালা ভর্তি স্তূপাকার তোপসে মাছ ভাজা।

হাত কচলাতে কচলাতে পচা বলে, 'একটু সেবা করুন স্যার—'

সেবা করে তৃপ্ত হয়ে আমরা পচার আনা ভ্যানরিকশয় উঠে বসি। স্টেশনে এসে যখন নামি তখনো ভালো করে ফর্শা হয়নি। যা পকেটে যা ছিল সব উজাড় করে পচার হাতে তুলে দিলে ও লজ্জায় জিভ কাটে, ফেরত দিতে যায়। শক্তি ধমকে ওঠে, 'চোপ, হারামজাদা—একটাও কথা নয়, আয়, এদিকে আয়—'পচা গিয়ে শক্তির সামনে দাঁড়াতে— ট্রেন থেকে নামার সময় শক্তি জামাকাপড় পরে নিয়েছিল—ও পচাকে জড়িয়ে ধরে ওর কপালে দীর্ঘ চুম্বন করে, শক্তির যেমন চিরকালের দস্তুর। যে কামরাতে এসেছিলাম সেই কামরাটাতেই উঠে বসি আমরা, বাকিরা তখনো ঘুমে আচ্ছন্ন। ক্যানিং লোকালে, বিশেষত ভোরের প্রথম ট্রেনে—টিকিট কাটার কোনো দরকার হয় না।

ঘটনাহীনভাবে ঝিমোতে ঝিমোতে যাদবপুরে এসে নেমে পড়া গেল। এবারে কার বাড়িতে গিয়ে এতগুলো বাসভাড়া জোগাড় করা যায়? বেলাল বলল, 'দাঁড়াও দেখি।

সমীর আমার পিছনে এসে দাঁড়াও তো—'নির্দেশ পালন করলে বলে, 'আমার কলারের ভিতরে আঙুল চালিয়ে দ্যাখো তো কিছু পাও কিনা—'

কলারের দু'পরত কাপড়ের ভিতর দিকের কাপড়টা কাটা। সেখান দিয়ে আঙুল চালাতে একটা কাগজের টুকরো হাতে ঠেকে। দু'আঙুল দিয়ে সেটা বের করে আনি। একটা পাঁচ টাকার নোট। লাজুক মুখে বেলাল বলে, 'এতে সকলের বাড়ি ফেরার বাসভাড়াটা হয়ে যাবে না?'

একদিন কফিহাউসে বসে আছি, শক্তি হঠাৎ খানিকটা আকস্মিকভাবেই আমাকে জিগেস করল, 'সমীর, গান লেখা ব্যাপারটা মানো?'

—মানে?

—মানে, একটা কথা আমি ধরো বাঁধলাম, তাতে সুর দিল আরেকজন, সেটা গাইল আরেকজন?

—তার মানে তো আধুনিক গান—অন্তত ওই নামে যা চলে? না, মানি না।

—কিন্তু মানতে হবে যে—

—মানে?

ক্রমে জানা গেল, শক্তিকে রেডিয়ো থেকে গান লিখতে বলেছে। শক্তি তাতে সম্মতি জানিয়ে কয়েকটা গান লিখেছেও, এখন সেগুলো পড়ে শোনাতে চায়। কফিহাউস থেকে উঠে গিয়ে কলেজ স্ট্রিট বাজারের ভেতরে একটা চায়ের দোকানে বসে কয়েকটা তেমন গান শক্তি পড়ে শোনাল। এই গোপনতার কারণ, শক্তি নিজে লেখাগুলি সম্পর্কে খুব নিশ্চিত নয়, ছাপতে দেবার আগে সেগুলি পড়িয়ে নিতে চায়, জানতে চায় আধুনিক গান বলে চলবার মতো হয়েছে কিনা। আধুনিক গান বলতে যে ধরনের কথা চলে খানিকটা তাই, আবার খানিকটা আধুনিক কবিতার নির্যাসও তার মধ্যে ঢুকে গেছে—যে রকম গানের কথা রচনা করা সাধারণ গান লিখিয়েদের পক্ষে অসম্ভব। সে রকম কথা যদি গানের ক্ষেত্রে চালু হত তাহলে আধুনিক গানের ইতিহাস তখন থেকে অন্যরকম হয়ে যেত। কয়েকটা গান লিখে জমা দিয়েছিল শক্তি; কিন্তু সম্ভবত কোনো সুরকারের পছন্দ হয়নি সেগুলো, হলে কোথাও না কোথাও কানে আসত। অনেক বছর পরে, 'অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়' বইটি সম্পাদনা করতে গিয়ে সেই গান কয়েকটা হাতে পড়েছিল—লুপ্তাবস্থা থেকে তাদের উদ্ধার করে ওই বইটাতে দিয়ে তৃপ্তি পেয়েছিলাম।

কৃত্তিবাসের দলের মধ্যে প্রথম পরিচয় হয় দীপকের সঙ্গে, তারপর তারই সূত্রে শক্তির সঙ্গে। দীপক দূরে সরে যায় কিছুদিন পরেই—ভৌগোলিকভাবে, মানসিক ভাবেও। কোনো কাজেই যেমন দীপক বেশিদিন লেগে থাকতে পারত না, তেমনি এক মানুষের সঙ্গেও বেশিদিন সংলগ্ন হয়ে থাকাটা ওর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু শক্তির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল তার মৃত্যু পর্যন্ত।

তবে আমি শক্তির গেরস্ত দিকটার সঙ্গেই বেশি পরিচিত ছিলাম। আমি কোনোদিন

শক্তির সঙ্গে চাইবাসা যাইনি, বর্ষার রাত্রে ওর সঙ্গে পায়ে হেঁটে জোঁক আর হাতিসংকুল ডুয়ার্সের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াইনি। লেজে ভর দিয়ে আমি দাঁড়াইনি চাঁদ খাবো বলে। প্রথম কফিহাউসে ঢুকেই ওর সঙ্গে পরিচয় হলেও, সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হল মীনাক্ষী ও তার সখীদের মঞ্চে আবির্ভাবের পর থেকে। সে গল্প একবার লিখেছি, আরো একবার বলা যেতে পারে। কারণ সে গল্পে যে শক্তির দেখা পাওয়া যায় সে শক্তির সঙ্গে ওর চেনা ভাবমূর্তিটির সাদৃশ্য কমই।

১৯৬৫ সালের শেষ দিকে মীনাক্ষী বাংলা নিয়ে এম.এ পড়ত কলকাতায়, থাকত আমহার্স্ট স্ট্রিটে মেয়েদের পোস্টগ্র্যাজুয়েট হস্টেলে। ওরা ঠিক করেছিল পরীক্ষার পর 'সখীসংবাদ' নাম দিয়ে একটা ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করবে। রোজই ওরা তিনচারটি মেয়ে কফিহাউসে আসে—একটা টেবিল ঘিরে বসে আড্ডা দেয়। ইচ্ছে কবিদের সঙ্গে আলাপ করবার, কিন্তু ইচ্ছেটাকে কাজে পরিণত করবার সাহস হয় না। দূর থেকে দ্যাখে কৃত্তিবাসের কবিদের। ততদিনে হাংরি জেনারেশন পর্ব শেষ হয়ে গেছে, গীন্সবার্গরা কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে, শক্তি তখনই পরিণত হয়েছে উত্তপ্ত লেজেন্ড-এ, এম.এ ক্লাশের ছোট ছোট মেয়েদের পক্ষে সে তাপ সহ্য করা মুশকিলই। কিন্তু অসমসাহসিকা রুচিরা একদিন অসম্ভবকে সম্ভব করে ফেলল। শত্রুপক্ষের কোর্টে ঢোকবার আগে হাডুডু খেলোয়াড় যেমন দম বন্ধ করে নেয়, তেমনি দম বন্ধ করে এসে শক্তিকে এক নিশ্বাসে বলে ফেলল, 'আমাদের টেবিলে একবারটি আসবেন?'

শক্তি একটু অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল, তারপর ওদের টেবিলটার দিকে চেয়ে দেখল। মেয়েরা তখন সবাই মুখ নিচু করে বসে, সম্ভবত ঘামছে। শক্তি এবার চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল সামনে বসা শংকরের দিকে। শংকর মাথা হেলিয়ে বলল, 'যাও না, বলছেন যখন—' শক্তি উঠে দাঁড়াল। শক্তির বয়স তখন বত্রিশ, মেয়েদের দলটায় কারো বয়সই কুড়ি-একুশের বেশি নয়। সাধারণত ওরা চারজন থাকত দলে— রুচিরা, কৃষ্ণা, প্রণতি, মীনাক্ষী। শক্তি গিয়ে সোজাসুজি তাদের 'তুমি' করে কথা বলতে আরম্ভ করে দিল। পত্রিকা নিয়েই কথা হল বেশি—প্রথম আলাপের জড়তাটা কেটে গেল তাতে।

দিন কাটতে থাকে। কৃত্তিবাসের দল কফিহাউসে আসে বিকেলের দিকে, মেয়েরাও আসে। ক্রমে দুই দলে ভালো রকম আলাপ পরিচয় হয়ে গেল, কখনো কখনো দুটো দল এক টেবিলেও বসে। তারপর মেয়েদের পরীক্ষা টরিক্ষা এসে গেল, কফিহাউসে তাদের আর বিশেষ দেখা যায় না। দুয়েকটি হার্দ্য সম্পর্ক আরম্ভ হতে যাচ্ছিল, এমনকী দুয়েকটি ত্রিভুজ—কিন্তু পরীক্ষার পর বাড়ি যাবার তাড়াতেই হোক, বা ত্রৈভুজিক জটিলতায় ভয় পেয়েই হোক, মেয়েরা এক রকম সরিয়েই নিল নিজেদের কফিহাউসের পরিবেশ থেকে। ক্রমে তাদের কথা সবাই প্রায় ভুলে গেল।

একদিন বিকেল চারটে নাগাদ কফিহাউসে বসে আছি, অঠাৎ শক্তি বলল, 'সমীর, আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে—চলো না একটু সঙ্গ দেবে আমাকে?' শরৎ (বা

আর কেউ) অন্যমনস্কভাবে জিগেস করল, 'কোথায় চললে?' শক্তি একটা অনির্দিষ্ট জবাব দিয়ে আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এল। রাস্তায় নেমে একটা দোকানে ঘড়ি দেখে বলল, 'একটু সময় আছে—চলো হেঁটেই যাই।'

'কোথায় যাবে?'

যে কথাটা বলতে দ্বিধা হত সেটা বলবার একটা বিশেষ ভঙ্গি ছিল শক্তির। প্রথমে মুখটা একটু লাজুকমতো হয়ে যেত, তারপর খুব জোর দিয়ে, যেন মনস্থির করে নিয়ে, প্রতিটি শব্দ পরিষ্কার করে কেটে কেটে কথাটা উচ্চারণ করত। একটু চুপ করে থেকে, সেই ভাবে কেটে কেটে বলল, 'ম্—মীনাক্ষী আসবে রাজাবাজারের মোড়ে, পাঁচটার সময়।'

সেই আরম্ভ। মাঝে মাঝেই বিকেলে টেবিলে বসে চারটে নাগাদ শক্তি আমার দিকে তাকায়, আমি বুঝে যাই যা বোঝবার। একটু আগে-পরে আমরা বেরিয়ে আসি, আমরা যে একসঙ্গে কোথাও যাচ্ছি সেটা কাউকে বুঝতে দেয়া হয় না। হাঁটতে হাঁটতে রাজাবাজার, সেখানে ঘোড়ার গাড়ির দুর্গন্ধময় আড্ডার পাশে বাসস্টপের লোহার রেলিঙের ওপর পা তুলে বসে আমরা দুজন পুবে ফুলবাগানের দিকে তাকিয়ে গল্প করি—মীনাক্ষী আসবে ষষ্ঠীতলা থেকে। আসত, অন্য সখীরাও এসে পৌঁছত। ওটা ওদের সেই প্রথম পর্যায় চলছে যেখানে দুজনে মুখোমুখির চেয়ে অনেকে মুখোমুখিতে স্বস্তি পাওয়া যায় বেশি। ওরা তিনচারজন, আমরা দুজন। বেশির ভাগ দিনই আমরা গিয়ে বসতাম শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। মেয়েরা সাড়ে সাতটা থেকেই উঠিউঠি করত, শক্তি জোর করে তাদের ধরে রেখে দিত প্রায় সাড়ে আটটা পর্যন্ত। কারণটা বুঝতে আমার দুয়েকদিন সময় লেগেছিল। শক্তি চেষ্টা করছে মদ ছাড়তে। সাড়ে আটটায় কেটির গেট বন্ধ হয়ে যায়, ভেতরে নটা পর্যন্ত থাকা গেলেও নতুন খদ্দের ঢোকা সাড়ে আটটায় বন্ধ। সেই সময়টা কোনোমতে পার হয়ে গেলে সেদিনকার মতো শক্তি নিশ্চিন্ত, আজ আর কেটিতে যাওয়া যাবে না। পারেনি ছাড়তে, কিন্তু চেষ্টা যে করেছিল সেকথাটা এখানে উল্লিখিত থাকুক। খুব বেশি দিন অবশ্যি চেষ্টাটা চালাতে পারেনি, সম্ভবত কয়েক মাস—তারপরই নিজের ফর্ম-এ ফিরে এসেছিল আবার।

কোনো কোনো দিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্থির হয়ে থাকত একটু আগে আগেই, সেদিন যাওয়া হত গঙ্গার ধারে। গোয়ালিয়র মনুমেন্টটা আমাদের প্রিয় জায়গা ছিল, ওর রেলিংহীন দোতলাটা তখনো সাধারণের জন্যে নিষিদ্ধ হয়ে যায়নি। ওখানে বসে অনেক সূর্যাস্ত দেখেছি আমরা ক'জন।

মীনাক্ষী এম.এ পরীক্ষার ফল বেরোনো উদ্‌যাপন করতে শক্তি রাজাবাজার থেকে একটি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে, মীনাক্ষী চেয়েছিল ঘোড়ার গাড়িতে চড়বে। তাইতে চেপে আমরা সখীবৃন্দ সহ গোয়ালিয়র মনুমেন্টের পাদদেশে পৌঁছই বিকেল চারটে নাগাদ। একটি নৌকো ভাড়া করা হয়। মাঝগঙ্গায় গিয়ে আমাদের নির্দেশে একটা বয়ার সঙ্গে মাঝি নৌকো বাঁধে—হাঁচোরপাঁচোর করে আমরা সবাই বয়ার ওপর উঠে পড়ি, শক্তি বাদে। ওর ভয় হয়েছিল সবাই উঠে পড়লে মাঝি যদি নৌকো নিয়ে পালিয়ে যায় তাহলে কী হবে। বয়ারূঢ় হয়ে সূর্যাস্তদর্শন করে আমরা ফিরে আসি।

ক্রমে ওদের কোর্টশিপের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হল, বৈকালিক ভ্রমণে সখাসখীর দল বাদ পড়তে লাগল। ওরা দুজনে তখনও গোয়ালিয়র মনুমেন্টে যায়, উপরন্তু যোগ হয়েছে মল্লিকবাজারের খৃষ্টান গোরস্থানটি, সে সময়ে মীনাক্ষীকে নিয়ে বেড়াতে যাবার ওটি প্রিয় জায়গা ছিল শক্তির। কোনো কোনো দিন সকালে বেরিয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে বেড়াচাঁপা, বোড়াল বা ডায়মন্ডহারবার—তার কোনো কোনোটা শক্তি পরে আমাকে বলত, বেশির ভাগই বলত না। তা ছাড়া ছিল বিশ্বস্ত বন্ধুদের বাড়ি। আমাদের বাড়িতে অনেকবারই এসেছে ওরা। রিজেন্ট পার্কে আমাদের বাড়িতে গিয়ে আমার মা'র সঙ্গে গল্প করেছে, আমার ঘরে বসে গলা ছেড়ে গান গেয়েছে। একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড়ো রাস্তায় এসে মীনাক্ষীকে আড়াল করে বলেছিল, 'এই দরিদ্র ভ্রমণকারীদের কিছু পাথেয় দাও তো সমীর—' আজ এতকাল পরেও দেখছি বাক্যটি হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে আছে।

১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি ওরা স্থির করল, বিয়ে করবে। শক্তির মতো পাত্র কোনো বাঙালি মেয়ের পরিবার থেকে পছন্দ হবার কথা নয়—মীনাক্ষীর পরিবারেও ঘোরতর আপত্তি উঠেছিল। তার সমস্ত অনুপুঙ্ক্ষ প্রকাশ করবার সময় এখনো আসেনি, তবে এটুকু বলা যায় যে নিজের সম্পর্কে অজস্র মিথ্যে কথা বলে শক্তি ব্যাপারটাকে জটিলতর করে তুলেছিল। যেমন ও বলেছিল কপিরাইটারের চাকরি করে জে. ওয়ালটার টমসনে, বলেছিল ওরা বাঙাল, বলেছিল ওরা ব্রাহ্ম, বলেছিল ও ওর বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। আসলে শক্তি তখন সম্পূর্ণ বেকার (যদিও কালেভদ্রে ওয়ালটার টমসনে ফ্রিলান্স কপি লেখে), ওরা সাতপুরুষের ঘটি—ওদের পৈতৃক বাড়ি হুগলি জেলার আরামবাগে, রামমোহন রায়ের রাধানগরের পাশে কৃষ্ণনগর গ্রামে। ওদের পরিবার কট্টর বামুন, শক্তি ওর বাবা-মায়ের তিন সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয়। তা এসব কথা মিথ্যে বলে প্রতিপন্ন হওয়ায় মীনাক্ষীর পরিবারের লোকেরা স্বভাবতই আপত্তি করেছিলেন। ফলে ওরা বিয়ে করল গোপনে, পরের বছরের ১৫ আগস্ট, প্রকাশ্যে তার মাস দেড়েক পরে, মহালয়ার দিন। বিয়ের কার্ড এঁকে দিয়েছিল পৃথ্বীশ। প্রকাশ্য বিয়েটার আগে শক্তি উল্টোডাঙার অধর দাস লেনের বস্তি ছেড়ে উঠে এল বেহালায়, ব্রাহ্মসমাজ রোডের মধ্যবিত্ত পাড়ায় বাসা ভাড়া করে। বিয়ের দিন শক্তি ঠিকমতো এসে পৌঁছবে কিনা মীনাক্ষীর সন্দেহ ছিল, বিকেলবেলা তিনটে ঠিকানা হাতে দিয়ে রুচিরাকে পাঠিয়েছিল বর আনতে—বাড়িতে না পেলে কোথায় কোথায় খুঁজতে হবে তারই নির্দেশ ছিল, ঠিকানা তিনটেতে। রুচিরাকে দেখে শক্তির মা বললেন, 'একটু বসো, কোথায় গেছে, এখুনি ফিরবে বলে গেছে।' তাঁরও বিশ্বাস হয়নি তাঁর পুত্রটি সত্যি সত্যি বিয়ে করতে যাবে, তিনি তাই কোনো আয়োজনও করেননি। একটু পরে একজন লোক এসে উপস্থিত, রুচিরার তাকে চেনা চেনা লাগল। তাকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে লোকটি নিজের গাছে হাত দিয়ে বলল, 'রুচিরা, আমি শক্তি।' কোদালে দাড়িটা কামিয়ে এসেছে।

আমি বিয়ে করি পরের বছর, আমরা হানিমুন করতে যাই একসঙ্গে, শক্তির প্রিয় হেসাডিতে। কিন্তু সে আবার অন্য শক্তির কাহিনী, আমি আমার স্ব-আরোপিত সময়সীমা পেরিয়ে চলে যাচ্ছি।

কৃত্তিবাস-এর দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভবে যুক্ত ছিল না অথচ মনের দিক দিয়ে তাদের সমানধর্মা এমনও ছিল কেউ কেউ—যেমন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। দশাসই চেহারার মানুষ ছিল শ্যামল। একবা কফিহাউসে আমাকে প্রকাণ্ড একটা চড় মেরেছিল। আমি (কী একটা কাগজে ভুলে গেছি, *মহেঞ্জদড়ো কি?)* ওর *অনিলের পুতুল উপন্যাসের সমালোচনা করেছিলাম। পৃষ্ঠাতিনেক জোড়া সেই রিভিয়ু-প্রবন্ধে* উপন্যাসটি সম্পর্কে কোনো কথা ছিল না—ছিল তার ছাপাই বাঁধাই শেলাই প্রচ্ছদ কাগজ শুধু এই সব বিষয় নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা, তার মাসদুয়েক আগে দাঙ্গায় পাটোয়ারবাগানের বেশ কয়েকজন দপ্তুরির ঘর জ্বলে গেছে, তাই নিয়ে আলোচনা। শ্যামল কফিহাউসে ঢুকে আমাকে একটা টেবিলে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে এসে জিগেস করল, 'অমুক পত্রিকায় আমার *অনিলের পুতুল* বইটার রিভিয়ুটা কি আপনার করা?' আমি 'হ্যাঁ' বলবার সঙ্গে সঙ্গে সপাটে চড়, চশমাটশমা ছিটকে গেল, আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম। তখন আমার পাওয়ার প্রায় মাইনাস দশ, চশমা না থাকলে চোখে অন্ধকার এমনিই দেখবার কথা। আর শ্যামলের এই শেষ অসুস্থতার আগে বছরখানেকের মধ্যে বোধ হয় চারপাঁচবার ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে নানান জায়গায়, প্রত্যেকবার দেখা হতে প্রথমেই বলেছে, কুশলসম্ভাষণেরও আগে, 'সমীর তোমার লেখা স্যারের জীবনীটা কী ভালো যে হয়েছে!' কিছুদিন কম্প্যারেটিভ লিট্রেচার পড়েছিল বলে বুদ্ধদেব বসুকে শ্যামল 'স্যার'ই বলত। শ্যামলের চরিত্রে একটি উষ্ণ বরণীয়তা ছিল, বিরাগ বা অনুরাগ উভয়তই তা সমান বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ পেত। এই চরিত্রও *কৃত্তিবাস*-বিরোধী নয়।

কলকাতার হস্টেলে অনন্ত স্বাধীনতা, রাত্তিরে না ফিরলেও কেউ ডেকে জিগেস করে না। সকালবেলাটা বিছানায় শুয়ে পা নাচাতে নাচাতে নিজের পছন্দের বই পড়ে কেটে যায়। দুপুরবেলায় কলেজ, বা কলেজে যেতে ইচ্ছে না করলে কফিহাউস; বিকেলে আমার ঠিকানা হল সোমনাথ লাহিড়ির নেবুতলার বাড়ি। আমার আকর্ষণের কেন্দ্র অবশ্য সোমনাথ লাহিড়ি নন, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীকে আমি বীণাদি বলে ডাকি, একটু বেশি বয়সে তিনি আমার সহাধ্যায়িনী, সুরেন্দ্রনাথে মর্নিঙে পড়েন। বিকেলবেলাটায় তিনি ও তাঁর কয়েকজন সহপাঠিনী আমার কাছে ইংরিজি শেখেন, আমার আকর্ষণ সেই ক্লাশটা নেয়ায়। ভীষণ রেগুলার টিউটার, একটা বিকেলও ফাঁক যায় না। বাইরের ঘরে তক্তপোষের ওপর একটা ছেঁড়া মাদুর পাতা, তার ওপর আমার ছাত্রীরা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে, আমাকে সম্মান জানিয়ে বসতে দেয়া হয় একটু তফাতে একটা হাতলভাঙা চেয়ারে, সেজন্যে আমার গোপনে একটু নিরাশ লাগে। ফেরতা দিয়ে ধুতি পরা, রোগা ফ্যাকাশে-ফর্শা সোমনাথ লাহিড়ি একেকদিন বিকেলে দরজায় দাঁড়িয়ে একটুক্ষণ আমার পড়ানো শুনে একটু মুচকি হেসে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান।

মেয়েদের চারপাঁচজনের দলটিতে সকলেই কলকাতার, শুধু একজন ছিল উত্তরবাংলার সুদূর মফস্‌সল থেকে আসা। ছোটখাট চেহারার সেই কালো মেয়েটি হল, পুরোনো বাংলায় যাকে বলা যায় আমার নির্বন্ধ। সে-ই আমার সেখানকার মূল আকর্ষণ, সে যেদিন না আসে আমার বিকেলটা বিস্বাদ হয়ে যায়। খানিকক্ষণ পড়াশোনা চলবার পরেই আর ভালো লাগে না, চার্লস ল্যাম কিম্বা শেক্‌সপিয়ারের চেয়ে অনেক বেশি

উতরোলভাবে ডাক দেয় জীবন, আমরা সবাই মিলে বেরিয়ে পড়ি রাস্তায়। আরো দুচারজন রূপমুগ্ধ যুবক এসে জোটে, তাদের কেউ খুচরো ব্যাবসাদার, কেউ লেদমেশিনের মিস্তিরি, কেউ রাজনীতিক দলের সর্বক্ষণের কর্মী, কেউ বা বিশুদ্ধ বেকার। আমরা কখনো গিয়ে বসি মৌলালির মোড়ে 'শ্যামল' রেস্টোরান্টে (আশ্চর্য, এখনো টিকে আছে দোকানটা, সেই রকমই দু-সারি টেবিলচেয়ার দিয়ে সাজানো, শুধু নোংরা পর্দায় ঢাকা কেবিনগুলো উঠে গেছে), কোনোদিন চলে যাই নির্জন কনভেন্ট পার্কে। হাসি গল্প খুনসুটিতে দলবদ্ধভাবে সন্ধেটা কাটে, তারপর এক সময় তার হস্টেলে ফেরবার সময় হয়ে আসে। সে চলে যায়, তার খানিক পরে আমিও উঠে পড়ি। ভিড়ে আকীর্ণ শেয়ালদায় এসে দেখতে পাই ল্যাম্পোস্টের পাশে সে দাঁড়িয়ে আছে—যেন বাসেরই অপেক্ষায়, যেন হঠাৎই দেখা হয়ে গেল আমার সঙ্গে। স্পষ্ট করে ঠিক হাসে না সে, তবু তার মুখে বিব্রত খুশির একটা সূক্ষ্ম ও জটিল ভাব ফুটে ওঠে। তারপর আমি তাকে প্রস্তাব দিই, 'বাসে তো ভয়ংকর ভিড়, একটুখানি হাঁটবে নাকি? চলো একটু এগিয়ে দিই তোমাকে?' সে রাজি হয়। হাঁটতে আরম্ভ করবার আগে বৌবাজার স্ট্রিট যেখানে সার্কুলার রোডে এসে পড়েছে, উতরোল ভিড়ে আক্রান্ত সেই মোড়ের কাছে ছোট্ট একটা অদ্ভুতভাবে নির্জন রেস্টোরান্ট, আর্যনিবাস, সেখানে বসে শুধু চা এক পেয়ালা করে; তখন এক পেয়ালা চায়ের জন্যেও রেস্টোরান্টে গিয়ে টেবিলে চেয়ারে বসা যেত, মাথার ওপর ফ্যানও চালিয়ে দিত বেয়ারারা। কিন্তু সেখানে নির্জনে বসে অস্বস্তি আরম্ভ হত—এবার কী কথা বলা যায় তাকে? পাঁচজনের সামনে প্রদর্শিত যাবতীয় স্মার্টনেস অবসিত তখন, ভিতরে ভিতরে ঘামছি, টের পাচ্ছি কানদুটো অকারণে গরম হয়ে উঠছে। স্টেজে ওঠা নতুন অভিনেতার মতো হাতদুটোকে নিয়ে কী করব কোথায় রাখব ভেবে পাচ্ছি না। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বেরিয়ে আসি রাস্তায়, সেখানে অন্তত আছে নিশ্চিত অন্যেরা, হলই বা তারা রাস্তার মানুষ, তাদের সামনে কথা খুঁজে পেতে অসুবিধে হয় না আমার।

শেয়ালদার ভিড় ছাড়িয়ে কোনোদিন আমরা আমহার্স্ট স্ট্রিট ধরি, কোনোদিন বা ক্যানাল ওয়েস্ট রোড। আমহার্স্ট স্ট্রিটটাও ভালো, লোকচলাচল কম, কিন্তু ক্যানাল ওয়েস্ট রোড আরো ভালো। একদিকে খাল, অন্যদিকে ছোট ছোট কারখানা—সন্ধের আগে তাদের বেশির ভাগই বন্ধ হয়ে গেছে, রাস্তাটা সম্পূর্ণ নির্জন। হাঁটতে হাঁটতে অনবরত কথা বলে যাই আমি, আমাদের বিষয় কবিতা, আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে আধুনিক কবিতা, বিশেষ করে জীবনানন্দ। জীবনানন্দের রসে সে ডুবে আছে তখন, আমারই মতো তারও প্রিয়তম কবিতার বই হল ধূসর পাণ্ডুলিপি আর বনলতা সেন, শেষদিককার জীবনানন্দ তত টানে না তাকে, আর রূপসী বাংলা কি সত্যি সত্যি সেই একই জীবনানন্দের লেখা? আমি অনর্গল কথা বলে যাই, সে চুপচাপ শুনতে শনতে পথ চলে। কবিতার ক্লাশে অধ্যাপকদের কাছে যা কিছু নতুন শুনছি, রোমান্টিসিজ্‌ম সিম্বলিজ্‌ম মিস্টিসিজ্‌ম মডার্নিজ্‌ম, পুরোনো বিশ্বাসের পতনের ভিতর থেকে নতুন বিশ্বাসের উদ্ভব, সমস্ত উগরে দিতে থাকি জীবনানন্দকে উপলক্ষ করে। নিচু গলায় আবৃত্তি করে চলি, "একদিন এমন সময়—আবার আসিয়ো তুমি, আসিবার ইচ্ছা যদি হয়—পঁচিশ বছর পরে—"। হাঁটতে হাঁটতে নিজের সঙ্গে একটা কঠিন

ব্যালান্সের খেলা খেলতে থাকি আমি, প্রায় নিজেরও অজ্ঞাতে—তাকে না ছুঁয়ে তার কত কাছাকাছি আসা যায় চলতে চলতে তার পরীক্ষা—সে টের পায় কিনা বুঝতে পারি না।

ওদের হস্টেলটা প্রাইভেট, নিয়মকানুনের বিশেষ বালাই নেই। ফলে অনেক রাত্রি পর্যন্ত পথে পথে ঘুরে বেড়াতে পারি আমরা। আমরা এড়িয়ে চলি সেই সব জায়গা যেখানে চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ক্ষীণতম সম্ভাবনা আছে। আমরা হাঁটি ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, গ্যাস স্ট্রিট, হাজি জ্যাকেরিয়া লেন ধরে, রাজাবাজারের বস্তির ভেতর দিয়ে দিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে দশটা বাজে, সাড়ে দশটাও বেজে যায় কোনো কোনো দিন, তারপর সে দীনেন্দ্র স্ট্রিটের হস্টেলে ঢোকে। হস্টেলের গেট পর্যন্ত আমি যাই না, রোজ রোজ একই যুবক তাকে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে এটা হস্টেলের অন্য মেয়েদের চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে—হাজি জ্যাকেরিয়া লেনের মোড়টায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি। ও গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ে। একটু পরে দরজাটা একটু ফাঁক হয়, ওর ছোট্ট চেহারা মিলিয়ে যায় মস্ত দরজার আড়ালে।

আমাকেও ফিরতে হবে যাদবপুর। আমার হস্টেলে অবশ্যি নিয়মকানুন আছে, কিন্তু সেগুলোকে কেমন করে ফাঁকি দিতে হয় তাও জানা আছে আমার—তবে ফিরে গিয়ে খাবার আর পাওয়া যাবে না। রাজাবাজারে যে কোনো একটা মুসলমান দোকানে ঢুকে একটি সিকির বদলে ময়লা এনামেলের ডিসে দুটো তন্দুরি রুটি আর চারপিস টকটকে গোমাংস দিয়ে ডিনার সেরে পথে নামি আবার। বাসে উঠতে ইচ্ছে করে না, হাঁটতে হাঁটতে মধ্যরাত্রে হস্টেলে ফিরে আসি। একদিন তো ভোরই হয়ে গেল, সারা রাত এরাস্তা-ওরাস্তা করে উদ্দেশ্যহীন ঘুরতে ঘুরতে। হস্টেলে যখন ঢুকলাম তখন সূর্য উঠছে, মেকানিকল এঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যাপক সুপারিন্টেন্ডেন্ট মশায় সামনে দাঁড়িয়ে দাঁতন করছিলেন, আমাকে দেখে দাঁতের ফাঁক থেকে কাঠিটা বের করে বললেন, 'খুব ভোরেই দেখছি বেড়াতে বেরিয়েছিলে, সমীর?'

আমি একটা অস্পষ্ট জবাব দিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে যাই। বিকেল পাঁচটা বাজতে আর কত দেরি?

ভেবেছিলাম এমনি দিন যাবে লঘুপক্ষ, কিন্তু তা গেল না। সে ছিল রাজনৈতিক দলের সদস্য, তার পার্টির নেতাদের গোচরে গেল ব্যাপারটা, তাঁরা পছন্দ করলেন না। একদিন তিনচারটি ছেলে আমাকে ঘিরে ধরল 'শ্যামল'এ, দুজনে আমার হাতদুটো চেপে ধরল, আরেকজন আমার চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বলল, ফের আমাকে ও পাড়ায় ঘুরতে দেখা গেলে এর চেয়ে অনেক বেশি মুশকিলে পড়তে হবে। পার্টিতে অনেক টাকা চাঁদা দেয় এমন একজন মধ্যবয়স্ক টাকমাথা বিপত্নীক ব্যবসায়ী তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। ভয় পেয়ে সে কলকাতা ছেড়ে ফিরে গেল তার বালুরঘাটের বাড়িতে, কিন্তু সেখানেও গিয়ে হানা দিল সেই নাছোড়বান্দা লোকটি তার দলবলসহ, তার বাবাকেও গিয়ে বলল। তার ভালোমানুষ ইশকুলমাস্টার বাবাও ভয় পেয়ে গেলেন, তার পড়াটড়া বন্ধ হয়ে গেল, ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল কলকাতায় যাওয়া। আর তার কেমন করে যেন ধারণা হয়েছিল আমি তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারতুম—করিনি যে,

সেই অভিযানে সে আমার সঙ্গে সব যোগাযোগ বন্ধ করে দিল, চিঠি লিখলে উত্তরও দেয় না। বহুবার মনে হয়েছে বালুরঘাটে চলে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করার কথা—সেকালে একটা প্রাইভেট কোম্পানি এরোপ্লেন চালাত কলকাতা থেকে বালুরঘাট, ভাড়া ছিল কুড়ি টাকা। মাঝে মাঝে সিটের তলায় রশুনের বস্তা বা মুরগির ঝাঁকারও দেখা পাওয়া যেত অবশ্যি। কিন্তু সেই ব্যবসায়ীটি সেখানে গিয়ে যেসব হামলা করে এসেছিল বলে পরম্পরায় শুনেছিলাম, তারপর আর সশরীরে যেতে ভরসা পাইনি। ক্রমে যোগাযোগহীনভাবে কেটে যেতে লাগল মাসের পর মাস, তারপর বছরের পর বছর।

চিঠি লিখে লিখে উত্তর না পেয়ে আমি এক সরল কৌশল ধরলাম, রেজেস্ট্রি করে চিঠি দিতে লাগলাম, অ্যাক্‌নলেজমেন্ট ডিউ সহ। গোটা গোটা হরফে তার স্বাক্ষর বহন করে অ্যাক্‌নজেলমেন্ট স্লিপটা ফিরে আসে; সেটা আমি জমিয়ে রেখে দিই, চিঠির মতো। চিঠিগুলো তো সে নিচ্ছে পিয়নের কাছ থেকে, ফেরত তো দিচ্ছে না? সে এখনো বেঁচে আছে কিনা, তা সুদ্ধ জানতেন না সুধীন্দ্রনাথ—আমি সেটুকু তো অন্তত জানি।

সে আর ফিরবে না, আমার জীবন থেকে সে পুরোপুরি নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেছে—এই বোধটা আমাকে ক্রমে বয়স্ক করে তুলল। এত দিন ভালো করে চেয়ে দেখিনি, এবার বুঝতে আরম্ভ করলাম, সব মেয়েরই একটা করে শরীর আছে—সেটা তারা নানা প্রয়োজনে কাজে লাগাতে চায়, এবং আমার কাজেও লাগতে পারে। ক্রমে আমার প্রতীতি হতে লাগল, মনের ব্যাপারটা নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করবার কোনো মানে নেই, শরীর থেকে কতটা সুখ নিংড়ে নেয়া যায়, সেটাই সম্ভবত আসল কথা। কথাটা অন্তত আংশিকভাবে ভুল বলে বুঝতে অবশ্য দেরি হয়নি, গণিকালয়ে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা এই ব্যাপারটাকে বুঝতে খুব সাহায্য করেছিল।

জীবনে প্রথমবার গণিকালয়ে ঢুকেছিলাম শম্ভুর সঙ্গে। শম্ভু মুখার্জি।

শম্ভু একটা অদ্ভুত চরিত্র। ও ঠিক আমার বন্ধু ছিল না—পার্থর বন্ধু, পার্থর সূত্রেই পরিচয় হয়েছিল আমার সঙ্গে। পার্থ বিদ্যামন্দিরে আমার সঙ্গে পড়ত, তারপর প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয় ইংরেজি অনার্স নিয়ে। বয়সে শম্ভু আমাদের চেয়ে বেশ খানিকটা বড়ো, আমরা যখন পাশ করে বেরোলাম তখন ও মৌলানা আজাদ কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক। মফস্‌সলের বাড়িতে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে কলকাতায় এসে একা একা থাকে, রান্না করে সেদ্ধভাত খায়, যখন সময় পায় তখনই দিশি মদের বোতল খুলে বসে। এমনিতে খুব মৃদুভাষী, কখনো জোরে কথা বলে না, রসবোধ ভালো, পড়াশোনা অনেক—কিন্তু কিছুদিন ওর সঙ্গে মিশলে বোঝা যায়, প্রচণ্ড একটা রাগ পুষে রেখেছে বুকের মধ্যে কোথাও—কার বিরুদ্ধে সেটা বোঝা যায় না, কিন্তু মাতাল হলে সেই রাগটা ওর মনোরম ব্যক্তিত্বকে ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। এখানেই বলে রাখা যায়, কয়েক বছর পরে পার্থর মুখেই খবর পাই যে শম্ভু আত্মহত্যা করেছে—শুনে খুব অবাক হইনি। ওর নাকি ধারণা হয়েছিল ও ওর পিতার সন্তান নয়। তাতে

কী এল গেল তা অবশ্য আমি ভালো বুঝতে পারিনি—এখনও পারি না। বেঁচে থাকায় কোথায় কম পড়ল তাতে? কী জানি।

তা যাই হোক, প্রথম আলাপের পরে শম্ভুর ব্যক্তিত্বে আমি মুগ্ধ ছিলাম। নিচু গলায় কথাবার্তা, চমৎকার কৌতুকবোধ, চমৎকার পড়াশুনো, চমৎকার ইংরেজি লেখে। এতটাই মুগ্ধ ছিলাম যে একবার, বাবা তখন নেফায়, মা সেখানে তাঁর কাছে গেছেন, আমি একা আছি রিজেন্ট পার্কের বাড়িতে, শম্ভুর থাকার জায়গা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে বলে জানাতে পেরে আমিই ওকে নিমন্ত্রণ করলাম যে ক'মাস মা না ফিরছেন আমার সঙ্গে এসে থাকতে। তিনমাস আমরা একসঙ্গে ছিলাম। রাধা রান্নাবান্না করত, আমরা সকালবেলা খেয়েদেয়ে বেরিয়ে যেতাম যে যার ধান্দায়, সন্ধেবেলা ফিরে এসে দু'নম্বরের বোতল খুলে বসা হত। আমার ফিরতে একটু দেরি হত সাধারণত, ফিরে এসে বেশির ভাগ দিনই দেখতাম শম্ভু চুর হয়ে আছে। সে কী অস্বস্তিকর কাণ্ড, মা ফিরে এসে যেখানে হাত দেন সেখান থেকেই দিশি মদের খালি বোতল বেরোয়—বিছানার নিচে থেকে, আলনার পিছন থেকে, জুতোর র‍্যাকের তলা থেকে, বইয়ের পেছন থেকে, এমনকী মা-র লক্ষ্মীর কুলুঙ্গি থেকে।

একদিন বিকেলবেলায় বলছিলাম, আর এভাবে ভালো লাগছে না, কী যে করা যায়।

শম্ভু বলল, চলো, আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে?

কোথায়?

চলো যাই—গেলে তোমার মনটা ভালো করে দিতে পারব আশা করি।

চলো যাই—বলোই না কোথায়?

চলোই না যাই, গেলেই দেখতে পাবে—

বাড়ি থেকে বেরিয়ে শম্ভু ট্যাক্সি নিল। অনেক দূর উত্তরে গিয়ে, হেদোর ধার থেকে বিডন স্ট্রিটে মোড় নিল। বিডন স্ট্রিট যেখানে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউতে পড়বে ঠিক তার আগে ডাইনে একটা গলিতে ঢুকে, দুটো তিনটে মোড় নিয়ে একটা ঝুরঝুরে পুরোনো বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। তখন সন্ধে সাতটা বাজে।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে আধভেজানো পাল্লা ঠেলে বাড়িটায় ঢুকল শম্ভু, পেছনে পেছনে আমি। বেঁটো ধুতি আর গেঞ্জি পরা একটি লোক দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিল, আমাদের পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল। কাকে চান বাবু?

শিউলি খালি আছে?

বসুন, দেখছি।

আমরা একটা ছোট ঘরে গিয়ে বসলাম। মেঝেয় গদি পাতা, আধময়লা একটা সাদা চাদর তার ওপর। ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটি তাকিয়া, একদিকে একটি স্টিলের আলমারি।

যে মহিলা এসে ঢুকলেন তাঁর নাম শিউলি ভাবতে বেশ কষ্ট হল আমার। বয়স পঞ্চাশ না হলেও চল্লিশের বেশ ওপরে, পৃথুলাঙ্গী, ঘটোধ্নী। দিব্যি ভদ্র পোশাক পরা, মুখের হাসিটি অবশ্য একটু চটুল, বয়সের সঙ্গে মেলে না ঠিক।

—ও আপনি? আমি ভাবলাম কে আবার আমার খোঁজ করে—মহিলা এসে শম্ভুর গা ঘেঁষে বসলেন। অনেকদিন পরে এলেন। সঙ্গে ওটি কে? একেবারে কচি?

কনুইয়ের ওপরে বাহুর যে অংশটি অনাবৃত থাকে, মহিলার সেইখানে হাত রেখে শম্ভু বলল, আমার বন্ধু। খুব ভালো ছেলে, এসব জায়গায় আসে না। ওকে আজ জোর করে ধরে নিয়ে এলাম, খুশি করে দিতে হবে তোমাকে—

মহিলা শম্ভুর গায়ের ওপর এলিয়ে পড়ে আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, নিশ্চয়ই, খুশি হতেই তো আমাদের কাছে আসা। তো, আগে একটু গা গরম করে নেবেন না? একটু হুইস্কি আনতে বলি? চোখে একটু রং না লাগলে জিনিশ দেখতে কি তত ভালো লাগবে?

যতদূর মনে পড়ে এটা একষট্টি কি বাষট্টি সালের ঘটনা, কথাগুলো যে ঠিক ঠিক মনে আছে তা নয়। তবে ভাবখানা ছিল এই রকমই অনেকটা। সেই লোকটি একটা হুইস্কির বোতল আর মুরগি ভাজা দিয়ে গেল। প্রথম পেগটা মহিলা নীট খেয়ে পরেরটায় একটু জল মিশিয়ে নিলেন, মুরগির ঠ্যাঙে অশ্লীল রকম বড়ো কামড় বসালেন একটা। খানিকক্ষণ এ গল্প সে গল্প, অমুক সিনেমাটা দেখেছি কিনা, ওমা, দেখিনি? তমুককুমার কি দারুণ লাভসিন করে, দেখে মরে যেতে ইচ্ছে করে—

আমার খুব একটা ভালো লাগছিল না। নার্ভাসনেস, কৌতূহল, উত্তেজনা, অস্বস্তি, বিতৃষ্ণা, এমনকী সামান্য বমিবমি ভাব। কী রকম একটা এঁদো গন্ধ বাড়িটায়, কতকাল চুনকাম হয় না কে জানে। দেয়ালে পানের চুন মোছার দাগ। ঘরের কোনায় পানের পিক, জল দিয়ে ধোয়া হয়েছে তবু বোঝা যায়। মাথার ওপর সীলিঙে লোহার কড়ি, কাঠের বরগা, ঝুলের লম্বা লম্বা দাগ। কাঠের ব্লেডওয়ালা চার ব্লেডের একটা পাখা অত্যন্ত আস্তে আস্তে ঘুরছে, খশরখশর করে একটা আওয়াজ বেরোচ্ছে পাখাটা থেকে। বহুদিনের পুরোনো লাল সিমেন্টের মেঝে। উনিশ শতকের বাড়ি। শক্তির কবিতা মনে পড়ছে, দোতলার লাল মেজে হাঁটুতে বিস্তৃত করে বল—সদ্য গত বছরের কবিতা।

গল্পে গল্পে ঘন্টাখানেক কাটল, শম্ভু মহিলার সঙ্গে হালকা ছেনালিপনা করেই যাচ্ছে। ইতিমধ্যে কখন সে মহিলার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়েছে, মহিলা তার চুলে বিলি কেটে দিচ্ছেন। ওরা বেশ তাড়াতাড়ি খাচ্ছে, বোতলটায় মাল এখন অর্ধেকের কম, মহিলার কথা একটু জড়িয়ে এসেছে। আমি একটার পর আরেকটা নিয়ে বসে আছি, বেশি খেতেও ইচ্ছে করছে না। মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কিছুই খাচ্ছ না যে, বাবু? ভালো লাগছে না বুঝি এসব? দাঁড়াও, তোমার মন ভালো করে দিতে পারে এমন কাউকে ডেকে পাঠাই। রামলাল, বেবি আর লক্ষ্মীকে দ্যাখ্ তো—খালি থাকলে এখানে আসতে বল্।

একটু পরে দরজায় দুটি মেয়ে এসে দাঁড়াল।

আমি একবার মুখ তুলে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলাম। সেই এক ঝলকের মধ্যে আমার চোখে পড়েছিল দুটি মেয়েরই সধবার বেশ, সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে নোয়া, শাঁখা। এর আগে কখনো এত কাছ থেকে গণিকা দেখিনি, ওরা সবাই যে সধবার বেশে থাকে জানতুম না। আমার কেমন ধারণা ছিল ওদের কাস্টমাররা কুমারীবেশই পছন্দ করবে বেশি। খুবই ভুল ধারণা সেটা জেনেছি অনেক পরে। সেই এক লহমায়

আমার চোখে বেজেছিল মেয়েদুটির ভাবলেশহীন মুখ, মুখের কঠোর রেখাগুলি। তাদের বয়স শিউলিদেবীর চেয়ে কম বটে, কিন্তু আমার চেয়ে অনেক বেশি, তিরিশের আশেপাশে হবে। আমি তখনো ছবির বাইরে নগ্ননারী দেখিনি।

শিউলি জিগেস করল, বল, বাবু। কাকে পছন্দ হয়?

আমি মাথা নিচু করে বসে। একবার ভাবতে চেষ্টা করলাম, এই মেয়েদুটির মধ্যে একজনের সঙ্গে আমি—। শম্ভু একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বলল, মন স্থির করতে পারছ না?

শিউলি মুচকি হেসে চোখ মারল; বলল, তাহলে দুজনকেই নিয়ে বসো গে না?

আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। দুটি মেয়েকে? এক সঙ্গে?

শম্ভুও বলল বেশ সীরিয়াসভাবেই, যদি চাও তো নিয়ে যাও না দুজনকেই। খরচের কথা ভেবো না, তুমি আমার গেস্ট।

আমি মাথা নিচু করে দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়লাম। নাকি আরো দেখতে চাও? অনেক মেয়ে থাকে এ বাড়িতে—

আবারও ঘাড় নাড়লাম আমি। আর দেখতে চাই না, যথেষ্ট হয়েছে। এত আবেগহীন, উত্তাপহীন, মৃতদেহের মতো ঠান্ডা, দাঁতমাজার মতো কেজো এই বেশ্যাগমন ব্যাপারটা? মাছের চোখের মতো ভাবলেশহীন চোখের এই মেয়েদুটির মধ্যে কোনো একজন আজ আমার কৌমার্য হরণ করবে।

তাহলে? কাকে পছন্দ, বলো?

আমি আরেকবার চোখ তুলে চোখ নামিয়ে নিলাম।

শিউলি বলল, আমার মনে হয়, লক্ষ্মীই নিয়ে যাক বাবুকে—ফরসা রঙ, ওকেই পছন্দ হবে বাবুর। লজ্জায় বলতে পারচে না—কী গো, তাই না? মুচকি হেসে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে আমার পাঁজরার বাঁদিকে একটা খোঁচা দিল শিউলি।

লক্ষ্মী বলল, আসুন আমার সঙ্গে—

আমি উঠে যন্ত্রচালিতের মতো ওর পেছন পেছন গিয়ে আরেকটা ঘরে ঢুকলাম। আলোর একটা টিউব জ্বলছে ঘরে, তার ওপর ঝুলের দাগ। একটা তক্তপোশ, তার ওপর মোটা গদি, আধময়লা চাদর, বালিশের কোঁচকানো ওয়াড়গুলি হাত দিয়ে টান করে যথাসম্ভব মসৃণ করা হয়েছে। দেয়ালে একটা পুরোনো ক্যালেন্ডারকাটা কার্তিকের ছবি। ঘরের এক কোণে একটা নর্দমার ফুটো, তার পাশে এক বালতি জল, টিনের মগ, সাবান। অন্য কোনায় দুটো ট্রাঙ্ক, একটা ওপর আরেকটা চাপানো, পাড়শেলাই করা ঢাকনা দিয়ে ঢাকা। দেয়ালের কুলুঙ্গিতে সামান্য স্নো-পাউডার। খাটের পাশে একটা কাঠের চেয়ার, তার ওপর একটা শস্তা অ্যালুমিনিয়মের অ্যাশট্রে পোড়া সিগারেটের টুকরোয় ভর্তি।

দরজা বন্ধ করে কাঠের হুড়কো তুলে দিয়ে লক্ষ্মী বলল, আলো নিবিয়ে ছোট আলো জ্বেলে দেব? না থাকবে? তার মুখের ভাব নির্বিকার।

আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোতে চাচ্ছে না। শুধু ভেতর থেকে কেউ বলছে, ও যা বলবে তার প্রত্যেকটা প্রস্তাবে 'না' বলে যেতে হবে—তাতে যদি ও বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত আমাকে প্রত্যাখ্যান করে। নিজে থেকে ওকে প্রত্যাখ্যান করবার

মতো মনোবল আমার নেই, অথচ ওকে গ্রহণ করবার মতো নিশ্চিন্ত শিশ্ননির্ভরতাও আমি নিজের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না।

আঁচলটা নামাতে নামাতে লক্ষ্মী বলল, এসো বাবু—

পাঠকের যদি অন্নদাশঙ্করের 'স্তনন্ধয়' গল্পটা পড়া থাকে তাহলে তিনি আমার অবস্থাটা খানিকটা বুঝতে পারবেন। আমি তখনো কোনো মেয়ের গা দেখিনি, সেই দেখাটা—বা, একটি মেয়ের পক্ষে সেটা খুলে দেখানোটা—হলই বা সে পুরোনো, পোড় খাওয়া গণিকা—যে এত ঠান্ডা, নিরাসক্ত ও আবেগহীন হতে পারে আমি কখনো কল্পনা করিনি। ওর দিকে তাকিয়ে সদ্য পড়া কবিতার লাইন আমার মনের ওপর দিয়ে ভেসে গেল, She combs her hair with automatic hands/and puts a record on the gramophone....

তার সুকুমার কিন্তু ভাবলেশবর্জিত নারীশরীরের শীতল ও যৌনতাহীন সঞ্চালনে, তার পিছনে হাত নিয়ে গিয়ে মেয়েলি ভঙ্গিতে কিন্তু পুরোপুরি যান্ত্রিক ধরনে ব্রা'য়ের হুকে হাত রাখায়, আমি আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলাম না। ভক্ করে বমি উঠে এল আমার মুখের মধ্যে। কোনোমতে ঠোঁট চেপে বমিটাকে মুখের মধ্যে আটকে রেখে আমি খাট থেকে উঠে পড়ে এক লাফে দরজার কাছে এলাম, কাঠের হুড়কো খুলে বারান্দার কোনায় গিয়ে সন্ধে থেকে যা খেয়েছিলাম সমস্ত হড়হড় করে উগরে দিলাম।

উপস্থিত কেউ খুব একটা বিস্মিত হল না তাতে। বমি করার শব্দ পেয়ে শম্ভু উঠে এল, বলল, চলো বাড়ি যাই। মুখটা মাথাটা ধুয়ে নাও ভালো করে—যেন এমন একটা সম্ভাব্য পরিণামের জন্য মনে মনে তৈরিই ছিল সে। মাথায় জল দিতে দিতে আমার মনে পড়ল শিউলির উরুতে মাথা দিয়ে শুয়ে শম্ভুর ওর হাঁতটা নিয়ে নিজের গায়ে ঘষা—আমি হঠাৎ বুঝতে পারলাম শম্ভু মনের দিক দিয়ে আমার থেকে কত বেশি পরিণত। ও কত ভালো করে জানে, যে শরীরের বিশুদ্ধ ও জান্তব দিকটাকে উপেক্ষা করে মেয়েমানুষের ছেনালির দিকটাকেই নিয়ে খেলা করে যেতে হয় যতটা সম্ভব। কানের পিছনে ভেজা হাত ঘষতে ঘষতে প্রথমবার আমি এই লাইনদুটোর মানে ঠিকমতো বুঝতে পারলাম—"যেসব খবর নিয়ে সেবকেরা আগ্রহে অধীর, আধঘন্টা নারীর আলস্যে তার ঢের বেশি পাবে"। সেই অসম্ভব খারাপ লাগার মধ্যেও আমার মনে হল, 'নারীর আলস্য' শব্দবন্ধটি কী অসামান্য!

টলতে টলতে বাড়ি ফিরলাম। ফিরে এসে ডাকবাক্সে একটা অ্যাক্নলেজমেন্ট রশিদ পেলাম, তার গোটা গোটা হাতের লেখায় সই করা। সে অন্তত বেঁচে আছে, হে ভগবান তোমাকে মানি না, তবু সে বেঁচে আছে। কত বছর হয়ে গেল দেখি না।

গণিকাগমনের ইচ্ছেটা আমার এই প্রথম বারেই প্রায় মরে গিয়েছিল। তার পরেও কয়েকবার গিয়েছি, বেশির ভাগই আমোদগেঁড়ে বন্ধুদের সাহচর্যে, দুয়েকবার একা একাও—কিন্তু কোনোবারেই উদ্দেশ্যসাধনে সক্ষম হইনি। এ থেকে হয়তো এটাই প্রমাণিত হয় যে আমি মানুষটা অনুদ্ধারণীয়ভাবে রোমান্টিক, অধুনান্তিকতার পক্ষে একেবারেই অগ্রাহ্য জঞ্জাল—কেননা অনেকবার চেষ্টা করেও আমি মনোহীন শরীরবিলাসে মগ্ন হতে পারিনি।

এই সময়ে মানব আর কল্যাণ চাকরি পেল হিজলি স্কুলে। দুজনেই ব্যাচেলার, দুজনকে একটাই কোয়ার্টার দেয়া হল থাকবার জন্যে।

আমি আর শক্তি মাঝে মাঝেই চলে যেতাম সেখানে। আলাদা আলাদা ভাবেও গিয়েছি, পার্থও গেছে একাধবার আমাদের সঙ্গে। সেখান থেকে কয়েক মাইল দূরে চিত্রাপাথর গ্রাম, সেখানে চলে গেছি হাঁটতে হাঁটতে, সাঁওতালরা ডেকে নিয়ে বসিয়েছে তাদের হাঁড়িয়ার আড্ডায়। তখনো ওরা সমস্ত বাবুদের 'দিকু' বলে ভাবতে শেখেনি। একবার কী একটা মেলা ছিল, মোরগের লড়াই হয়েছে বেশ কয়েকটা। হেরে যাওয়া মোরগগুলোকে মেরে, পুড়িয়ে আকণ্ঠ মহুয়া সহযোগে খেয়ে সবাই যে যেখানে পারে শুয়ে পড়েছে, আমি আর পার্থও। প্রচণ্ড ঝড় উঠল মাঝরাতে, কাঁকর ছিটকে উঠে চোখেমুখে লাগছে, ঘুম ভেঙে উঠে নেশাতুর অর্ধজাগরিত অবস্থায় কোনোমতে মুখের সামনে হাত রেখে কাঁকর ঠেকাচ্ছি। ঝড়ের শোঁ শোঁ গর্জনে কানে তালা লাগবার উপক্রম। এমন সময় চোখে পড়ল, গোল, আকারে একটা মাঝারি সাইজের দোতলা বাড়ির মতো, কী যেন গড়াতে গড়াতে আসছে মাঠের ওপর দিয়ে। তাকিয়ে দেখছি, উঠে পালানোর ক্ষমতা নেই, সময়ও নেই। মুহূর্তের মধ্যে এসে পড়ল জিনিশটা— প্রকাণ্ড একটা গাছ, সকালে উঠে দেখেছিলাম গাছটা কদম, গড়াতে গড়াতে এসে হাত দশেকের জন্যে আমাদের না ছুঁয়ে ডানদিক দিয়ে গিয়ে একটা ডোবার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আরেকটু এপাশ ঘেঁষে এলে অর্ধেক চিত্রাপাথর গ্রাম উজাড় হয়ে যেত, সেই সঙ্গে আমরাও।

আমি তখন বেকার, একবার পুজোর ছুটির ঠিক আগে মাসখানেকেরও বেশি কাটিয়েছিলাম ওদের সঙ্গে, ওদের কোয়ার্টারে। শক্তি চলে আসত মাঝে মাঝে। কল্যাণ খুব ভালো গান গাইত, আমরা তখন কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের গানে পাগল, জ্যোৎস্নারাত্রে দিকচিহ্নহীন মাঠের মধ্যে চিৎকার করে গাইতে গাইতে উদ্দেশ্যহীন ঘোরা, "ও কেন দেখা দিল রে, না দেখা ছিল যে ভালো...." দেখা-র খা-তে ছোট্ট কিন্তু অসাধারণ মুর্কির কাজটা কল্যাণ গলায় তুলেছিল নিখুঁতভাবে, আর অন্তরার "দেখিতে না দেখিতে সে"র না-য়ের ওপরকার গমকটা। এই সেদিন কাগজে দেখলাম কী অসুখে কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের বাক্‌রোধ হয়ে গেছে, পড়ে অসম্ভব খারাপ হয়ে গেল মন। আমার জীবনের সেই লীলাময় রাত্রিগুলোর চাঁদের আলো যেন ম্লান হয়ে গেল। আমার বয়স বাড়ে বাড়ুক, যারা গান করে তারা কেন যে বুড়ো হয়।

কিছুদিন আমি থাকতে থাকতেই শক্তি চলে এল। দুপুরবেলা মানব আর কল্যাণ স্কুলে চলে যায়, আমি আর শক্তি বাড়িতে থাকি। প্রচণ্ড দুপুর, বাইরে বেরোনো অসম্ভব। দুপুরবেলা ঘরে বসে মহুয়া খাওয়া আর শক্তির কবিতা লেখা চেয়ে চেয়ে দেখা। লুঙ্গি পরা, খালি গা, একটা বালিশে কনুই দিয়ে আধশোয়া হয়ে শক্তি লিখে যায়, প্রায় কোনো কাটাকুটি করে না। আমি শুয়ে শুয়ে মানবের ডরোথি সেয়ার্স পড়ি।

একদিন এক দুপুরে চার-পাঁচটি কবিতা লিখল শক্তি : তার মধ্যে একটি "অবনী বাড়ি আছো?" আর একটি হল "আমি স্বেচ্ছাচারী"। ঘরের মধ্যে আমি আর শক্তি, বাইরে জ্বলন্ত দ্বিপ্রহর। মনে আছে লেখা শেষ করে এক হাতে গেলাশে মহুয়া,

চিত্রাপাথর থেকে ভোরবেলা সংগ্রহ করে আনা, অপর হাতে সদ্যরচিত পাণ্ডুলিপি, উন্মত্ত দরবেশের মতোই শক্তি পদদাপ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে—ঈষৎ স্খলিত উচ্চকণ্ঠে সেই টাটকা কবিতা পড়তে পড়তে। পূর্ব পূর্ব জন্মের বহু সুকৃতির পুণ্য সঞ্চিত থাকলে তবে এমন ঘটনার সাক্ষী হওয়া যায়—সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ঈশ্বরের এমন একজন ভয়ংকর প্রতিদ্বন্দ্বীর।

যেসব সুখ বা দুঃখের চরিত্র নিতান্ত ব্যক্তিগত সেগুলোকে কারো সঙ্গে ভাগ করে নেয়া যায় না। অন্য কেউ ঠিক বুঝতেই পারবে না তার সাফল্য বা ব্যর্থতাটা ঠিক কোন জায়গায়। যেমন একটা ছেঁড়াখোঁড়া কীটদষ্ট বইকে ভালোভাবে বাঁধিয়ে পুনরায় সেটাকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা—ধরা যাক সেটা একটা দুষ্প্রাপ্য বই, নষ্ট হয়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না—একটা সত্যি উদাহরণই দিই, যেমন বুদ্ধদেব বসুর নিজস্ব কবিতাপত্রিকার সেইটার কয়েকটা খণ্ড—এই কাজটা নিজে হাতে করে উঠে যে আনন্দ সেটা কারো সঙ্গে ভাগ করে নেয়া যায় না, সেটা সম্পূর্ণ আমার একলার। অন্য কেউ যদি শোনে, পাগলামি বলে মনে করবে। আর পাগলামি তো বটেই, কারণ যে কোনো ভালো দপ্তরি কয়েক পয়সার বিনিময়ে কাজটা বেশ ভালোভাবেই করে দেবে। সে তো দেবেই, কিন্তু নিজের হাতে কাজটা করে তোলার যে আনন্দ সেটার ভাগ নিতে পারে এমন বন্ধু আমার কোনোদিন জোটেনি।

কিম্বা ধরা যাক আরেক দিনের কথা। একা বাড়িতে আছি, সে এল বিকেলবেলা, সন্ধে থেকেই যাই যাই করতে লাগল। আমি তাকে বলছি রাত্রে থেকে যেতে—কিন্তু তার অনেক অসুবিধে, অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব, অনেক ভয়। সেসব কাটিয়ে বহু চেষ্টায় তাকে দিয়ে একটা টেলিফোন করাতে পারলাম তার বাড়িতে—সে এক জায়গায় আটকে গেছে, কাল সকালে ফিরবে, চিন্তার কোনো কারণ নেই। টেলিফোনটা রেখে দিয়ে আবছা অন্ধকারে টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে সে, সামান্য হাঁপাচ্ছে উত্তেজনায়, সন্ধ্যার আবছায়ায় অস্পষ্ট চোখে পড়ছে বড়ো বড়ো নিশ্বাসের সঙ্গে তার আঁচলের ওঠানামা—তখন আমার যে মনের ভাব হয়েছিল তা কি কখনো কাউকে বলতে পারব, নাকি বলা যায়।

এইভাবে ক্রমে জীবনের খাদ্য হয়ে উঠি। চীন ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ আরম্ভ হয়, আমার বাবা বর্মা থেকে ফিরে নেফায় চাকরি নিয়ে গিয়েছিলেন, যেখানে তাঁর কর্মস্থল ছিল সেই নাফরা বলে জায়গাটা বমডিলা থেকে তখনকার দিনে পাঁচদিনের হাঁটাপথ। সেখান থেকে ঘাঁটি ছেড়ে চলে আসার নির্দেশ যেদিন এসে পৌঁছল, ব্রিগেডিয়ার সাহেব সেটা চেপে রেখে দিয়ে, সমস্ত স্থানীয় কুলি জোগাড় করে তাঁর সমস্ত মালপত্র নিয়ে স্থানত্যাগ করলেন। এমনকী একটি কুলি তাঁর পোষা বেড়ালটাকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। পরের দিন যখন সামরিক নির্দেশ অন্যান্যদের কাছে এসে পৌঁছল তখন কোনো কুলি পাওয়া গেল না। আটান্ন বছরের প্রৌঢ় নিজের মাল নিজে বয়ে রওনা হলেন। কলকাতায় বাড়িতে এসে পৌঁছলেন এক বস্ত্রে, কোনো কিছুই আনতে পারেননি, বর্ষায় ভিজে মালপত্র এত ভারি হয়ে গিয়েছিল যে সবকিছুই পথে ফেলে আসতে হয়েছিল, জোঁকের কামড়ে দুই পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ঘা।

বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুতে পশ্চিমবঙ্গ শোকে পাগল হয়ে গেল, আমেরিকার

প্রেসিডেন্ট কেনেডি নিহত হলেন, নেলসন ম্যান্ডেলার আজীবন কারাদণ্ড হল। ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল, জওহরলাল নেহরুর মৃত্যু হল। আমি একটা ইশকুলে পড়াচ্ছি। দুটো-একটা ইশকুল কলেজে চাকরি করে শেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারে যোগ দিলাম। আমার সময় বলে যে সময়টাকে বুঝি, সে সময়টা কখন শেষ হয়ে গেল, আমার অগোচরেই। জীবনে নতুন কিছু, অভাবনীয় কিছু ঘটবার আর সম্ভাবনা রইল না। এখন যখন সেই সব কথা ভাবি, বহুদিন আগে পড়া উপন্যাসের গল্প মনে হয়—মনে হয়, এ সব আমার জীবনেই ঘটেছিল কি? তিরিশ চল্লিশ বছর কেটে গেলে আর নিজের জীবনের কথা থাকে না, গল্পের চেহারা পায় নিজের কাছেই। তার খানিকটা সত্যি, অনেকটাই পুনর্নির্মাণ, বানানো। অন্তত বানানো বলেই মনে হয় নিজের কাছে।

কত কী বদলে গেছে সেই সময়ের থেকে। তখন বিবাহিতা মেয়েরা শাঁখার সঙ্গে পলা পরত না। মা-মাসিদের কখনোই ওই লালরঙের চুড়িটা পরতে দেখিনি। কলকাতায় তখন কালীপুজোয় রমরমা ছিল না এত। দু'চারটি পুজো হয়ত হত, কিন্তু দুর্গাপূজার জাঁকজমকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না এমন। নৈহাটির কালীপুজোর খ্যাতি ছিল, যেমন জগদ্ধাত্রীপুজোর খ্যাতি ছিল চন্দননগরের। পরিবর্তন নিশ্চয়ই প্রতিনিয়তই হয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়ে চমকে উঠি। যেমন কয়েক বছর আগে চমকেছিলাম আমাদের সামনে একটি মেয়েকে দেখে—তার পরনে জিন্‌স্‌ আর টিশার্ট, কবজিতে শাঁখা লোহা, কপালে সিঁদুর। বিয়েবাড়ির ভোজে মুরগির মাংস তখন অকল্পনীয় ছিল, তবে আরম্ভ হল যখন থেকে মুরগি-বিপ্লব হয়ে মুরগি শস্তা হয়ে গেল আর পাঁঠার মাংসের দাম বেড়ে গেল, তখন থেকে ধীরে ধীরে। তারপর তো ডাক্তারের নির্দেশে রেডমিট খাওয়া বন্ধই হয়ে গেল।